জুল ভের্ন অমনিবাস

দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা

জুল ভের্ন (১৮২৮-১৯০৫)

জ়ুল ভের্ন অমনিবাস
৩

দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা

অ নু বা দ
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দে' জ পা ব লি শিং।। ক ল কা তা ৭ ০ ০ ০ ৭ ৩

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ ১৩৯৯
জানুয়ারি ১৯৯৩

স্বত্ব :
কৌশল্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

I S B N – 81-7079-222-3

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থণ :
অরিজিৎ কুমার
লেজার ইম্পেসনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক :
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সত্তর টাকা

কেউ না

যখন কেউ তার স্বাধীনতা হারায়, সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ যখন তাকে হন্যে হ'য়ে খুঁজে বেড়ায়, আত্মগোপন করবার জন্য তাকে যখন শেষকালে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় এতকাল যা ছিলো মানুষের অগম্য কোনো জলে বা ডাঙায়, তখন সে কে ? কেউ-না। নামহীন, দেশগোত্রহীন, পরিচয়হীন —শুধু স্পর্ধাই তার আছে তখন, আর আছে অন্য যে-সব দেশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের উদ্দেশে বাড়ানো সাহায্যের দক্ষিণ হাত। 'চলন্তের মধ্যে সচল' *নটিলাস* জাহাজের কাপ্তেন সম্বন্ধে এই রকমই ভেবেছিলেন জুল ভের্ন।

কিন্তু *টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগ্‌স আণ্ডার দি সী*-র গল্প যে-ভাবে ফাঁদা হয়েছিলো, শ্লেষ্মাকুল অধ্যাপক আরোনার জবানিতে, উত্তমপুরুষের-উক্তিতে, রচিত আখ্যান তাতে সবদিক সামলে-সুমলে সব খেই ধরিয়ে দিয়ে সব জট খুলে ফেলে *নটিলাসের* কাপ্তেনের জীবনবৃত্তান্ত খুব সহজে বলা যেতো না সম্ভবত—তখন জরুরি ছিলো ডুবোজাহাজ, জলের তলা দিয়ে আস্ত পৃথিবী ঘুরে-আসা, ডাঙার বদলে জলের প্রাণীবৈচিত্র্যের বিবরণ যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক ক'রে তুলে-ধরা। আর পাণ্ডিত্যের ব্যায়ামবিদ্‌ অধ্যাপক আরোনার সঙ্গে জুটিয়ে দিতে হয়েছিলো ডাকাবুকো অকুতোভয় তিমিশিকারি ক্যানাডার নেড ল্যাণ্ডকে। একজন ধীর, স্থির, শান্ত, জ্ঞানান্বেষী—অন্যজন করিৎকর্মা, চঞ্চল, অস্থির, টগবগে—এই দুই আপাতবিরোধী স্বভাবের দুজনকে দিয়ে একটা জুটি বাঁধিয়ে দিয়ে মজা দেখাও ছিলো জুল ভের্ন-এর খেয়াল—সঙ্গে আরো-যদি কেউ থাকে তবে সে হবে অনুগত পরিচারক, অযথা তর্কে সময় নষ্ট না-ক'রে, বিনাবাক্যব্যয়ে, যে চট ক'রে সবকিছু হাসিল ক'রে দেবে—কেননা পরিচারকটি যদি সারাক্ষণই পায়ের তলায় চাকা লাগিয়ে রোলার কোস্টারে চেপে খেলা দেখায়, তবে যে কী হয় তা তো দেখা যাবে যখন ফিলিয়াস ফগ বাজি ধ'রে আশি দিনে আস্ত পৃথিবীটাকেই সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ডাঙার ওপর দিয়ে ঘুরে দেখতে বেড়াবেন।

টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগ্‌স... -এর জট-না-খোলা রহস্যগুলো দাবি করছিলো অন্তত আরো-একখানা চনমনে রুদ্ধশ্বাস কাহিনী—যাতে এই কেউ-না-কাপ্তেনটির পরিচয় আমরা জানতে পারি। আবারও অধ্যাপক আরোনাকে দিয়ে বলানো যেতো না এই নতুন গল্প, কেননা তাঁকে যদি কাপ্তেন সব ব'লে দিতে চাইতেন তবে আগেই

তো সব ব'লে দিতে পারতেন; তা ছাড়া উত্তমপুরুষের বয়ান, তার আদর্শ বা তাত্ত্বিক চিন্তা, সেটা তখন অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকতো। জুল ভের্নকে তাই ভাবতে হচ্ছিলো সম্পূর্ণ অন্য কুশীলবের কথা—আর এটাও ঠিক ক'রে নিতে হয়েছিলো এবার গল্পের কোনো চরিত্র গল্পটা বলবে না। কী হবে তাহ'লে এই চরিত্ররা, এই নতুন-সব কুশীলব ?

জুল ভের্ন এবার গল্প ফেঁদেছিলেন মার্কিন মুলুকের গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায়, যেখানে তাঁর চরিত্ররা হবে দাসপ্রথার বিরোধী দলের মানুষ। জুল ভের্ন তখনও অব্দি বিশ্বাস করতেন মানুষের স্বাধীনতায়—ব্যর্থ ফরাশি বিদ্রোহের মূল বাণী তখন তাঁর মনে হচ্ছিলো সকলেরই আদর্শ হওয়া উচিত। তাছাড়া *নটিলাসের* কাপ্তেন যাদের সাহায্য করবেন তাদের স্বাধীনতার পক্ষে না-হ'লে চলবে কেন ?

বেলুনে ক'রে ঝড়ের আকাশে উড়াল, দৈনন্দিন জীবনযাপনের বেলায় উপযোগী বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো, অক্লান্ত পরিশ্রম মারফৎ স্বাবলম্বী হ'য়ে ওঠার বিবরণ—এইসব *মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড*কে রুদ্ধশ্বাস ক'রে রেখেছে। আর আড়ালে থেকে তাদের যিনি সাহায্য ক'রে আসছেন—তিনি অন্যকোনো গ্রহের জীব নন, দেবতা বা অপদেবতাও নন—তিনি সেই *নটিলাসের* কেউ-না—পরিচয়বিহীন কাপ্তেন। জুল ভের্ন স্বভাবতই দানিকেন নন, তাই ভিন্ন গ্রহের জীব এসে দেবতা সেজে কিছু ক'রে যায়নি। এবং শেষ অব্দি কীভাবে কাপ্তেন নেমোর পরিচয় বেরিয়ে পড়লো—সেটাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। সঙ্গে আছে পাপ, অনুতাপ, শোধন— এই নিয়ে একটি নৈতিক কাহিনী, ফাউ। আর আরম্ভটা ছিলো অন্য-একটি উপন্যাসে, ইংরেজিতে যার নাম *ইন সার্চ অভ দ্য কাস্টঅ্যাওয়েজ,* যেটা পরের কোনো খণ্ডে বেরুবে এই অমনিবাস পর্যায়ে।

অন্য কাহিনীটিতে আবার বলটিমোরের *গান-ক্লাব :* ইম্পে বার্বিকেন এবং তাঁর সহযোগীরা। এবারে চাঁদে যাওয়ার গল্প, : ব্যারন মুনখাউসেনের মতো নয়, তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণাকে ব্যবহার ক'রে মোটামুটি *সম্ভাব্য* একটা উপায়ে নিয়ে যেতে হবে মানুষকে চাঁদে।

. *ফ্রম দি আর্থ টু দ্য মুন* প্রথম আবির্ভাবেই তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মাধ্যাকর্ষণ পেরিয়ে চাঁদে যাবার জন্য অন্য পরিকল্পনা করেছে, হাউইনির্মাণবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে। হয়তো কামানের গোলা থেকে নিক্ষিপ্ত আকাশযানে ক'রে কেউ এখন অন্তরিক্ষ বিজয়ে বেরুবে না—তবু মোটামুটি যানটাকে তীব্রগতিতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের পাল্লা থেকে বার ক'রে দেবার পরিকল্পনাটা জুল ভের্ন-এর উদ্ভাবনী শক্তি ও অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম কল্পনারই পরিচায়ক। জুল ভের্ন বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, ছিলেন সাহিত্যিক। বৈজ্ঞানিকের তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হ'লে নাকচ হ'য়ে যায়—সাহিত্যিকের কল্পনায় তৈরি উপাখ্যানের সেই বিপদ নেই। নেই যে, তার প্রমাণ *ফ্রম দি আর্থ টু দ্য মুন*।

জুল ভের্ন-এর কৌতুক সরল, সুমধুর, অনেক সময়েই নেহাৎ মজা—অন্তত

এখনও পর্যন্ত। পরে জুল ভের্ন বিজ্ঞানের অপব্যবহার দেখে রূঢ়কঠোর পরিহাস আমদানি করবেন তাঁর রচনায়—নিছক কৌতুকহাস্য তা আর থাকবে না। রহস্য কথাটির সর্বাঙ্গীন অর্থে তাই এই রচনাগুলো জ'মে উঠেছে—কেননা রহস্য মানে তো শুধু ধাঁধাজাগানো জটপাকানো রোমাঞ্চ নয়, কৌতুকও।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৯ পৌষ ১৩৯৯

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : কলকাতা ৭০০ ০৩২

ফ্রম দি আর্থ টু দ্য মুন
ক্লিপার অভ দ্য ক্লাউড্স
দ্য মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড
অ্যালবাট্রস

ফ্রম দি আর্থ টু দ্য মুন

প্রথম পর্ব

কামান দাগো বাবুম-বুবুম
কামান দাগো চাঁদের দিকে !

১

'যুদ্ধ ছাড়া কাটে না দিন,
অসহ্য এই আলস্য !'
বললো যারা, সব মার্কিন,
গান-ক্লাবেরই সদস্য !

অক্টোবর মাসের তিন তারিখের সন্ধেবেলায় আমেরিকার বল্টিমোর শহরে সুবিখ্যাত 'গান-ক্লাবে'র বড়ো হলঘরটায় একটা সভা বসেছিলো । বাইরে রাত্রির কুয়াশা নেমেছে একটু-একটু ক'রে, আর নামছে অন্ধকার । লোকজনের চলাফেরা এর মধ্যেই অল্প হ'য়ে এসেছে । কিন্তু সেই সভায় হাজির হয়েছিলো অনেক লোক, এবং তাদের সকলেই গান-ক্লাবের সভ্য । সমাগতদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো সাধারণ, এবং তা সহজেই চোখে পড়ে ; তাদের কারু শরীরই আস্ত ছিলো না । কারু-বা হাত আছে, একটি পা নেই ; কারু-বা পা-দুটি সম্পূর্ণ আছে কিন্তু হাতদুটি অদৃশ্য ; আবার কারু-কারু হাত-পা দুইই আছে, কিন্তু একটি চোখ কি একটি কান নেই । কারু-বা কাঠের হাত, কারু-বা কাঠের পা, কারু-কারু পাথরের চোখ । অর্থাৎ সভায় যতজন লোক হাজির হয়েছিলো, তাদের কারুরই শরীর নিখুঁত নয়, কোনো-না-কোনো অঙ্গহানি হয়েছেই ।

গান-ক্লাবের যারা সভ্য, তাদের একমাত্র কাজই ছিলো কামান, বন্দুক, গোলা-বারুদ তৈরি করা । সম্মেলনের নামটা সে-জন্যেই গান-ক্লাব । সভ্যরা সবাই ওস্তাদ গোলন্দাজ, এবং সেই হিশেবেই তাদের নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো । কেমন ক'রে কামান তৈরি করলে বড়ো-বড়ো একেকটা গোলাকে বহুদূরের পাল্লায় প্রেরণ করা যায়, কী করলে সেই দূর-পাল্লার কামানের গোলা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অনেক জায়গা ধ্বংস ক'রে ফেলতে পারে, গান-ক্লাবের সুবিখ্যাত সভ্যদের তা-ই ছিলো একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ।

কামান-বন্দুক, গোলা-বারুদ—এ-সব অস্ত্রশস্ত্রের জোর পরখ করতে গিয়েই তারা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারাতো । কিন্তু তাই ব'লে তারা কখনো আপশোশ করতো না, বরং তা-ই যেন তাদের প্রতিভার সোনালি প্রতীক হ'য়ে উঠেছিলো । কী করলে ধ্বংসের বাজনা

আরো জোরে বাজানো যায়, কেমন ক'রে আরো অনেক বেশি মানুষ মারা যায়, তার নতুন-কোনো পরিকল্পনায় সাফল্য লাভ করতে পারলেই তারা ভাবতো মানবজন্ম বুঝি সার্থক হ'য়ে গেলো ।

এহেন গান-ক্লাবের সভ্যদের সামনেও একদিন বিষম দুর্দিন ঘনিয়ে এলো । যে-সব যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছিলো, হঠাৎ সে-সব গেলো থেমে । পৃথিবীর সকল মানুষই যুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো : 'শান্তি চাই' । এবং, আশ্চর্য হবার মতো বিষয় হ'লেও সত্যই একদিন পৃথিবীর উপর থেকে সমস্ত যুদ্ধ থেমে গেলো । 'শান্তি স্থাপিত হোক সর্বত্র'—এ-কথায় কারুই আপত্তি ছিলো না, কিন্তু সত্যি-সত্যি যখন একদিন যুদ্ধ থেমে গেলো, গান-ক্লাবের সভ্যদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'লো । তাদের মনে হ'লো সর্বনাশ হ'য়ে যাচ্ছে, আর তো গোলা-বারুদ, কামান-বন্দুকের ব্যবহার ঘটবে না ; আর-তাহ'লে এ-সব অস্ত্রের উন্নতি হচ্ছে না অবনতি হচ্ছে, সেই তথ্য কী ক'রে অবগত হওয়া যাবে ? কেল্লায়-কেল্লায় স্তূপীকৃত হ'য়ে প'ড়ে রইলো গোলা-বারুদ ; একদিন যে-সব কামান-বন্দুকের চকচকে ইস্পাত রোদে ঝিলকিয়ে উঠতো, মরচে প'ড়ে গেলো সে-সবে, গোলন্দাজেরা আলস্যে শরীরে বাত হ'তে দিলো । একদিন যেখানে কামানের গোলায় মাঠে-মাঠে হাজার-হাজার ছোটো-বড়ো গর্ত হয়েছিলো সেখানে জ'মে গেলো মাটি, চাষীরা ফুর্তিতে নানারকম ফসল ফলাতে শুরু করলো । সভ্যরা চোখের সামনে দেখতে লাগলো তাদের সমস্ত কীর্তিকলাপ বিস্মৃতির তলায় মিলিয়ে যাচ্ছে । ইতিহাসের তথ্যলিপ্সু কোনো অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ছাড়া তাদের ক্লাবের নাম কেউ আর বিশেষ জানতে চায় না । এমনকী খোদ আমেরিকার সব-সময়-লেগে-থাকা গৃহযুদ্ধগুলোও যখন বন্ধ হ'য়ে গেলো তখন গান-ক্লাব-এর সদস্যরা চোখের সামনে দেখলো চাপ বাঁধা জমাট অন্ধকার ; আচমকা তাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো । ক্লাবের বড়ো হল-ঘরটায় সভ্যদের ভিড় আর হ'তো না, কোনো সভা বসতো না, নতুন-কোনো মারণাস্ত্র আবিষ্কার ক'রে প্রায়ই তারা যে-উল্লাসধ্বনি তুলতো, তা-ও আর শোনা যেতো না । কেনই বা আর ভিড় হবে, সভাই বা বসবে আর কী জন্যে, আর নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার ক'রেই বা আর-কী লাভ ? ক্লাবের দু-চারজন মাথাওলা সদস্য ছাড়া আর-কেউ ঐ ধারই মাড়াতো না আর । দেশি-বিলেতি কত পত্র-পত্রিকা টেবিলের উপর প'ড়ে থাকতো, কিন্তু একটারও প্যাকেট খুলে দেখতো না কেউ, কোনো মোড়কই খোলা হ'তো না ।

তবে অক্টোবরের তিন তারিখে অকারণেই অনেকদিন পরে বহু সভ্য জমায়েত হয়েছিলো । ঘরের কোণায় চুল্লির ঘুলঘুলি আবার অনেকদিন পরে দাউ-দাউ আগুনের টকটকে লাল আভা ছড়িয়ে দিচ্ছিলো । সেই আগুনের আঁচে হাত সেঁকতে-সেঁকতে হান্টার ক্ষোভের সুরে বললেন, 'আমাদের কী-রকম দুর্দিন পড়েছে, দেখছো ! একেবারে যেন কুঁড়ের বাদশা হ'য়ে যাচ্ছি আস্তে-আস্তে ! অথচ এমন দিনও ছিলো, যখন ঘুম ভাঙতো কামানের গর্জনে, আবার ঘুমিয়েও পড়তুম কামানের নির্ঘোষ শুনতে-শুনতে । হায়-রে সে-দিন ! জীবনটা অসহ্য হ'য়ে উঠলো ! আর কি সে-দিন আসবে ?' সময় এবং নদীর জলের চ'লে যাবার কথা বলতে-বলতে হান্টার উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন ; তাঁর কাঠের পা-খানা যে চুল্লির আগুনে পুড়ে যাচ্ছে সেদিকে কোনো খেয়াল না-ক'রেই চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'ইচ্ছে করে যারা শান্তি এনেছে, সেইসব লোকগুলোকে একবার মুখোমুখি দেখি !'

বিল্‌স্‌বি বললেন, 'হুঁ' ! আর সে-দিন আসবে ! খ্যাপা না পাগল ! সে-সব দিনগুলো তো স্বপ্ন ! আগে একটা পেল্লায় কামান তৈরি হ'তে-না-হ'তেই তার পরীক্ষা শুরু হ'তো। তারপর যেই শিবিরে ফিরেছি, অমনি বন্ধুদের সে কী হৈ-চৈ ! আবার কামান একদিন একটু বেশি মানুষ মারতে পারলে তাদের কী উল্লাস ! অমনটি আর হয় না, হবেও না !'

ক্লাবের সেক্রেটারি ম্যাস্টন তাঁর প্লাস্টিকের তৈরি ডান হাতের তালু চুলকোতে-চুলকোতে ক্ষোভের স্বরে বললেন, 'বরাত ! সবই বরাত ! ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ বাধবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আজ সকালে বেকার ব'সে থাকতে-থাকতে শেষ পর্যন্ত একটা নতুন ধরনের কামানের নকশা এঁকে ফেলেছি। শুধু নকশাই নয়, মায় মাপ, ওজন সব বার ক'রে ফেলেছি। এ যদি ব্যবহার করতে পারা যেতো তাহ'লে দেখতে পেতে যুদ্ধের ধারাই একেবারে আমূল বদলে গেছে।'

কর্নেল ব্লুম্‌স্‌বি চশমা খুলে তাঁর পাথরের বাঁ-চোখ রুমাল দিয়ে মুছতে-মুছতে বললেন, 'তাই নাকি হে ?'

'নিশ্চয়ই !' ম্যাস্টন বললেন, 'এই-তো, দ্যাখো না নকশাটা। কিন্তু কী-ইবা লাভ এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ! এ দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না। আমেরিকার লোক তো আর যুদ্ধ করবে না !'

কর্নেল ব্লুম্‌স্‌বি বললেন, 'তার চেয়ে চলো আমেরিকা ছেড়ে য়ুরোপে চ'লে যাই। তারা তো আর আমেরিকান নয়, একটু উশকে দিতে পারলেই হ'লো, সঙ্গে-সঙ্গেই যুদ্ধ বাধিয়ে বসবে।'

হান্টার অবাক হ'য়ে শুধোলেন, 'তাতে আমাদের কী হবে ?'

'কী হবে মানে ? তাদের হ'য়েই না-হয় কামান বানাবো। মানুষ মারার কল তৈরি তো ? তা, সে যেখানে-সেখানে করলেই হ'লো। রক্তের রঙ সব জায়গাতেই তো লাল ! তা ছাড়া এতে আমাদের কাজও হবে, কোনো আমেরিকানও মরবে না।'

'ধেৎ, তা-ই কি হয় ?' হান্টার বললে, 'ইয়াঙ্কি হ'য়ে কিনা বিদেশীর জন্যে কামান বানাবো !'

ব্লুম্‌স্‌বি চ'টে উঠে বললেন, 'কিছু না-করার চেয়ে তো ভালো। কুঁড়ের মতো ব'সে থাকতে-থাকতে যেটুকুও জানতুম, তা-ও ভুলে-যাবার জোগাড় !'

ম্যাস্টন বললেন, 'না-হে কর্নেল, তোমার ঐ বিদেশে—বিশেষ ক'রে য়ুরোপে—যাবার আশা ছাড়ো। জাতীয় উন্নতি কীসে হয়, সে-সব বুঝতে তাদের এখনো যথেষ্ট দেরি ! কোথায় মার্কিন মুলুক আর কোথায় য়ুরোপ ! আমেরিকার সঙ্গে তাদের কিছুতেই বনবে না।'

হান্টার করুণভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তা-হ'লে আর কী, চলো এখন লাঙল নিয়ে মাঠে নেমে যাই, আর না-হ'লে তিমি মাছ ধ'রে তার চর্বিটা নিয়ে গিয়ে চুল্লিতে চাপাই ! হুঁ ! যত্তসব !'

ম্যাস্টন একটু উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, 'অতটা আর করতে হবে না হে ! চিরদিনই কি আর শান্তিতে কাটবে ? দ্যাখো না, দু-দিনেই যুদ্ধ লেগে যাচ্ছে ! ফ্রান্স কি ভুল ক'রেও আমাদের দু-একখানা জাহাজ আটকে রাখবে না ? ইংল্যাণ্ড কি আর দু-চারজন ইয়াঙ্কি খুনেকে ফাঁসিতে লটকাচ্ছে না ? দ্যাখো-না, একটা যুদ্ধ বাধলো ব'লে ! কেবল একটা সুযোগের

অপেক্ষা মাত্র ।'

'কিন্তু ম্যাস্টন, তুমি এ-তথ্যটা ভুলে যাচ্ছো কেন যে, আমেরিকার চামড়া এখন মোষের মতো পুরু হয়েছে । ছুঁচের ঘা আর লাগছে না । তোমার ঐ আশায় ছাই দাও । আমরা কি আর মানুষ আছি ! গোল্লায় গেছি, একেবারে গোল্লায় গেছি ! নইলে কি আর এতদিনেও ছোটোখাটো একটা যুদ্ধ বাধে না ?'

ব্লুম্‌স্‌বি বললেন, 'একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে কী-রকম হয় ?'

'কেমন ক'রে বাধাবে ? কারণ কই যুক্তিসংগত ?'

'কারণ ?' ব্লুম্‌স্‌বি বললেন, 'কারণের আবার অভাব ? এই দ্যাখো-না—আমেরিকা কি একদিন ইংরেজদের ছিলো না ?'

'ছিলো বৈকি । কিন্তু তাতে কী ?'

'তাতে কী ? তাহ'লে ইংল্যাণ্ডই বা আমাদের দেশ হবে না কেন ?'

বিল্‌স্‌বি তাঁর ভাঙা দাঁত কিড়মিড় ক'রে বললেন, 'হুঁ ! যাও-না একবার প্রেসিডেন্টের কাছে, মজাটা টের পাইয়ে দেবেন ! অমি কিন্তু এবার আর ওঁকে ভোট দেবো না !'

'কে দেবে ?' হান্টার বললেন, 'ঐ গোবেচারা ঘর-কুনো লোকটাকে আবার কে ভোট দেবে ? আমি তো দিচ্ছি না !'

তখন সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হ'লো, আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্টকে কেউ আর ককখনো ভোট দেবে না । এমন সময় উত্তেজিত সভ্যরা দেখতে পেলো ক্লাবের বেয়ারা এসে চেঁচিয়ে একটা নোটিস পড়ছে ।

'গান-ক্লাবের সভাপতি মিস্টার ইম্পে বার্বিকেন সবিনয়ে সকল সদস্যকে জানাচ্ছেন যে, আগামী পাঁচই অক্টোবর সন্ধে আটটার সময় তিনি সভ্যদের এক চমকপ্রদ আশ্চর্য খবর শোনাবেন । মিস্টার বার্বিকেন আশা করেন যে সকল সদস্যই সমস্ত কাজ ফেলে সেদিন সভায় হাজির হবেন । প্রত্যককে আবার জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে সেদিনকার সভার বিষয় ভীষণ জরুরি ।'

২

আচমকা সব চাঙ্গা হঠাৎ,
উত্তেজনা তুমুল :
তাজ্জব এক প্রকল্প যে
বাধায় হুলুস্থুল !

পাঁচই অক্টোবর বিকেলবেলাতেই গান-ক্লাবের মস্ত হলঘরটায় লোক আর ধরে না । ত্রিশ হাজারেরও বেশি সদস্য গান-ক্লাবের । ঘণ্টায়-ঘণ্টায় প্রত্যেক ট্রেনে সদস্যরা আসতে লাগলো । অত বড়ো হলঘরটায় পর্যন্ত আর তিলধারণের জায়গা রইলো না । শেষে রাস্তার

মোড়ে-মোড়ে পর্যন্ত হাজার-হাজার উত্তেজিত লোক অপেক্ষা করতে লাগলো। ক্লাবের ফটকে বসলো দারোয়ান : সমিতির সদস্য ছাড়া আর-কারু ভিতরে ঢোকা পুরোপুরি নিষিদ্ধ ক'রে দেয়া হ'লো ।

ক্লাবের বিরাট আলো-উজ্জ্বল ঘরের এক কোণায় একটা উঁচু মঞ্চের উপর সভাপতির আসন নির্দিষ্ট ছিলো। সেই আসন বানানো হয়েছিলো কামান-বওয়া গাড়ির উপর। আসনের সামনে টেবিল, আর টেবিলের সামনে সদস্যদের বসবার জন্যে গ্যালারি বানানো হয়েছিলো।

সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন ধীর, সুস্থির, গম্ভীর মানুষ । তাঁর প্রত্যেক কাজ চলতো ক্রনোমিটারের কাঁটার মতো । অন্যের কাছে যে-কাজ অকল্পনীয় ও দুঃসাধ্য, বার্বিকেন তা অবলীলাক্রমেই করতে পারতেন। সমিতির সভ্যবৃন্দের মধ্যে শুধু-কেবল তাঁরই দেহ নিখুঁত ছিলো । অথচ তাঁর মতো নিত্য-নতুন গোলা-বারুদ-কামান-বন্দুক আবিষ্কার করতে আর-কেউ পারেনি ।

আটটা বাজতে যখন দেড় মিনিট বাকি, তখন কালো রেশমের একটা টুপি মাথায় দিয়ে বার্বিকেন মঞ্চে উঠলেন । ঘড়িতে যেই আটটা বাজার প্রথম ঘণ্টা বাজলো—ঢং, তখনই বার্বিকেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের বীর সহযোগিবৃন্দ ! আমাদের সুবিখ্যাত গান-ক্লাবের সদস্যরা আজ পরম অকর্মণ্যতার মধ্য দিয়ে যে-জীবন কাটাচ্ছেন তা সত্যই দুর্বহ । হঠাৎ যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সমস্ত যুদ্ধ থেমে আপোষ-রফা হ'য়ে যাবে, তা কে জানতো ! এবং এই আপোষ যে দীর্ঘস্থায়ী হবে, তাও ছিলো সকলেরই স্বপ্নের অগোচর। অথচ প্রতি সেকেণ্ড নতুন যুদ্ধের প্রতীক্ষায় কাটিয়ে এতদিনে আমরা এই তথ্য সম্বন্ধে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে অচিরকালের মধ্যে কোনো যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা নেই । আমরা কি তবে চুপ ক'রে ব'সে থাকবো ? কামান-বন্দুক গোলা-বারুদের আর-কি কোনো উন্নতি হবে না ?

'আমি আপনাদের জিগেস করি, আর যদি যুদ্ধ না-ই হয় তাহ'লে কি আমরা গণ্ডমূর্খের মতো নিশ্চেষ্টই তাকিয়ে থেকে প্রমাণ ক'রে দেবো যে আমরা এই ঊনবিংশ শতাব্দীর অযোগ্য ? আমি জিগেস করি, পৃথিবীখ্যাত গান-ক্লাব কি আজ তার সম্মান রাখবার জন্যে নতুন ধরনের কোনো বিশেষ কাজে লাগতে পারবে না ?'

হাজার-হাজার গলা চেঁচিয়ে উঠলো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ ! গান-ক্লাব নতুন কোনো কাজ করতে চায় !'

বার্বিকেন ব'লে চললেন, 'বন্ধুগণ ! আমি অনেক ভেবে দেখেছি, গান-ক্লাব এখন এমন-একটা কাজে হাত দিতে পারে, যা শুধু এই গান-ক্লাবেরই সাজে, যা শুধু আমেরিকারই মানায়। দুনিয়াশুদ্ধু লোক সে-কথা শুনলে অবাক হ'য়ে যাবে ।'

এখানে হাজার কণ্ঠের ধ্বনি উঠলো : 'কী ? কী ? সে-কাজ কী ?'

'আপনারা মন দিয়ে আমার কথা শুনুন । সে-কথা বলবার জন্যেই আজ এই সভার আয়োজন ক'রে আপনাদের ডেকে আনা হয়েছে। আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, আপনারা সকলেই পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রকে দেখেছেন । আমরা সেই চন্দ্রলোকে অভিযান চালাতে চাচ্ছি : চন্দ্রলোক আবিষ্কার ক'রে আমরা নতুন কলম্বাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে চাই । নতুন-কোনো ক্রিস্তোবাল কোলন হ'য়ে উঠবো আমরা । আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভূত

রাজ্য এখন ছত্রিশটি : গান-ক্লাব তার শক্তি প্রয়োগ ক'রে আরেকটি নতুন রাজ্য তার অন্তর্ভুক্ত করতে চায় । চন্দ্রলোকও আমাদের অধিকারে আসবে ।'

উল্লাসে গান-ক্লাবের সদস্যরা এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলো যে মনে হ'লো ঘরের ছাদ যেন ভেঙে পড়বে ।

'বন্ধুগণ,' বার্বিকেনের গম্ভীর গলা শোনা গেলো, 'আপনারা জানেন যে চন্দ্রলোক নিয়ে প্রচুর আলোচনা হ'য়ে গেছে । চাঁদের গুরুত্ব, ঘনত্ব, অবস্থা, গতি, গঠনপ্রণালী, দূরত্ব—সবকিছুই আজ আমরা জানি । এই সৌর জগতে চাঁদ কী কাজ করে, তা-ও আমাদের জানতে বাকি নেই । ব্যারন মুন্‌খাউসেনের চাঁদে পাড়ির আজগুবি গল্পও হয়তো অনেকের জানা । আপনারা হয়তো চাঁদকে নিয়ে লেখা অনেক গল্প-কল্প পড়েছেন, চন্দ্রলোকে যাবার অনেক পরিকল্পনার কথা শুনেছেন । কিন্তু এ-পর্যন্ত সে-কাজে কেউই সাহস ক'রে এগিয়ে আসতে পারেননি । কাজেই চন্দ্রলোক এখনো সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত বললে ভুল বলা হয় না । সেই অজানা সাম্রাজ্য আবিষ্কার ও অধিকার ক'রে আমরাই হবো পৃথিবীর'—সভ্যদের তুমুল হট্টগোলে আর-কিছু শোনা গেলো না । কিছুক্ষণ বাদে যখন উত্তেজনা একটু কমলো তখন বার্বিকেন আবার বলতে শুরু করলেন, 'আপনারা হয়তো ভাবছেন এ অসম্ভব । কিন্তু মোটেই না—বরং খু-ব সোজাই বলা যায় । গত কয়েক বছরে কামানের ক্ষমতা কত বেড়েছে কত দূর পর্যন্ত তার গোলার পাল্লা, তাছাড়া বিস্ফোরকেরও কতটা উন্নতি হয়েছে, তা বোধকরি আপনাদের ব'লে দিতে হবে না । আপনারা নিঃসন্দেহে জানেন দক্ষ লোকের কাছে বারুদ কত জোর পায়, কামানের পাল্লা কতটা বাড়ে । সেই কারণেই আমি ভাবছিলুম চন্দ্রলোকে আমাদের কামানের একটি গোলা ফেলতে পারলে দোষ কী ? তাতে আমাদের কামানের পাল্লাও পরখ ক'রে নেয়া যাবে, চাঁদের দেশও দখল ক'রে নেয়া হবে ।'

অন্ধকার রাত্রে চলতে-চলতে বিদ্যুতের আলোয় সামনে উদ্যতফণা সাপ দেখলে মানুষ যেমন স্তম্ভিত হ'য়ে থাকে, বার্বিকেনের এই প্রস্তাব শুনে ক্লাবের সদস্যরা খানিকক্ষণ তেমনি মুহ্যমান হ'য়ে রইলো । কিন্তু সংবিৎ ফেরবার সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে যে-উল্লসিত চীৎকার উঠলো, তাতে মস্ত হলঘরটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো । বার্বিকেন আবার কথা বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সম্ভব হ'লো না । এই শোরগোলের মধ্যে কোনো কথা বলবার চেষ্টা করা বাতুলতা । খানিকক্ষণ বাদে সদস্যরা যখন একটু শান্ত হ'লো, তখন বন্ধ হলঘর বার্বিকেনের উদাত্ত কণ্ঠস্বরে আবার গমগম ক'রে উঠলো : 'আমার আরেকটি কথা বলবার আছে । আমি এ ক-দিন ভালো ক'রে হিশেব ক'রে দেখেছি, সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ যেতে পারে এমন-একটা গোলা যদি চাঁদকে লক্ষ্য ক'রে ছোঁড়া যায়, তাহ'লেই তা চাঁদে পৌঁছুবে । তাই আপনাদের কাছে আমার সবিনয় আবেদন যে আপনারা আপাতত কুঁড়ের মতো ব'সে না-থেকে এই সামান্য কাজটায় একটু মনোনিবেশ করুন ।'

৩

খাতার পাতায় হিশেব খোলা :
কেমন কামান, কেমন গোলা !

গান-ক্লাবের সভাপতি বার্বিকেন যখন ক্লাবের হলঘরে বক্তৃতা করছিলেন, তখনি প্রত্যেকটি শব্দ টেলিগ্রাম ক'রে ওয়াশিংটনে, ফিলাডেলফিয়ায়, নিউইয়র্কে, বস্টনে পাঠানো হচ্ছিলো। সারা আমেরিকা যখন বার্বিকেনের পরিকল্পনা জানতে পারলো, তৎক্ষণাৎ উৎসব শুরু হ'য়ে গেলো। শহরে-শহরে শোভাযাত্রা বেরুলো, নাচ-গানের কলরব শুরু হ'লো, বন্যা ব'য়ে গেলো শ্যাম্পেনের ; সারা মার্কিন দেশে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে যেন শুরু হ'লো জাতীয় উৎসব।

রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে-সরাইয়ে, রেস্তোরাঁয়-কফিখানায়, আপিশে-বন্দরে—যেখানেই দু-জন লোক মুখোমুখি হ'লো, অমনি শুরু হ'লো চাঁদের কথা। আমেরিকার হাজার হাজার খবর-কাগজে চাঁদের দেশে কামানের গোলা পাঠানো সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হ'য়ে গেলো। কেউ সামাজিক, কেউ রাজনৈতিক, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ-বা দার্শনিক, আবার কেউ-কেউ স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে বার্বিকেনের প্রস্তাবটি বিচার করলো। আর শেষকালে সবাই একটি কথাই বললো যে, গান-ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন অসম্ভব কিছুই বলেননি, ইয়াঙ্কিরা সবকিছুই পারে, আর এইজন্যেই আমেরিকা ও য়ুরোপে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

যে-ইম্পে বার্বিকেন তাঁর নতুন প্রস্তাবে সারা যুক্তরাষ্ট্রে তুমুল শোরগোল সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর ভাবলেশহীন মুখে কিন্তু উত্তেজনার কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না। লোকে যখন কল্পনায় চাঁদের দেশে নিত্য-নতুন অভিযান চালাচ্ছে, তখন বার্বিকেন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে চাঁদের দেশে যাবার পথ ঠিক করছিলেন।

কেম্‌ব্রিজ মানমন্দির পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো এবং ভালো অবজারভেটরি ব'লে সুনাম অর্জন করেছিলো। সেখান থেকে বার্বিকেন এক চিঠি পেয়ে জানলেন যে প্রতি সেকেণ্ডে যদি কোনো গোলা বারো হাজার গজ যেতে পারে তাহ'লে অনায়াসেই তা চাঁদে পৌঁছুবে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম তাহ'লে আর সে-গোলার উপর খাটবে না, অভিকর্ষ তাকে আর পৃথিবীতে টেনে নামাতে পারবে না। চলতে-চলতে গোলাটা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছুবে, যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণের চেয়ে চাঁদের আর্কষণের জোর হ'য়ে উঠবে বেশি, আর তার ফলে গোলাটা তখন আরো-বেগে চাঁদের দিকে চ'লে যাবে। গোলাটি যদি বরাবর সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ যেতে পারতো তাহ'লে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা চাঁদে পৌঁছুতে পারতো। কিন্তু তা তো আর হবে না ! মাধ্যাকর্ষণ আছে, বাতাসের বাধা আছে ; এবং এর ফলেই আস্তে-আস্তে গতি কমতে থাকবে। বিজ্ঞানীরা অঙ্ক ক'ষে বললেন, যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণ শেষ হ'য়ে চাঁদের আকর্ষণ শুরু হয়েছে সেখানে পৌঁছুতে গোলার লাগবে তিরাশি ঘণ্টা বিশ মিনিট। আর সেখান থেকে চাঁদে পৌঁছুতে লাগবে আরো তেরো ঘণ্টা তিপ্পান্ন মিনিট কুড়ি সেকেণ্ড।

তোমরা জানো, চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। হ্যাঁ, ঘোরে তো নিশ্চয়ই, তবে বৃত্তাকারে

নয়। ঘুরতে-ঘুরতে যখন পৃথিবী থেকে চাঁদ সবচেয়ে দূরে স'রে যায়, তখন সে-দূরত্ব হয় দুশো সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো বাহান্ন মাইল। আর যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখনো পৃথিবী থেকে চাঁদ আঠারো হাজার ছ-শো মাইল দূরে থাকে। কাজেই চাঁদ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখনি কামান ছোঁড়বার ঠিক সময়, এবং তাতে সুবিধেও অনেক।

প্রত্যেক মাসেই চাঁদ একবার পৃথিবীর খুব কাছে আসে, কিন্তু সকল মাসেই জেনিথ ছাড়িয়ে আসে না। অনেক বছর পর-পর চাঁদ এ-ভাবে পৃথিবীর খুব কাছে আসে। বিজ্ঞানীরা বার্বিকেনকে জানালেন যে, আগামী বছর ডিসেম্বরের চার তারিখে রাত্রি দ্বি-প্রহরে অনেক বছর পরে চাঁদের এই অবস্থা ঘটবে। তার আগে পয়লা ডিসেম্বর রাত দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডের সময় চাঁদকে লক্ষ্য ক'রে কামান ছুঁড়তে হবে। এইই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, কারণ তখন পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব আরো কয়েক মাইল ক'মে যাবে। ঠিক ঐ সময়ে কামান ছুঁড়তে না-পারলে আঠারো বছর এগারো দিনের আগে চাঁদ আর এই পৃথিবীর নিকটতম জায়গায় আসবে না। আর, কামান ছুঁড়তে হবে দক্ষিণ বা উত্তর অক্ষরেখার শূন্য ডিগ্রি থেকে আঠাশ ডিগ্রির মধ্যকার কোনো জায়গা থেকে; না-হ'লে অন্য-কোনো জায়গা থেকে যদি কামান ছোঁড়া হয় তবে তার গতি আস্তে-আস্তে বেঁকে গিয়ে গোলাকে চাঁদ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা আরো বললেন যে, চাঁদ প্রত্যেক দিন তেরো ডিগ্রি দশ মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ড পথ চলে। চাঁদ যখন জেনিথ থেকে চৌষট্টি ডিগ্রি দূরে থাকবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই চাঁদকে লক্ষ্য ক'রে কামান ছুঁড়তে হবে।

এ-সব বিষয় যখন ঠিক হ'য়ে গেলো, তখন গান-ক্লাবের সভ্যবৃন্দ একটি বিশেষ বৈঠকে মিলিত হলেন। সেই বৈঠকে ঠিক হ'লো, লোহার বা পিতলের গোলা হ'লে চলবে না, কারণ তাহ'লে গোলা অসম্ভব ভারি হ'য়ে যাবে; কেবল-মাত্র অ্যালুমিনিয়ামের গোলা হ'লে এই মারাত্মক ওজনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। আর ঐ গোলার ব্যাস করতে হবে নয় ফুট, কারণ আয়তন তার চেয়ে কম হ'লে সব-সেরা দুরবিনেও গোলাটা দেখা যাবে না। গোলাটা ফাঁপা করতে হবে; চাই-কি, তার ভিতর পৃথিবীর দু-চারটে জিনিশের নমুনাও পাঠিয়ে দেয়া যাবে। ন-ফুট ব্যাসের ফাঁপা গোলাটার ওজন হবে দুশো চল্লিশ মণ পঁচিশ সের। কিন্তু গোলাটা যদি লোহার হয় তাহ'লে তার ওজন সেখানে হবে আটশো তেতাল্লিশ মণ। তাই সকলে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে অ্যালুমিনিয়মের গোলাই বানানো হবে। হিশেব ক'রে গোলা বানাবার সম্ভাব্য ব্যয় দেখা গেলো পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশো একাশি ডলার।

গোলাটা কী-ধরনের হবে, কী-রকম হবে, সব যখন ঠিক হ'য়ে গেলো, তখন এলো ঐ বিপুল ওজনের ন-ফুট চওড়া গোলা ছোঁড়বার উপযোগী কামানের কথা, আর এ-প্রশ্নও সঙ্গে-সঙ্গে এলো, কী ক'রে ঐ গোলার গতি সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ করা যায়।

শূন্যে একটি গোলা ছুঁড়লে যে-বায়ুস্তর ভেদ ক'রে সেটা এগিয়ে চলে সেই বায়ু তাকে বাধা দেয়, মাধ্যাকর্ষণও তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করে; তবুও সেটা এগিয়ে চলে বারুদের জোরে যে-বেগ পায় তার সাহায্যে। পৃথিবীর চল্লিশ মাইল উপরে আর বায়ুস্তর নেই, কাজেই যে-গোলা সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ ছুটবে, সে অবিলম্বেই বায়ুস্তর পেরিয়ে যাবে ব'লে

কয়েক সেকেণ্ড পর আর বায়ুস্তর কাটাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তখনও মাধ্যাকর্ষণের কথা থাকে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলি রচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞান বলছে যে, একটি জিনিশ যতই উপরে উঠবে তার ওজনও ততই দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতে কমতে থাকবে। গোলার বেগ বাড়াতে পারলেই মাধ্যাকর্ষণ অনায়াসে কাটিয়ে নেয়া যাবে। সেই বেগ নির্ভর করে কামানের দৈর্ঘ্য আর বারুদের জোরের উপর। তার মানেই হ'লো কামানটা খুব বেশি লম্বা করতে হবে, কারণ কামানের নলচে যতই লম্বা হবে গোলার পিছনে বারুদের গ্যাস ততই বেশি জমবে, এবং সেই কারণেই গতিবেগও বাড়বে।

বার্বিকেন হিশেব ক'রে জানালেন যে, এই কাজের জন্যে চল্লিশ হাজার মণ বারুদের প্রয়োজন হবে। এ-কথা শুনে ক্লাবের সদস্যরা অবাক হ'য়ে গেলেন, কেননা চল্লিশ হাজার মণ বারুদে বাইশ হাজার ঘন-ফুট জায়গা জুড়বে। তারপর বারুদের গ্যাসেরও জায়গা চাই, জায়গা চাই গোলাটা রাখবার ; তার মানে কামান হবে কয়েক হাজার ঘন-ফুট লম্বা। কিন্তু বার্বিকেন তখন জানালেন যে কামান হবে ন-শো ফুট লম্বা, ব্যাস ন-ফুট, পুরু ছয় ফুট এবং তার ওজন হবে উনিশ লক্ষ পনেরো হাজার দুশো মণ ; আর বানাবার খরচ পড়বে এগারো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশো কুড়ি ডলার।

গান-ক্লাবের সেক্রেটারি ম্যাটসন বললেন, 'চল্লিশ হাজার মণ বারুদে জায়গা জুড়বে বাইশ হাজার ঘন-ফুট। ন-শো ফুট লম্বা ন-ফুট ব্যাসের কামানে অল্পবিস্তর চুয়ান্ন হাজার ঘন-ফুট জায়গা আছে। তার প্রায় অর্ধেক জায়গাই যদি বারুদ রাখতে লেগে যায়, তাহ'লে বারুদের গ্যাস কোথায় থাকবে ? গোলাটা তো তাহ'লে চলবেই না।'

অবিচলিত স্বরে বার্বিকেন বললেন, 'আপনারা জানেন, গাছে বা লতা পাতায় অগুনতি কোষ আছে। তুলোয় এই কোষ আছে সব-চেয়ে বেশি। উত্তপ্ত নাইট্রিক অ্যাসিডে পনেরো মিনিট তুলো ভিজিয়ে শুকিয়ে নিলেই পৃথিবীর সবচেয়ে তীব্র বিস্ফোরক তৈরি হ'য়ে গেলো। বারুদ জ্বলে দুশো চল্লিশ ডিগ্রি গরমে, আর এই তুলো জ্বলবে একশো সত্তর ডিগ্রি উষ্ণতায়। তা ছাড়া এই তুলোর শক্তি হবে সাধারণ বারুদের চারগুণ বেশি। যতটা তুলো লাগবে তার চার-পঞ্চমাংশ নাইট্রেট-অভ্-পটাশ তুলোর গায়ে লাগিয়ে দিলে গ্যাসের প্রসারণ-শক্তি যাবে আরো অনেক বেড়ে। তার মানে, চল্লিশ হাজার মণ বারুদের বদলে আমাদের লাগবে মাত্র পাঁচ হাজার মণ তুলো। চাপ দিলে ছ-মণ দশ সের তুলোকে সাতাশ ঘন-ফুটের ভিতরে রাখা যায়। কাজেই আমাদের যতটুকু তুলো লাগবে, তা অনায়াসেই একশো আশি ঘন-ফুটের মধ্যে রাখা যাবে। তার মানে হচ্ছে, আমাদের ন-শো ফুট লম্বা কামানের প্রয়োজনীয় গ্যাসের অভাব হবে না।'

তার পরে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর প্রথম ঠিক করা হ'লো যে, হয় টেক্সাস, নইলে ফ্লরিডা—এই দু- জায়গার কোনো-এক এলাকা থেকেই চাঁদে গোলা পাঠানো হবে। তখন টেক্সাস আর ফ্লরিডার ঝগড়া বেধে গেলো। টেক্সাস বললে, 'আমিই চাই চাঁদের দেশে পৃথিবীর প্রথম গোলাপাঠানোর গৌরব', আর অমনি ফ্লরিডা রেগে উঠে বললে, 'তার মানে ! চাঁদের সঙ্গে প্রথমে আত্মীয়তার জয়মাল্য আমারই প্রাপ্য।' টেক্সাসের লোকেরা দল বেঁধে বল্টিমোরে এলো বার্বিকেনের সঙ্গে দেখা করতে, ফ্লরিডা থেকেও অগুন্তি লোক এলো গান-ক্লাবে। দু-দলের তর্ক শুনতে-শুনতে সভ্যদের কান ঝালাপালা হ'য়ে গেলো, মাথার মধ্যে ভোঁ-ভোঁ

করতে লাগলো, কানের পর্দা শোরগোলে ফেটে যাবার জোগাড় হ'লো । কিন্তু কোনো মীমাংসার নাম-গন্ধও দেখা গেলো না ।

শেষকালে এমন হ'লো যে, টেক্সাসের লোকেরা ফ্লরিডার বাসিন্দাদের রাস্তায় দেখলেই মারামারি বাধিয়ে দেয়, ফ্লরিডা তো সরকারিভাবে যুদ্ধ-ঘোষণার তোড়জোড় করতে লাগলো। এ-রকম অবস্থা দেখে বার্বিকেন ঘোষণা করলেন, 'টেক্সাসে আছে এগারোটি শহর, আর ফ্লরিডায় মাত্র একটি । কাজেই ফ্লরিডাকে মনোনীত না-করলে টেক্সাসের শহরে-শহরেই লড়াই শুরু হ'য়ে যাবে প্রত্যেকেই বলবে, "এ-শহরেই কামান তৈরি হোক" ।'

৪

এই ধরলাম বাজি :
প্রকল্পটা ভেস্তে যাবেই,
মৎলবটাই পাজি !

গান-ক্লাবের সমস্ত সিদ্ধান্তই যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'লো তখন কেবল সারা আমেরিকাতেই হুলস্থুল বাধলো না, সমস্ত পৃথিবীতেই শোরগোল প'ড়ে গেলো । কেউ বলে আড়াইশো মণ ওজনের গোলা বার্বিকেন বানাতেই পারবেন না, আর ন-শো ফুট লম্বা কামান বানানো তো পাগলের খেয়াল । তাছাড়া এ-সব বানাতেও তো আর কম টাকা লাগবে না, সে-টাকা জোগাড় হবে কোত্থেকে ? কেউ-বা বললেন, অমন কামানে বারুদ ঢালা অসম্ভব ; কোনোরকমে যদিও-বা ঢালা যায়, তবে আড়াইশো মণ ওজনের গোলার চাপে তা আপনা থেকেই জ্ব'লে উঠবে । কেউ-বা বললেন, বারুদে আগুন দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই কামান ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে । অনেকে আবার সোজাসুজি বললেন, কামানের গোলা দশ মাইল পথও যাবে না, চাঁদে পৌঁছুনো তো দূরের কথা । কেউ-বা আবার বার্বিকেনের সমস্ত সিদ্ধান্তকেই সম্ভব ব'লে জোর গলায় ঘোষণা করলেন । অর্থাৎ বার্বিকেনের পক্ষে-বিপক্ষে দু-দুটো যুযুধান দল খাড়া হ'য়ে গেলো ।

বার্বিকেন কিন্তু এইসব উত্তেজনা নজরেই আনলেন না । তাঁর ভাবহীন মুখে ভালো-মন্দ কিছুরই আভাস পাওয়া গেলো না । এইসব নানা ধরনের হৈ-হল্লার মধ্যে বার্বিকেন ফ্লরিডায় গেলেন কামান বানাবার জায়গা ঠিক করতে । অনেক ঘোরাঘুরির পর তাঁর পছন্দ হ'লো স্টোনিহিল ; ঘোষণা করা হ'লো যে, এই স্টোনিহিল-এর চুড়ো থেকেই চন্দ্রলোক লক্ষ্য ক'রে কামান ছোঁড়া হবে ।

ইস্পে বার্বিকেন সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র যাঁর নিন্দা-প্রশংসাকে গ্রাহ্য করতেন, তিনিও বার্বিকেনের মতোই পরিশ্রমী, দৃঢ়চেতা, দুঃসাহসী, এবং বার্বিকেনের সঙ্গে তাঁর চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা । তাঁর নাম কাপ্তেন নিকল । বিপদের মুখে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে কখনো তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হ'তো না । মৃত্যুকে সামনে দেখে তিনি কখনো পিছু হঠতেন না । সমস্ত

যুক্তরাজ্যে যখন ইম্পে বার্বিকেনের জয়গান গাওয়া শুরু হ'লো, তখন ফিলাডেলফিয়ায় ব'সে-ব'সে কাপ্তেন নিকল হিংসায় জ্বলতে লাগলেন ।

কাপ্তেন নিকল আর ইম্পে বার্বিকেনের মধ্যে কোনো পরিচয় ছিলো না, জীবনে কখনো পরস্পরের মুখোমুখি হননি তাঁরা ; অথচ বার্বিকেনকে বিফল হ'তে দেখলে নিকল আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠতেন । বার্বিকেন যতই জোরালো কামান তৈরি করতেন, নিকল ততই সুদৃঢ় বর্ম বানাতেন । বার্বিকেন চাইতেন কঠিনতম পদার্থকেও কামানের গোলায় শতচ্ছিদ্র ঝাঁঝরা ক'রে ফেলতে, আর নিকলের কাজ ছিলো বার্বিকেনের যাবতীয় সংকল্পকে ব্যর্থ করা । দু-জনের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিন্তু কামান এবং বর্মের খুব উন্নতি হয়েছিলো, এবং সে-জন্যেই এই দুই প্রতিযোগীর মধ্যে কে বড়ো, তা বলা সম্ভব নয় । তবে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলতে হয় যে, দু-জনেই দু-জনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ।

কাপ্তেন নিকল যখন শুনলেন যে বার্বিকেনের নতুন কামানের নলচে হবে ন-শো ফুট লম্বা এবং গোলার ওজন হবে দুশো চল্লিশ মণ পঁচিশ সের, তখন হতাশায় তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন । তিনি ভেবেও কূল পেলেন না এখন তাঁর কাজ কী । কেবলই ভাবতে লাগলেন এমন-কোনো বর্ম কি বানানো যাবে, যাতে এ-গোলাও প্রতিহত হবে, যার কাছে কোনো জারিজুরিই খাটবে না এ-গোলার ! কিন্তু তিনি কোনো ভরসা পেলেন না । স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এমন-কোনো বর্ম তৈরি করা অসম্ভব ।

আর সেইজন্যেই ঈর্ষায় তিনি আরো খেপে উঠলেন । অঙ্কের পর অঙ্ক ক'ষে, বিজ্ঞানসম্মত নানান আলোচনা ক'রে, তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে, গান-ক্লাবের সভাপতির পরিকল্পনাটি একবারে উন্মাদ পাগলের কল্পনাবিলাস ছাড়া আর-কিছুই না । বাতুল না-হ'লে কি আর কোনো লোক এমন গাঁজাখুরি কল্পনা করতে পারে ? বার্বিকেনকে মানসিক চিকিৎসালয়ে পাঠানো হোক—এ-কথাই তিনি বারে-বারে বললেন । তবুও যখন বার্বিকেন তাঁর সংকল্প থেকে পিছু হঠলেন না, বরং কামান এবং গোলা বানাবার জন্য প্রচণ্ড উৎসাহে তোড়জোড় করতে লাগলেন, তখন কাপ্তেন নিকল সরকারকে বললেন যে, বার্বিকেন বে-আইনি কাজ করতে চাচ্ছেন ; এ-ভাবে কামানের জোর পরীক্ষা করা রীতিমতো অন্যায় ; কামানের জোর যাচাই করবার সময় যদি কামান ফেটে যায় তাহ'লে অগুন্তি মানুষ প্রাণ হারাবে, যে-জায়গায় পরীক্ষা হবে, সে-জায়গাও একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যেতে পারে ; কিংবা এমনও তো হ'তে পারে যে বার্বিকেন আসলে শান্তিভঙ্গ ক'রে যুদ্ধ বাধাবার পরিকল্পনা নিয়েই এই কামান তৈরি করছেন !

সরকার কিন্তু কাপ্তেন নিকলের কথায় কোনো কান তো দিলো না-ই, বরং চুপ ক'রে থেকে বার্বিকেনের প্রস্তাবে সম্মতি জানালো । রকম-সকম দেখে নিকল আরো রেগে উঠলেন । খবর কাগজে বার্বিকেনের বিরুদ্ধে নানারকম প্রবন্ধ রচনা করলেন তিনি ; কিন্তু তাতেও তাঁর পক্ষে কোনো জনসম্মতি জুটলো না । তখন তিনি কাগজে প্রকাশ্যে বার্বিকেনের সঙ্গে এই ব'লে বাজি ধরলেন :

(ক) গান-ক্লাবের নতুন পরিকল্পনাকে সফল ক'রে তুলতে যত টাকা লাগবে, তা কখনোই জোগাড় করা যাবে না । বাজি এক হাজার একশো পঁচিশ ডলার ।

(খ) ন-শো ফুট লম্বা কামান ছাঁচে ঢালাই করা সম্ভব হবে না। বাজি : দু-হাজার দু-শো পঞ্চাশ ডলার।

(গ) যদিও-বা কামান বানানো সম্ভব হয়, কামানে বারুদ ঢালা কিছুতেই সম্ভব হবে না, কেননা আড়াইশো মণ ওজনের গোলার চাপে তা আপনা থেকেই জ্ব'লে উঠবে। বাজি : তিন হাজার তিনশো পঁচিশ ডলার।

(ঘ) বারুদে আগুন দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই কামানটি চক্ষের পলকে ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে। যদি তা না-হয় তবে আমি মিস্টার ইম্পে বার্বিকেনকে চার হাজার চারশো পঞ্চাশ ডলার দিতে বাধ্য থাকবো। এবং

(ঙ) কামান যদি একান্তই চূর্ণ-বিচূর্ণ না-হ'য়ে যায় তাহ'লে চাঁদ তো দূরের কথা, কামানের গোলা দশ মাইল পথও যাবে না, বাজি : আট হাজার ন-শো ডলার।

অর্থাৎ কামানের গোলা যদি দশ মাইল পথও অতিক্রম করতে পারে, তাহ'লে আমি মিস্টার ইম্পে বার্বিকেনকে কুড়ি হাজার পঞ্চাশ ডলার দিতে আইনত এবং ন্যায়ত বাধ্য থাকবো।

(স্বাক্ষর) কাপ্তেন নিকল

দিন-কয়েক পরে কাপ্তেন নিকল গান-ক্লাবের সীল-মোহর-দেয়া একটি লেফাফা পেলেন। তার ভিতরে একটি মূল্যবান চিঠির কাগজের মধ্যে শুধু একটি লাইন লেখা :

আমি বাজি ধরলুম। —ইম্পে বার্বিকেন : সভাপতি, গান-ক্লাব।

৫

কামান তবে তৈরি হবে ?
তেতে উঠলো ভুঁই !
নিকল তবে হেরেই গেলেন
বাজি নম্বর দুই !

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ থেকে চাঁদা আসতে লাগলো গান-ক্লাবের নামে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এমন হ'লো যে ডাকঘরের লোকেরা মানি-অর্ডার বিলি করতে-করতে প্রায় হয়রান হ'য়ে যাবার জোগাড়। কিছুদিনের মধ্যেই বার্বিকেন দেখলেন যে গান-ক্লাবের নামে প্রায় তিন কোটির মতো ডলার জমেছে। তখন মহা উৎসাহে শুরু হ'লো কামান এবং গোলা বানানোর কাজ।

এঞ্জিনিয়ার মার্চিসন দু-হাজার মজুর নিয়ে স্টোনিহিলে কাজ শুরু ক'রে দিলেন। এতদিনকার জনহীন প'ড়ে-থাকা স্টোনিহিল এক সপ্তাহের মধ্যেই একটি জনবহুল আধুনিক শহরে পরিণত হ'য়ে গেলো। কয়েকদিন ধ'রে জাহাজ থেকে শুধু কেবল কলকব্জা আর

যন্ত্রপাতিই আনানো হ'লো। শাবল, কুড়ুল, কোদাল, হাতুড়ি ইত্যাদি যে ক'ত এলো তা কে গুনতে পারে! কত রকমের যন্ত্রপাতি, কত ক্রেন, বয়লার, চুল্লি, রেললাইন—এমনকী লোহা দিয়ে বানানো ছোটো-ছোটো ঘর-বাড়ি অব্দি টম্পা বন্দরে নামানো হ'লো। টম্পা থেকে মাইল পনেরো দূরে স্টোনিহিল। বার্বিকেন দু-দিনের ভিতর এই পনেরো মাইল রাস্তায় রেললাইন বসিয়েছিলেন।

এক বার্বিকেন যেন হাজার হলেন। যেখানে সামান্যতম অসুবিধে, সেখানে বার্বিকেন; যেখানে মজুরদের ভিতর সামান্য অসন্তোষ, সেখানে বার্বিকেন; যেখানে কাজ বেশি এগুচ্ছে না, সেখানে বার্বিকেন। এককথায়, যেখানেই যাওয়া যাক না কেন সেখানেই দেখা যেতে লাগলো বার্বিকেনের উঁচু মাথা। তাঁর কাছে কোনো বাধাই আর বাধা হ'য়ে রইলো না। কোথাও-বা তিনি নিজে মাটি কাটছেন, কোনোখানে তাঁকে নিজ হাতে কাঠ কাটতে দেখা গেলো, আবার কোথাও-বা তিনি নিজে কল চালাচ্ছেন। এ-সব দেখে-শুনে মজুররাও নতুন উৎসাহে ও উত্তেজনায় কাজ করতে লাগলো।

পয়লা নভেম্বর টম্পা থেকে স্টোনিহিলে এসে বার্বিকেন দেখলেন, সেখানে কিছুদিনের মধ্যেই সারি-সারি ঘর-বাড়ি গ'ড়ে উঠেছে ঘরে-ঘরে কুলি-মজুর, স্থপতি, তাঁতি, কামার বাস করছে, কাঠের দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে সেই নতুন-তৈরি-হওয়া শহরকে, কারখানা তৈরি হয়েছে বৈদ্যুতিক আলোর।

বার্বিকেন সেদিনই মজুরদের একটি সভা ডাকলেন। বললেন, 'বন্ধুগণ! তোমরা নিশ্চয়ই এর মধ্যেই শুনেছো যে আমরা ন-শো ফুট লম্বা একটা কামান বানিয়ে ঠিক সোজাভাবে মাটির উপর বসাতে চাই। কুড়ি ফুট উঁচু পাথরের পাঁচিল দিয়ে কামানটা ঘেরা থাকবে। কাজেই ষাট ফুট চওড়া আর ন-শো ফুট লম্বা একটি খাদ আমাদের তৈরি করতে হবে। এত-বড়ো একটা কাজ যদি ঠিক সময়ে ভালোভাবে করা যায়, তাহ'লে আমাদের সমস্ত অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম সার্থক হবে। যদি দিনে দশ হাজার ঘন-ফুট মাটি কাটা যায় তাহ'লেই কাজটা ঠিক সময়ে শেষ হ'তে পারে। আমরা তোমাদেরই অধ্যবসায় আর কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর ক'রে আছি। এঞ্জিনিয়ার মার্চিসন যে-পরিকল্পনা মতো কাজ করতে বলবেন তোমরা যদি স্থিরভাবে কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে সে-কাজ ক'রে যাও তাহ'লেই আমাদের এই বিরাট পরিকল্পনা সার্থক হবে, এবং চন্দ্রলোক অভিমুখে পৃথিবীর প্রথম অভিযানের ইতিহাসে তোমাদের নামও সোনার হরফে লেখা হ'য়ে থাকবে।'

প্রাণপণে কাজ করতে লাগলো মজুররা। ওক কাঠের একটা খুব শক্ত ও বড়ো চাকার উপর পাথরের দেয়ালটা বানানো হ'তে লাগলো। মাটি কাটার সঙ্গে-সঙ্গে তা নামতে লাগলো মাটির নিচে। এই সাংঘাতিক দুঃসাহসী ও বিপজ্জনক কাজে দু-চারজনকে মারাত্মকভাবে আহত হ'তে হ'লো, কেউ-কেউ প্রাণ পর্যন্ত হারালো, কিন্তু তবু কেউ দ'মে গেলো না। দিন-রাত সমানে কাজ চলতে লাগলো। দিন-রাত ঘটাংঘট ঘট ঘট আওয়াজ শোনা গেলো কল-কব্জার, সকল সময় গোঁ-গোঁ গুমরানি শোনা গেলো এঞ্জিনের, সুপটু ও সবল হাজার-হাজার হাত ব্যস্ত হ'য়ে থাকলো একটানা।

তিনমাসের মধ্যেই পাঁচশো ফুট গভীর খাদ খোঁড়া হ'য়ে গেলো, দশই জুন তারিখে কূপটি ন-শো ফুট নিচে নামলো। সেদিন গান-ক্লাবের সভ্যদের আনন্দ দ্যাখে কে! ঐ

ন-শো ফুট গভীর খাদকে কেন্দ্র ক'রে ছ-শো গজ দূরে বারোশো বড়ো-বড়ো চুল্লি বানানো হয়েছিলো। গোল্ড স্প্রিং কম্পানি নিলে কামান তৈরি করার ভার। আটষট্টিখানা জাহাজ বোঝাই ক'রে তারা কেবল সতেরো লক্ষ মণ লোহাই আনালে। কম্পানি নিজেদের বড়ো-বড়ো চুল্লিতে ঐ লোহা একবার কয়লা আর বালির মধ্যে ঢেলেছিলো। কিন্তু পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাবার জন্যে ঐ লোহাকে আবার গলাবার দরকার হ'য়ে পড়েছিলো। সেই গলন্ত লোহার স্রোতকে কড়া থেকে এক সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে বের করিয়ে নিয়ে বারো শো নালার ঐ ন-শো ফুট গভীর খাদে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

যেদিন খাদ বানানো শেষ হ'লো বার্বিকেন তার পরদিনই সিমেন্ট নিয়ে খাদের ঠিক মাঝখানে ন-ফুট ব্যাসের ন-শো ফুট লম্বা কামানের নলচে তৈরি করতে শুরু করলেন। এই নল আর পাথরের পাঁচিলের মধ্যে যে-ফাঁকা জায়গা ছিলো, তারই ভিতর গলন্ত লোহা ঢেলে কামান তৈরি করবার বন্দোবস্ত করা হ'লো।

লোহা ঢালাই করবার দিন ভোরবেলায় যেন অগ্নিকাণ্ড গেলে গেলো। দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে বারোশো চুল্লি, আগুনের লকলকে জিহ্বা যেন লাফাচ্ছে আকাশ ছোঁবার জন্যে, চিমনির মুখ দিয়ে হু-হু ক'রে ধোঁয়া বেরিয়ে আকাশ ঢেকে ফেলছে। শোনা যেতে লাগলো আগুনের হিস-হিস আওয়াজ। ঠিক হ'লো যে একটা কামান থেকে তোপ দাগার সঙ্গে-সঙ্গে একসঙ্গে সবগুলো কড়া থেকে লোহার বন্যা ছুটে চলবে খাদের ভিতর।

বেলা বারোটা। একটা ছোট্ট টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছেন গান-ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইম্পে বার্বিকেন। বারোটার শেষ ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তোপ দাগা হ'লো। তোপের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই বারোশো পিপের ঘুলঘুলি দিয়ে আগুনের সাপ ফণা নেড়ে ধেয়ে এলো। তরল আগুনের বন্যা ছুটলো খাদের দিকে। বারোশো নালার ভিতর জোয়ার এলো তরল আগুনের। ঝড়ের সমুদ্রের মতো তোলপাড়-তোলা ঢেউ তার। সেই তরল লোহা হু-হু ক'রে খাদের মধ্যে নামতে লাগলো, ঝাঁক বেঁধে আলোর ফুলকি উড়লো আকাশে, যেন বহু যুগের ঘুম ভেঙে জেগেছে অগ্নিগিরি বিসুবিয়সের জ্বালামুখ। মাটি কাঁপলো সেই তরল লোহার প্রবল স্রোতধারায়, যেন শুরু হ'লো দারুণ ভূমিকম্প।

লোহা ঢালাই হবার সপ্তাহ-খানেক পরেও দেখা গেলো কামানের নল দিয়ে তখনো উঠছে আগুনের লেলিহ লোল জিহ্বা। আরো এক সপ্তাহ কাটলো, কিন্তু কামানের নল দিয়ে অগ্নিবাষ্প ওঠার বিরাম নেই : তখনো তার এক মাইলের ভিতর যাবার উপায় নেই, আগুনের আঁচে ঝলসে যায় শরীর। অথচ নতুন কামান দেখবার জন্যে সবাই উদগ্রীব হ'য়ে আছেন। সত্যি-সত্যি যদি কামানটি ঠিকমতো তৈরি না-হ'য়ে থাকে, তাহ'লে গোটা পরিকল্পনাই ব্যর্থ। তাহ'লে কুড়ি বছরের মধ্যে তো চাঁদ আর পৃথিবীর এত কাছে আসবে না! আশা আর নিরাশার তুমুল বোঝাপড়ায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গেলো সবার। সকলেই কামানটা দেখবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। বার্বিকেনও বোধহয় ব্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মনের ভাব কখন কী-রকম থাকে, তা বোঝা হয়তো ঈশ্বরেরও অসাধ্য। এক মাইল জায়গা জুড়ে এমনভাবে যে তেতে থাকবে মাটি, তা কেউ আগে বুঝে উঠতে পারেনি। কারু বারণ না-মেনে ম্যাস্টন একবার কামানের কাছে যাবার চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু তাপে তাঁর রবারের জুতো গ'লে গেলো, আগুনের আঁচে প্রায় পুড়ে গেলো পা, মরতে-মরতে কোনোরকমে

পালিয়ে বাঁচলেন তিনি । স্টোনিহিলে তখন কারু ঢোকবার হুকুম ছিলো না । বার্বিকেনের হুকুমে আগে থেকেই স্টোনিহিলের ফটকে ফটকে কড়া পাহারা বসেছিলো ।

আরো কিছুদিন গেলে বার্বিকেন মাত্র কয়েক গজ এগুতে পারলেন কামানের দিকে। তখনো সেখানকার মাটি কাঁপছিলো, তখনো চারদিকের উষ্ণ মাটি থেকে তপ্ত বাষ্প উঠছিলো আগের মতো । শেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আগস্ট মাসের শেষদিকে মাটি ঠাণ্ডা হ'লো । একটুও সময় নষ্ট না-ক'রে বার্বিকেন কাজ শুরু ক'রে দিলেন । সিমেণ্টের ছাঁচটিও লোহার মতোই শক্ত হ'য়ে উঠেছিলো । কোনোরকমে কপিকলের সাহায্যে তা সরানো হ'লো । তারপর আস্তে-আস্তে কামানের অভ্যন্তরভাগ মসৃণ ক'রে তোলার কাজ আরম্ভ হ'লো ।

অবশেষে বাইশে সেপ্টেম্বর দেখা গেলো কামানটা ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে । তখনই সে-খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো । কাপ্তেন নিকলও অন্য-সকলের সঙ্গে এ-খবর শুনলেন । বলাই বাহুল্য, দু-নম্বর বাজি হেরে গিয়ে তাঁর রাগ আরো বেড়ে গেলো ।

৬

এ-কোন আজব কথা উঠছে ?
এ-কোনদেশী প্রস্তাব ?
মিশেল আর্দা মানুষটা কে ?
সত্যি কী তার মনের ভাব ?

পরদিন—তেইশে সেপ্টেম্বর—স্টোনিহিলের বন্ধ ফটক থেকে কড়া পাহারা অপসারিত হ'লো । স্টোনিহিলের বন্ধ ফটক সকলের জন্যে উন্মুক্ত হ'লো । অমনি এক প্রবল জনস্রোত প্রবেশ করলো সেখানে । বিস্মিত ও বিস্ফারিত হাজার-হাজার চোখ মাটির নিচে বানানো ঐ কামানের দিকে তাকিয়ে রইলো : তাহ'লে সত্যিই চন্দ্রলোকে গোলা প্রেরণের কামানটা তৈরি হয়েছে !

ছোট্ট শহর টম্পা । তারই কাছে কী এত-বড়ো একটা কাণ্ড হচ্ছে ! শহরে মানুষের আর জায়গা হচ্ছে না দেখে শহরের কর্তৃপক্ষ পাশের গ্রাম এবং বিপুল প্রান্তর নিয়ে শহরের আয়তন বাড়িয়ে দিলেন । টম্পা আর ছোট্ট শহর হ'য়ে রইলো না, প্রায় নিউ-ইয়র্কের সঙ্গে পাল্লা দেবার উপযোগী একটা শহর হ'য়ে উঠলো । দু-দিনের মধ্যেই চললো ট্র্যাম, গাড়ি-ঘোড়া ; হাজার-হাজার দোকান বসলো, অগুনতি ইশকুল, কলেজ, হাসপাতাল, সরাইখানা স্থাপিত হ'লো অল্পদিনের মধ্যে । আলাদিনের জাদু-প্রদীপের মায়ায় যেন রাতারাতি একটি আধুনিক বড়ো শহর হ'য়ে উঠেছে টম্পা ।

দু-দিন আগেও যে-শহর নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য ছিলো, এখন সেখানে যেন সারা যুক্তরাজ্য এসে বাসা বানালে । আমেরিকানরা কখনো অলস হ'য়ে থাকবার লোক নয়, জাত-সদাগর তারা ; চাঁদে কামানের গোলা পাঠানো দেখতে এসে তারা টম্পায় ব্যাবসা ফেঁদে

বসলো। কত বড়ো-বড়ো গুদাম বানানো হ'লো মাল বোঝাই ক'রে রাখবার জন্যে, কত বাণিজ্যবিষয়ক খবরের কাগজ বেরুলো নতুন-তৈরি-হওয়া ছাপাখানায়। সংক্ষেপে, দু-দিন আগের ছোট্ট শহর টম্পা রাতারাতি এত অদ্ভুত রকমে বদলে গেলো যে, যারা আগে টম্পাকে দেখেছে, তারা এই নতুন শহর দেখে দু-হাতে চোখ কচলে ভাবতে লাগলো : রিপ ভ্যান উইঙ্কল হ'য়ে গেলুম না তো, না কি শেষটায় এসে পৌঁছুলুম সেই সহস্রাধিক-এক আরব্য রজনীর কোনো রাতে?

যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গে টম্পার যোগাযোগের সুব্যবস্থার জন্যে নতুন একটি রেলপথ তৈরি হ'য়ে গেলো। যুক্তরাজ্যের সমস্ত লোক ঝাঁক বেঁধে এসে ভেঙে পড়লো স্টোনিহিলে বানানো সেই কামান দেখতে। বাইরে থেকে কামানটার চেহারা দেখেই কেউ ক্ষান্তি দিলো না, মাটির নিচে ন-শো ফুট নেমে কামানের তলা পর্যন্ত দেখতে লাগলো। নামবার সুবিধের জন্য বড়ো-বড়ো কপিকল এনে বার্বিকেন তার সঙ্গে গদিমোড়া আসন যোগ করলেন: হাজার-হাজার মানুষ টিকিট ক'রে সেই আসনে ব'সে পাতালে ঢুকে কামান দেখতে লাগলো। পরে হিশেব ক'রে দেখা গিয়েছিলো, শুধু ঐ টিকিট বাবদই গান-ক্লাব দু-কোটি ডলার উপার্জন করেছে।

একদিন গান-ক্লাবের সকল সদস্য ন-শো ফুট নিচে কামানের তলায় ব'সে এক বিপুল ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। বৈদ্যুতিক আলোয় অন্ধকার পাতাল স্পষ্ট দিবালোকের মতো হ'য়ে উঠেছিলো। ভোজসভার পর সদস্যরা সবাই গান-ক্লাব এবং যুক্তরাজ্যের দীর্ঘ জীবন কামনা ক'রে ধ্বনি তুলেছিলেন। আর তাঁদের সেই সমবেত গলার ধ্বনি পাতাল থেকে ন-শো ফুট উপরে উঠে হাজার কামানের গর্জনের মতো ছড়িয়ে পড়লো। মাটির উপরে তার জবাবে হাজার-হাজার কণ্ঠ থেকে সাড়া উঠলো : 'গান-ক্লাব দীর্ঘজীবী হোক! যুক্তরাজ্য দীর্ঘজীবী হোক!'

ম্যাস্টন আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ব'লে উঠলেন, 'সারা দুনিয়ার বাদশাহি পেলেও আমি কিছুতেই এখান থেকে একচুলও নড়বো না। এক্ষুনি যদি কেউ এই বিশাল কামানে কার্তুজ ভরে গোলা পুরে দেয়, তাহ'লেও আমি এখানেই থাকবো। বরং গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে যাবো, তবু একচুলও নড়বো না।' একটু থেমে তিনি গান-ক্লাবের নামে 'হুরে' দিয়ে উঠলেন, যার জবাব অন্যরাও দিলেন সমবেত গলায়।

পাতালে ভোজসভা ছেড়ে যখন বার্বিকেন বেরুলেন, তখন তাঁর খুশি-ভরা চোখ চকচক করছিলো। উপরে উঠে দেখলেন, তাঁর নামে বিদেশ থেকে একটি টেলিগ্রাম এসেছে। ভাবলেন যে কেউ হয়তো তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তার করেছে।

লেফাফা খুলে টেলিগ্রামখানা পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর ফরশা মুখ পাণ্ডুর হ'য়ে গেলো। প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যেও একটু ঘাম জমলো তাঁর মুখে। রুমালে মুখ মুছে আবার টেলিগ্রামখানা পড়লেন বার্বিকেন, তারপর আবার পড়লেন, তারপর আবার। কিন্তু টেলিগ্রামটির কোনো সারমর্মই তিনি উদ্ধার করতে পারলেন না। এ-কী লেখা এতে? এও কি সম্ভব? আবার টেলিগ্রামটি পড়লেন তিনি। তবু কোনো-কিছুই তাঁর বোধগম্য হ'লো না। কম্পিত হাতে তিনি টেলিগ্রামটি সেক্রেটারি ম্যাস্টনের হাতে দিয়ে বললেন, 'আমি তো এর মানে কিছুই বুঝতে পারছিনে, মিস্টার ম্যাস্টন। আপনি প'ড়ে দেখুন তো।'

ম্যাস্টন বিস্মিতভাবে টেলিগ্রামটি বার্বিকেনের হাত থেকে নিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেন :

'পারী : ফ্রানস ।
তিরিশে সেপ্টেম্বর : ভোর ।

ইম্পে বার্বিকেন : টম্পা : ফ্লরিডা : যুক্তরাষ্ট্র : আমেরিকা ।

আপনি যে-গোলাটা চাঁদে পাঠাবার জন্যে বানাচ্ছেন, দয়া ক'রে সেটা গোল না-ক'রে, ফাঁপা ক'রে, ডিমের আকারে তৈরি করুন । আমি ঐ গোলার ভিতরে ক'রে চাঁদে যাবো । আমি আসছি । আজ 'এস. এস. অ্যাটালান্টা' জাহাজে লিভারপুল ছাড়ছি ।

মিশেল আর্দাঁ

চক্ষের পলকে খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো । ঘরে-ঘরে, রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে-পশারে, আপিশে-রেস্তোরাঁয়, জাহাজ-ঘাটায়, রেল-স্টেশনে—সর্বত্রই এক কথা : 'চাঁদে নাকি মানুষ যাচ্ছে !' যারা পৃথিবীর হালচালের কোনো খবরই রাখে না, তারা তৎপর গলায় বললে যে মিশেল আর্দাঁ নামে কেউ নেই, ওটা কারু বিশুদ্ধ ইয়ার্কির নমুনা । কেউ আবার বললে, ওটা ফরাশিদের বাতুলতার একটা নজির । পৃথিবীর মানুষ কী ক'রে চাঁদে যাবে ? বাতাসই বা পাবে কোথায়, আর নিশ্বাসই বা নেবে কী ক'রে ? ঐ বারুদের আগুনে তেতে-ওঠা গোলার মধ্যেই তো পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে । আর যদিই-বা কেউ কোনো দৈব মাহাত্ম্যে চাঁদে পৌঁছোয়, ফিরে আসবে কী ক'রে ? এ অসম্ভব । আর এ-রকম আজগুবি কল্পনাবিলাসে ওস্তাদ হচ্ছে ফরাশিরা । ওটা ওদের জাতের বৈশিষ্ট্য ।

তক্ষুনি বার্বিকেন লিভারপুলের—জাহাজ-আপিশে তার করলেন । এক ঘণ্টার মধ্যেই জবাব এলো : 'অ্যাটালান্টা জাহাজ লিভারপুল বন্দর ছেড়েছে । টম্পার উদ্দেশেই রওনা হয়েছে সে । সেই জাহাজের যাত্রী-তালিকায় বিশ্ববিখ্যাত ফরাশি বৈজ্ঞানিক মিশেল আর্দাঁর নাম আছে । আর বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তিনি এস. এস. অ্যাটালান্টা ক'রে টম্পা যাচ্ছেন ।'

খবর পেয়ে বার্বিকেনের চোখদুটি অদ্ভুত রকমে জ্ব'লে উঠলো, মুঠো হ'য়ে এলো অস্থির হাতদুটি । বার্বিকেন কোনো মতামত প্রকাশ না-করে যে-কম্পানি গোলাটা বানাবার ভার নিয়েছিলো তাকে জানালেন : 'পরবর্তী খবর না-পাওয়ার আগে যেন গোলা বানাবার কাজে হাত দেয়া না-হয় ।'

এদিকে আমেরিকার সর্বত্র মিশেল আর্দাঁর নাম লোকমুখে শোনা যেতে লাগলো । কেউ-কেউ বললে : 'শেষ পর্যন্ত অত-বড়ো একজন বৈজ্ঞানিক কিনা ডাহা পাগল হ'য়ে গেলেন ! আহা ! অবশ্যি প্রতিভাবানেরা একটু পাগলই হয়, কিন্তু তাই ব'লে এতটা !'

বার্বিকেন যে গোলা-বানানোর কাজ আপাতত স্থগিত রাখতে হুকুম দিয়েছেন তা শুনে কেউ-কেউ মন্তব্য করলে, 'শেষটায় ধীর-গম্ভীর বার্বিকেনও কিনা পাগল হ'য়ে গেলেন ? চাঁদে মানুষ যাবে ! কী অসম্ভব কথা ! অমন আজগুবি পরিকল্পনায় মেতে থাকলে আমেরিকার গোলা আর কোনোদিনই চাঁদে গিয়ে পৌঁছুবে না !'

দেখতে-দেখতে টম্পার লোকসংখ্যা চতুর্গুণ হ'য়ে গেলো । অগুনতি লোক জমায়েত হ'য়ে যাওয়ায় টম্পায় দস্তুরমতো খাদ্য-সমস্যা দেখা দিলো । মিশেল আর্দাঁ, মিশেল আর্দাঁ,

আর মিশেল আর্দাঁ ! মিশেল আর্দাঁকে একবার চর্মচক্ষে দেখবার জন্যে কেউ জাহাজে, কেউ রেলে, কেউ ঘোড়ার গাড়িতে টম্পার দিকে ছুটলো । লোকের ভিড় এতটা বেড়ে গেলো যে একটি সূঁচ ফেলবার জায়গা পর্যন্ত রইলো না টম্পায় ।

রাস্তায়-ঘাটে, হাটে বাজারে, দোকানপাটে সবখানেই শুধু এক কথা : 'মিশেল আর্দাঁ কবে আসছেন ?' জাহাজ-আপিশের লোকজনেরা 'এস. এস. অ্যাটালান্টা' কবে আসবে বলতে-বলতে একেবারে পাগল হ'য়ে গেলো । একটি চালাক খবরের কাগজ 'এস. এস. অ্যাটালান্টা' কবে আসবে সেই তারিখটি প্রকাশ ক'রে দিয়ে অন্য কাগজগুলোকে টেক্কা দিয়ে অনেক লাভ ক'রে ফেললো । শেষকালে টম্পার জনসমাবেশ এমন প্রচণ্ড হ'য়ে উঠলো যে, কর্তৃপক্ষ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলেন ।

বিশে অক্টোবর সকালবেলায় দূরে দিগন্তে 'অ্যাটালান্টা'র চিমনির ধোঁয়া দেখা গেলো । হাজার-হাজার লোক দুরবিনের কাচে চোখ বসিয়ে উদগ্রীব হ'য়ে রইলো । সমুদ্রতীরে নিবিড় অরণ্যের মতো জনসমাবেশ হয়েছিলো ব'লেও শোরগোল খুব-একটা কম হ'লো না ।

প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন এক-একটা বছর ; সময় যেন কিছুতেই আর কাটতে চাচ্ছে না । কখন জাহাজ আসে, কখন মিশেল আর্দাঁকে দেখা যাবে—এই উৎকণ্ঠায় সকলে উদগ্রীব হ'য়ে রইলো । একসময়ে অবশ্য ভয়ংকর চ্যাঁচামেচির মধ্যে এই প্রতীক্ষার অবসান হ'লো । 'এস. এস. অ্যাটালান্টা' জেটিতে ভিড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই ছোটো-বড়ো বহু নৌকো জাহাজটাকে ঘিরে ধরলো । এই ভিড়ের মধ্য থেকে অনেক চেষ্টা ক'রে গান-ক্লাবের সভাপতি বার্বিকেন সকলের আগে জাহাজে উঠে যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে জিগেস করলেন : 'মিশেল আর্দাঁ ?'

একজন যাত্রী এগিয়ে এলেন । 'এই-যে আমি । হাজির ।'

৭

কী বলতে চান মিশেল আর্দাঁ,
পাগলপারা মানুষ !
বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে ?
একেবারে বেহুঁশ ?

গান-ক্লাব-এর সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন তাঁর এতদিনকার অবিচলতার সুনাম হারালেন । রুদ্ধ নিশ্বাসে হতবাক বার্বিকেন সবিস্ময়ে মিশেল আর্দাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন । মিশেল আর্দাঁ ? ইনিই সেই বিশ্ববিখ্যাত দুঃসাহসী ফরাশি বিজ্ঞানী ? আর্দাঁর বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, দীর্ঘ সুঠাম শরীর, প্রশস্ত কপাল, শরীরের তুলনায় মাথার আকার একটু বড়ো, ধূসর কেশগুচ্ছ উড়ছে সমুদ্রের হাওয়ায় । শিকারী বেড়ালের মতো মস্ত গোঁফ, তীক্ষ্ণ নাক, চোখের মণি বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল করছে । সবল দুই বাহু, পৌরুষমণ্ডিত পদক্ষেপ ।

পোশাক সযত্নবিন্যস্ত । মানুষটিকে দেখেই মনে হ'লো যেন এক জীবন্ত প্রতিভার সম্মুখীন হলাম । ইনিই মিশেল আর্দাঁ ? সাংবাদিকদের ক্যামেরায় একসঙ্গে 'ক্লিক' ক'রে আওয়াজ হ'লো । মিশেল আর্দাঁই আজকের সংবাদপত্রের প্রথম পাতার শিরোনাম ।

ফরাশি দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিশেল আর্দাঁর নাম য়ুরোপ এবং আমেরিকার কে না জানে ? সারা পাশ্চাত্য জগৎ জানতো, এই শিশু-সরল প্রতিভার হৃদয়ে নানা ধরনের দুঃসাহস অগ্নিশিখার মতো সর্বক্ষণ জ্বলে । অনাড়ম্বর এই বিজ্ঞান-সাধকের প্রচেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞানের কতদূর অগ্রগতি হয়েছে, তা কি আর কারু জানতে বাকি আছে এতদিনে ? নাপোলিয়ঁর মতো তিনিও বলতেন, 'অসম্ভব' এই শব্দটা কেবলমাত্র মূর্খদের অভিধানেই আছে । তিনি বলতেন, লোকে যাকে অসম্ভব ব'লে ভাবে, একাগ্র হ'য়ে একটু বুদ্ধি খরচ করলেই তা পৃথিবীতে সম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায় । হানিবলের মতো তিনিও বলতেন, আল্‌প্‌স্‌ পর্যন্ত আমাকে মাথা নুইয়ে পথ ক'রে দেবে ।

সংক্ষেপে এই-ই হ'লো মিশেল আর্দাঁর পরিচয় ।

বার্বিকেন এতক্ষণ ধ'রে অন্য-সমস্ত-কিছু ভুলে গিয়ে এই অদ্ভুত বিজ্ঞানীকেই দেখছিলেন । যখন আচমকা হাজার গলা মিশেল আর্দাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করলে তখন তাঁর চমক ভাঙলো । ইম্পে বার্বিকেন দেখলেন, জাহাজের ঐ ছোট্ট ডেকটায় লোক আর ধরে না । মানুষের ভারে 'এস. এস. অ্যাটালান্টা'র অবস্থা প্রায় কাহিল হ'য়ে এসেছিলো ; জলেই বোধহয় ডুবে যায়—এমনি নিদারুণ অবস্থা । বার্বিকেন দেখলেন মিশেল আর্দাঁর সঙ্গে করমর্দন করবার জন্যে ঠেলাঠেলি প'ড়ে গিয়েছে । করমর্দন করতে-করতে ভদ্রলোক প্রায় শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন, তবু উৎসাহী মানুষের শেষ নেই । শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক রকম-সকম দেখে এই প্রচণ্ড প্রশংসার হাত এড়াবার জন্যে তাঁর ক্যাবিনে গিয়ে ঢুকলেন । চুম্বকের পিছনে লোহা যেভাবে ছুটে যায়, বার্বিকেন সে-রকমভাবে নীরবে পিছন-পিছন গিয়ে তাঁর ক্যাবিনে ঢুকলেন ।

ক্যাবিনে ঢুকে কিছুক্ষণ দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে রইলেন । সম্বিত ফিরলে পর বার্বিকেন জিগেস করলেন, 'মঁসিয় আর্দাঁ, আপনি কি তাহ'লে সত্যিই চাঁদে যাবেন ব'লে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?'

গম্ভীর গলায় উত্তর এলো, 'নিশ্চয়ই ।'

'কোনোমতেই আপনি এই সংকল্প পরিত্যাগ করবেন না ?'

'না ।' ধীর গলায় মিশেল আর্দাঁ বললেন, 'না, কিছুতেই না । কোনোরকমেই আমি এই সংকল্প থেকে বিচ্যুত হবো না ।'

'আপনার এই সংকল্প যে কতদূর মারাত্মক হ'তে পারে, তা কি আপনি ভেবে দেখেছেন ?'

'এর মধ্যে ভাববার আবার কী আছে ?' মিশেল আর্দাঁ গম্ভীর গলায় বললেন, 'কী আবার ভাববো ? এ-রকম একটি সহজ এবং সাধারণ বিষয় নিয়ে খামকা ভেবে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই । যখনই শুনতে পেলুম আপনারা চন্দ্রলোক অভিমুখে একটি কামানের গোলা পাঠাচ্ছেন, তখনই মনে হ'লো এই সুযোগে একবার চাঁদ থেকে ঘুরে এলে মন্দ হয় না । এটা আর এমন-কী সাংঘাতিক ব্যাপার যে এ নিয়ে দিন-রাত মাথা ঘামাতে হবে ?

যাবো ব'লে একবার যখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, তখন যেমন ক'রেই হোক আমি যাবোই—এ আপনি নিশ্চয়ই জানবেন।'

'হুঁ! তাহ'লে নিশ্চয়ই থাকবার একটা উপায়ও আপনি মনে-মনে করেছেন। সেটা কী, জানতে পারি কি?'

'হ্যাঁ, উপায় একটা ঠিক করেছি বৈকি। সে-সব না-ভেবে আমি তো আর খামকাই পাগলের মতো এ-রকম একটা সিদ্ধান্ত নিইনি! তবে, এক-এক ক'রে প্রত্যেককে সে-কথা ব'লে বেড়াবার মতো অবসর আমার নেই, তা ছাড়া সেটা খুব-একটা লোভনীয় ব্যাপারও নয়। আপনি বরং কালকেই একটা জনসভা ডাকুন। আপনার যদি ইচ্ছে হয়, তাহ'লে সে-সভায় গোটা মার্কিন মুলুক কি সমস্ত পৃথিবীকেই আমন্ত্রণ জানাতে পারেন—আমার তাতে কোনোরকম আপত্তি নেই। আমার যা-কিছু বলবার সেই সভাতেই বলবো। কী, মিস্টার বার্বিকেন, বলুন, আপনি এ-প্রস্তাবে রাজি আছেন?'

কলের পুতুলের মতো ঘাড় নেড়ে বার্বিকেন তাঁর সম্মতি জানালেন মিশেল আর্দাঁকে।

সেই রাত্রে প্রায় বারোটা পর্যন্ত মিশেল আর্দাঁর সঙ্গে ইম্পে বার্বিকেনের নানা বিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো, কিন্তু কী কথা হয়েছিল, তা অবশ্যি কেউ ঠিক ক'রে বলতে পারে না। তবে রাত প্রায় সাড়ে-বারোটার সময় বার্বিকেন যখন 'এস. এস. অ্যাটালান্টা' থেকে নেমে এলেন, তখন তাঁর মুখে এ ক-দিনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না, বরং তাঁর মুখচোখ দেখে মনে হ'লো, তিনি এই মুহূর্তে রীতিমতো ফুর্তিতেই আছেন।

সেই রাত্রেই সর্বত্র ঘোষণা ক'রে দেয়া হ'লো, পরদিন সকাল-বেলায় এক জনসমাবেশে বিখ্যাত ফরাশি বৈজ্ঞানিক মিশেল আর্দাঁ তার প্রস্তাবিত চন্দ্রভ্রমণ বিষয়ে এক বিবৃতি দেবেন।

৮

সভার মধ্যে হুলুস্থুলু!
মানুষ যাবে চাঁদে!
মধ্যিখানে কে উটকো, ঐ
কথায় বাদ সাধে?

টম্পার নতুন-তৈরি-হওয়া টাউন হলে জনসংকুলান হবে না বুঝতে পেরেই বার্বিকেন একটি মস্ত বড়ো মাঠের মধ্যে সভার আয়োজন করেছিলেন। একুশে অক্টোবর ভোরবেলায় সভা শুরু হবার আগেই অত-বড়ো মাঠটায় আর তিলধারণের জায়গাও রইল না। যখন সভা শুরু হ'লো, বার্বিকেন চারদিকে তাকিয়ে আন্দাজ করলেন, অন্তত তিন-চার লাখ লোক জমায়েত হয়েছে—সে-আন্দাজ মোটেই ভুল হয়নি।

মিশেল আর্দাঁ আর ইম্পে বার্বিকেন একটি উঁচু মঞ্চের উপর ব'সে ছিলেন। সভা শুরু

হ'লে সেই নিস্তরঙ্গ জনসমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মিশেল আর্দাঁ ঠাণ্ডা, গম্ভীর গলায় বলতে লাগলেন, 'সমবেত ভদ্রবৃন্দ ! আমি কেমন ক'রে চাঁদে যেতে চাই, তার একটা উপায় বাৎলে দেবার জন্যেই আজকের এই সভার আয়োজন করা হয়েছে, যদিও এ-রকম কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে । সেই সূত্রে প্রথমেই এ-কথা জানিয়ে রাখা ভালো, কোনো নিন্দা-প্রশংসা আমাকে স্পর্শ করবে না । কেননা আমি বিশ্বাস করি যে অচিরেই কোনোদিন চাঁদে যাবার অনেক সুব্যবস্থা হবেই । জগৎ নিত্য-পরিবর্তনশীল —এ-তথ্য আপনারা দর্শনচর্চা ক'রে থাকলে নিশ্চয়ই জেনেছেন । বৈজ্ঞানিকেরা যে-কথা বলেন তা হ'লো, রূপান্তরের এই জগতে একমাত্র সচল রীতি হচ্ছে প্রগতি । মানুষের ক্ষমতা অসীম । বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বস্তুজগতের অনেককিছুই সে আজ ব্যাখ্যা করতে পারে ; এখনো যে-সব ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা সে দিতে পারেনি, উন্নতির অনিবার্য ধারায় আস্থাবান ব'লে আমি বিশ্বাস করি অচিরেই সে সে-সবের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারবে । পৃথিবীর প্রতিটি বিচিত্র সৃষ্টি মানুষের এই সীমাহীন বুদ্ধিবৃত্তিরই পরিচয় দেয় । একটা নজির নিলেই এ-কথাটা পরিষ্কার হবে । প্রথমে মানুষ অন্য ইতর প্রাণীকে ব্যবহার করেছিলো যাতায়াতের বেলায়, পরে যন্ত্রকে । প্রথমে গোরুর গাড়ি, তারপর ঘোড়ার, তারপর মোটর, রেল । প্রথমে দাঁড়ে-টানা নৌকো, পরে কলে-চালানো জাহাজ । আমার তো মনে হয় ভবিষ্যতের মানুষেরা শুধু কামানের গোলায় চ'ড়েই যাতায়াত করবে । এতে সময় যেমন কম লাগবে, তেমনি পরিশ্রমও যথেষ্ট পরিমাণে কম হবে । আপনারা হয়তো বলবেন, গোলাটি ভয়ানক দ্রুত চলবে ব'লে ওর ভিতরে থাকতে পারা অসম্ভব । কিন্তু এই কথাটা যুক্তিসংগত কি না ভেবে দেখতে আমি অনুরোধ জানাই । আমাদের এই পৃথিবী—যেখানে মানুষের একচ্ছত্র আধিপত্য—তার গতি ন্যূনপক্ষে ঘণ্টায় তিরিশ হাজার মাইল । অবশ্য এমন প্রশ্ন না-ক'রে অনেকে আরেকটি মৌলিক জিজ্ঞাসার অবতারণা করবেন । তাঁরা বলবেন, মানুষ সীমাবদ্ধ জীব, পৃথিবীর গণ্ডির বাইরে যাবার শক্তি তার নেই, পৃথিবী ছেড়ে গ্রহে-গ্রহান্তরে যাবার ক্ষমতা তার কোনোকালে আসবে না । কিন্তু এই ধারণা যে মস্ত একটা ভ্রান্তিমাত্র সেটা কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে ? আজ আমরা প্রবল সমুদ্রে, মহাসমুদ্রে, অনায়াসে পাড়ি জমাচ্ছি ; আকাশ কি তার চেয়েও অজেয় কিছু ? আমি তো সেই অদূর ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি : সুনীল শূন্য অধিকারে এসেছে, মানুষের পৃথিবীর অর্ধেক লোক অনবরত হাওয়া বদলাতে চাঁদে চলেছে ।'

মিশেল আর্দাঁ নিশ্বাস নেবার জন্যে একটু থামতেই একজন শ্রোতা জিগেস করলেন, 'গ্রহগুলিতে কি কোনো প্রাণী আছে ?'

'এখানে একজন শ্রোতা আমাকে জিগেস করছেন যে গ্রহগুলিতে কোনো জীবজন্তু আছে কি না ।' মিশেল আর্দাঁ আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন, 'উত্তরে আমি বলবো, নিশ্চয়ই আছে । পৃথিবীও তো একটি গ্রহ, পৃথিবীতে যে কত রকমের প্রাণী আছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই । আর কুতার্ক, সোয়েডনবর্গ, বর্নাডিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অনেক আলোচনা ক'রে এই মীমাংসায় পৌঁছেছেন যে সব গ্রহেই জীবজন্তু রয়েছে । তাঁদের সেই পরিভাষা-মণ্ডিত যুক্তিজালের পুনরাবৃত্তি না-ক'রে শুধুমাত্র এই কথাই বলবো যে, গ্রহে-উপগ্রহে জীবজন্তু আছে কি না, তা আমার মতো মূর্খ ব্যক্তির বলা সাজে না । আছে কি না জানি না ব'লেই

তো দেখতে যাচ্ছি ।'

এ-কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে চারদিকে দারুণ শোরগোল শুরু হ'লো । চ্যাঁচামেচি একটু কমলে পরে মিশেল আর্দাঁ বলতে লাগলেন, 'গ্রহে-উপগ্রহে যে প্রাণী আছে, লক্ষ করলে তার প্রচুর প্রমাণ দেখা যায় । সে-সব প্রমাণ দেবার জন্যে আমি এখানে আসিনি । যদি কেউ বলতে চান সৌরজগৎ বাসের অযোগ্য, তবে তাঁকে আমি এ-কথাই জিগেস করতে চাই, আমাদের এই পৃথিবীটাই যে বাসযোগ্য, তার কী প্রমাণ তিনি দিতে পারেন ? আপনারা জানেন আমাদের এই পৃথিবীর উপগ্রহ মাত্র একটি, যা আমার গন্তব্যস্থল । আর এমন গ্রহও আছে যাদের উপগ্রহ একাধিক । তবু সেগুলি বাসযোগ্য নয়, আর এই পৃথিবীই শুধু বাসযোগ্য-এ-কথা কি বিশ্বাস করা যায় ? পৃথিবীর ঋতুচক্রের আবর্তন কী-রকম জটিল একবার ভেবে দেখুন তো ! কখনো দারুণ গরমে প্রাণ কণ্ঠাগত, কখনো-বা কনকনে ঠাণ্ডায় শরীরের রক্ত জ'মে যেতে চায় । পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের উপর একটু বাঁকাভাবে অবস্থিত থেকে সূর্যের চারদিকে ঘোরে ব'লেই তো দিন আর রাত্রির ব্যবধান, ঋতুতে-ঋতুতে এত বৈচিত্র্য, আর ঋতু-বদলের সময় আমাদের এত অসুখ । কিন্তু জুপিটারকে দেখুন দেখি ! জুপিটার তার মেরুদণ্ডের উপর ঈষৎ বাঁকাভাবে অবস্থিত, অতি সামান্যই সেই বক্রতা, এবং সেই কারণেই বর্ষচক্রে সেখানে এ-রকম বিপরীত ধরনের ঋতুর সমাবেশ হয় না । অসুখবিসুখও তাই নিঃসন্দেহে সেখানে অনেক কম । জুপিটার যে এ-বিষয়ে পৃথিবীর চেয়ে ভালো, তা-তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ।'

এখানে প্রচণ্ড করতালির আওয়াজে মিশেল আর্দাঁর কণ্ঠস্বর চাপা প'ড়ে গেলো । একটু পরে সভার আবহাওয়া যখন কিঞ্চিৎ শান্ত হ'লো,তখন ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেখুন মঁসিয়, আপনার মতে তো চাঁদে মানুষ আছে ? তাহ'লে তাদের নিশ্চয়ই শ্বাস-প্রশ্বাসের বালাই নেই, কেননা চাঁদে তো বাতাস নেই ব'লেই জানি ।'

'তাই নাকি ?' বিদ্রূপ ছুঁড়ে মারলেন মিশেল আর্দাঁ । 'তা সেটা জানালেন কী ক'রে ? চাঁদে গিয়ে ?'

'পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন চাঁদে বাতাস নেই, এবং তাঁদের কথা অবিশ্বাস করবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ দেখি না ।'

'তাই নাকি ?'

'নিশ্চয়ই ।'

'দেখুন,' মিশেল আর্দাঁ বললেন, 'যাঁরা জেনে-শুনে দেখে, সবকিছু পরখ ক'রে যাচাই ক'রে পণ্ডিত, তাঁরা শ্রদ্ধার্হ । কিন্তু যাঁরা কিছু না-জেনেই পণ্ডিত, তাঁরা আমার ঘৃণার পাত্র । আপনি কোন্ শ্রেণীর পণ্ডিতদের কথা শুনে ভাবছেন যে চাঁদে বাতাস নেই ?'

'বাতাস যে নেই তার অগুনতি অকাট্য প্রমাণ আমার হাতে আছে । আপনি বোধহয় জানেন যে যখন সূর্যকিরণ বাতাসের ভিতর দিয়ে আসে, তখন ঠিক সোজাভাবে আসতে পারে না, খানিকটা বাঁকাভাবে আসে । অর্থাৎ আলোকরশ্মির পরাবৃত্তি ঘটে । চাঁদ যখন নক্ষত্রকে ঢাকে, তখন নক্ষত্রের আলো চাঁদের পাশ ঘেঁষে আসে, কিন্তু আলোর একটুও পরাবৃত্তি হয় না । এতেই তো প্রমাণিত হচ্ছে চাঁদে বাতাস নেই ।'

ব্যঙ্গ করলেন মিশেল আর্দাঁ, 'তাই নাকি ?'

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ। সতেরোশো পনেরো সালে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ লুভিল আর হেলি চন্দ্রগ্রহণের সময় ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখেছিলেন চাঁদে এক অদ্ভুত ধরনের আলো দেখা যাচ্ছে। তাঁরা উল্কার আলোকেই চাঁদের আলো ব'লে ভুল করেছিলেন।'

'এ-কথা বাদ দিন। কেননা, সতেরোশো একাশি সালে হার্সেল তো চাঁদে আলো দেখেছিলেন।'

'দেখেছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলো যে সত্যি কী, তা তিনি নিজেই ঠিক করতে পারেননি।'

'তাহ'লে তো আপনি একজন "চন্দ্রতত্ত্ববিদ"!'

'মুসেঁ বিয়র বা মদলার মতো পণ্ডিতেরাও মেনে নিয়েছেন যে চাঁদে বাতাস নেই।'

মিশেল আর্দাঁ গম্ভীর হলেন এবারে : 'ফরাশি জ্যোতির্বিদ মঁসিয় লসেদাঁতর নাম শুনেছেন ? শুনে থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর পর্যবেক্ষণের উপর আপনার শ্রদ্ধা জন্মাতো।'

'শ্রদ্ধা আমার আছে।'

'কিন্তু চাঁদে যে বাতাস নেই, এ-কথা তিনি বলেননি, বরং তাঁর অভিমতই হ'লো চাঁদে বাতাস আছে।'

'যদিও-বা বাতাস থাকে, তা নিশ্চয়ই খুব হালকা, মানুষের যোগ্য নয়।'

'যতই হালকা হোক একজনের উপযোগী বাতাস নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তা ছাড়া একবার চাঁদে পৌঁছুতে পারলেই হ'লো, তারপর না-হয় বৈজ্ঞানিক উপায়েই অক্সিজেন বানিয়ে নেয়া যাবে। চাঁদে যে-রকম বাতাসই থাক, বাতাস আছে ব'লে যখন স্বীকার করছেন, তখন এও নিশ্চয়ই স্বীকার করছেন যে জলও আছে। কেননা জল না-থাকলে বাতাস থাকবে কী ক'রে ?'

'আচ্ছা, তা না-হয় হ'লো। কিন্তু গোলাটা যখন বায়ুস্তর ভেদ ক'রে উঠবে, তখন সেই ঘর্ষণে যে-উত্তাপ—'

বাধা দিয়ে মিশেল আর্দাঁ বললেন, 'সেই উত্তাপে আমি পুড়ে মরবো ভাবছেন ? তা যদি ভেবে থাকেন তো মস্ত ভুল করেছেন, কেননা, বায়ুর স্তর পেরিয়ে যেতে ক-সেকেণ্ড লাগবে জানেন তো ? তাছাড়া গোলার পাশটাও খুব পুরু হবে।'

'খাদ্য এবং পানীয়ের কী-ব্যবস্থা করবেন ?'

'তা বছর-খানেকের উপযোগী সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। মাত্র তো চারদিনের পথ, তারপর চাঁদে যা-হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

'পথে নিশ্বাস নেবার বাতাস পাবেন কী-ক'রে ?'

'বৈজ্ঞানিক উপায়ে বানিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবো।'

'চাঁদে যদি-বা গোলাটা গিয়ে পৌঁছোয়—অবশ্য আদৌ পৌঁছুবে কি না সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে—কিন্তু যদি-বা গিয়ে পৌঁছোয় তখন প্রচণ্ড বেগে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়বেন—'

'তখন পৃথিবীতে পড়লে যতটা জোরে পড়তুম, সেখানে তার অন্তত ছ-গুণ কম হবে ।'

'তাহ'লেও তো আপনি কাচের টুকরোর মতো গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে যাবেন !'

'হবো না, কেননা ইচ্ছে করলেই পতন-বেগ কমিয়ে নেয়া যাবে । আমি কতগুলো হাউই সঙ্গে নেবো । উপযুক্ত সময়ে তাদের অগ্নিসংযোগ করলেই গোলার বিপরীত দিকে একটি গতির সৃষ্টি হবে, কাজেই আমি নির্বিঘ্নেই চাঁদে অবতরণ করতে পারবো ।'

থতমত খেয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'তাহ'লে আপনি না-হয় নির্বিঘ্নেই চাঁদে পৌঁছুলেন, কিন্তু পৃথিবীতে ফিরবেন কী ক'রে ?'

'ও ! এই কথা !' হেসে উঠলেন মিশেল আর্দাঁ । 'আমি যে ফিরবো, এ-কথা আপনাকে কে বললে ? আমি তো আর ফিরবোই না ।'

এ-কথা যারা শুনলো তারা বিদ্যুতাহতের মতো দাঁড়িয়ে পড়লো । এই দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিক বলছেন কী ? যে-ভদ্রলোক এতক্ষণ ধ'রে জেরা করছিলেন তিনি বললেন, 'আরেকটি মস্ত বিপদ আপনার সামনে দেখতে পাচ্ছি । যে-মুহূর্তে অত-বড়ো একটা গোলা কামানের নলচে থেকে বেরুবে, অমনি এমন-একটা ধাক্কা লাগবে যে তাতেই গোলার মধ্যে আপনার হাড়গোড় ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে ।'

একটু চিন্তিত স্বরে মিশেল আর্দাঁ বললেন, 'এতক্ষণে আপনি একটি সত্যিকার বাধার কথা তুলেছেন । তা সে নিয়ে আমার মাথা না-ঘামালেও চলবে । আমার বন্ধু নিশ্চয়ই এর একটা উপায় বের করবেনই ।'

ভদ্রলোক জিগেস করলেন, 'এত-বড়ো মাথাওলা ব্যক্তিটি কে বলবেন কি ?'

গম্ভীরস্বরে মিশেল আর্দাঁ বললেন, 'তিনি গান-ক্লাবের সুবিখ্যাত সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন ।'

'ওঃ ! সেই উজবুকটা, যার প্রস্তাবে সমস্ত পৃথিবী বোকার মতো নেচে উঠছে !' কারুই বুঝতে বাকি রইলো না যে ভদ্রলোক বার্বিকেনকে লক্ষ্য ক'রেই এ-কথা বললেন । বার্বিকেন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না । লাফিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে ভদ্রলোকের দিকে এগুবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে ভদ্রলোক যে চট ক'রে কোথায় মিশে গেলেন তা আর বোঝা গেলো না ।

মিশেল আর্দাঁর দুঃসাহসী সংকল্প কিন্তু জনতার মধ্যে পাগলা হাওয়ার ঝড় বইয়ে দিয়েছিলো । বার্বিকেনকে মঞ্চ থেকে নামবার অবসর আর কেউ দিলো না । তারা আর্দাঁ আর বার্বিকেনকে মঞ্চশুদ্ধ কাঁধে তুলে নিয়ে হৈ-হৈ করতে-করতে জাহাজ-ঘাটের দিকে এগুলো । মঞ্চটা কাঁধে বওয়াই এক মহা গৌরবের বিষয় হ'য়ে উঠলো ; ঐ কাঠের মঞ্চটা বইবার জন্যেই হুটোপাটি শুরু হ'য়ে গেলো সেখানে ।

যে-ভদ্রলোক এতক্ষণ ধ'রে আর্দাঁকে জেরায়-জেরায় জেরবার করছিলেন, তিনি কিন্তু এ-সুযোগে পালিয়ে যাননি । শোভাযাত্রার সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও জাহাজ-ঘাটের দিকে এগুচ্ছিলেন । যখন মঞ্চটাকে টম্পা বন্দরে নামানো হ'লো, তখন বার্বিকেন ও আর্দাঁ মঞ্চ থেকে নেমে এলেন । নেমে এসেই বার্বিকেন সেই ভদ্রলোককে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন । বহু কষ্টে রাগ চেপে তিনি ঠাণ্ডা গলায় ভদ্রলোককে বললেন, 'শুনুন তো একটু !

এদিকে আসুন, কথা আছে ।'

ভদ্রলোক নীরবে ভাবলেশহীন মুখে বার্বিকেনকে অনুসরণ করলেন । একটু আড়ালে গিয়ে বার্বিকেন তীব্র গলায় বললেন, 'আপনার নামটা জানতে পারি কি ?'

'লোকে আমায় কাপ্তেন নিকল ব'লে জানে ।'

৯

দুই প্রতিভাই দারুণ ক্ষুব্ধ !
তাই কি হবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ?

'কাপ্তেন নিকল !'

'হ্যাঁ ।'

নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাত হ'লেও বার্বিকেন এতটা চমকে উঠতেন কি না সন্দেহ ।

'আজই আমাদের প্রথম দেখা হ'লো ।'

'আমি নিজেই দেখা করতে এসেছি ।'

'আপনি আমাকে আজ অপমান করেছেন !'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে ক'রেই করেছি—লক্ষ-লক্ষ লোকের সামনে করেছি ।'

'আমি তার প্রতিশোধ নিতে চাই !' স্থির গলায় বার্বিকেন জানালেন ।

'বেশ-তো । এক্ষুনি এর মীমাংসা হ'য়ে যাক । আমি প্রস্তুত আছি ।'

'না, এখন সময় নেই । আমাদের মুখোমুখি দেখা হওয়া উচিত গোপন কোনো জায়গায় । টম্পা থেকে মাইল তিনেক দূরে যে-বনটা আছে, চেনেন ?'

'খুব চিনি ।'

'কাল ভোর পাঁচটায় সেখানে হাজির হ'তে পারবেন কি ?'

'নিশ্চয়ই পারি, অবশ্য যদি অনুগ্রহ ক'রে আপনি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে রাজি থাকেন ।'

'আপনার বন্দুকটা সঙ্গে আনতে ভুলবেন না ।'

বিদ্রূপের স্বরে কাপ্তেন নিকল বলেলেন, 'আপনি না-ভুললেই হ'লো ।'

বার্বিকেন তক্ষুনি সে-স্থান পরিত্যাগ করলেন ।

সেদিন সারা রাত বার্বিকেনের বিনিদ্র কেটেছিলো বিছানায় ছটফট ক'রে । পরদিনের দ্বন্দ্বযুদ্ধের উত্তেজনায় নয়, কামান থেকে গোলা বেরুবার সময় গোলার গায়ে যে-ধাক্কা লাগবে, কী ক'রে সেই ধাক্কা সামলে ওঠা যাবে, তার চিন্তায় ।

বাইশে অক্টোবর ভোর হবার আগেই ম্যাস্টন হুড়মুড় করে ছুটে এসে মিশেল আর্দাঁর শোবার ঘরের দরজায় সজোরে ধাক্কা মারতে লাগলেন । প্রথমটায় কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না ।

শেষকালে ম্যাস্টন প্রচণ্ডভাবে দরজায় ধাক্কা মারতে-মারতে বললেন, 'দরজা খুলুন মঁসিয় আর্দাঁ, দোহাই ধর্মের, দরজাটা খুলুন ! সাংঘাতিক বিপদ, খুলুনই না দরজাটা !'

তখনো ঠিক ভোর হয়নি। ঝাপসা অন্ধকার দূর করবার জন্যে রাস্তায় তখনো বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। আর্দাঁ তাড়াহুড়ো ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে দুয়ার খোলবার সঙ্গে-সঙ্গে এক ধাক্কায় তাঁকে সরিয়ে ম্যাস্টন ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'কাল প্রকাশ্যে জনসভায় যে-ভদ্রলোক বার্বিকেনকে অপমান করেছিলেন, বার্বিকেন তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছেন। সে-ভদ্রলোক হচ্ছেন বার্বিকেনের চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বী কাপ্তেন নিকল। আজ ভোরেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ, একটু পরেই। হয় নিকল, না-হয় বার্বিকেন—দু-জনের একজনকে আজ প্রাণ হারাতেই হবে। বার্বিকেন নিজে আমাকে এ-কথা বলেছেন। আরো বলেছেন যে,পৃথিবী অনেক ছোটো ব'লেই তাঁদের দু-জন একই কালে বেঁচে থাকেত পারেন না, কেবল একজনেরই স্থান-সংকুলান হয় এখানে ; সুতরাং একজনকে আজ মরতেই হবে। কিন্তু যে-ক'রেই হোক এ-লড়াই এখন আমাদের বন্ধ রাখতে হবে। বার্বিকেনকে এখন আমরা কিছুতেই মরতে দিতে পারিনে। যে-কোনোরকমেই হোক এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ স্থগিত রাখতেই হবে। অথচ আপনি এ-বিষয়ে সচেষ্ট না-হ'লে তার কোনো উপায় দেখছিনে, মঁসিয় আর্দাঁ।'

মিশেল আর্দাঁ দ্রুত হাতে পোশাক পরতে-পরতে বললেন, 'আপনাদের দেশের লোক দেখছি খামকা-খামকা খুনোখুনি ক'রে মরে। মিস্টার বার্বিকেন এখন কোথায় ?'

'তা ঠিক জানিনে। বোধহয় এতক্ষণে লড়াইয়ের জায়গায় পৌঁছে গেছেন।'

'লড়াইয়ের জায়গাটা কোথায় ?'

'শহরের কাছেই একটা বন আছে ; সেই বনে।'

দু-জনে আর এক মুহূর্তও দেরি না-ক'রে বনের দিকে ছুটলেন। বড়ো রাস্তা দিয়ে গেলে দেরি হ'তে পারে ভেবে মাঠের মধ্যে দিয়েই ছুটলেন, রীতিমত দৌড়ুলেন বলা চলে। দৌড়ুতে-দৌড়ুতেই ম্যাস্টন বার্বিকেনের সঙ্গে কাপ্তেন নিকলের সাপে-নেউলে ঝগড়ার কথা সংক্ষেপে খুলে বলতে লাগলেন। বনের মুখে এক কাঠুরের সঙ্গে তাঁদের দেখা হ'লো। কাঠুরেকে দেখেই আর্দাঁ শুধোলেন, 'বনে কোনো শিকারীকে কি দেখেছো ?'

'শিকারী ? তা একজন বন্দুকধারীকে তো দেখেছি একটু আগে।

'একটু আগে ? কখন ?' ব্যগ্র গলায় ম্যাস্টন জিগেস করলেন, 'কখন দেখলে ?'

'তা সে ঘণ্টাখানেক হবে।'

ম্যাস্টন আর আর্দাঁ একসঙ্গেই ব'লে উঠলেন, 'ঘণ্টাখানেক ! তবে তো এতক্ষণে সব শেষ হ'য়ে গিয়েছে ! তুমি কি কোনো বন্দুকের আওয়াজ শুনেছো ?

উত্তরে কাঠুরে এই কথাই জানালো যে, সে কোনো বন্দুকের আওয়াজ শোনেনি।

'একবারও শোনোনি ?'

'না।'

'শিকারীকে কোনদিকে দেখেছো ?'

কাঠুরে আঙুল দিয়ে গভীর বনের একপ্রান্ত দেখালো। ম্যাস্টনের হাত ধ'রে আর্দাঁ তক্ষুনি সেদিকে ছুটলেন।

কী গভীর বন ! কোনোকালে যে যেখানে সূর্যালোক প্রবেশ করেছে এমন-কোনো

চিহ্নই দেখা গেলো না। বিশেষ ক'রে বনের সে-অংশটা এত ঘন যে কয়েক হাত দূরের মানুষকেও দেখবার সম্ভাবনা নেই। অনেকক্ষণ বনে-বনে ঘুরে শেষে আর্দাঁ বললেন, 'মিস্টার ম্যাস্টন, আমার মনে হচ্ছে ব্যার্বিকেন হয়তো-বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের সংকল্প ছেড়েছেন, বনে আসেননি।'

গম্ভীর স্বরে একটু অহমিকার সঙ্গে ম্যাস্টন বললেন, 'অসম্ভব মার্কিনরা কখনো কথার খেলাপ করে না, বিশেষ ক'রে এ-সব ক্ষেত্রে তো নয়ই!'

আর্দাঁ আর-কোনো কথা না-ব'লে আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। বার্বিকেন আর নিকলের নাম ধ'রে চেঁচিয়ে ডাকতে-ডাকতে তাঁরা আরো গভীর বনে ঢুকলেন। কিছুদূর এগিয়ে ম্যাস্টন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। 'ওটা কী দেখুন তো —'

'নিঃসন্দেহে একজন মানুষ।'

'জ্যান্ত, না মরা? কই, নড়ে-চড়ে না তো? বন্দুকও তো হাতে দেখছি না! লতা-পাতার আড়াল থেকে মুখটাও দেখা যাচ্ছে না ভালো ক'রে।'

আর্দাঁ বললেন, 'চলুন, কাছে যাই।'

দুজনে আরেকটু এগুতেই ম্যাস্টন লোকটিকে চিনত পারলেন: কাপ্তেন নিকল। ক্ষোভে-দুঃখে-রাগে তাঁর দু-চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগলো। দাঁতে দাঁত চেপে চেপে ম্যাস্টন বললেন, 'ইনি কাপ্তেন নিকল।—তাহ'লে নিশ্চয়ই বার্বিকেনের মৃত্যু হয়েছে!'

১০

আর্দাঁ কেন মিথ্যেমিথ্যি একলা যাবেন চাঁদে?
নিকল এবং বার্বিকেনও যাবেন তাঁরই সাথে।

'কাপ্তেন নিকেল!' আর্দাঁ নামটা আরেকবার অস্ফুট গলায় উচ্চারণ করলেন, 'কাপ্তেন নিকল!'

দু-জনে নিকলের কাছে গিয়ে দেখলেন, একটি পাখির ছানা বিষাক্ত মাকড়শার জালে আটকে প'ড়ে ছটফট করছে, আর নিকল আলগোছে সযত্নে পাখিটাকে জাল থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন। তাঁর বন্দুকটা পায়ের কাছে প'ড়ে আছে। পাখির ছানাটিকে জাল থেকে মুক্ত ক'রে নিকল উড়িয়ে দিলেন। ডানা ঝাঁপিয়ে উড়ে গিয়ে পাখিটা কাছেই একটা গাছের ডালে গিয়ে বসলো। নিকল কোমল চোখে পাখির ছানাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর্দাঁ এই দৃশ্য দেখে আবাক হ'য়ে ভাবলেন, যাঁর মনের মধ্যে এ-রকম স্নেহের ধারা ব'য়ে চলেছে, তিনি কি কখনো নিষ্ঠুর খুনী হ'তে পারেন? কাছে গিয়ে বললেন, 'কাপ্তেন নিকল! সত্যিই আপনি বীর!'

নিকল সচমকে তাঁর দিকে তাকিয়ে অবাক গলায় বললেন, 'এ কী! মঁসিয় আর্দাঁ যে! তা আপনি এখানে কেন?'

'আপনার সঙ্গে বন্ধুতা ক'রে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বন্ধ করতে এসেছি, কাপ্তেন নিকল ! এ-যুদ্ধে লাভ কী, বলুন তো ? খামকা একটি মূল্যবান জীবন বিনষ্ট হবে । হয় আপনি মরবেন, নয় তো বার্বিকেন—'

বাধা দিয়ে কাপ্তেন নিকল ব'লে উঠলেন, 'কী বললেন ? বার্বিকেন ? আমি দু-ঘণ্টা ধ'রে তাঁর খোঁজ করছি । কোনো সত্যিকার ইয়াঙ্কি যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিমন্ত্রণ ক'রে এভাবে পালিয়ে যায়, তা আমি জানতুম না !'

ম্যাস্টন চ'টে উঠে তীব্র গলায় বললেন, 'আমেরিকানরা কখনো চম্পট দেয় না ! ভোর হবার অনেক আগেই বার্বিকেন এদিকে এসেছেন ।'

'তবে আর দেরি ক'রে লাভ কী ?' কাপ্তেন নিকল বললেন, 'আমার প্রচুর কাজ আছে । খামকা সময় নষ্ট করতে চাই না । তাঁকে খুঁজে দেখা যাক । এত সামান্য একটা কাজের জন্যে এভাবে সময় নষ্ট করা শোভন দেখায় না ।'

মিসেল আর্দাঁ বললেন, 'তাড়াহুড়ো করবেন না । এত ব্যস্ত হ'য়ে কী লাভ ? বার্বিকেন যদি জীবিতই থাকেন, তাহ'লে আমরা নিশ্চয়ই এখানে তাঁর দেখা পাবো । কিন্তু আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি আপনাদের দু-জনের মধ্যে দেখা হ'লে আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে না ।'

'উঁহু !' কাপ্তেন নিকল ঘাড় নাড়লেন । 'সে হয় না । আজ আমাদের একজনকে মরতেই হবে । আমাদের দু-জনের একসঙ্গে পৃথিবীতে থাকবার অধিকার নেই ।'

এ-কথা শুনে ম্যাস্টন বললেন, 'কাপ্তেন নিকল, আমি বার্বিকেনের বন্ধু, তাঁর ডান হাত বললেও চলে । আজ যদি আপনার কোনো মানুষ না-মারলেই না-চলে, তবে আমাকেই গুলি করুন । আমাকে মারাও যা, বার্বিকেনকে মারাও তাই ।' এই ব'লে তিনি কাপ্তেন নিকলের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন ।

নিকলের চোখে যেন চকিতের জন্যে কোনো শয়তানের আবির্ভাব হ'লো, তিনি বন্দুক তুললেন । সর্বনাশ হ'তে চললো দেখে দু-জনের মাঝে প'ড়ে মিশেল আর্দাঁ বললেন, 'আ-হা-হা ! করেন কী ! আমি মানুষে-মানুষে খুনোখুনি অপছন্দ করি । কাপ্তেন নিকল, আমি আপনার কাছে এমন একটা প্রস্তাব করবো যে আপনার মরতে বা মারতে ইচ্ছেই হবে না ।'

অবিশ্বাসের সঙ্গে বন্দুক নামিয়ে কাপ্তেন নিকল বললেন 'আপনার সেই লোভনীয় প্রস্তাবটা শুনতে পারি ?'

'একটু পরেই জানতে পারবেন । বার্বিকেনের সামনে ছাড়া সে কথা বলা ঠিক হবে না ।'

'বেশ । তবে চলুন, তাঁকে খুঁজে দেখি ।'

'চলুন ।'

তিনজনে তখন বার্বিকেনের খোঁজে চললেন । কিছুদূর গিয়েই নিকল হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে অদূরে তর্জনীনির্দেশ করলেন । দেখা গেলো, একটা বড়ো গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বার্বিকেন দাঁড়িয়ে আছেন ।

বার্বিকেনের নাম ধ'রে ডাকতে-ডাকতে সেদিকে এগুলেন আর্দাঁ । কিন্তু কোনো সাড়া নেই, বার্বিকেন যেন একটি পাথরের মূর্তি । আর্দাঁ কাছে গিয়ে দেখলেন, বার্বিকেন তন্ময়

হ'য়ে কতগুলো জ্যামিতিক নকশা আঁকছেন, তাঁর পায়ের কাছে বন্দুকটা প'ড়ে। আর্দাঁ তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলেন, 'মিস্টার বার্বিকেন!'

চমকে উঠলেন বার্বিকেন। 'এ কী! মঁসিয় আর্দাঁ!—ইউরেকা! ইউরেকা! আমি পথ বের ক'রে ফেলেছি! আর-কোনো ভাবনা নেই!'

'কীসের পথ?'

'সেটার।'

'কোনটার?'

'গোলাটা যখন কামানের মুখ থেকে ছিটকে বেরুবে, তখন যাতে কোনো ধাক্কা না-লাগে তার পথ বের ক'রে ফেলেছি!'

খুশি হ'য়ে আর্দাঁ জিগেস করলেন, 'সত্যি?'

একটু হেসে বার্বিকেন বললেন, 'ও আর বেশি কী! জলকে স্প্রিং-এর কাজে লাগালেই হয়। তার উপর থাকবে বসবার আসন।—আরে! ম্যাস্টন যে? ব্যাপার কী?'

আর্দাঁ বার্বিকেনের হাত ধ'রে বললেন, 'ঐ গাছটার কাছে কাপ্তেন নিকলও দাঁড়িয়ে আছেন। চলুন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

বার্বিকেনের কপালের শিরাগুলি ফুলে উঠলো। লাল হ'য়ে উঠলো গাল। লাজুক গলায় বললেন, 'কী লজ্জা! কথা রাখতে পারিনি।' কাপ্তেন নিকলকে এগুতে দেখে চেঁচিয়ে বললেন, 'কাপ্তেন নিকল! মাপ করবেন! আমারই গাফিলতির জন্যে আপনার প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে। চাঁদে গোলা পাঠাবার কথা ভাবতে-ভাবতে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলুম। তা চলুন, এখন আমি প্রস্তুত।' বার্বিকেন তাঁর বন্দুকটা তুলে নিলেন।

মিশেল আর্দাঁ বাধা দিয়ে বললেন, 'উঁহু! সেটি হচ্ছে না। পৃথিবীর বরাত ভালো যে লড়াইটা আগেই শেষ হ'য়ে যায়নি। আপনারা দু-জনেই প্রতিভাবান, কোনো সাধারণ রগচটা মানুষ নন। প্রতিভাকে হত্যা করবার জন্যেই কি আপনাদের জন্ম হয়েছে?'

বার্বিকেন ও নিকল নীরবে মাথা নিচু ক'রে লজ্জিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর্দাঁ ব'লে চললেন, 'আমি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছি যে, আপনারা দুজনেই মস্ত-একটা মারাত্মক ভুলের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেই ভুলটাকে যতই বড়ো ক'রে দেখছেন ততই আপনারা খেপে উঠছেন। বার্বিকেনের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর গোলা চাঁদে পৌঁছুবেই, আর নিকল ভাবছেন তা হ'তেই পারে না।'

নিকল বললেন, 'ঠিক। কামানের ও-গোলা কি কখনো চাঁদে পৌঁছুতে পারে?'

বার্বিকেন বাধা দিয়ে বললেন, 'পারে না মানে? আলবৎ পারে।'

মিশেল আর্দাঁ বললেন, 'বেশ তো, তাহ'লে আপনারা দুজনেই আমার সঙ্গে চাঁদে চলুন না কেন? গোলাটা চাঁদে পৌঁছোয় কি না, তা স্বচক্ষে দেখেই সমস্ত বিবাদ ভঞ্জন করতে পারবেন।'

বার্বিকেন আর নিকল তক্ষুনি একসঙ্গে ব'লে উঠলেন, 'আমি রাজি আছি!'

তাঁদের দু-জনের আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ সমাপ্ত করা হ'য়ে উঠলো না।

অন্তত সেদিন না।

১১

কামানের গোলাটায় থাকা যাবে নাকি ?
পরীক্ষা বাকি ।
সেটা যাবে দেখা,
মহড়া দেবেন যবে ম্যাস্টন একা ।

তখনো অনেকেই পুরোপুরি বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছিলেন না, গোলার ভিতরে সত্যিই মানুষের যাওয়া সম্ভব কি না । সকল সন্দেহের অবসান করবার জন্যে বার্বিকেন একটি বত্রিশ ইঞ্চি কামান আনলেন । একটি ফাঁপা গোলা তৈরি ক'রে ভিতরটা স্প্রিং-এর গদি দিয়ে মুড়ে দেয়া হ'লো । তারপর গোলার ভিতর একটা জ্যান্ত বন-বেড়াল আর একটা শজারু রেখে ঢাকনিটা স্ক্রু দিয়ে বন্ধ করা হ'লো । কামানে দু-মণ বারুদ পুরে তারপর গোলাটাকে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলতে কোনো অসুবিধেই হ'লো না । গোলাটা হাজার ফুট উপরে উঠে একটু বেঁকে মাটিতে পড়লো । তাকে কুড়িয়ে এনে দেখা গেলো বন-বেড়ালটা কিঞ্চিৎ আহত হয়েছে সত্যি, কিন্তু গোলার ভিতরে ব'সেই সে শ্রীমান শজারুকে উদরসাৎ করেছে ।

পরীক্ষার ফল দেখে সবাই খুশি হ'য়ে উঠলেন । ম্যাস্টন তো বারবার বলতে লাগলেন, 'আমাকেও সঙ্গে নিন আপনারা, আমিও চাঁদে যাবো ।'

বার্বিকেন ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তা কী ক'রে হয়, ম্যাস্টন ? অত জায়গা আমরা পাবো কোত্থেকে ?'

ম্যাস্টন রীতিমত মুষড়ে প'ড়ে তাঁকে সঙ্গে নেবার জন্যে নাছোড়বান্দার মতো বার-বার আর্দাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন ।

এদিকে আর্দাঁ আবার এক বিষম বিপদে পড়েছিলেন । প্রত্যহ এত লোক চাঁদে যাবার বায়না নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লাগলো যে, তিনি দস্তুরমতো বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন । একদিন তো ধাড়ি-ধাড়ি কতগুলো লোক এসে বললে, 'আমরা চাঁদের মানুষ । দেশে ফিরে যাবার জন্যে বড়ো মন-কেমন করছে ; অনেক দিন দেশ-ছাড়া কিনা !' আর্দাঁ একটু হেসে তাদের বললেন, 'দেখুন, এবার গোলায় জায়গা বড্ড কম, সুতরাং সে-বিষয়ে আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারবো না । তবে চাঁদে পৌঁছেই আপনাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবো ।'

যারা মিশেল আর্দাঁর দেখা পেলো না, তারা তাঁকে চিঠি দেখতে শুরু করলো । প্রত্যেকদিন এত চিঠি আসতে লাগলো যে ডাকঘরের লোকেরা পর্যন্ত তিত-বিরক্ত হ'য়ে উঠলো । আর্দাঁ তো অত চিঠি পড়বারই সময় পেলেন না, জবাব দেয়া তো দূরের কথা । চাঁদে যাবার উপসর্গ হিশেবে এমন-কোনো উপদ্রব যে জুটতে পারে তা তিনি ভুলেও কল্পনা করেননি ।

তারপর অবশেষে এলো দশই নভেম্বর, বহু-প্রতীক্ষিত সেই শুভ দিন । যে-কম্পানি গোলাটা বানাবার ভার নিয়েছিলো, তারা তৈরি-হ'য়ে-যাওয়া গোলাটা বার্বিকেনকে পৌঁছে

দিলে। আমেরিকা হুজুগের দেশ। যেই না গোলাটা বানানোর খবর কাগজে বেরুলো, অমনি হাজার-হাজার লোক পাগলের মতো গোলাটা দেখতে ছুটলো। সকলে যাতে দেখতে পারে সেজন্যে বার্বিকেন গোলাটা একটা খোলা মাঠে রেখেছিলেন : তবু আর জায়গা হয় না! লোকের ভিড়ে আর চ্যাঁচামেচিতে সকলে উত্যক্ত হ'য়ে উঠলেন ; কাঁহাতক আর এ-আপদ সহ্য করা যায় ? আর্দাঁ গোলাটা দেখে খুশি হ'লেও ঠাট্টা করলেন, 'এ-কী বানিয়েছেন, বার্বিকেন ? গোলাটা দেখতে তো মোটেই সুন্দর নয়! এমন-একটা বিশ্রী গোলা দেখে চাঁদের অধিবাসীরা তো হাসবে!'

বার্বিকেন হেসে বললেন, 'বাইরের জৌলুশ দিয়ে আর কী করবেন ? ভিতরটা আপনার ইচ্ছেমতো সুশ্রী ক'রে নিন।' আর্দাঁ কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে তাতেই রাজি হ'লেন।

বার্বিকেন মনে-মনে বুঝতে পেরেছিলেন, লোহার স্প্রিং হাজার ভালো হ'লেও তাতে কাজ চলবে না। তাই তিনি জলের ব্যবস্থা করেছিলেন। গোলার ভিতর তিন ফুট জল ঢালা হ'লো, সেই জলের উপর রইলো একটি কাঠের চাক্তি। চাক্তিটা গোলার গায়ে এমনভাবে লাগানো হ'লো যাতে ইচ্ছেমতো খোলা যায়। ঐ চাক্তিটার উপর বার্বিকেন যাত্রীদের বসবার ব্যবস্থা করেছিলেন। জলকে কয়েকটা থাকে-থাকে ভাগ করবার জন্যে জলের মধ্যে পর-পর কতগুলো কাঠের চাক্তি রাখা হ'লো। সবচেয়ে উপরে থাকলো যাত্রীদের বসবার চক্র, আর তার নিচেই রাখা হ'লো খুব শক্ত স্প্রিং।

বার্বিকেন বুঝেছিলেন যে, কামানের মুখ থেকে গোলাটা ছিটকে চাক্তিগুলি একে-একে ভেঙে গিয়ে এক থাকের জল অন্য থাকের জলের সঙ্গে মিশে যাবে, কাজেই যাত্রীদের কোনো ধাক্কা সহ্য করতে হবে না। গোলা ছুঁড়লে সব-আগে সুমুখের দিকে, আর পরে পিছনে ধাক্কা লাগবার কথা। জলের এই অদ্ভুত স্প্রিং থাকবার জন্যে সামনের ধাক্কা যে লাগতে পারবে না বার্বিকেন তা ভালো ক'রেই বুঝতে পেরেছিলেন। পিছনের ধাক্কায় যাতে কোনো কিছু না-হয় তার জন্যে খুব ভালো জাতের লোহার স্প্রিং-এর উপর নির্ভর করতে হ'লো। গোলার ভিতরটা ঘড়ির স্প্রিং-এর মতো নরম, অথচ সহজে যাতে না-ছেঁড়ে এমন ধরনের স্প্রিং-এর উপর পুরু কুশন বসিয়ে জুড়ে দেয়া হয়েছিলো।

এত-সব আয়োজন দেখে মিশেল আর্দাঁ বললেন, 'অত ক'রেও যদি ধাক্কা লেগে হাড়গোড় ভাঙে, তাহ'লে ভাঙুক ; আমার কোনো আপত্তি নেই।'

গোলার ভিতরে ঢোকবার দরজা বানানো হয়েছিলো ক্রমসূক্ষ্ম ঊর্ধ্বদিকে। যাতে ভিতর থেকে খুব শক্ত ক'রে দুয়ার বন্ধ করা যায়, বার্বিকেন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সে-ব্যবস্থা করেছিলেন। যাতে আচমকা কোনো ঝাঁকুনি লাগলে দরজা খুলে না-যায় সেইজন্যে বৈদ্যুতিক বোতামের ব্যবস্থা করা হ'লো।

গোলার ভিতরে ক'রে চাঁদে গেলেই তো আর হ'লো না, যাবার পথে মহাশূন্যের অবস্থাও দেখতে হবে, নইলে চাঁদে গিয়ে আর লাভ কী ? সে-জন্যে স্প্রিং-এর কুশনের নিচে চারটে কাচের জানলা বসানো হয়েছিলো। দুটো জানলা দু-পাশে, একটা উপরে আর একটা নিচে- এর ফলে মহাকাশে চলবার সময় ছেড়ে-আসা পৃথিবী, ক্রমনিকটবর্তী চন্দ্রলোক এবং নক্ষত্রখচিত অসীম জ্যোতিষ্কলোক পর্যবেক্ষণ করবার আর-কোনো অসুবিধে ছিলো না। এই কাচগুলো যাতে বায়ুর চাপে না-ভেঙে যায়, সে-জন্যে ধাতুর আবরণ দিয়ে সেগুলি এমনভাবে

ঢাকা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিলো যে গোটাকয়েক স্ক্রু খুললেই জানলার কাচের উপর থেকে ঐ আবরণ স'রে যেতো ।

গোলাটায় যাতে আলো আর তাপের অভাব না-হয় সেজন্যে খুব বেশি ক'রে গ্যাস নেয়া হ'লো । একটি নলের মুখ খুলে দিলেই গ্যাস বেরুতো । বার্বিকেন এক সপ্তাহের উপযোগী খাদ্য, পানীয় এবং গ্যাস নিলেন ; কোনোরকমে বেঁচে থাকবার জন্যে যা দরকার শুধু তাই যে গোলায় নেয়া হ'লো এমন নয়, যাতে বেশ আরামেই থাকা যায় তারও ব্যবস্থা করা হ'লো । যদি প্রচুর জায়গা থাকতো তাহ'লে মিশেল আর্দা নিশ্চয়ই পৃথিবীর যাবতীয় সুকুমার শিল্পের একটি আস্ত জাদুঘরই সঙ্গে ক'রে নিতেন ।

খাদ্য, পানীয়, আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যখন শেষ, হ'লো, তখন এলো বাতাসের পালা । গোলার ভিতর যে-টুকু স্বাভাবিক বাতাস ছিলো, তা যে তিনজনের পক্ষে চারদিনের উপযোগী ছিলো, তা নিশ্চয় না-ব'লে দিলেও চলবে । বার্বিকেনের সঙ্গে আবার চলেছিলো তাঁর বাঘা কুকুরটি । কাজেই পাঁচটি প্রাণীর জন্যে চব্বিশ ঘণ্টায় ন্যূনপক্ষে সাড়ে-তিন সের ক'রে অক্সিজেনের দরকার । একুশ ভাগ অক্সিজেন আর উনআশি ভাগ এজোট মেশালেই বাতাসের জন্ম হয় । আমরা যখন প্রশ্বাস নিই তখন শরীরে প্রবেশ করে অক্সিজেন, আর নিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে বেরোয় এজোট । বদ্ধ জায়গায় কিছুক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চললেই বাতাসের অক্সিজেন ফুরিয়ে কেবল থাকে কার্বনিক অ্যাসিডের গ্যাস । কার্বনিক অ্যাসিড মানুষের পক্ষে মারাত্মক বিষ । বার্বিকেন দেখলেন, গোলার ভিতর যেটুকু অক্সিজেন লাগবে তা তৈরি ক'রে পরে জ'মে-যাওয়া কার্বনিক অ্যাসিডের গ্যাস বিনষ্ট ক'রে ফেলতে পারলেই গোলার আর বাতাসের অভাব হবে না ।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেলো, ক্লোরেট অভ্ পটাশ আর কস্টিক পটাশ ব্যবহার করলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, চারশো ডিগ্রি উত্তাপে ক্লোরেট অভ্ পটাশ রূপান্তরিত হয় ক্লোরিন অভ্ পটাশিয়ামে, আর তার ভিতর যে-অক্সিজেন থাকে তা বেরিয়ে পড়ে । ন-সের ক্লোরেট অভ পটাশে সাড়ে তিন সের অক্সিজেন পাওয়া যায়, চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে একজনের পক্ষে সাড়ে তিন সের অক্সিজেনই প্রচুর । বাতাসে যে কার্বনিক অ্যাসিড থাকে ক্লোরেট অভ্ পটাশ তা সবসময়েই টেনে নেয়, কাজেই খুব বেশি ক'রে ক্লোরেট অভ্ পটাশ আর কস্টিক পটাশ নেবার ব্যবস্থা করা হ'লো ।

ম্যাস্টন বললেন, 'যদিও বিজ্ঞান বলেছে যে এরপর গোলার ভিতর আর বাতাসের অভাব হবে না, তবুও একবার হাতে-কলমে যাচাই করে নেয়া ভালো নয় কি ?'

সবাই এ-প্রস্তাবে সায় দিলেন । বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই । এ-কথা ঠিক । একবার পরখ ক'রে দেখা নিঃসন্দেহে ভালো ।'

তখন এক সপ্তাহের উপযোগী খাদ্য, পানীয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে ক্লোরেট অভ্ পটাশ আর কষ্টিক পটাশ দিয়ে ম্যাস্টনকে গোলার ভিতরে আটকে রাখা হ'লো । সাত দিন পর সবাই খুশি হ'য়েই দেখতে পেলে, ম্যাস্টন দিব্যি বহাল তবিয়তেই আছেন গোলাতে । বার্বিকেন অবশ্য পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্যে ম্যাস্টনকে ওজন করলেন । সবিস্ময়ে সবাই দেখলেন, ম্যাস্টনের ওজন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে ।

১২

আরো-এক বাজি
নিকল খুশির সাথে
হেরে যেতে রাজি ।

চাঁদকে লক্ষ্য ক'রে গোলাটা ছোঁড়বার পর যাতে পৃথিবী থেকে গোলার গতি দেখতে পাওয়া যায়, প্রথম থেকেই বিজ্ঞানীরা সে-চেষ্টা করেছিলেন । চাঁদ যদি উনচল্লিশ মাইল উপরে থাকতো তাহ'লে চাঁদকে খালি চোখে যে-ভাবে দেখা যেতো, তখনকার দুরবিন দিয়ে তার চেয়ে বেশি স্পষ্ট দেখবার সম্ভাবনা ছিলো না । আর, চাঁদের তুলনায় কামানের গোলা তো ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র, ছোট্ট একটা বিন্দু । সেই বিন্দু তীব্রগতিতে মহাকাশে ছুটে চলেছে—এ-দৃশ্য দেখতে হ'লে দুরবিনকে আরো শক্তিশালী করা দরকার, বৈজ্ঞানিকেরা সে-জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন । এর আগে যে-যন্ত্রে কোনোকিছুকে ছ-হাজার গুণ বড়ো ক'রে দেখা যেতো, তার ক্ষমতাকে কম ক'রে আরো ছ-গুণ বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছিলো । কেমব্রিজের বিখ্যাত মানমন্দিরের বিজ্ঞানীরা যে-দুরবিন বানালেন, তার নলচেটিও হ'লো দু-শো ফুট লম্বা । নলচের ভিতরে দূরের জিনিশ দেখবার জন্যে যে-কাচ বসানো হ'লো তার ব্যাস ষোলো ফুট ।

পৃথিবীতে চন্দ্রালোক এসে পৌঁছোয় বায়ুস্তর পেরিয়ে । বায়ুমণ্ডল ভেদ ক'রে পৃথিবীতে আসতে গিয়ে চাঁদের আলো তার ঔজ্জ্বল্যের অনেকখানিই হারিয়ে ফ্যালে । সুতরাং দুরবিন যত উঁচুতে স্থাপন করতে পারা যাবে, চাঁদের আলোকে আর সেই ততটুকু বায়ুমণ্ডল পেরুতে হবে না । কাজে-কাজেই ঠিক হ'লো যে কেমব্রিজ মান-মন্দিরের কর্তৃপক্ষ নতুন যে-বিরাটকায় দুরবিনটা বানিয়েছেন তা কোনো-একটি উঁচু পাহাড়ের উঁচু চুড়োয় বসানো হবে । অনেক তর্ক-বিতর্ক গবেষণার পর ঠিক হ'লো, যুক্তরাজ্যের রকি মাউন্টেনের চুড়োর উপর ঐ দুরবিন বসালে সুবিধে হবে ; সমুদ্রতল থেকে সে-চুড়োর উচ্চতা হচ্ছে এক হাজার সাতশো এক ফুট ।

রকি মাউন্টেনের পথ ছিলো অতি দুর্গম । দুস্তর গিরি-নদী, দুর্ভেদ্য অরণ্য, প্রবল উৎরাই তার চুড়োর পথ বিপজ্জনক ক'রে রেখেছিলো । তার উপর নরখাদক জংলিরা তো আছেই । কিন্তু তবু কখনো যেখানে মানুষের পদার্পণের সম্ভাবনা ছিলো না, যন্ত্রপাতি নিয়ে এঞ্জিনিয়ারেরা সেখানে গিয়েছিলেন দুরবিন বসাতে । বহুদিন প্রাণপণ পরিশ্রম ক'রে সুউচ্চ এক লৌহস্তম্ভের উপর সেই বিরাট দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসানো হ'লো ।

সবই যখন ঠিকঠাক হিশেব মাফিক হ'য়ে গেলো, তখন স্টোনিহিল-এ ভারে-ভারে বারুদ আসতে লাগলো ; একসঙ্গে যদি দশ হাজার মণ বারুদ স্টোনিহিলে আনানো হ'তো, তাহ'লে কারু সামান্য অসাবধানতায় মহাপ্রলয় ঘ'টে যাবার সম্ভাবনা ছিলো । সেইজন্যে বহু চিন্তার পর সাবধানী বার্বিকেন অল্প-অল্প ক'রে বারুদ আনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন । স্টোনিহিলের চারিদিকে দু-মাইলের ভিতর কোনো কারণেই আগুন জ্বালানো চলবে না—এই মর্মে সরকারি

বিজ্ঞপ্তি বেরুলো। এঞ্জিনিয়াররা পর্যন্ত খালি পায়ে কাজ করতে লাগলেন। যদি হঠাৎ জুতোর ঘসায় বারুদের কণা জ্ব'লে ওঠে। শুধু রাত্রিবেলায় বৈদ্যুতিক আলোয় কার্তুজ বানানো হ'তে লাগলো। কার্তুজগুলো একে-একে লোহার তারে জড়িয়ে অতি সাবধানে কামানের ভিতর স্থাপন করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। কার্তুজের তারের সঙ্গে আরেকটি তার লাগিয়ে কামানের গায়ের একটি ছোট্ট ফুটো দিয়ে তার এক দিক বাইরে আনা হ'লো। স্টোনিহিল থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা শক্তিশালী বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রস্তুত করা হয়েছিলো; বহু লৌহস্তম্ভের মাথা দিয়ে শূন্যে ঝুলে সেই তারের সঙ্গে ঐ-যন্ত্র সংযোগ স্থাপন করা হ'লো। বার্বিকেন স্থির করেছিলেন, যথাসময়ে এই যন্ত্র দিয়ে বারুদে অগ্নিসংযোগ করা হবে।

বারুদের কার্তুজগুলো নিরাপদেই কামানে রাখা হ'লো; কাপ্তেন নিকল আবার পরাজয় স্বীকার করলেন। তিন নম্বর বাজিতে হেরে গিয়ে কাপ্তেন নিকল বার্বিকেনকে তিন হাজার তিনশো পঁচিশ ডলার বের ক'রে দিলেন।

১৩

চাঁদে তবে যাবে বুঝি এরা বস্তুত?
প্রস্তুতি চলে তাই কামানের, দ্রুত।

মিশেল আর্দাঁর তখন একটুও অবসর ছিলো না। খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত নিয়মমতো করতে পারছিলেন না, এত ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছিলো। নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিশপত্র জড়ো করছিলেন তিনি: ব্যারোমিটার, দূরবিন, পৃথিবীর মানচিত্র, বন্দুক, গোলা-বারুদ, শাবল, কুঠার—আরো কত জিনিশ যে তিনি গোলার মধ্যে তুললেন তার ইয়ত্তা রইলো না। যেমন ঠাণ্ডার উপযোগী পোশাক-আশাক নেয়া হ'লো, তেমনি আবার ভীষণ গরমে গায়ে দেবার জামা-কাপড়েরও ব্যবস্থা করা হ'লো। ছোটো-ছোটো কৌটোয় নানা ধরনের ফসলের বীজ নেয়া হ'লো; মাংস এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যকে যন্ত্রের সাহায্যে ছোট্ট বড়ির মতো বানিয়ে তোলা হয়েছিলো। আর্দাঁ এই বিশেষ ধরনে প্রস্তুত খাদ্য নিলেন, দু-মাসের উপযোগী, এবং স্থির হ'লো সেই পরিমাণ পানীয় নেয়া হবে।

জলের স্প্রিং-এর উপর যেভাবে আসনগুলি বসাবার পরিকল্পনা হয়েছিলো, সেই অনুযায়ীই এই কাজ সমাপন করলেন বার্বিকেন। বাতাসের অভাব দূর করবার জন্য দু-মাসের উপযোগী ক্লোরেট অভ্ পটাশ আর কস্টিক পটাশ নেয়া হ'লো।

কাপ্তেন নিকল কিন্তু একরোখার মতো তখনো ব'লে চলছিলেন, 'উঁহু! যা-ই করুক না কেন, গোলা কিন্তু কিছুতেই চলছে না!'

বার্বিকেন মৃদু হেসে জিগেস করলেন, 'কেন চলবে না?'

কাপ্তেন নিকল মৃদু হেসে বললেন, 'আস্তে-আস্তে গোলাটার ওজন কত বেড়ে উঠেছে দেখছেন? অত ভারি গোলাটা কামানের মধ্যে রাখতে গেলেই সমস্ত কার্তুজগুলো একসঙ্গে

জ্ব'লে উঠে প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।'

এ-কথা শুনে বার্বিকেন গম্ভীরভাবে বললেন, 'আচ্ছা, দেখাই যাক।'

আগেই নির্দেশ দিয়ে খুব মজবুত একটি কপিকল আনানো হয়েছিলো। কপিকলটার শেকলগুলো খুব সাবধানে পরীক্ষা ক'রে যখন গোলাটা তোলবার ব্যবস্থা করা হ'লো, তখন গান-ক্লাবের সকল সদস্যের মনে যে কী-রকম উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো, তা ব'লে বোঝানো যাবে না। কেউ-কেউ উদ্বিগ্ন হ'য়ে ভাবতে লাগলেন, 'শেকলটা শেষ, পর্যন্ত ছিঁড়ে না-যায়; যদি ছিঁড়ে যায় তাহ'লে তো সর্বনাশ। বিদ্যুতের বেগে গোলাটা গিয়ে পড়বে কামানের তলায়, আর তক্ষুনি সেই আকস্মিক আঘাতে কার্তুজগুলো জ্ব'লে উঠবে। তারপর —উঃ, ভাবতেও কী সাংঘাতিক!'

খুব আস্তে-আস্তে কপিকলের হাতল ঘুরিয়ে সেই মস্ত গোলাটাকে কামানের মধ্যে নামানো হ'তে লাগলো: আস্তে-আস্তে গোলাটা ঢুকতে লাগলো পাতালে, তারপর ধীরে-ধীরে চোখের আড়াল হ'য়ে গেলো। সবাই রুদ্ধশ্বাসে শেষ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু না, কোনো দুর্ঘটনাই ঘটলো না। গোলাটা নির্বিঘ্নে যথাস্থানে গিয়ে বসলো।

কাপ্তেন নিকল টাকা নিয়ে বার্বিকেনের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বার্বিকেনের করমর্দন ক'রে অভিনন্দন জানালেন তিনি, 'আরেকটা বাজিও হারলুম; এই নিন তার টাকা।'

বার্বিকেন হেসে বললেন, 'না, না ও কী করছেন? আপনি তো এখন আমাদেরই একজন। আপনার কাছ থেকে কি বাজির টাকা নেয়া চলে?'

'কেন নেয়া যাবে না?' নিকল বললেন, 'নিশ্চয়ই নেয়া যাবে। বাজি—চিরকালই বাজি। এর মধ্যে আবার আপন-পর কী? নিজের কথা ঠিক রাখতে হবে তো? কথা যখন দিয়েছি একবার, তখন— এই নিন, টাকা নিন।'

বার্বিকেন টাকার থলি হাতে নিয়ে বললেন, 'তাহ'লে আপনি বাকি দুটো বাজির টাকাও দিতে পারেন, কেননা সে-দুটোও তো আপনাকে হারতে হবে।'

কাপ্তেন নিকল বললেন, 'সে-বিষয়ে কিন্তু আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। আর সন্দেহ আছে ব'লেই তো বাজি ধরেছি। সুতরাং আগে হেরে নিই, তারপর বাজির টাকাটা দেয়া যাবে। কী বলেন?'

১৪

মনে হয় সব বুঝি খ্যাপার প্রলাপ:
স্টোনিহিল ভিড়ে-ভিড়ে তবু ছয়লাপ!

বেতার-মারফৎ ঘোষণা ক'রে দেয়া হয়েছিলো, পয়লা ডিসেম্বর রাত্রি দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডের সময় গান-ক্লাবের বানানো সেই অদ্ভুত গোলা ইস্পে বার্বিকেন, কাপ্তেন নিকল এবং মিশেল আর্দাঁকে নিয়ে চাঁদের দিকে ছুটে চলবে—আমেরিকা আর ফ্রানস একসঙ্গে

যাবে চন্দ্রলোক দখল করতে । হয় সে-দিনই যেতে হবে, নয় তো আবার আঠারো বছর এগারো দিন পরে ।

সমস্ত পৃথিবী বেতারের পরবর্তী ঘোষণার অপেক্ষায় উদগ্রীব হ'য়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো । যারা পারলো, তারা তো আমেরিকাতেই চ'লে এলো স্টোনিহিলে ; যারা পারলো না, তারা আর কী করবে ? বেতারের চাবি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দুর্বহ প্রতীক্ষায় ব'সে রইলো । অবশেষে একদিন এলো সেই বহু-প্রতীক্ষীত পয়লা ডিসেম্বর ।

সূর্যোদয়ের আগে স্টোনিহিলের চারপাশে অজস্র লোক জমায়েত হয়েছিলো । যে-দিকেই তাকানো যায়, জনসমুদ্রের উদ্বেলিত তরঙ্গ ; সকলেই উৎকণ্ঠ হ'য়ে আছে রাত্রি দশটা চল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডের জন্যে ।

তার প্রায় এক সপ্তাহ আগেই স্টোনিহিলের চারদিকে অজস্র তাঁবু খাটানো হয়েছিলো, যেন এক তাঁবুর শহর । সারি-সারি দোকান, সরাইখানা, রেস্তোরাঁ—সব তাঁবুর মধ্যে । পয়লা ডিসেম্বর ভোর হ'তে-না-হ'তেই কোনোখানে আর ছুঁচ ফেলবার জায়গা রইলো না । পনেরো মিনিট অন্তর সেই তাঁবুর শহরে হাজার-হাজার লোক নিয়ে আসতে লাগলো রেলগাড়ি । বার্বিকেন তো খুশি গলায় সেই তাঁবু-শহরের নাম রেখে দিলেন, 'সিটি অব মিশেল আর্দাঁ' ।

'সিটি অব মিশেল আর্দাঁয় জমা হয়েছিলো পৃথিবীর সব দেশেরই লোক, কথোপকথন চলছিলো পৃথিবীর সব ভাষাতেই, লোক জমা হয়েছিলো সকল বয়সেরই ।

তারপর আস্তে-আস্তে কুয়াশা-মাখা সন্ধ্যা নামলো সিটি অভ্ মিশেল আর্দাঁয় । সাতটার সময় আকাশে দেখা গেলো সকল উত্তেজনার মূল সেই চাঁদকে । নির্মেঘ আকাশের সোনালি চাঁদ তার স্ফটিক জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিলে । কান পর্যন্ত টানা ধনুকের ছিলার মতো প্রতীক্ষারত জনতা চাঁদের দীর্ঘ জীবন কামনা করলো সমবেত গলায় । এই তারিখের আগে লোকে কতবার চাঁদকে দেখেছে, কত পূর্ণিমার রাতে না-ঘুমিয়ে উৎসব ক'রে কাটিয়েছে ; কিন্তু কই, চাঁদকে তো অত সুন্দর কখনো দেখা যায়নি ! চাঁদকে সেদিন মনে হ'লো অপার্থিব, কিন্তু পরমাত্মীয় ; অনিমেষ চক্ষে সবাই দেখতে লাগলো চাঁদকে । কেবল চাঁদেরই দীর্ঘ জীবন কামনা করলে না তারা, দীর্ঘ জীবন কামনা করলে গান ক্লাবের, বার্বিকেনের, নিকলের, মিশেল আর্দাঁর ।

লক্ষ-লক্ষ লোকের গলার আওয়াজে কেঁপে উঠলো স্টোনিহিল, টম্পা, ফ্লরিডা—কেঁপে উঠলো গোটা মার্কিন মুলুক । স্টোনিহিলের গিরিকন্দরে প্রতিধ্বনিত হ'লো লক্ষ কণ্ঠস্বর : 'ভিভ লা ল্যুন'—'চন্দ্রলোক জিন্দাবাদ' !

১৫

বুদ্ধি সকলই বুঝি গেলো তবে খোয়া ?
চাঁদের দিকেই চলে তিন বেপরোয়া !

রাত দশটার সময় মিশেল আর্দাঁ, কাপ্তেন নিকল এবং ইম্পে বার্বিকেন হাসতে-হাসতে

কামানের কাছে এসে দাঁড়ালেন। রেলগাড়িতে অজানা কোনো দূর বিদেশে যাবার সময় মানুষের যতটুকু চাঞ্চল্য হয়, তাঁদের চোখ-মুখে সেটুকুও কেউ লক্ষ করতে পারলো না। তাঁরা গোলার মধ্যে ঢোকবার জন্যে তৈরি হলেন।

ম্যাস্টন বললেন, 'বার্বিকেন, এখনো সময় আছে। আমি সঙ্গী হবো আপনার?'

'না ম্যাস্টন, তা কী ক'রে হয়?' বার্বিকেন বললেন, 'আমরা পৃথিবীর অগ্রদূত হ'য়ে আগে চাঁদে যাই। কামান তো রইলোই, পরে দরকার হ'লে তোমরা আমাদের কাছে পৃথিবীর খবর পাঠাতে পারবে।'

মিশেল আর্দাঁ বললেন, 'মিস্টার বার্বিকেন কিন্তু ঠিক কথাই বলেছেন, ম্যাস্টন। এই কাজটা করার জন্যে আপনাকে পৃথিবীতে থাকতে হবে : আর-কিছু না-হোক মাঝে-মধ্যে আপনি অন্তত খাদ্য-পানীয় তো পাঠাতে পারবেন।'

এ-কথা শুনে ম্যাস্টন নিজেকে কোনোমতে সান্ত্বনা দিলেন। ঈষৎ উৎসাহিত গলায় বললেন, 'প্রত্যেক বছর বড়োদিনের সময় আপনারা খাদ্য ও পানীয় পাবেন, এবং সেইসঙ্গে পাবেন সমস্ত পৃথিবীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।' এই ব'লে ম্যাস্টন কিছুটা উত্তেজিত হ'য়েই বন্ধুদের সঙ্গে করমর্দন ক'রে বিদায় নিলেন।

আর এক মুহূর্তও দেরি না-করে কাপ্তেন নিকল, মিশেল আর্দাঁ আর ইম্পে বার্বিকেন যন্ত্রের সাহায্যে গোলার ভিতর ঢুকলেন। সমবেত জনতার শোরগোলে কামানের নলচের ভিতরকার অন্ধকার গমগম করছিলো। গোলার ভিতরে দিয়ে যেই তাঁরা ভালো ক'রে দরজা দিলেন, অমনি জমাট স্তব্ধতার মধ্যে অনুভব করলেন পৃথিবীর সঙ্গে প্রবল বিচ্ছেদ।

রকি-মাউন্টেনের চূড়োয় দাঁড়িয়ে এঞ্জিনিয়ার মার্চিসন তখন নিষ্পলক চোখে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যতই সেই চরম মুহূর্তটি কাছে আসতে লাগলো, জনতা ততই উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হ'তে লাগলো, যেন কোনো জাদুকরের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় তাদের কথাবার্তা সব বন্ধ হ'য়ে গেলো, কান পর্যন্ত টানা ধনুকের ছিলার মতো স্পন্দনহীন হ'য়ে তারা অপেক্ষা করতে লাগলো সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তের।

মার্চিসন নীরবে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন : দশটা ছেচল্লিশ। আর মাত্র চল্লিশ সেকেণ্ড। মার্চিসনের বুকটা একবার কেঁপে উঠলো। সেকেণ্ডের কাঁটা ঘুরছে। দশ—পনেরো—কুড়ি—পঁচিশ—ত্রিশ। আর দশ সেকেণ্ড মাত্র। উত্তেজনায় সমবেত জনসাধারণ একবার অস্ফুট একটি আওয়াজ ক'রে উঠলো। মার্চিসন গুনতে লাগলেন : পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ, সাঁইত্রিশ, আটত্রিশ। মার্চিসনের হৃৎপিণ্ড একবার প্রবলভাবে লাফিয়ে উঠলো, ডান হাত স্পর্শ করলো বৈদ্যুতিক বোতাম, বন্ধ হ'য়ে এলো নিয়মিত নিশ্বাস। উনচল্লিশ-চল্লিশ। রাত্রি দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ড!!

যা ঘটলো, তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। লক্ষ প্রবল বজ্র যদি জমাট স্তব্ধতায় একসঙ্গে ফেটে পড়তো তাহ'লে যে-আওয়াজ হ'তো, কামানের গর্জনের কাছে তা কিছুই না। হঠাৎ যেন কোনো আগ্নেয়গিরির ঘুমন্ত জ্বালামুখ ফেটে ছিটকে বেরিয়ে গেলো, কামানের নল থেকে আকাশ স্পর্শ ক'রে উঠলো লকলকে লাল আগুন, মুহূর্তের জন্যে গোটা মার্কিন মুলুক উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো সেই আলোয়, যেন আচমকা সূর্যোদয় হয়েছে।

সমস্ত যুক্তরাজ্য কেঁপে উঠেছিলো সেই প্রবল কামান-গর্জনে। জনতার মধ্যে ছিটকে

পড়লো বহু লোক ; কে কার গায়ে পড়লো, কে কাকে পায়ের তলায় চাপা দিলে—প্রাণের ভয়ে পালাতে-পালাতে কে আছাড় খেয়ে মৃত্যুবরণ করলো, সে-খবর নেয় কে ? ভীষণ চীৎকারে, ভয়-ধরানো আর্তনিনাদে স্টোনিহিল যেন এক বিরাট মহাশ্মশান হ'য়ে উঠলো ।

বাতাসে এমন আলোড়ন উঠেছিলো যে, তক্ষুনি প্রবল সাইক্লোন ব'য়ে গেলো দূরে-কাছে, যুক্তরাজ্যের নানা অঞ্চলে । ঘূর্ণি বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেলো হাজার-হাজার তাঁর, প্রান্তরে চক্ষের পলকে ভেঙে পড়লো বহু গাছপালা, নতুন-গ'ড়ে-ওঠা টম্পার বাড়িঘর ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেলো, রেললাইন থেকে চলন্ত রেলগাড়ি কাৎ হ'য়ে ছিটকে পড়লো মাঠে, বন্দরের জাহাজগুলোর শেকল ছিঁড়লো, নোঙর খসলো, আছড়ে পড়লো তারা মহাসমুদ্রে । ফেনিয়ে-ঘোরা চর্কিজল যে কত জাহাজকে ছোট্ট পুতুলের মতো লুফতে-লুফতে শেষটায় ডুবিয়ে দিলো অনেক হুজ্জুত ক'রে তার সঠিক সংখ্যা জানা গিয়েছিলো বহুকাল পরে ।

সেই রাত্রে চাঁদ উঠেছিলো নিটোল গোল, ছড়িয়ে দিয়েছিলো স্বচ্ছ জ্যোৎস্নাধারা ; কিন্তু সেই মুহূর্তে পলকের মধ্যে সেই সোনালি চাঁদ ঢাকা প'ড়ে গেলো মেঘে । কালো ধোঁয়া আর মেঘ ভেদ ক'রে কারু দৃষ্টি চললো না । বিশেষভাবে-তৈরি-করা সেই প্রবল শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত কামানের গোলাটির কী হ'লো, তা জানা গেলো না শুধু ঐ মেঘ আর ধোঁয়ার জন্যে ।

পরদিন ভোরবেলাতেও আকাশ রইলো মেঘলা, অন্ধকার । দুপুরবেলাতেও কেউ সামান্যতম সূর্যালোক দেখতে পেলে না । রাত্রির কালো আকাশে সেদিন একটানা চললো পাগলা ঝড়ের মাতামাতি, হারিকেন লুনার তাণ্ডব ।

তার পরদিন বেতারে ঘোষণা করা হ'লো : 'কেমব্রিজ মানমন্দিরের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে কামানের গোলা প্রচণ্ড বেগে চাঁদের দিকে ছুটে চলেছে ।'

দ্বিতীয় পর্ব

চাঁদকে ঘিরে ঘোরা কেবল
কপাল বুঝি রাখছে লিখে ?

১

মানুষ চললো চাঁদের দিকে
অবাক তাদের আজব গাড়ি ।
ধাপ্পা ? না কি সত্যি যাবে ?
সত্যি দেবে চাঁদেই পাড়ি ?

বিস্ফোরণের ভয়ংকর আওয়াজ কাঁপিয়ে দিলে মাটি, আকাশ ছুঁলো আগুনের টকটকে হলকা । বৈদ্যুতিক কলটির বোতাম টিপেছিলেন ম্যাস্টন : বিস্ফোরণের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ছিটকে পড়লেন দূরে, কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর চেতনা বিলুপ্ত হ'য়ে গেলো ।

আকাশ ঢাকা পড়লো ধোঁয়ায়, মেঘ জমলো অমাবস্যার অন্ধকারের মতো, স্টোনিহিলের লোকারণ্য কেঁপে উঠলো থরথরিয়ে । কেবর স্টোনিহিলই কাঁপলো না, কাঁপলো টম্পাও এবং সমস্ত যুক্তরাজ্য । সমুদ্রে লাফিয়ে উঠলো জল, ফেনিয়ে ঘুরলো চর্কিবাজির মতো । সবাই যখন সংবিৎ ফিরে পেলো প্রথমেই তাকালো আকাশের দিকে. । কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেলো না । কোন্ মহাশূন্যে তখন গোলকটি ছুটে চলেছে, কে জানে ।

গান-ক্লাবের তৈরি সেই যাত্রীবাহী গোলকটি কিন্তু তখন দূর পাল্লার অভিযানে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাচ্ছিলো চাঁদের দিকে । যে-চাঁদের দিকে তাকিয়ে এতকাল মায়েরা ঘুম-পাড়ানি গেয়ে শোনাতেন ছেলেমেয়েদের, সেই চাঁদ শেষ পর্যন্ত মানুষের দখলে আসতে চললো । জ্যোতির্বিদরা যাকে মহাশূন্যের অন্যতম বিস্ময় ব'লে মনে করতেন, সেই চাঁদ আজ জয় করতে চললো পৃথিবীর তিনজন মানব-যাত্রী ।

ঊর্ধ্বে পৃথিবীর অনেক উপরে, দূরে আকাশের কোলে, মহাশূন্যে গ্রহজগতের অন্যতম বিস্ময়ের রাজ্য : চাঁদ । কী সেই চাঁদের ইতিহাস ? কারা থাকে চাঁদে ? চাঁদ কি সত্যিই বাসযোগ্য ? কে জানে কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সেই উপগ্রহে ! শেষ পর্যন্ত চাঁদ জয় করতে চলেছে দুঃসাহসী মানুষ, যে একদিন থাকতো গুহায়, চোখা পাথরের হাতিয়ার দিয়ে হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াই ক'রে নির্মম প্রকৃতির প্রতিরোধ চুরমার ক'রে আত্মরক্ষা করতো, যে বিচিত্রবীর্য মানুষ বানিয়েছে বিজ্ঞান, দীপ্তিময় দর্শন, আলোকপ্রাপ্ত সাহিত্য ।

এইসব বিষয়েই বললো সমস্ত খবরের কাগজগুলি, যখন কেমব্রিজ মানমন্দির দু-দিন ঘোষণা করলো : 'গান-ক্লাবের বিশাল গোলকটিকে তীরবেগে মহাশূন্যে ছুটে চলতে দেখা যাচ্ছে । গোলকটির লক্ষ্য পৃথিবীর বহু-আলোচিত উপগ্রহ চন্দ্র ।' আর এই সমস্ত সংবাদের

শিরোনাম হ'লো বড়ো-বড়ো হরফে :

'পৃথিবীর প্রথম বিস্ময় !

গান-ক্লাবের গ্রহান্তর অভিযান !!

চন্দ্রলোক অভিমুখে প্রথম তিনজন মানব-যাত্রী !!!

এবং সবিস্তারে বিবৃত করা হ'লো সেই চমকপ্রদ কাহিনী, যা আমরা এই মাত্রই প'ড়ে ফেলেছি ।

২

মহাশূন্যের অভিযাত্রী—

কেউ জানেন না দিন, না রাত্রি !

পৃথিবীর আলো-বাতাস আকাশ-মাটি মানুষ-জন—সবকিছুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই বিশাল গোলকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন অধ্যাপক মিশেল আর্দাঁ, কাপ্তেন নিকল এবং ইম্পে বার্বিকেন । প্রয়োজনীয় জিনিশপত্রের সঙ্গে নিলেন বার্বিকেনের প্রিয় কুকুর দুটি, নেপচুন এবং সাটেলাইটকে ।

গোলার ভিতরে ঢুকে প্রথমে সবাই কিছুক্ষণ নির্বাক হ'য়ে থাকলেন । শুধু-যে বলবার মতো কোনো কথা না-পেয়েই তাঁরা চুপচাপ রইলেন তা নয়, এমনিতেই তাঁরা কথা বলতে চাচ্ছিলেন না, ইচ্ছেই হচ্ছিলো না কিছু বলবার । কিন্তু এই-রকম উৎকণ্ঠ অবস্থায় বেশিক্ষণ আবার চুপচাপ থাকা যায় না, তাই একসময়ে কব্জিঘড়ির দিকে তাকিয়ে নীরবতা ভেঙে অধ্যাপক মিশেল আর্দাঁ বললেন, আর মাত্র তিন মিনিট বাকি, তারপরই আমাদের নিয়ে গোলাটি শূন্যে ছিটকে বেরোবে ।'

'আমরা তবে সত্যিই চন্দ্রলোকে চলেছি ?' কাপ্তেন নিকলের যেন অবস্থাটা কিছুতেই বিশ্বাস হ'তে চাচ্ছিলো না , সে-কথা তিনি মুখ ফুটে জানালেনও : 'আমার তো এখনো সত্যি বিশ্বাসই হ'তে চাচ্ছে না !'

কেবল ইম্পে বার্বিকেনের চোখ-মুখেই খুশির আভা ঝিলকিয়ে উঠছিলো । একটু হেসে তিনি বললেন, 'কী ক'রে হবে বলুন ? চাঁদে গোলা পাঠাবার কথা কল্পনা করলেও আমি নিজে তো স্বপ্নেও ভাবিনি চাঁদে পদার্পণ করবার কথা । আমার তো মনে হয় না মঁসিয় আর্দাঁ ছাড়া আর-কারু মগজে এমন আশ্চর্য ইচ্ছে গজাতো । তবে আমরা শেষ পর্যন্ত চাঁদে যদি না-ও পৌঁছুতে পারি, তবু আমি এই জেনেই খুশি আমার এতদিনের স্বপ্ন শেষটায় আজ সফল হ'তে চলেছে ।'

'আপনারা না-হাসলে আমি সত্যি কথাটা বলতুম,' হালকা গলায় মিশেল আর্দাঁ জানালেন, 'আমার কিন্তু ফুর্তিতে এখন ছোটোদের মতো নাচতে ইচ্ছে —'

অধ্যাপক আর্দাঁ মুখের কথা আর শেষ করতে পারলেন না । আচমকা প্রচণ্ডভাবে কেঁপে

উঠলো গোলাটা, যেন বাইরে শুরু হয়েছে এক প্রবল প্রলয় । আসন থেকে তীব্র বেগে ছিটকে পড়লেন তিনজনেই । তিনজনে এত জোরে ধাক্কা খেলেন মজবুত দেয়ালের গায়ে যে ঝিম-ঝিম ক'রে উঠলো মাথা, যেন সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হ'য়ে যেতে চাচ্ছে । চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হ'য়ে এলো, কে যেন পাৎলা একটা কুয়াশার চাদর দিয়ে সবকিছু ঢেকে দিয়ে গেলো ।

যদিও মাথাটা এখনো ঝিম-ঝিম করছিলো, তবুও সংবিৎ প্রথম ফিরে পেয়েছিলেন অধ্যাপক আর্দাঁ । গোলকের মধ্যে কোনো রকমে স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে-করতে তিনি নিস্তেজ গলায় বললেন, 'শেষকালে এই সামান্য বিস্ফোরণ কিনা আমার সমস্ত শক্তি নিংড়ে নিলো !'

নিজেকে একটু সামলে কোনো-রকমে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন আর্দাঁ । দেখতে পেলেন কাপ্তেন নিকল মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছেন । তাঁকে ধরে ওঠাবার চেষ্টা করলেন আর্দাঁ । তাঁর হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে করুণ স্বরে কাপ্তেন নিকল জিগেস করলেন 'আমি কোথায় আছি, কিছুই বুঝতে পারছি না ।'

'নিজেকে মহাশূন্যের অভিযাত্রী ব'লে ভাবতে নিশ্চয়ই খুব বেশি দেরি হবে না আপনার । এ-সব বিষয়ে চট ক'রেই অভ্যস্ত হ'য়ে যাওয়া যায়, কেননা পদে-পদেই খুব ক'রে প্রমাণ পাওয়া যায় তো কোনখানে আছি !' আর্দাঁ ঠাট্টা করলেন, 'এবার আসুন তো শিগগির, বার্বিকেনের কী দশা হ'লো আবিষ্কার ক'রে দেখি ।'

তাঁদের সাহায্যে কোনোরকমে নিজেকে সামলাতে-সামলাতে বার্বিকেন বললেন, 'সত্যি-বলতে, আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিলো । সব ঝাপসা হ'য়ে গিয়েছিলো চোখের সামনে, এখন অবিশ্যি কোনো-রকমে সামলে নিয়েছি । গ্রহান্তর অভিযানের ইতিহাসে প্রথম অভিযাত্রী ব'লে যেহেতু আমাদের নাম উজ্জ্বল-চিহ্নিত হবে, সেজন্যেই এমনভাবে নেতিয়ে পড়লে আমাদের চলবে না । দেখুন তো, কাপ্তেন নিকল, কদ্দুর এগুনো গেলো এর মধ্যে ।'

কাপ্তেন নিকল বললেন, 'ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না । আমরা এখন গোলকের ঠিক মধ্যখানে । একটা জিনিশ কিন্তু আমার ভারি আশ্চর্য ঠেকছে । বিস্ফোরণের কোনো শব্দই কিন্তু আমি শুনতে পাইনি ।'

একটি ঘন পুরু কাচের জানলার উপরকার ধাতুর আবরণী উন্মোচন করতে-করতে মিশেল আর্দাঁ বার্বিকেনকে আহ্বান করলেন, 'দেখুন তো, মিস্টার বার্বিকেন, বাইরে এখন কোনো-কিছু দ্রষ্টব্য আছে কি না !'

'কী-প্রচণ্ড বেগে আমরা পৃথিবী ছাড়িয়ে চলেছি !' সাফল্যের আলোয় বার্বিকেনের চোখমুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো : 'শেষ অব্দি সত্যি-সত্যিই তাহ'লে চাঁদে চলেছি আমরা ?'

'আচ্ছা, বার্বিকেন, এই ব্যাপারটার মানে আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন ?' কাপ্তেন নিকল আবার জিগেস করলেন, 'আমাদের আকাশ-যান তো কামানের নলচের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে । কিন্তু সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কোনো শব্দ কেন শুনতে পাওয়া গেলো না ?'

একটু ভেবে বার্বিকেন আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি ! বুঝতে পেরেছি কেন আমরা বিস্ফোরণের কোনো শব্দই শুনতে পাইনি ! ... আসল ব্যাপারটা কী, জানেন কাপ্তেন নিকল ? শব্দের যে-গতি, আমরা তার চেয়েও ঢের বেশি জোরে ছুটে চলেছি। আমাদের আকাশ-যানের গতি হ'লো সেকেণ্ডে বারো হাজার ফুট । সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই শব্দ আমাদের নাগাল পায়নি—এবং বলাই বাহুল্য শব্দ কখনোই আমাদের নাগাল ধরতে পারবে না ।'

'অবিস্মরণীয় মুহূর্ত !' নিকল ব'লে উঠলেন ।

'সমস্ত জীবনটা এইরকম রূদ্ধশ্বাস মুহূর্ত দিয়ে গড়া নয় ব'লেই এই মুহূর্তের সকল আনন্দ আপনি উপভোগ করতে পারছেন, কাপ্তেন নিকল । তা যদি না-হ'তো, তাহ'লে কি আর এত আনন্দ হ'তো আপনার ?' মিশেল আর্দাঁ গম্ভীর না-হ'য়েই দার্শনিক হবার চেষ্টা করলেন ।

বার্বিকেন ধারালো গলায় জানালেন, 'হারলে আমাদের চলবে না । যে-ক'রেই হোক না কেন, চাঁদ আমাদের জয় করতে হবেই ।'

'মিথ্যে অত ভাবছেন কেন ?' বার্বিকেনকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করলেন নিকল, 'খামকা অত নিরাশ হবেন না । চাঁদ আমরা নিঃসন্দেহে জয় করবো । এতদূর যখন এগিয়ে এসেছি তখন আমরা নিশ্চয়ই ব্যর্থতা বরণ করবো না !'

'এটা কেবল আমরা আশাই করতে পারি, কাপ্তেন নিকল, কিন্তু অতটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না ।' অধ্যাপক আর্দাঁ বললেন, 'তীরের কাছে এসেও অনেক সময় তীর ডোবে । অজানা আকাশে পাড়ি চলেছে আমাদের : যে-আকাশে এতকাল শুধু কল্পনারই অবাধ বিহার চলতো, সেখানে আজ আমরা বাস্তবেই পাড়ি দিয়ে চলেছি । এত উঁচু দিয়ে চলেছি যে মানুষের কল্পনা এখানে পৌঁছোয়নি কোনোদিন । না-জানা কত-কী বিপদ অপেক্ষা ক'রে আছে আমাদের জন্যে, সুতরাং আমরা কিছুতেই নিশ্চন্ত হ'তে পারি না ।'

দু-চোখে প্রশংসা নিয়ে কাপ্তেন নিকল বার্বিকেনকে অবলোকন করলেন । 'আপনার মতো প্রতিভার কাছে বাজি হেরেও গৌরব আছে ! আমার আগেকার ধৃষ্টতার জন্যে ক্ষমা করবেন, বার্বিকেন ।'

নিকলের করমর্দন করলেন বার্বিকেন । বললেন, 'কী-যে বলেন আপনি ! আপনার এবং অধ্যাপক আর্দাঁর সাহচর্যেই আমার স্বপ্ন আজ সফল হ'তে চলেছে !'

৩

উল্কা সে কি ? না, ধূমকেতু ?
যা-ই হোক, সে ভয়ের হেতু ।

এতকাল যে-জ্যোতিষ্কমণ্ডলে কল্পনা বিহার করতো, আজ সেখানে মানুষ চলেছে । এর জন্যে যা-কিছু প্রশংসা, সব নিঃসন্দেহে গান-ক্লাবেরই প্রাপ্য ব'লে সেক্রেটারি ম্যাস্টনের কাছে অজস্র অভিনন্দন-পত্র আসতে লাগলো । ম্যাস্টন দস্তুরমতো ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন অভিনন্দন-পত্র গ্রহণ করতে-করতে । কেবল আমেরিকার সবকটি গৃহ থেকেই নয়, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ব-পশ্চিমের সকল দেশ থেকেই অবিরল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আসতে লাগলো । এত অজস্র চিঠি-পত্র বাছাই এবং বিলি করতে-করতে ডাকঘরের লোকেরা পর্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো ।

কিন্তু কেবল এতেই শেষ নয় । চন্দ্রযাত্রীদের খবর কী,এখন তাঁরা কোথায়, কী করছেন —ইত্যাদি বিষয় জানতে চেয়েও আরো অগুনতি চিঠি এলো । 'কাজে-অকাজে কত চিঠি যে লিখতে পারে লোকে—' একথা ভাবতে-ভাবতে ম্যাস্টন মনে-মনে চ'টে উঠছিলেন । গান-ক্লাবের আকাশ-যানের কী হ'লো জানবার জন্যে দূরবীক্ষণের কাছে বসবার সময় পাচ্ছিলেন না তিনি : ঐ চিঠিপত্রগুলিকেই তিনি সমস্ত ঝামেলার মূল ব'লে মনে করেছিলেন । আসলে তিনি চিঠিপত্রগুলি নিয়ে খামকা সময় নষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না, তাই শিগগিরই সিদ্ধান্ত নিলেন, 'না, আর চিঠিপত্র দেখাশোনা নয় । কোথায় জরুরি কাজ নিয়ে বসবো, না যত্তসব ঝামেলা ! আসুক যত চিঠিপত্র আসতে পারে ; ভ'রে যাক ঝুড়ির পর ঝুড়ি । এই-যে আমি দূরবিনের কাছে গিয়ে বসছি, আর একচুলও নড়ছি না । ওঁরা রওনা হবার পর তিন দিন কেটে গেলো, অথচ এর মধ্যে কেমব্রিজ মানমন্দিরের ঘোষণা ছাড়া ওঁদের সম্বন্ধে আর-কিছুই জানতে পারলুম না । উঁহু, আর এই চিঠির ঝামেলা ঘাড়ে নিচ্ছি না ! এবার কেবল দূরবীক্ষণকেই সম্বল করতে হবে !

আচমকা বার্বিকেন আর্তগলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অ্যাঁ ! কী ওটা ? ঐ-যে, ওটা কী জিনিশ ?'

অধ্যাপক আর্দাঁর গলায় ভয় ফুটলো : 'দেখুন ! দেখুন ! আমাদের মূর্তিমান ধ্বংস এগিয়ে আসছে !'

তিনজনেই হুড়মুড় ক'রে ব্যগ্রভাবে কাচের জানলার কাছে এগিয়ে এলেন, ভালো ক'রে বাইরে তাকিয়ে দেখবার জন্যে ।

'আমাদের গোলকের দিকেই যে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে ঐ জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডটা !' ভয় পেয়ে কেঁপে গেলো কাপ্তেন নিকলের গলা : 'সোজাসুজি এ-দিকেই আসছে দেখছি ! আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তো ওটার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধবে ! আর আমাদের রক্ষা নেই, ধ্বংস অনিবার্য !'

যে ভয়ংকর করাল আগুনের গোলাটা দেখে তিনজনে আঁৎকে উঠলেন, সেটি হ'লো পৃথিবীর চারপাশে ঘূর্ণ্যমান জ্বলন্ত ধাতুপিণ্ডগুলোর একটি । মহাশূন্যে পৃথিবীর চারপাশে কেবলই আবর্তন করছে অসংখ্য ছোটো-ছোটো ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতি । তারই একটি ছিটকে আচমকা এই আকাশ-যানের গতিপথে ছুটে এসেছে । কক্ষচ্যুত ঐ জ্বলন্ত উল্কাটির সঙ্গে সংঘাত না-ঘ'টে আর যায় না ! এবং এই সংঘাতের একটিই শুধু মানে হতে পারে, সোজা ভাষায় যাকে বলা যায় : মৃত্যু । একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে গান-ক্লাবের এই বিরাট গোলকটি, যদি একবার ধাক্কা খায় ঐ উল্কাটির সঙ্গে ।

বিজ্ঞানের গৌরবময় অভিযানে অংশ নিতে গিয়ে যুগে-যুগে এমনি ভাবেই মৃত্যুকে বরণ ক'রে নেন বিজ্ঞানীরা । তাঁদের এই প্রবলভীষণ বিনাশকে অবলম্বন করেই যুগের পর যুগ ধ'রে গ'ড়ে উঠেছে সভ্যতার আকাশস্পর্শী প্রাসাদ ।

ব্যগ্র গলায় কাপ্তেন নিকল শুধোলেন, 'এখন তাহ'লে উপায় ?'

'উপায় ?' করুণভাবে হাসলেন বার্বিকেন : 'ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া এই মুহূর্তে আর-কোনো উপায়ই আমি দেখতে পাচ্ছি না । আমাদের কাছে অবিশ্যি অনেকগুলি হাউই আছে এবং বিশেষভাবে তৈরি ব'লে তাদের শক্তিও প্রচুর । এই হাউইগুলির সাহায্যে হয়তো আমাদের আকাশ-যানের গতিপথ বদলে নিয়ে বাঁচবার একটা ক্ষীণ প্রয়াস করা যেতো : কিন্তু এখন তো সেই হাউইগুলি ব্যবহার করবার মতোও সময় নেই ! দেখছেন না কী-প্রচণ্ড বেগে উল্কাটা আমাদের গোলার কাছে এসে পড়েছে !'

আর্দাঁ জিগেস করলেন, 'এখন তাহ'লে কী করা যায় ?'

'কেবল মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর-কিছু আমরা করতে পারি ব'লে বোধ হচ্ছে না ।' বার্বিকেন নানান কথায় ব্যস্ত থেকে উল্কাটিকে ভুলে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন : 'আমাদের এই গৌরবময় অভিযানের সমাপ্তি যে এমনভাবে ঘটবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ।'

শুকনো একটুকরো হাসির রেখা ফুটলো মিশেল আর্দাঁর ঠোঁটে । 'ভেবে আর লাভ কী হবে, বলুন ! বিজ্ঞানের শহিদ হিশেবে অমর হ'তে চলেছি আমরা এবং সেজন্যে এখন আমাদের রীতিমতো আনন্দ করা উচিত ।'

যদিও আর্দাঁ মুখে এ-কথা বললেন, তবু এইরকম বিনাশের সম্মুখীন হ'তে তাঁর যে খুব ভালো লাগছিলো, এমনটা মনে হ'লো না অন্যদের ।

৪

শূন্যে হারায় স্যাটেলাইট, সে
অভিযানের শরিক—
সহচরের কবর এমন !
ভালো না ভাবগতিক ।

আকাশে যখন গান-ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন, ফরাশি বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক মিশেল আর্দাঁ এবং রিচমণ্ডের কাপ্তেন নিকল মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন, তখন পৃথিবীতে....যুক্তরাজ্যের বল্টিমোরে গান-ক্লাবের মস্ত অট্টালিকায় ব'সে ম্যাস্টন দূরবীক্ষণ দিয়ে আকাশ-পথ পর্যবেক্ষণ করছিলেন ।

মার্চিসন জিগেস করলেন, 'বার্বিকেনদের খবর কী, বলুন তো ? কী দেখতে পাচ্ছেন আকাশে ? কেমব্রিজ মানমন্দিরের ঘোষণা বাদে আর-কিছুই তো শুনিনি ওঁদের সম্বন্ধে !'

'কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না ।' ক্ষোভের সঙ্গে বললেন ম্যাস্টন, 'ওঁদের যাত্রাকালীন বিস্ফোরণের ফলে যে-ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো তা থেকে আকাশ এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি, এখনো কিছু ধোঁয়া জ'মে আছে আকাশে । আর, আমার এই দূরবীক্ষণের ক্ষমতা অতটা প্রবল নয়, যে এই অপরিচ্ছন্ন ধোঁয়া ভেদ করে আকাশ-যানটা দেখতে পাবো ।'

'এখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ?' মার্চিসনের গলায় আপশোশের বদলে একটু রাগই প্রকট হ'লো : 'কী জ্বালাতন । তাহ'লে ওঁদের কী হ'লো বুঝবো কী ক'রে ?'

'অন্তত কিছুক্ষণ ধৈর্য ধ'রে না-থাকলে কিছুই বোঝা যাবে না । আগে আকাশ পরিষ্কার হোক, তারপর ওঁদের কী হ'লো বোঝা যাবে ।'

'কোন্ সময়ে যে আকাশ পরিষ্কার হবে তার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা দেখছিনে । হয়তো যখন আকাশ পরিষ্কার হবে, তখন ওঁরা চাঁদেই পৌঁছে গেছেন । আপনি বরং ভালো ক'রে একটু চেষ্টা ক'রে দেখুন ।'

'আমি কি আর ইচ্ছে ক'রে খারাপ ক'রে দেখছি ?' মৃদু হাসলেন ম্যাস্টন । মার্চিসনের এই ধৈর্যহীনতার কারণ তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন, কেননা তাঁরও তো মনে ঐ-রকমই কৌতূহল আর উত্তেজনা । তবু তিনি সমস্ত চাঞ্চল্য গোপন রাখবার চেষ্টা ক'রে বললেন, 'চোখের সামনে কেবল কালো মেঘের মাতামাতি । কেবল মেঘ, আর মেঘ : আর-কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ।'

'আমার কিন্তু একটুও তর সইছে না ।' মার্চিসন বললেন, 'আপনি বরং একটু স'রে বসুন । আমি নিজেই দেখি, কী ব্যাপার ।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দূরবীক্ষণের কাছে থেকে স'রে এলেন ম্যাস্টন । 'আপনাকে খুবই অল্পক্ষণের জন্যে দেখবার সুযোগ দিচ্ছি, এ-কথা মনে রাখবেন । এক্ষুনি কিন্তু স'রে বসতে হবে । আমি আর-কিছুতেই এই দূরবীক্ষণ চোখ-ছাড়া করবো না !—আহা, আমাদের চর্মচক্ষু যদি কল্পনার মতো শক্তিধর হ'তো !'

ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবীর হাজার মাইল উপরে মহাশূন্যে উল্কায় আর আকাশ-যানে সংঘর্ষ প্রায় ঘটে আর-কি !

চক্ষের পলকে প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলো গান-ক্লাবের গোলকটি । মনে হ'লো বাইরে যেন প্রলয় শুরু হয়েছে । ভীষণ বেগে আসন থেকে ছিটকে পড়লেন তিনজনে । চোখের সামনে সব ঝাপসা হ'য়ে এলো ; চেতনাহীন তিনজন আকাশ-যাত্রী নিঃসাড়ে প'ড়ে রইলেন আকাশ-যানের মেঝেয় ।

কয়েক মিনিট পরে যখন সংবিৎ ফিরলো, তখন দারুণ অবাক হ'য়ে গেলেন তিনজনে । প্রথমটায় তো কোনো কথাই বলতে পারলেন না, শুধু বিস্মিতভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন । তারপরে তিনজনেই একসঙ্গে ছুটে এলেন কাচের জানলার কাছে, বাইরে তাকাবার জন্যে ।

দূরে একটি সবুজ আলোর মতো জ্বলজ্বল করছে পেরিয়ে-আসা পৃথিবী, আর মহাশূন্যে এদিকে-ওদিকে হিরের মতো জ্বলছে অসংখ্য নক্ষত্র । অনেক দূরে তাঁদের গন্তব্যস্থল চাঁদ তেমনি সোনালি আলো ছড়াচ্ছে ।

কাপ্তেন নিকলই প্রথম কথা বললেন, 'সত্যি তাহ'লে আমাদের মৃত্যু হয়নি ?'

জবাব দিলেন বার্বিকেন, 'না । এমনকী উল্কাটার সঙ্গে সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়নি । এ নিশ্চয়ই দেবতার দয়া, তাই শেষ মুহূর্তে আমাদের কিংবা উল্কাটার—কারু পরিক্রমা-পথ নিশ্চয়ই কিছুটা বদলেছে । সংঘর্ষ না-বেধেই তো যেভাবে গোলকটি কেঁপে উঠেছিলো, তাতে বোঝা যায় সংঘর্ষ ঘটলে কী হ'তো !'

আর্দা বললেন, 'ভবিষ্যতেও যে আপনার দেবতা এইভাবেই আমাদের বাঁচিয়ে দেবেন, সেই ভরসা আমি করতে পারছি না ।'

'এবারে কিন্তু অলৌকিকভাবেই বেঁচে গিয়েছি আমরা । এ-রকম কোনো পরিত্রাণের কাহিনী মানুষের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই !' কাপ্তেন নিকল নিশ্চয়ই আরো-কিছু বলতেন, কিন্তু আচমকা একটি মৃত্যু-কাতর আর্ত গোঙানি শুনে তিনি নির্বাক হ'য়ে গেলেন । করুণ সেই আর্তনাদ শিহরণ বইয়ে দিলো তাঁদের সর্বাঙ্গে । এই মহাশূন্যে আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো কে ?

পর-মুহূর্তে আবারও কার করুণ গলার আর্ত স্বরে তাঁদের স্তম্ভিত বিস্ময় ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেলো । তারপর একটানা শোনা যেতে লাগলো একটি করুণ আর্ত গোঙানির সুর । কাপ্তেন নিকলের গলায় দারুণ ভয়ের লক্ষণ পাওয়া গেলো, 'এবারে আর রেহাই নেই । আমাদের এই ভুতুড়ে চিৎকার আসলে আমাদের মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ ঘোষণা করছে নিশ্চয়ই ।'

'ঐ উল্কাটার প্রেতাত্মাই কাঁদছে নাকি এইভাবে ?' বার্বিকেনের গলায় কেবল ভয়ই নেই, বিস্ময়ও সুপ্রচুর । 'সামান্যর জন্যে আমাদের লোকান্তরে পাঠাতে না-পেরে ঐ উল্কাটাই ক্ষোভে-দুঃখে কাঁদছে নাকি?'

কিছুক্ষণ মুহ্যমানের মতো দাঁড়িয়ে তিনজনে একটানা সেই অবাক ক্রন্দন শুনতে লাগলেন । তারপর হঠাৎ কী মনে হ'তেই বার্বিকেন একটি মই বেয়ে আকাশ-যানের উপরের

চত্বরে উঠতে লাগলেন ; সেখানে একটি ছোট্ট কামরার ব্যবস্থা ক'রে তাঁর কুকুরদুটিকে বেঁধে রাখা হয়েছিলো ।

যা ভেবেছিলেন, তা-ই । নেপচুন নামে কুকুরটি সেখানে ব'সে করুণ গলায় ডাকছে, আর সাটেলাইট অসাড় হ'য়ে তার পায়ের কাছে প'ড়ে রয়েছে ।

বার্বিকেন চেঁচিয়ে জানালেন, 'ঐ কান্নাটা আর-কিছুই না, নেপচুনের চীৎকার । দেখে মনে হচ্ছে সাটেলাইট আহত হয়েছে, তাই ও ঐভাবে চ্যাঁচাচ্ছে ।'

উল্কাটার সঙ্গে সংঘাত না-ঘটলেও উল্কাটা গোলকের পাশ দিয়ে ভীষণ বেগে ছুটে চ'লে গিয়েছিলো ব'লে গোলকটি যখন দারুণভাবে থরথরিয়ে কেঁপে উঠেছিলো, তখন সাটেলাইট ছিটকে প'ড়ে কোনো কিছুর সঙ্গে আহত হয়েছে বোধহয় ।

সাটেলাইটকে ধরাধরি করে মেঝেয় শুইয়ে দিয়ে ভালো করে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন বার্বিকেন । কিন্তু তার অসাড় শরীরে প্রাণের কোনো স্পন্দন পাওয়া গেলো না । বেশ-কিছুক্ষণ আগেই তার মৃত্যু হয়েছে ।

কিছুক্ষণ আগেও, যখন উল্কাটার সঙ্গে সংঘাত ঘটতে যাচ্ছিলো, যখন বাঁচবার কোনো আশাই ছিলো না, তখনো মিশেল আর্দাঁ ঠাট্টা ক'রে মৃদু হেসে কথা বলেছিলেন ; বলেছিলেন, 'বিজ্ঞানের শহিদ হিশেবে অমর হ'তে যাচ্ছি আমরা, এখন তো আমাদের দস্তুরমতো আনন্দ করা উচিত !' সেই সৌম্য, প্রফুল্ল ফরাশি ভদ্রলোকের চোখ এখন সজল ঝাপসা হ'য়ে এলো । কাঁপা গলায় তিনি কেবল বললেন, 'বেচারি সাটেলাইট !'

কিন্তু ও-ভাবে মুহ্যমান থাকবার মতো সময় তখন ছিলো না । বার্বিকেন জিগেস করলেন, 'এখন তাহ'লে কী করা যায় ? পৃথিবী ও চন্দ্রলোকের মধ্যবর্তী মহাশূন্যে কী ক'রে সাটেলাইটকে কবর দেবো আমরা ?'

'তাই তো !' ঘাড় চুলকোলেন নিকল : 'কী করা যাবে কিছুই তো বুঝতে পারছি না ।'

খানিকক্ষণ সকলেই নির্বাক হ'য়ে রইলেন, শেষটায় অধ্যাপক আর্দাঁ বললেন, 'মেঝের ঐ ধাতুর ঢাকনিটা খুলে সাটেলাইটকে ফেলে দিলে হয় । এত উপর থেকে পৃথিবীতে প'ড়ে ওর হাড়গোড় যদি একটুও অবশিষ্ট থাকে, তাহ'লে কেউ-একজন দেখতে পেয়ে সেগুলো কবর দেবার ব্যবস্থা করবে নিশ্চয়ই ।'

বার্বিকেন ধাতুর ঢাকনিটা খুলে ধরলেন । 'শিগগির করুন, না-হ'লে এই ফাঁক দিয়ে সব অক্সিজেন নষ্ট হ'য়ে যাবে !'

মহাশূন্যের সহচর সাটেলাইটকে এভাবে শূন্যে নিক্ষেপ করবার সময় অধ্যাপক আর্দাঁর হাতদুটি কেঁপেছিলো বৈকি ।

৫

ওজন কখন হারায় শূন্যে ?
—অভিকর্ষ যখন নাস্তি ।
মজার-মজার কী কাণ্ড হয় !
দুঃসাহসের আজব শাস্তি ।

কয়েক মিনিট পর জানলা দিয়ে শূন্যে তাকিয়ে বার্বিকেন বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে আমাদের আকাশ-যানটির গতিবেগে কিংবা গতিপথে কিছু-একটা গণ্ডগোল হয়েছে । আমার হিশেব-মতো এখন আমাদের চাঁদের কাছাকাছি হওয়া উচিত ছিলো ।'

'সত্যিই কি কোনো গণ্ডগোল হয়েছে ?' উদ্গ্রীব মিশেল আর্দাঁ জিগেস করলেন ।

বার্বিকেন উত্তর করলেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না । তবে ভয় হচ্ছে, একটা-কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নিশ্চয়ই !'

টেলিস্কোপে চোখ রেখে বাইরে দৃষ্টিপাত করলেন আর্দাঁ, এবং তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, আরে ! ওটা কী জিনিশ বলুন তো !'

'দেখি, দেখি,' ব'লে বার্বিকেন সাগ্রহে এগিয়ে এলেন । 'এই টেলিস্কোপটা যদি আমাদের নিশ্চিত কোনো খবর দিতে পারে, তবে তো ভালোই ।

টেলিস্কোপের ফুটোয় দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সবিস্ময়ে বার্বিকেন দেখলেন, মহাশূন্যের নক্ষত্রমালার মধ্যে একটি কুকুর, এবং সেটি একটি নক্ষত্রকে কেন্দ্র ক'রে বন্‌বনিয়ে ঘুরছে । 'আরে ! এ-যে আমাদের সাটেলাইট ! বুঝেছি ব্যাপারটা । ওর তো নিজস্ব কোনো গতিবেগ নেই যা ওকে ধাবমান করতে পারে, সেই কারণেই ওকে নিকটবর্তী নক্ষত্রের চারপাশে এভাবে ঘুরতে হচ্ছে । আমাদের আকাশ-যানের মতোই ও চাঁদের এতটা নিকটবর্তী নয় যে তার মাধ্যাকর্ষণের টানে চাঁদে গিয়ে পৌঁছুবে । পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণও এখন ওকে টানছে না । তাই কাছাকাছি যে-নক্ষত্র ছিলো তারই মাধ্যাকর্ষণে প'ড়ে এখন তাকে কেন্দ্র ক'রেই অনবরত ওকে ঘুরতে হচ্ছে ।

এমনি সময় আচমকা নিকলের অবাক গলা শোনা গেলো : 'আরে, এ-কী কাণ্ড ! দেখুন, দেখুন—আমার দুরবিনটা শূন্যে ভাসছে !'

এমন আজগুবি ও তাজ্জব খবর শুনে তক্ষুনি সবিস্ময়ে ফিরে তাকালেন আর্দাঁ ও বার্বিকেন ।

একটু লক্ষ ক'রে ব্যাপারটা বার্বিকেন ব্যাখ্যা করলেন, 'বুঝতে পেরেছি ! আমরা মহাশূন্যে এমন-এক রহস্যময় এলাকায় প্রবেশ করেছি যেখানে আমাদের উপর পৃথিবী আর চাঁদ—কারুর মাধ্যাকর্ষণই আর জোর খাটাতে পারছে না । এখন আমরা চাঁদ আর পৃথিবী—উভয়ের অভিকর্ষেরই নাগালের বাইরে ।'

মাধ্যাকর্ষণ কাকে বলে, সে-জিনিশটা এবারে স্পষ্ট ক'রে বুঝে নেয়া যাক ।

এ-কথা সকলেই জানে যে পৃথিবী গোল । অবশ্যি পুরোপুরি গোল নয়, উত্তরে দক্ষিণে

সামান্য পরিমাণে চাপা। এই চাপা অংশটি এতই সামান্য যে পৃথিবীকে গোলাকার বললে বিশেষ ভুল করা হয় না। সেইসঙ্গে এ-কথাও সকলেই জানে যে মেরুরেখাকে অক্ষ ক'রে পৃথিবী অতি প্রচণ্ডবেগে সর্বদাই লাটিমের মতো বন-বন ক'রে ঘুরছে। সেই ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর উপর মানুষের বাস।

একটা পাঁক-মাখা বল যদি ভীষণ বেগে ঘুরোনো যায়, তাহ'লে বলটার গা থেকে চারদিকে পাঁক ছিটকে পড়বে। কিন্তু এই গোল পৃথিবী এত জোরে অনবরত ঘোরা সত্ত্বেও তার উপর থেকে আমরা ছিটকে পড়ি না কেন ?

পড়ি না মাধ্যাকর্ষণের জন্যে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যার অন্য নাম হ'লো অভিকর্ষ। সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, এই অভিকর্ষ হ'লো টেনে রাখার জোর। ছুঁড়ে ফেলবার যে জোর, তার নাম কেন্দ্রাতিগ শক্তি ; তার চেয়ে এই টেনে রাখার জোয়ের,. —অর্থাৎ অভিকর্ষের—ক্ষমতা বেশি। এবং এই কারণেই আমরা পৃথিবীর উপর থাকতে পারছি, নইলে কোন্‌কালে যে কোন্ শূন্যে ছিটকে পড়তুম, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। অভিকর্ষের আকর্ষণ পৃথিবীর সবখানে, ছোটো-বড়ো সকল জিনিশেই, আছে ; প্রত্যেক জিনিশ প্রত্যেক জিনিশকে আকর্ষণ করছে। শুধু পৃথিবী কেন, এই সৌর জগতের সমস্ত জড় পদার্থে এই আকর্ষণ ওতপ্রোত হ'য়ে আছে : সেই কারণে অনেকে একে 'মহাকর্ষ' ও ব'লে থাকেন।

মহাকর্ষের কাজ-কারবার যে-যে কানুন ধ'রে চলে, সেই আইন-কানুনগুলো প্রথমে আবিষ্কার করেছিলেন নিউটন। দুটো জিনিশের মধ্যে পারস্পরিক টানের জোর জিনিশদুটির ভারের উপর নির্ভর করে ; তাছাড়া জিনিশদুটি নিকটতম হ'লে টানের জোর বাড়ছে, ব্যবধান বাড়লে সেই জোর ক'মে যাচ্ছে। অর্থাৎ আকর্ষণের হ্রাসবৃদ্ধি হয় দুটি জিনিশের ভার অনুযায়ী ; আর দুটি জিনিশের মধ্যে তফাৎ যত বাড়ে টেনে রাখার জোর কমে তার বর্গ-গুণ, এবং তফাৎ যত গুণ ক'মে আসে টেনে রাখার জোর বাড় তার বর্গ-গুণ। মানে, দূরত্ব যত বেশি, টেনে রাখার জোর তার বর্গ অনুসারে তত কম। এই আইন-কানুনগুলি যে সত্য, এবং সর্বত্রই এর প্রভাব প্রসারিত—তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। সমস্ত বিশ্বে —গ্রহে-উপগ্রহে—চুম্বকের মতো এই মহাকর্ষ এই নিয়মেই কাজ ক'রে চলেছে।

এখন, বার্বিকেনদের গোলকটি মহাশূন্যের এমন এলাকায় এসে পৌঁছেছিলো যেখানে পৃথিবীর টান আর পৌঁছুতে পারে না। আবার চাঁদ থেকেও দূরত্ব প্রচুর ব'লে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণও তার নাগাল ধরতে পারেনি।

এই মাধ্যাকর্ষণ না-থাকলে যে কী-সব কাণ্ড হ'তো, তা ব'লে ফুরোনো যায় না। আমরা যে কোন্ শূন্যে ছিটকে পড়তুম, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা থাকতো না। যা দেখে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন, সে-কথাই ভাবা যাক। মাধ্যাকর্ষণ আছে ব'লেই ফল মাটিতে পড়ছে, না-থাকলে তাকে আর মাটিতে পড়তে হ'তো না, শূন্যেই ঝুলে থাকতে হ'তো ; বা, কেউ লাফ দিলে আর মাটিতে নামতো না, শূন্যেই উঠতে থাকতো, কেননা কোনো-কিছুই যখন টানছে না, তখন লাফাবার বেলায় যে-গতি সঞ্চারিত হ'তো তা বাধা পেতো না ব'লে কখনো ফুরোতো না, এবং ফুরোতো না ব'লে ক্রমাগতই উপরে উঠতে হ'তো। সবচেয়ে বড়ো কথা হ'লো, মাধ্যাকর্ষণ না-থাকলে কোনো-কিছুর কোনো ওজনই থাকতো না।

এবং মাধ্যাকর্ষণ না-থাকার দরুন বার্বিকেনদের সেই আকাশযানের মধ্যেও নানা অদ্ভুত, হাস্যকর ও বিচিত্র ঘটনার সৃষ্টি হ'তে লাগলো। বার্বিকেন তাড়াতাড়ি জানালার কাছে যাবার জন্যে পা তুলতেই একেবারে ছাতে উঠে ধাতুর ঢাকনায় এক ঘা খেলেন ; ঘা খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গতি হ'লো নিম্নমুখী, সুতরাং পড়বি তো পড় একেবারে আর্দাঁর গায়ে। কিন্তু সেখানেও স্থির হ'য়ে দাঁড়ানো গেলো না, আবার উঠতে হ'লো উপরে ; শূন্যেই ঝুলতে লাগলেন তিনজনে। টেলিস্কোপটাও তেমনি ঝুলতে থাকলো।

আর্দাঁ সেই ঝোলা অবস্থায় থেকেই বললেন, 'আমরা এখন এমন-এক অঞ্চলে এসে পৌঁছেছি যেখানে ওজনের আর কোনো বালাই-ই নেই।'

'আমাদের এই রোমাঞ্চকর অভিযানের এই পর্যায়ে পৌঁছে আমি কিন্তু যথেষ্ট খুশিই হয়েছি।' নিকল বললেন, 'কিন্তু এতক্ষণে তো আমাদের চাঁদের আরো কাছাকাছি হবার কথা ছিলো ! এ-কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না, কী জন্যে আমাদের সময়ের হিশেবে এই গণ্ডগোল হ'লো।'

'আমি কিন্তু সেটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি।' বার্বিকেন জানালেন, 'আমাদের হিশেবে কোনো গণ্ডগোলই হয়নি। ঐ সর্বনেশে ভয়ংকর উল্কাটাই এই কাণ্ডটা ক'রে গেছে। উল্কাটা আমাদের গোলকের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে তার প্রচণ্ড গতির আলোড়নে আমাদের গোলকের গতিপথে কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রে গেছে।

হঠাৎ নিকল আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মাধ্যাকর্ষণের কিছুটা প্রভাব অনুভব করতে পারছি ! তার মানে, চাঁদের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি আমরা !'

যেই-না এই কথা শোনা, অমনি অধ্যাপক আর্দাঁ তাড়াতাড়ি জানলার কাছে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখনো তো আর ভালো ক'রে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব পড়েনি গোলকে, তাই চক্ষের পলকে তিনি জানলার কাছে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। ব্যথা তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন, কিন্তু অত কাছ থেকে চাঁদ দেখবার আনন্দের মধ্যে ঐ তুচ্ছ আঘাতে দৃক্পাত করবার সময় কি তাঁর আর তখন আছে ? ছোট্ট ছেলের মতো হৈ-চৈ ক'রে উঠলেন তিনি, 'দেখুন ! দেখুন ! চাঁদ—আমাদের স্বপ্নের চন্দ্রলোক !'

বার্বিকেন রুদ্ধ কণ্ঠে কেবল এ-কথাই বলতে পারলেন, 'তাহ'লে সত্যিই চাঁদে যাচ্ছি আমরা !'

৬

চাঁদের উপগ্রহ হওয়াই
কপালে ছিলো গ্রহের ফের !
অনন্তকাল এমনি ঘুরবে !
ভুল হিশেবের এটাই জের !

অবশেষে দেখা গেলো আকাঙ্ক্ষিত উপগ্রহের পৃষ্ঠদেশ ।

দেখা গেলো বিশাল গিরিমালা, সারি-সারি অগ্নিগিরি, অগ্ন্যুদ্‌গারের জন্যে অসমতল এবড়োখেবড়ো চন্দ্রলোকের ত্বক । দেখা গেলো নদীর মতো দূরাভিসারী খাদ—নদীর মতোই মনে হ'লো, কেননা জল আছে কি না, দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা গেলো না ।

পৃথিবীর ত্বক-সৃষ্টির ইতিহাসের প্রথম দিকে বার-বার বহু মন্থন, আলোড়ন, উদ্‌গিরণ, প্লাবন ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছে । যুগের পর যুগ এইভাবে মন্থনের মধ্যে কেটে যাবার পর ভূ-ত্বক ক্রমে ঈষৎ শান্ত হ'লে পরই এই পৃথিবী হয়েছে জীবধাত্রী । প্রাণীজগতে অভিব্যক্তির শেষ পর্যায়ে আবির্ভূত হয়েছে মানব জাতি—ভূতত্ত্ববিদদের মন্তব্য অনুযায়ী 'অতি-আধুনিক' যুগে । তারপর, মানুষের ঐতিহাসিক যুগ শুরু হবার পরেও ধরিত্রীতলে ভূকম্পন, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি কত কাণ্ড হ'য়ে গেলো, যার কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত পুরাণ এবং ইতিহাসের পাতায়-পাতায় লেখা আছে । তবে সে-কালের সে-সব প্রলয়ংকর আলোড়ন, উদ্‌গিরণ, বন্যা প্রভৃতি—যার ফলে সমুদ্রতল থেকে বিশাল পর্বত মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো, একেকটা গোটা মহাদেশ বিলীন হ'য়ে যেতো সমুদ্রে—তা আর হয় না, ত্বকের প্রাথমিক অবস্থা মোটামুটি শান্ত এখন । অবশ্য একেবারে শান্ত এখনো হয়নি । ভূত্বকের সংকোচন ও প্রসারণে সমুদ্রের প্রবল তুফান, অগ্নিগিরির তুমুল উদ্গার, ভয়াবহ ভূকম্পন—এমনকী নতুন স্থলভূমির সৃষ্টি পর্যন্ত—আজও সম্ভব । যুগের পর যুগ আসমান পদক্ষেপে পেরিয়ে এসে পৃথিবী আজ শ্যামলা ও সুফলা । পৃথিবীর সৃষ্টিমুহূর্তে যে ঘন-ঘন আলোড়নের কাল এসেছিলো, চাঁদের সৃষ্টি সেই সময়ে । চাঁদ এখন কেমন, কে জানে ? বিজ্ঞানীরা চাঁদ সম্বন্ধে যা-কিছু বলেন, তা তো মানমন্দির থেকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে । মূলত অনুমান-নির্ভর ব'লে তাঁদের ধারণায় ভুল হওয়া বিচিত্র নয়, বরং অনায়াসেই সম্ভব । এমনকী, অনুমাণে ভুল যে হ'য়ে থাকে তার দৃষ্টান্ত তো বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিতান্ত কম নয় ।

সেই চাঁদের চেহারা দেখা গেলো, দেখা গেলো একেবারে কাছ থেকেই । এখন আরেকটু কাছে যেতে পারলেই কেবল নিছক আন্দাজ নয়, চাঁদ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যাবে । কিন্তু সেই পুরোপুরি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হ'লে চাঁদে পা ফেলতে হবে সর্বপ্রথমে ।

চাঁদের একটা গহ্বরের দিকে চোখ পড়লো বার্বিকেনের । টেলিস্কোপে চোখ রেখেই তিনি বললেন, 'কোনো-কোনো জ্যোতির্বিদের মতে চাঁদের গহ্বরগুলি চন্দ্রবাসীদেরই কীর্তি : চন্দ্রবাসীদেরই ও-সব খুঁড়ে দিয়েছে—এই হ'লো তাঁদের অভিমত ।'

আর্দাঁ জিগেস করলেন, 'তাঁদের মতে ঐ গহ্বরগুলি কী জন্যে খোঁড়া হয়েছে ?'

'প্রখর সৌরতাপ এবং প্রচণ্ড শৈত্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে। মনে রাখবেন, একটি চান্দ্র দিন পৃথিবীর পনেরো দিনের সমান।' বার্বিকেনের উত্তর।

হঠাৎ আর্দাঁ বিস্মিত গলায় ব'লে উঠলেন, 'আরে! এ-যে দেখছি চাষ-করা জমি!'

নিকল বললেন, 'যা দেখে আপনি চাষ-করা জমির কথা বললেন, আমার মনে হয় তা হ'লো আসলে শুকিয়ে-যাওয়া খাল-বিল।'

'আসল ফসলভরা জমি, গাছপালা বা বাড়ি-ঘর হয়তো ঐ-সব গহ্বরের ভিতর দেখতে পাওয়া যাবে,'—বার্বিকেন বললেন।

আর্দাঁ বললেন, 'আপনার গবেষণা সত্যি কি না, তা শিগগিরই আবিষ্কার করার সৌভাগ্য আমাদের হবে ব'লে আশা করছি।'

হঠাৎ অন্ধকারে আকাশ-যানের অভ্যন্তর ভ'রে গেলো। তিনজনেই একসঙ্গে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। নিকল বললেন, 'এবার আমরা চাঁদের অন্ধকার এলাকায় চলেছি। এবারে আমাদের আকাশ-যান চাঁদের ছায়াময় অঞ্চলে প্রবেশ করছে।'

'তার মানে, চাঁদের যে-এলাকায় রাত, আমরা এখন সেই এলাকার দিকে চলেছি তো ?—তাহ'লে তো মুশকিলের ব্যাপার, কেননা একটি চান্দ্র রাত্রি মানে তো পৃথিবীর পনেরো রাত।'

'তাপমাত্রা ক'মে যাচ্ছে,' বার্বিকেন আরেকটি নিদারুণ তথ্য জানালেন, 'আমার সাংঘাতিক শীত করছে!'

আর্দাঁ গ্যাসের ব্যবস্থা করতে যেতেই বার্বিকেন তাঁকে সতর্ক ক'রে দিলেন: 'গ্যাস একটু কম ক'রে খরচ করবেন। আমাদের ভাঁড়ারে গ্যাস কিছু বেশি নেই কিন্তু, তার উপর সরবরাহও সীমিত। যতটুকু না-হ'লে নয়, তার বেশি একটুও খরচ করা চলবে না।'

'আকাশ-যানটির বর্তমান গতিবেগ আমাদের অচিরেই আবার চাঁদের দিবালোকিত অঞ্চলে পৌঁছিয়ে দেবে।' আর্দাঁ বললেন, 'ততক্ষণ গ্যাসের তাপের সাহায্যেই এই হাড়-কাঁপানো, রক্ত-জমানো কনকনে ঠাণ্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।'

কিন্তু চন্দ্রলোকের সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা কি আর এই গ্যাসের উত্তাপে বাধা মানে ? বাইরে চাঁদের বুকে এর মধ্যেই তুষার-বর্ষণ শুরু হ'য়ে গেছে। গোলকের ভিতরে তিনজনে হী-হি ক'রে কাঁপতে লাগলেন। ব্যারোমিটারের পারদ সেই কখন শূন্য ডিগ্রির অনেক নিচে নেমে গেছে।

'হাড়ে-হাড়ে যেন ঠোকাঠুকি হচ্ছে!' আর্দাঁ গুটিশুটি মেরে বসবার চেষ্টা করলেন, 'ঠাণ্ডায় জ'মে যাচ্ছি একেবারে! শেষটা শীতেই না আমাদের মৃত্যু হয়—আমার সবচেয়ে বড়ো ভয় এইটেই।'

'কোনোরকমে সামলে-শুমলে থাকুন।' তেমনি কাঁপতে-কাঁপতে বললেন নিকল, 'ধৈর্য ধরুন। শিগগিরই আমরা চাঁদের দিবালোকিত অঞ্চলে পৌঁছুবো। চাঁদের বুকে নামবার একটা ভালো জায়গাও পাওয়া যাবে তখন।'

বার্বিকেন বললেন, 'দিবালোকিত এলাকায় গিয়ে পৌঁছুলেই কিন্তু আমদের সব সমস্যা মিটে গেলো না। আমাদের পক্ষে সত্যিকার প্রয়োজনীয় হ'লো নিচের দিকে—মানে চাঁদের

দিকে—নামা। চাঁদের চারপাশে এই সর্বনেশে ঘোরা ঘুরে লাভ কী ? আমরা যদি না-থেমে এইভাবেই আবর্তন শুরু করি, তাহ'লে তার প্রচ্ছন্ন অর্থ কী হ'য়ে ওঠে, বুঝতে পারছেন তো ? এখন আমরা চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের পাল্লায় এসে পৌঁছেছি। সুতরাং আমরা যদি কোনোরকমে চাঁদের বুকে অবতরণ করতে না-পারি তো সাটেলাইটের মতো আমাদেরও মহাশূন্যে চিরকাল চাঁদকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরতে হবে। সেটা যাতে না-হয়, সেজন্যে আগেভাগেই আমাদের যা-হোক একটা কিছু করতে হবে।'

নিকল আর আর্দাঁ দু-জনেই একসঙ্গে সচমকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তার মানে ? তার মানে অপনি বলতে চাচ্ছেন—'

'হ্যাঁ, আপনারা যা ভাবছেন, সে-কথাই বলতে চাচ্ছি আমি। শেষ পর্যন্ত এই-না আমাদের বরাতের ফের হ'য়ে ওঠে !'

যদি বার্বিকেনের ধারণা সত্যি হয়, তাহ'লে চিরকালের জন্যে গোলকটিকে চন্দ্রলোকের চারদিকে বৃত্তাকারে আবর্তন ক'রে চলতে হবে। কোনোদিন চাঁদে পৌঁছুতে পারবে না, আবার দূরেও স'রে যেতে পারবে না —যুগের পর যুগ এইভাবেই বন-বন ক'রে ঘুরে মরতে হবে।

'আমাদের আশাহীন ভবিষ্যৎকে আমরা সঠিক কখন জানতে পারবো ?' ব্যগ্র গলায় আর্দাঁ জিগেস করলেন।

'যখন আমরা দিবালোকিত অঞ্চলে প্রবেশ করবো, তখনই আমাদের বরাত আপনিই প্রকাশিত হ'য়ে পড়বে। দিবালোকিত এলাকায় প্রবেশ করবার আগে যদি আমরা চাঁদের নিকটতর না-হই, তাহ'লে মৃত্যু সুনিশ্চিত।'

রুদ্ধ নিশ্বাসে সময় কাটতে লাগলো। সমস্ত মগজ জুড়ে কী-এক অসহ্য চাপ নেমে এলো যেন, আর তাই গোনা গেলো না, শেনা গেলো না নিশ্বাসগুলি। এক অনাগত অথচ দ্রুতধাবমান অশুভ মুহূর্তের কালো ইঙ্গিত যেন দুঃসহ স্পর্ধায় এগিয়ে আসছে। নিষ্পলক চোখে তিনজনে জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন পাথরের মূর্তির মতো। কিন্তু সময় যেন আর চলতে চাচ্ছে না, সেও যেন তাঁদেরই মতো স্থাণু হ'য়ে গেছে।

এইভাবে তিনঘণ্টা কাটলো, অথচ তাঁদের মনে হ'লো, কাটলো যেন তিন শতাব্দী।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে কাপ্তেন নিকল জিগেস করলেন, 'আমরা কি আবার দিবালোকিত অঞ্চলে প্রবেশ করতে চলেছি ?'

মিশেল আর্দাঁ শুধোলেন, 'তাহ'লে সত্যিই চাঁদে নামতে পারবো না আমরা ?'

বার্বিকেন টেলিস্কোপের ফুটোয় আগ্রহী চোখ রাখতে-রাখতে বললেন, 'ভালো ক'রে দেখে এক মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের ভাগ্যফল ঘোষণা করতে পারবো ব'লে আশা করছি। চাঁদের বুকে আমাদের পায়ের ছাপ পড়বে কি না, এক মুহূর্তের মধ্যেই তা জানাচ্ছি।'

কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর মুখে টেলিস্কোপের ফুটো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন বার্বিকেন। ভারি গলায় ঘোষণা করলেন দুর্ভাগ্যকে : 'দুঃখিত। আর আমাদের রেহাই নেই। যতক্ষণ না মৃত্যু এসে আমদের মুক্তি দিচ্ছে, ততক্ষণ চাঁদের একটা উপগ্রহ হিশেবে চাঁদকে আবর্তন ক'রে ঘুরতে হবে আমাদের। তীরের কাছে এসে নৌকোডুবি হবার যে-কটি নজির পৃথিবীতে আছে, আমাদের এই অভিযানও তাদেরই একটি হ'লো এবারে। নিজেদের বাঁচাবার শক্তি আর আমাদের নেই।'

বিমূঢ় অভিযাত্রীদের মধ্যে নিরেট স্তব্ধতা নেমে এলো । কোনো কথা বলবার মতো শক্তি পাচ্ছিলেন না কেউ । চুপচাপ তিনজনে দাঁড়িয়ে রইলেন । স্পন্দন-রহিতের মতো ।

আচমকা লাফিয়ে উঠলেন অধ্যাপক মিশেল আর্দাঁ । 'আমাদের হাউইগুলো ব্যবহার করা যায় না এখন ?'

'হাউইগুলো তো আনা হয়েছে চাঁদে নামবার সময় গোলকের গতিবেগ কমাবার জন্যে ।' কাপ্তেন নিকল ভারি গলায় জানালেন ।

'হাউইগুলোর ক্ষমতা যে সুপ্রচুর, সে-বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনাদের সন্দেহ নেই । আমার মনে হয় চিরকালের-জন্যে-শুরু-হওয়া এই আবর্তন ব্যাহত করতে হাউইগুলো আমাদের সাহায্য করতে পারে ।'

'কিন্তু তাহ'লে আমরা চাঁদে নামবো কী ক'রে ? এখনই যদি হাউইগুলো আমরা ব্যবহার করি, তাহ'লে চন্দ্রলোকে অবতরণ করতে পারবো না আমরা ।'

'এই সুনিশ্চিত মৃত্যুর চেয়ে অন্য যে-কোনো কিছুই নিঃসন্দেহে ভালো ।' ইম্পে বার্বিকেন মিশেল আর্দাঁর প্রস্তাবে সায় দিয়ে বললেন ।

হাউইগুলো যেখানে ছিলো, তক্ষুনি সেখানে গিয়ে হাজির হলেন তিনজনে । জড়ো-করা হাউইগুলোর উপরকার ধাতুর ঢাকনা উন্মোচন ক'রে বার্বিকেন নির্দেশ দিলেন, 'তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বেলে অগ্নি-সংযোগ করুন ।'

দেশলাই জ্বালতে-জ্বালতে আর্দাঁ বললেন, 'বৎস হাউইবৃন্দ ! তোমরা যদি খানিকটা অনুগ্রহ ক'রে বিস্ফোরিত হও, তাহ'লে আমরা চাঁদে অবতরণ করতে পারি । আশা করি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার অবকাশ তোমরা দেবে ।' এই ব'লে সলতেয় আগুন ধরিয়ে দিলেন তিনি ।

চক্ষের পলকে ধাতু-নির্মিত ঢাকনিটা বার্বিকেন বন্ধ করে দিলেন ।

কয়েক মুহূর্ত পরে গোলকটি প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলো : ছিটকে পড়তে-পড়তে আর্দাঁ চ্যাঁচালেন, 'হাউইবৃন্দের প্রস্থান ! নতুন দৃশ্য আরম্ভ হবে এবার !'

শক্তিশালী হাউইগুলো বিস্ফোরিত হ'য়ে সেই বৃত্তাকার মৃত্যুমুখী কক্ষপথ থেকে মুক্ত ক'রে দিলো গোলকটিকে ।

হাউইয়ের বিস্ফোরণের দরুন গোলকের ভিতর ডিগবাজি খেতে-খেতে বার্বিকেন বললেন, 'তাহ'লে সত্যিই আমরা ভাগ্যবান !'

'আমরা কি চাঁদে নামছি ?' আর্দাঁ জিগেস করলেন ।

কোনোরকমে নিজেকে সামলে জানলার দিকে এগুতে-এগুতে কাপ্তেন নিকল বললেন, 'এক মিনিট !...আমার মনে হচ্ছে আমরা হয়তো-বা চন্দ্রলোকে অবতরণ করছি না !'

'অ্যাঁ ! তার মানে ?'

'আমাদের গোলকটি পৃথিবীর দিকে ছুটে চলেছে !'

সচমকে কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন বার্বিকেন, 'পৃথিবীর দিকে ছুটে চলেছে !'

৭

শূন্যে থেকে আছড়ে পড়ে
ওটা কী ? ঐ আগুনপুচ্ছ ?
গান-ক্লাবেরই গোলক ? না কি
আবোলতাবোল জিনিশ তুচ্ছ ?

এস. এস. সাসকুয়েহানা বিশাল যুক্তরাজ্যের বড়ো জাহাজগুলির অন্যতম ।

জাহাজটি একটি গুরুতর কাজের দায়িত্ব নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে ভ্রমণ করছিলো । যুক্তরাজ্য থেকে হাওয়াই দ্বীপে 'টেলিগ্রাফ কেবল' দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করবার একটি বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন যুক্তরাজ্যের সরকার । সেইজন্য এস. এস. সাসকুয়েহানার উপর ভার পড়েছে হনলুলু এবং সানফ্রান্সিসকোর মধ্যবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরে জলের গভীরতা পরিমাপের । সেই দায়িত্ব নিয়েই প্রশান্ত মহাসাগরে এস. এস. সাসকুয়েহানার এই অভিযান ।

ডেকে দাঁড়িয়ে জাহাজের কাপ্তেন তাঁর সহকারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন । অন্যান্য নাবিকেরা তখন জলের গভীরতা পরিমাপে ব্যস্ত ।

কাপ্তেন জিগেস করলেন, 'এখানে জল কত গভীর, এখনো সেটা কি মাপা গেলো না ?'

সহকারী জবাব দিলেন, 'তিন হাজার পাঁচশো আট ফ্যাদম পর্যন্ত পাঠ নেয়া হয়েছে । এখনো পর্যন্ত জলের নিচে পৌঁছুনো যায়নি ।'

'আমার মনে হচ্ছে এই এলাকাটাই সারা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সবচেয়ে গভীর ।'

'জলের এত তলায় যে-জীবন, তা নিশ্চয়ই চন্দ্রলোকের মতোই বিস্ময়কর !'

'চন্দ্রলোকের কথা বলছো ?' কাপ্তেন বললেন, 'আমার খুবই অবাক লাগছে ! বল্টিমোর গান-ক্লাবের সেই দুঃসাহসী তিন বন্ধু কোন্ চন্দ্রলোকে যে যাত্রা করলো, সে-কথা ভেবে আমি বিস্ময় বোধ করছি !'

তাঁদের আলাপে বাধা দিয়ে হঠাৎ একজন নাবিক চেঁচিয়ে উঠলো, 'আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কাপ্তেন !'

কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই বার্বিকেনের গোলক প্রচণ্ডবেগে এসে জলের উপর আছড়ে পড়লো, এবং চক্ষের পলকে সমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেলো । সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে জাহাজটা তীরবেগে চর্কির মতো একবার ঘূরপাক খেয়ে নিলো ।

জাহাজের রেলিং ধ'রে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিতে-নিতে কাপ্তেন বললেন, 'দ্যাখো-হে, তোমার চন্দ্রলোকযাত্রীরা পৃথিবীর ভূমিতে অবতরণ করলেন !'

ডেকের উপর আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে-করতে সহকারী কাপ্তেন বললেন, 'ঠিক ভূমিতে নয়, সাগরের জলে ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রযাত্রীদের খোঁজে একটি অন্বেষণ-বাহিনী বেরিয়ে পড়লো । কিন্তু

ঘণ্টা-কয়েক ধ'রে আশপাশের সমস্ত সমুদ্র আঁতিপাতি করে খুঁজেও কোনো-কিছুর চিহ্ন দেখতে না-পেয়ে তাদের ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে আসতে হ'লো । কাপ্তেন যখন শুনলেন চন্দ্রযাত্রীদের কোনো পাত্তাই নেই, তখন নির্দেশ দিলেন, 'সন্ধে পর্যন্ত তো সতর্ক চোখে খোঁজো কোথায় তারা গেলো ; তখনো না-পাওয়া গেলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে ।'

কিন্তু বৃথাই হ'লো খোঁজাখুঁজি । সন্ধে হ'য়ে এলো, তবু তাঁদের কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না । শেষকালে সহকারী কাপ্তেন প্রস্তাব করলেন, 'এখানকার অক্ষাংশ, দ্রাঘিমারেখা —সবই তো আমরা জানি, সুতরাং আবার আমরা এখানে ফিরে আসতে পারবো । এখন বরং তাড়াতাড়ি জাহাজ সানফ্রান্সিসকোয় নিয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে খুলে বলি । মনে হয়, তাহ'লে আমরা বড়োশড়ো একটি অন্বেষণ-বাহিনী, অর্থাৎ রীতিমতো একটা বহর, সমেত এখানে ফিরে আসতে পারবো । তবে আশা করি ওটা চন্দ্রযাত্রীদেরই গোলক ছিলো ।'

কাপ্তেন রাজি হলেন এ-প্রস্তাবে : 'চমৎকার ফন্দি ঠাউরেছো । আমি এক্ষুনি তাড়াতাড়ি সানফ্রান্সিসকো যাবার ব্যবস্থা করছি । এর মধ্যে, চন্দ্র থেকে এই অদ্ভুত প্রত্যাবর্তনের প্রচণ্ড আঘাত খেয়েও, আমাদের বন্ধুরা যদি মারা না-প'ড়ে থাকেন তো—আমি নিশ্চিত জানি, তাঁদের সঙ্গে যে-অক্সিজেন আছে তার সাহায্যে তাঁরা জলে ডুবে মরার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবেন ।'

তক্ষুনি কাপ্তেন অতি দ্রুতবেগে সানফ্রান্সিসকো রওনা হবার ব্যবস্থা করলেন । বেতার যন্ত্রের অভাবশত এস. এস. সাসকুয়েহানার তরফে এ ছাড়া অন্য-কিছু করণীয় ছিলো না ।

ওদিকে তখন সাগরের নিচে নোঙরহীন নৌকোর মতো কিছুক্ষণ সবেগে ঘুরপাক খেয়ে সেই বিরাট গোলকটি প্রশান্ত মহাসাগরের অতলে কত যুগের জন্যে বন্দী হ'য়ে রইলো, কে জানে ?

৮

হ'লো কি তিন বেপরোয়ার ?
অভিযানের ব্যাপারটা কী ?
ভুগবে তবে যারা গোঁয়ার ?
মহাশূন্যে মরবে না কি ?

সানফ্রান্সিসকোর জেটিতে দাঁড়িয়ে একটি নাবিক লাল আর সবুজ পতাকা নাড়ছিলো । নাবিকটির পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন উঁচু-গোছের কর্মচারী । দূর দিগন্তে তখন একটা জাহাজ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হ'য়ে উঠছিলো ।

'কী ব্যাপার হে ? হঠাৎ-যে একটা জাহাজ আসছে এদিকে ? এ-রকম সময়ে তো এখানে কোনো জাহাজ আসবার কথা নয় !'

'এস. এস. সাসকুয়েহানা ফিরে আসছে ।' সসম্ভ্রমে নাবিকটি জানালো, 'জাহাজ থেকে সংকেত ক'রে এই কথা বলছে যে তারা সেই দুঃসাহসী চন্দ্রযাত্রীদের সাক্ষাৎ পেয়েছে ।'

'অ্যাঁ ! সত্যি নাকি ?'

একটু পরেই এস. এস. সাসকুয়েহানা তীরে এসে ভিড়লো । এক মুহূর্তও অপেক্ষা না-ক'রে কাপ্তেন তাঁর সহকারীকে নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে চললেন । খবরের গতিবেগ যে হাওয়ার চেয়েও বেশি, তার প্রমাণ দেবার জন্যেই বোধহয় ইতিমধ্যে জাহাজটির চারপাশ লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গিয়েছিলো ।

সানফ্রান্সিস্‌কোর নৌবহরের অ্যাডমিরাল কাপ্তেনের কাছ থেকে সেই বিস্ময়কর কাহিনী শুনে বললেন, 'এই সংবাদ সরবরাহের জন্যে অজস্র ধন্যবাদ আপনাদের। আমরা এক্ষুনি সমর-বিভাগকে খবরটা জানাচ্ছি ; তাঁরা প্রেসিডেন্টকে জানাবেন । শিগগিরই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে ।'

নম্রস্বরে সহকারী কাপ্তেন বললেন, 'কিন্তু তাতে তো অনেক দেরি হ'য়ে যাবে । আপনি বরং এক্ষুনি বল্টিমোর গান-ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে জানিয়ে দিতে পারেন ।'

'ঠিক কথা ।' সরকারী কাপ্তেনের কথায় সায় দিলেন অ্যাডমিরাল । 'এই বিশাল মহাসাগরের অতলে তলিয়ে-যাওয়া গোলকটিকে কেউ যদি খুঁজে বার করতে পারে, তবে সে গান-ক্লাবের সদস্য ছাড়া আর-কেউই না ।'

চারদিন পর গান-ক্লাবের সম্পাদক ম্যাস্টনকে সানফ্রান্সিস্‌কোর জেটিতে সাসকুয়েহানার কাপ্তেনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেলো ।

ম্যাস্টন বলছিলেন, 'ক্যাপ্তেন, যদি আপনি অভিযাত্রীদের সমুদ্রতলের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে চান তবে আপনাকে জলের তলা থেকে খুব ভারি জিনিশ তোলবার ব্যবস্থা করতে হবে । মনে রাখবেন, গোলকটির ওজন ভীষণ ।'

সেই বিরাট অন্বেষণ-কাজের প্রস্তুতি শিগগিরই শুরু হ'য়ে গেলো । ঘুরে-ঘুরে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম দেখতে দেখতে ম্যাস্টন বলছিলেন, 'আমি আশাবাদী, কাপ্তেন । আমি এখনো আসা করি, তিনজনেই বেঁচে আছেন । কিন্তু দেখা হ'লে তাঁরা কোন্ গল্প বলবেন সেটা আন্দাজ করা আমার কল্পনায় কুলোচ্ছে না ।'

একটা বিরাট ডুবুরি-কামরা তোলা হয়েছিলো সাসকুয়েহানার উপর, যাকে নাবিকদের পরিভাষায় 'বয়া' বলে । ডুবুরি-কামরা কাকে বলে, তার একটা আন্দাজ থাকা দরকার । সমুদ্রতল সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের এই ডুবুরি-কামরায় ক'রে সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয় । এর ভিতরে দু-তিনজন মানুষ থাকবার ব্যবস্থা করা আছে । একে অনেকটা কামানের গোলার মতো দেখায় । এর ভিতরে অক্সিজেন, সন্ধানী আলো প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিশের বিশেষ ব্যবস্থা করা থাকে । এর ভিতরে ঢুকে যাঁরা সাগরের অভ্যন্তরে যাবেন, তাঁরা ভিতরে ঢুকলে পর বাইরে থেকে দরজায় খুব ভালো ক'রে কুলুপ এঁটে দেয়া হয় । এই কামরায় পুরু এবং শক্ত বিশেষভাবে তৈরি এক ধরনের কাচের জানলা থাকে । সন্ধানী-আলোর সাহায্যে কাচের জানলা দিয়ে দৃষ্টিপাত ক'রে বিজ্ঞানীরা সমুদ্রতলের খবর সংগ্রহ করেন । ক্যামেরার সাহায্যে এই ডুবুরি-কামরার ভিতর থেকে সমুদ্রগর্ভের ফোটোও তোলা যায় । এই কামরার ভিতর থেকেই ম্যাস্টন সমুদ্রের নিচে গান-ক্লাবের গোলকটির সন্ধান করবেন ।

ধীরে-ধীরে সমস্ত জোগাড়যন্ত্র সমাধা হ'তেই ম্যাস্টন কাপ্তেনকে বললেন, 'আর তো দেরি করা চলে না। বৃথাই চার-পাঁচ দিন কেটে গেলো। সত্যিকার কাজের কাজ কিছু হয়নি। আপনি এবার তাড়াতাড়ি রওনা হওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

তাঁর আর তর সইছিলো না। অবশ্য এমন অবস্থায় পড়লে কেই-বা খামকা সময় নষ্ট করতে চাইতো?

একটু পরেই অণ্বেষণ-বহর রওনা হ'য়ে পড়লো। প্রশান্ত-মহাসাগরের সুনীল জলোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে ঘটনাস্থল অভিমুখে দ্রুতবেগে এগিয়ে চললো এস. এস. সাসকুয়েহানা।

৯

চাঁদে যাবার ইচ্ছে শেষে
এমনিভাবেই হ'লো লেখা?
মুনখাউসেন ছদ্মবেশে
তিনরূপে কি দিলেন দেখা?

নিকল, আর্দাঁ, ও বার্বিকেন
করেছিলেন জল্পনা—
গোলায় চ'ড়ে চাঁদে যাবেন—
সেটা আজব গল্প না।

ম্যাস্টনের সঙ্গে ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন কাপ্তেন এবং তাঁর সহকারী।

ম্যাস্টন সহকারী কাপ্তেনকে বলছিলেন, 'আমার বিশ্বাস আপনি সমুদ্রতলে আমার সহযাত্রী হচ্ছেন। তাই না?'

সানন্দে সম্মতি জানালেন সহকারী। 'খুব রাজি। এটা ঠিক আমার মনের মতো কাজ।'

সমুদ্রের যেখানটায় গান-ক্লাবের গোলকটা ডুবে গিয়েছিলো, যথাসময়ে সাসকুয়েহানা সেখানে এসে পৌঁছুলো।

ম্যাস্টন বললেন, 'এখান থেকেই ডুবুরি-কামরায় ক'রে অন্বেষণ শুরু করবো, কাপ্তেন। আপনি তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা করুন।'

ডুবুরি-কামরার ভিতকার সাজসরঞ্জাম, অক্সিজেন, সন্ধানী আলো প্রভৃতি ঠিক আছে কি না ভালো ক'রে পরীক্ষা করা হ'লো। আধঘণ্টার মধ্যেই ম্যাস্টন এবং সহকারী কাপ্তেন ডুবুরি-কামরায় ঢোকার জন্যে তৈরি হ'য়ে নিলেন। তার আগে কাপ্তেন শুভেচ্ছা জানালেন ম্যাস্টনকে, 'আমার শুভকামনা জানবেন। আশা করি অচিরেই আপনার সুযোগ্য বন্ধুদের সাক্ষাৎ পাবেন।'

ম্যাস্টন এবং সহকারী কাপ্তেন ডুবুরি-কামরার ভিতরে প্রবেশ করবার পর কাপ্তেন দরজাটা বন্ধ ক'রে ভালো ক'রে কুলুপ এঁটে দিলেন। তারপর দুজনে প্রশান্ত মহাসাগরের তলে নামলেন নিখোঁজ বন্ধুদের সন্ধানে।

নীল সমুদ্রের অন্ধকার তলদেশ সন্ধানী আলোর তীব্র রশ্মিতে আলোকিত হ'য়ে উঠলো।

সমুদ্রতলের জমিটা কী-রকম? নদীর জলের নিচে যেমন কাদা-মাটি-বালি ইত্যাদি আছে, সমুদ্রের নিচেও কি তাই? এ-প্রশ্নের উত্তর কিন্তু নেতিবাচক, কেননা কাদা-মাটি-বালি তো নদীর দু-পাড় থেকে ধুয়ে ব'য়ে-আনা সামগ্রী। সমুদ্রে বালিই কেবল সেইমতো; তীরবর্তী জমি-পাথর ভেঙে ধুয়ে তার সৃষ্টি। কাজেই তীরের নিকটবর্তী অঞ্চলে কিছু-কিছু বেলে পাথর পাওয়া যায়। ঐসব ভাঙা পাথর ও বালি দিয়ে উপকূলের কাছাকাছি এলাকার সমুদ্রতলের গহ্বরগুলি ভর্তি থাকে। উপকূল থেকে দূরে—গভীর সমুদ্রে—আর পাথর বা বালি নেই। সেখানে সমুদ্রগর্ভ এক ধরনের শাদা গুঁড়ো জিনিশে ঢাকা, নানারকম সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষে যার সৃষ্টি। শামুক আর ঝিনুকই কেবল নয়, আরো নানা জাতের শক্ত-খোলাওলা প্রাণী সমুদ্রতলে বাস করে। সেইসব প্রাণীর দেহাবশেষ যুগের পর যুগ ধ'রে সেখানেই জমা হচ্ছে। তাছাড়া সমুদ্রের অগভীর জলেও অনেকরকম ছোটো আকারের প্রাণী থাকে, যাদের দেহাবশেষ হাজার-হাজার বছর ধরে নিচে পড়ছে। এইসব পদার্থের একটি পুরু ও কঠিন আবরণে গভীর সমুদ্রগর্ভ আচ্ছাদিত। এছাড়া সমুদ্রতলে অনেক সহস্র বর্গমাইল ধ'রে একধরনের লাল মাটির আচ্ছাদন থাকে। অনেকের মতে এর সৃষ্টি হয়েছে কোনো সামুদ্রিক অগ্নিগিরির উদগার থেকে। সমুদ্রগর্ভের আচ্ছাদন যা-ই হোক, আসলে সমুদ্রতল পাথরের তৈরি।

পাথরের তৈরি তো এই পৃথিবীও। পৃথিবীতেও কত বিচিত্র ধরনের বিভিন্ন রকমের প্রাণীর বাস। সমুদ্রতলেও তেমনি হাজার রকমের প্রাণী আছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রাণীদের মতো তাদের বাসস্থান এবং আহারের ব্যবস্থা আছে সমুদ্রতলেই। পৃথিবীপৃষ্ঠের মতো সমুদ্রতলেও নানা ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায়। সমুদ্রগর্ভের এই বিচিত্র সংবাদ 'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী' গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। উৎসাহী পাঠকেরা সেই অ্যাডভেনচারটি প'ড়ে দেখতে পারেন।

ডুবুরি-কামরার ভেতর থেকে জলের তলায় বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের সাক্ষাৎ পেলেন তাঁরা। কিন্তু তখন সে-বিষয়ে মাথা ঘামানোর মতো কোনো সময় ছিলো না। অন্য-কোনো-দিকে দৃক্‌পাত না-ক'রে তন্ন-তন্ন ক'রে তাঁরা চারপাশে গান-ক্লাবের গোলকটি খুঁজে বেড়ালেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো। কিন্তু কোথায় সেই গোলক? বেমালুম সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

একে-একে পাঁচ ঘণ্টা কাটলো খোঁজাখুঁজিতে। কিন্তু তবু সেই নিরুদ্দেশ গোলকের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না। শেষকালে সহকারী কাপ্তেন জিগেশ করলেন, 'আমরা কি আপাতত ফিরে যাবো, মিস্টার ম্যাস্টন?'

'তাছাড়া কী-ই বা আর করা যায়?' ম্যাস্টনের গলার আওয়াজ ক্ষুব্ধ শোনালো। 'বার্বিকেন বা অন্য—কারু চুলের ডগাটিও দেখা গেলো না কোনোখানে। খামকা আর কী

করবো এই সাগরের তলায় ?' এই ব'লে সংকেতে জাহাজের উপরে ডুবুরি-কামরা, উত্তোলন করবার নির্দেশ পাঠালেন তিনি ।

ধীরে-ধীরে জাহাজের উপর ওঠানো হ'লো ডুবুরি-কামরাকে ।

কাপ্তেন সাগ্রহে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন । ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সহকারী কাপ্তেন জানালেন, 'উঁহু, কোনো লাভ হ'লো না ।'

'কী দুর্ভাগ্য !' আপশোশ করলেন কাপ্তেন । 'এবার তাহ'লে জলের উপরেই তন্ন-তন্ন ক'রে একবার খুঁজে দেখা যাক ।'

...

দিন পাঁচেক কেটে গেলো ।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যার সঙ্গে-সঙ্গে ফেরে, পাঁচ দিন তাঁর কাছে পাঁচ শতাব্দী ; আর হতাশার ক্রমাগত আঘাত খেয়ে খেয়ে একদিন তার আশারও শেষ হ'য়ে যায় ।

ডেকের উপর দুরবিন হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ম্যাস্টন এবং সহকারী কাপ্তেন । ম্যাস্টন বলছিলেন, 'আশ্চর্য ! কোনো পাত্তাই নেই । আমাদের কি তবে শেষ পর্যন্ত হতাশ হ'য়ে ফিরে যেতে হবে !'

সহকারী কাপ্তেন আর কী সান্ত্বনা দেবেন ! দুরবিন দিয়ে চারদিক দেখতে লাগলেন তিনি নীরবে । জল, কেবল জল । যে দিকে তাকানো যায়, মহাসমুদ্রের সুনীল জলরাশি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না । আচমকা তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে ! ঐ-যে দূরে ওটা কী দেখা যাচ্ছে ?'

সচমকে ম্যাস্টন শুধোলেন, 'কী ! কী দেখতে পাচ্ছেন ?'

'অস্পষ্ট একটা কী-যেন দূরে ভাসছে !'

'সেটার উপরে আবার যুক্তরাজ্যের পতাকা উড়ছে পৎপৎ ক'রে ! তাহ'লে ওটাই বোধহয় গান-ক্লাবের গোলক, কারণ ঐ-ধরনের চেহারা তো কোনো জাহাজের নেই !'

মাইল-খানেক দূরে সমুদ্রবক্ষে অস্পষ্ট কী-যেন একটি দেখা যাচ্ছিলো । তার উপর যুক্তরাজ্যের পতাকা, তারা আর ডোরা, হালকা হাওয়ায় উড়ছে পৎপৎ ক'রে ।

তক্ষুনি একটি নৌকো নামানো হ'লো সমুদ্রে । কয়েকজন নাবিককে সঙ্গে নিয়ে তক্ষুনি ম্যাস্টন রওনা হ'য়ে পড়লেন, সঙ্গে গেলেন সহকারী কাপ্তেন । মুহূর্তের জন্যেও চোখ থেকে দুরবিনটা নামালেন না ম্যাস্টন । নৌকোটা কিছুদূর এগুবার পরই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'পেয়েছি ! পেয়েছি ! গান-ক্লাবের গোলকটিই জলে ভাসছে !'

নাবিকেরা দ্রুতহাতে দাঁড় টেনে চললো ।

'একটা কথা আমার মাথায় আসছে না, মিস্টার ম্যাস্টন । গোলকটা তো প্রচণ্ড বেগে সমুদ্রে প'ড়েই ডুবে গিয়েছিলো । এর যা ওজন, তাতে তো এর আর ভেসে ওঠবার কথা নয় ; তা সত্ত্বেও এটা কী ক'রে ভেসে উঠলো ঠিক বুঝতে পারছি না ।'

'এ-তো খুব সোজা ব্যাপার । জাহাজ কেন জলে ভাসে ? নৌকো কেন জলে ভাসে ? —ভাসে আপেক্ষিক গুরুত্বের জন্যে । এবং ঠিক সেই একই কারণে এই গোলকটিও জলের উপর ভেসে উঠেছে ।'

কথা বলতে-বলতেই গোলকটির কাছে গিয়ে পৌঁছুলো নৌকো। সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর-কোনো শব্দ নেই কোথাও। আস্তে-আস্তে নৌকোর বুকেও ভারি স্তব্ধতা নেমে এলো। ম্যাস্টন বললেন, 'জীবনের তো কোনো চিহ্নই নেই : আশা করি সবাই জীবিত আছেন।'

ঢেউয়ের আওয়াজের সঙ্গে মিশে গিয়ে ম্যাস্টনের গলা কী-রকম নিস্তেজ শোনালো।

ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে ম্যাস্টন গোলকটির দরজা খুললেন। সানন্দ বিস্ময়ে তিনি তাকিয়ে দেখলেন দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের। গোলকের ভিতর থেকে প্রশ্ন হ'লো, 'কী ব্যাপার, মিস্টার ম্যাস্টন ? ভালো তো ?'

'আপনারা ঠিকঠাক আছেন তো ?'

গোলক থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে বার্বিকেন বললেন, 'খুব ভালো আছি। যাত্রার এই পর্বটা বেশ শান্তভাবেই উপভোগ করছিলাম আমরা।'

ধীরে-ধীরে নৌকোয় উঠলেন তিনজনে : গান-ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন, ফরাশি বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক মিশেল আর্দাঁ এবং রিচমণ্ডবাসী কাপ্তেন নিকল। সবার শেষে নৌকোয় এসে উঠল তাঁদের প্রিয় সঙ্গী নেপচুন।

'আপনারা কি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন ?'

'ভয় !' হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন বার্বিকেন : 'যখন কোনো মানুষ চিরকালের জন্যে চন্দ্রে উপগ্রহ হবার হাত থেকে রেহাই পেয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় দু-লক্ষ অসহ্য মাইল ঘুরে বেড়ায় তখন সে ভুলে যায় ভয় পেতে। ভয় শব্দটাকে কী ক'রে বানান করে, ম্যাস্টন ?'

ক্লিপার অভ দ্য ক্লাউড্‌স

১

আওয়াজগুলো কীসের ?

গুড়ুম ! গুড়ুম !

দুটি পিস্তলই একসঙ্গে গর্জন ক'রে উঠলো । দিব্য শিষ্টভাবে পঞ্চাশ গজ দূরে ঘাস খাচ্ছিলো নম্রকান্তি গোরুটি : ঝগড়াটায় সে যদিও কোনো পক্ষেই যোগদান করেনি তবু একটি গুলি তার পশ্চাদ্দেশ ভেদ ক'রে চ'লে গেলো ।

দ্বন্দ্বযোদ্ধাদের কারু গায়েই একটি আঁচড়ও পড়লো না ।

কারা এঁরা, এই দুজন যোদ্ধা ? তা আমাদের জানা নেই, যদিও তাঁদের নাম দুটিকে অমরতার হাতে সমর্পণ ক'রে দেবার এক আশ্চর্য সুযোগ ছিলো এটা । কেবল এটুকুই এখানে বলতে পারি যে দুজনের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত বয়োপ্রাপ্ত তিনি ইংরেজ অপরজন মারকিন —আর দুজনেরই অন্তত সেই বয়েস হয়েছে, যে-বয়েসে ভালো-মন্দ শনাক্ত করতে অসুবিধে হওয়া উচিত নয় ।

তবে গোজাতির এই দুর্ভাগা বেচারিটি কোথাকার শ্যামলিমায় তার শেষ রোমন্থন সাঙ্গ করেছে, তা অত্যন্ত সহজেই ব'লে দেয় যায় । নায়েগ্রার বাম তীরে, প্রপাতটি থেকে তিন মাইল দূরে, যেখানে একটি ঝোঝুল্যমান সেতু মারকিনমুলুক আর ক্যানাডার সংযোগ রচনা করেছে, অকুস্থলটি তার থেকে বেশি দূরে নয় ।

ইংরেজটি মারকিনের দিকে এক পা এগিয়ে গেলেন ।

'তবু, এখনও, আমি বলছি যে ওটা "রুল ব্রিটানিয়া" ছিলো ।'

'মোটেই না—এটা ছিলো "ইয়াঙ্কি ডুডল" ।' তরুণ মারকিনের উত্তর শোনা গেলো তৎক্ষণাৎ ।

দ্বৈরথ সমরের পুনরারম্ভের সূচনা দেখে দ্বন্দ্বযোদ্ধাদের একজন সহকারী—দুধের ব্যাবসার কথা ভেবেই—দুজনের মধ্যে নাসাস্থাপন করলে ।

'আচ্ছা, আপাতত এটাকে "রুল ডুডল" বা "ইয়াঙ্কি ব্রিটানিয়া" ব'লে ধ'রে নিয়ে ছোটোহাজরিটা সেরে নিলে হয় না ?'

যুক্তরাজ্য আর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়তাবোধের মধ্যে এই মর্মে একটি সাময়িক সন্ধিস্থাপন করাটাই সবাই আপাতত তৃপ্তিকর ব'লে মনে করলে । ইংরেজ এবং মারকিনগণ নায়েগ্রার বামতীর ধ'রে গোট-আইল্যাণ্ড বা অজদ্বীপের দিকে অগ্রসর হলেন । অজদ্বীপ আসলে নিরপেক্ষভূমি—যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্র কারুই সীমানায় সে পড়ে না । সেদ্ধ ডিম, প্রচলনির্ভর হ্যাম, আর চায়ের প্লাবনের মধ্যে এখন এঁদের ছেড়ে দেয়াই ভালো, কেননা এই কাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয়বার যখন তাঁদের সঙ্গে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তখন তাঁদের নিয়ে

উত্যক্ত হবার কোনো দরকার দেখি না ।

কিন্তু কার কথা ঠিক ? ইংরেজটির ? না মারকিন যুবকের ? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া মোটেই সহজ নয় । তবে উত্তেজনাটা কী-রকম প্রবল হ'য়ে উঠেছিলো, এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যাপারটা থেকেই তার যৎকিঞ্চিৎ আঁচ পাওয়া যায় । এই উত্তেজনার জন্মভূমি যে কেবলমাত্র আমেরিকাই, তা নয়—মাসখানেক হ'লো ব্যাখ্যাতীত ও রহস্যময় কতগুলি ঘটনা সব দেশেই তুমুল শোরগোল তুলেছে ।

এই ভূমণ্ডলে মানুষ নামক জন্তুর আবির্ভাবের পর আকাশ বা অন্তরিক্ষ ইতোপূর্বে আর-কখনোই মানুষকে এমন ব্যাকুল ও কৌতূহলী ক'রে তোলেনি : কাল রাতে ক্যানাডার অনটারিয়ো হ্রদ আর ঈরি হ্রদের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড এক বিমানবিহারী শিঙার শব্দে চমকে উঠেছিলো । কারু মতে ওই শিঙার আওয়াজে 'ইয়াঙ্কি ডুডলে'র সুর বেজেছে, আবার কেউ-বা ওই আওয়াজে শুনেছে 'রুল ব্রিটানিয়া'র সুর । এরই জন্যে অজদ্বীপের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ—যার সমাপ্তি হ'লো শেষকালে ছোটোহাজরির টেবিলে । আসলে হয়তো কোনো দেশেরই জাতীয় সংগীত বাজেনি ওই শিঙায় ! কিন্তু নির্জল যেটা তথ্য তা এই যে কাল রাতে এক আশ্চর্য বংশীধ্বনি আকাশ থেকে ঝ'রে পড়েছিলো পৃথিবীতে ।

কীসের বংশীধ্বনি এটা ? কার ? সত্যি কি কোনো বংশীধ্বনি আসলে, নাকি অন্য-কিছুর আওয়াজ ? তবে কি কোনো উড্ডীন অবস্থার মুরলীধর প্যান-এর মতো নিজের আহ্লাদ সুরে-সুরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলো !

না তো ! কোনো বেলুনই তো দেখা যায়নি আকাশে, দেখা যায়নি কোনো বৈমানিককেই । আবহমণ্ডলের উঁচু স্তরে আশ্চর্য-কিছুর আবির্ভাব হয়েছিলো কাল—যে আশ্চর্য-কিছুর ধরনধারণ সম্বন্ধে কোনো তথ্যই কারু জানা নেই—এই শব্দকে ব্যাখ্যা করা তো দূরের কথা । আজ তাকে—অর্থাৎ এই বিস্ময়করকে—দেখা গেলো আমেরিকায়, আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ইওরোপের আকাশে ঘটলো তার আবির্ভাব !

ফলে জগতের প্রত্যেক দেশেই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিমাণ ক্রমশই বেড়ে চললো । বাড়িতে নানারকম অদ্ভুতুড়ে ও কিম্ভূত শব্দ শুনলে আপনি কি তক্ষুনি তার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন না ? এবং নানা তত্ত্বতালাশির পরেও যদি আপনি তার মাথামুণ্ডু কিছু জানতে না-পারেন, তাহ'লে কি সে-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আপনি অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নেন না ? কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আশ্রয়টা হ'লো তিনভাগ জলবেষ্টিত আমাদের এই ভূমণ্ডল । এই আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে চাঁদ, কি শুক্র, কি বৃহস্পতি বা মঙ্গলে গিয়ে মাথা গোঁজার কোনো উপায়ই নেই আমাদের—এই সৌরপরিবারের অন্য-কোনো গ্রহ বা উপগ্রহে বাসাবদলের কোনো সুযোগই নেই। কাজেই আবহমণ্ডলের এই রহস্যময় ব্যাপারটির সমাধান করা শুধু আবশ্যিক নয়, অতি জরুরি । অসীম শূন্যে নয়, এই অদ্ভুতুড়ের আনাগোনা আবহমণ্ডলেই—কেননা হাওয়া না-থাকলে আওয়াজ হয় না । এবং আওয়াজ যেহেতু নিয়তই হয়, যেহেতু ওই বিখ্যাত মুরলীধ্বনি প্রায়ই শোনা যায়, অতএব ওই আশ্চর্য বস্তুটি নিশ্চয়ই বায়ুমণ্ডলেই বিচরণ করে । আর বায়ুস্তরও ক্রমেই হ্রাস পেতে-পেতে পৃথিবীর ছয় মাইল দূরে একেবারেই থাকে না ।

স্বভাবতই জগতের খবরকাগজগুলি ব্যাপারটিকে সাগ্রহে লুফে নিলে । নানাভাবে ব্যাপারটাকে তারা বিচার করলে : বিষয়টির উপর যুগপৎ আলো এবং অন্ধকার—দুই-ই

ফেললে তারা, সত্য-মিথ্যা নানা জিনিশ প্রচার ও সম্প্রচারের ভার নিলে সোৎসাহে—কখনও পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে আতঙ্ক ও বিভীষিকা, আবার কখনও বা দিলে আশ্বাস ও ভরসা—আর তাদের সমস্ত উদ্যোগই নিয়ন্ত্রণ করলে কাগজের বিক্রি ; বিক্রি বাড়াবার জন্যেই নানা গুজব, জনরব ও হুজুগ তুলে সাধারণ মানুষকে উন্মাদ ক'রে দেবার দায়িত্ব নিলে তারা। অর্থাৎ একেবারে ঊনপঞ্চাশ পবন ব'য়ে গেলো সংবাদপত্র মারফৎ । এক ঘুষিতেই কুপোকাৎ হ'লো সব রাজনৈতিক মতবিরোধ—আর তাতে যে জগতের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হ'লো, তা-ও নয় ।

কিন্তু, বাস্তবিক, ব্যাপারটা কী হ'তে পারে ? জগতের সবগুলি মানমন্দিরে আবেদন-নিবেদন গেলো । মানমন্দিরগুলি যদি এ-সম্বন্ধে কোনো তৃপ্তিকর তথ্য জোগাতে না-পারে, তাহ'লে তারা আছে কী করতে ? যে-জ্যোতির্বিদরা নিয়মিত লক্ষ-কোটি মাইল দূরের তারা ও নীহারিকার সংখ্যা দ্বিগুণ-ত্রিগুণ বৃদ্ধি ক'রে চলেছেন, তাঁরা যদি মাত্রই কয়েক মাইল দূরের এই ব্যাপারটির কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে না-পারেন, তাহ'লে তাঁদের খামকা এত অর্থ ব্যয় ক'রে পুষেই বা আমরা কী করবো ?

ফ্রান্সের আবহাওয়া আপিশগুলো যথাকালেই অত্যন্ত সাবধানে ধরি মাছ না-ছুঁই পানি গোছের একটা বিবৃতি দিলে । কী-একটা বৈদ্যুতিক আলোর রেখা—ফ্রান্সের মফস্বল শহর থেকে প্রাপ্ত বার্তা অনুযায়ী—ঘণ্টায় একশো কুড়ি মাইল বেগে নাকি আল্‌প্‌স্‌ পর্বতের দিকে এগিয়ে গেছে ।

ইংল্যাণ্ডে দেখা গেলো নানা মুনির নানা মত : গ্রীনউইচ যা বললে, অক্সফোর্ডের মত তার একেবারে বিপরীত । তবে ইংরেজরা পুরো ব্যাপারটাকেই একটা দৃষ্টিবিভ্রম ব'লে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে । ওদিকে বের্লিন আর হ্বীন-এর মানমন্দিরের মধ্যে যে-মতভেদ দেখা দিলো, তাতে একটা আন্তর্জাতিক বিরোধ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠলো । কিন্তু ভাগ্যিশ ছিলো রাশিয়ার পুলকোওয়া মানমন্দির—সে জানালে যে হ্বীনও ঠিক, বের্লিনও ঠিক, কারুই কোনো ভুল হয়নি ; আসলে মতভেদ যেটা দেখা দিয়েছে, তা ধর্তব্যই নয়—আর এই মতভেদও হয়েছে কেবল জিনিশটার দিকে দুজনার দু-ভাবে তাকাবার জন্যে—ফলে দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত এই তর্কাতর্কি গ্রাহ্য না-করাই ভালো ।

সুইৎজারল্যাণ্ড থেকে জ্যোতির্বিদরা বললেন যে প্রমাণ করা যায় না এমন-কোনো মত প্রকাশ ক'রে কী লাভ—আর, সত্যি-বলতে, এ-কথার সারবত্তা অনস্বীকার্য । কিন্তু ইতালিতে, বিসুবিয়াসে কি এটনার গনগনে চুল্লির কাছ থেকে মানমন্দিরগুলা জানালে যে একটা-কোনো অদ্ভুত বস্তু যে আকাশে দেখা যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই—সেটা আবার দিনে হয় একরকম, রাতে হয় আর—দিনে তাকে দেখায় বাষ্পভরা, ধোঁয়ামাখা ছোটো মেঘের টুকরোর মতো, রাতে সেটা আবার হ'য়ে ওঠে কক্ষচ্যুত জ্বলন্ত নক্ষত্র । কিন্তু ব্যাপারটা যে কী, তা দেবা ন জানন্তি মানুষ তো ছার !

এত-সব কথাবার্তা হ'য়ে যাবার পর, জ্যোতির্বিদরা বড্ড ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন । মতভেদ অবশ্য থেকেই গেলো একে-অন্যের মধ্যে, এবং অজ্ঞ ও অবিজ্ঞদের সংখ্যাই স্বভাবত পৃথিবীতে বেশি ব'লে গোড়ায় কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেলেও শেষটায় তারা সামলে নিলে । অবশেষে তুমুল কোলাহলের পর ব্যাপারটা সবাই যথারীতি যাবতীয় হুজুগের মতো ভুলেই যেতো, যদি-না

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার জ্যোতির্বিদরা টেলিস্কোপ ঘুরিয়ে ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখ রাত্তিরে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন। পর-পর চারদিন তাঁরা এক অরোরা বোরিয়ালিসের মাঝখানে দেখলেন প্রকাণ্ড পাখির মতো কী-একটাকে—বোধহয় কোনো উড়ো রাক্ষস, যার চেহারাটা তাঁরা ভালো ক'রে বুঝতেই পারলেন না, কিন্তু এটা তাঁরা লক্ষ করলেন যে সেই উড়ো রাক্ষস কেবলই উগরে দিচ্ছে আগুন—কী-যেন বেরিয়ে আসছে তার দেহ থেকে, আর বোমার মতো ফেটে-ফেটে যাচ্ছে।

এ-সব কথা শুনে দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল, পেরু, লা প্লাতা, ও অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, অ্যাডেলাইড ও মেলবোর্নের মানমন্দিরগুলো হো-হো ক'রে হেসে উঠলো—এবং অস্ট্রেলিয়ার হাস্যরোগ এতই সংক্রামক যে ইওরোপও তাতে যোগ না-দিয়ে পারলে না।

এ-রকম অবস্থায় সবাই যখন কিঞ্চিৎ বিমূঢ় ও সন্দেহগ্রস্ত, তখন একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত এলো চিনের জি-কা-উয়ে মানমন্দির থেকে—যা শুনে ইওরোপের সবগুলো খবর-কাগজ টিপ্পনী ও টিটকিরিতে ভ'রে গেলো। জি-কা-উয়ে মানমন্দিরের অধ্যক্ষ বিস্তর গবেষণার পর কেবল বলেছিলেন, 'মনে হয় এটা একটা ব্যোমযান—কোনো বিমান—কোনো উড়ো কল!'

শুনেই 'বাজে কথা' ব'লে সবাই কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলে।

উড়িয়ে দিলে, কিন্তু সেই নভোচারী বিস্ময়কে নিয়ে কথাবার্তা যথারীতি চলতে লাগলো। আর ইওরোপই যখন এ-বিষয় নিয়ে হুলুস্থুল না-তুলে পারলে না, তখন আমেরিকার ব্যাপারটা কী-রকম শোরগোল তুললো তা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। ইয়াঙ্কিরা—এটা জানি—মাঝরাস্তায় সময় নষ্ট করে না। একেবারে নাক-বরাবর যেখানে-খুশি চ'লে যাবার পক্ষপাতী তারা। আর তাছাড়া এত বড়ো একটা দেশের মানমন্দিরগুলোও যত রকম তদন্ত ও গবেষণা করা যায় তার দিকে নজর দিলে। আকাশে কেবল সেই অভৌতিক ভ্রাম্যমাণ বস্তুটিকেই তারা দেখলে তা নয়, বারে-বারে শুনতে পেলে আকাশ থেকে ভেসে আসছে বাজনার আওয়াজ—যেন মস্ত-একটা গানের আসর ব'সে গিয়েছে আকাশে। শেষটায় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একদিন সোৎসাহে কাগজ-পেনসিল নিয়ে ব'সে পড়লো স্বরলিপি রচনা করতে—আর বহুক্ষণ উৎকর্ণ থেকে কোনো রকমে ডি. মেজরের কয়েকটা স্বর তুলে নিলে, যা থেকে বোঝা গেলো স্পষ্ট একটা সুর আছে এই বিমানবিহারী সংগীতে।

আর তারই ফলে আরেকটা তর্ক হ'লো তুমুল। কোন সুর বাজছে? ইয়াঙ্কি ডুডল, না রুল ব্রিটানিয়া? না কি ফরাশি বাদ্যকর সমিতি আকাশটা ইজারা নিয়েছে? তা ভেবে যে-পরিমাণ উত্তেজনার সৃষ্টি হ'লো, তারই অভিঘাত পড়লো আন্তর্জাতিক দুগ্ধ-ব্যবসায়ে—এবং গোড়াতেই তার একটা যথাযথ বিবরণ দিয়েছি আমরা।

কিন্তু তবু সমস্যাটা আদৌ মিটলো না। একমাত্র সন্তোষজনক ও সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন চৈনিক জ্যোতির্বিদ। কিন্তু চিনেদের আবার মত! তাদের আবার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি! সুতরাং কেউই ব্যোমযানের কথাটায় পাত্তা দিলে না। অথচ জুন মাসের গোড়ায় যখন সে নভোচারী বস্তুটির উপরে দেখা গেলো একটা নিশেন উড়ছে পৎ-পৎ—এবং জগতের বিভিন্ন স্থানেই সে-দৃশ্যটা পর-পর চোখে পড়লো—তখন আবার আরেকপ্রস্থ শোরগোল উঠলো। না, কোনো সন্দেহই নেই এবার। আকাশে যাই উড়ুক না কেন, তার গায়ে উড়ছে একটা কালো নিশেন,

কালো গায়ে জ্বলজ্বল করছে কতগুলো তারা—আর নিশেনের ঠিক মাঝখানটায় রয়েছে সূর্য—জ্বলন্ত ও সোনালি।

কারা এই নিশেন উড়িয়ে আকাশ দখল ক'রে নিলে ? কেউ জানে না—আর সেইজন্যেই এবার কোলাহলটা হ'লো একেবারে সপ্তমে চড়া।

২

একমত হওয়া অসম্ভব

'আর প্রথম যিনি এ-মতে সায় দেবেন না —'

'ইল্লি ! কিন্তু আমরা তো সর্বক্ষণ এইমতের বিপক্ষে বলবো ব'লেই ঠিক করেছি !'

'এবং আপনাদের যাবতীয় ভয় দেখানো সত্ত্বেও—'

'ব্যাট ফিন, তুমি কী বলছো, একবার ভেবে দ্যাখো !'

'আপনি কী বলছেন, তাই ভাবুন একবার, আঙ্কল প্রুডেন্ট !'

'আমি এখনো বলছি যে ইস্ক্রুপটা পিছনে লাগানো উচিত !'

'আমরাও তাই বলতে চাই ! আমরাও তাই বলতে চাই !' সমস্বরে প্রায় পঞ্চাশটি গলা চেঁচিয়ে উঠলো।

'না। এটা সামনে থাকবে,' চেঁচিয়ে বললেন ফিল ইভানস।

'সামনে ! সামনে !' আরো পঞ্চাশটি গলা ঠিক একই উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলো।

'আমরা কখনো এ-মতে সায় দেবো না !'

'কখনো না ! কক্‌খনো না !'

'তাহ'লে আর ঝগড়া ক'রে লাভ কী ?'

'এটা মোটেই ঝগড়া নয়। এটা আলোচনা—'

কিন্তু গত পনেরো মিনিট ধ'রে সভাকক্ষে এমন টিটকিরি টিপ্পনী আর চীৎকার হচ্ছিলো যে এটাকে কোনো আলোচনা ব'লে মনে-করাই ছিলো অসম্ভব।

ঘরটা ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। ওয়ালনাট স্ট্রিটের ওয়েলডন ইনস্টিটিউট হ'লো ফিলাডেলফিয়া, তথা পেনসিলভানিয়া, তথা আমেরিকার সেই বিখ্যাত ক্লাব। গতকাল সন্ধেয় এখানে লণ্ঠন সহযোগে নানা ছবি দেখিয়ে অত্যন্ত কোলাহল ভরা বাত্ময় একটি সভা হ'য়ে গেছে—শেষটায় আস্ত সভাটাই গোলেমালে পণ্ড হ'য়ে যায়—প্রায় একটা ছোটোখাটো দাঙ্গাই বেধে যায় সভার মধ্যে। গণ্ডগোলটা অবশ্য বাইরের কেউ করেনি—যারা করেছিলো তারা সবাই ওয়েলডন ইনস্টিটিউটেরই সদস্য। সদস্যরা সবাই বেলুনবাজ—বেলুনকে কীভাবে আকাশে চালানো যায়, কখন কোনদিকে উড্ডীন বেলুনের মোড় ফেরানো যায়—এই জ্বলন্ত প্রশ্নটিই ছিলো আলোচনার বিষয়বস্তু।

একশোজন বেলুনবাজ ঘরটায় জড়ো হয়েছে আলোচনার জন্যে—আর এই একশোজন

ওড়ন্দাজ এখানে এ-ওকে ঠেলা মারছে, হাতাহাতি করছে, হাত-পা ছুঁড়ছে, চীৎকার করছে, তর্ক করছে, ঝগড়া করছে—অথচ সবাই টুপি-পরা, নিখুঁত সজ্জিত—এমনকী সভায় রয়েছেন একজন সভাপতিও—যাঁকে সাহায্য করার জন্যে অধিকন্তু রয়েছেন একজন সচিব ও একজন কোষাধ্যক্ষ। এরা কেউই পুরোদস্তুর এঞ্জিনিয়ার নয়, সবাই শৌখিন নভোচারী—আর এখন এরা ক্রুদ্ধ সব শৌখিন বক্তৃতাবাগীশ—'বাতাসের চেয়েও ভারি যন্ত্র আকাশে ভাসবে কী ক'রে', এই কথা ব'লে যারা উড়ো কল, ব্যোমযান বা উড়োজাহাজের বিরোধিতা করতে চাচ্ছে তাদের এরা পরম ও গোঁড়া শত্রু। একদিন এরা বেলুনকে চালিয়ে নিয়ে যাবার উপায় বার ক'রে ফেলতে পারবে হয়তো, কিন্তু এখন এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এদের সভাপতি এখন এদের চালিত করতে পারছেন না।

সভাপতি ফিলাডেলফিয়ার সর্বজনপরিচিত বিখ্যাত আঙ্কল প্রুডেন্ট—প্রুডেন্ট তাঁর পারিবারিক পদবি। আঙ্কল কথাটা শুনে অবাক হবার কিছুই নেই—কারণ ভাইপো বা ভাগ্নে কিছু না-থাকলেও মার্কিনদেশে আঙ্কল হওয়া যায়। যেমন কোনো-কোনো জায়গায় 'বাবা' কথাটা চলে—যদিও বাবামশাইদের কোনো ছেলেপুলেই নেই।

আঙ্কল প্রুডেন্ট মস্ত নামজাদা লোক; প্রুডেন্ট কথাটার অর্থ বিচক্ষণ বা প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও—এবং প্রুডেন্ট তাঁর নাম হওয়া সত্ত্বেও—বেশ বেপরোয়া ডাকাবুকো ও দুঃসাহসী ব'লে তাঁর খ্যাতি ছিলো। বিস্তর টাকাকড়ির মলিক তিনি—আর মার্কিন দেশে ধনী হওয়াটা আদৌ দোষের নয়। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের আদ্ধেকেরও বেশি অংশের মালিক তিনি—ধনী না-হ'লে সেটা সম্ভব হ'তো কী ক'রে? বাফেলো রাজ্যে সম্প্রতি একদল এঞ্জিনিয়ার একটা সংসদ প্রতিষ্ঠা করেছেন নায়েগ্রাকে কাজে খাটাবার জন্যে, আর আঙ্কল প্রুডেন্টের কাছে সেটা বেশ লোভনীয় প্রস্তাব ব'লেই মনে হয়েছে। সাত হাজার পাঁচশো ঘন-মিটার জল আছড়ে পড়ছে নায়েগ্রায়—প্রতি সেকেণ্ডে তা থেকে সত্তর লক্ষ হর্স-পাওয়ার পাওয়া যাবে। এই বিপুল অশ্বশক্তিকে আশপাশে তিনশো মাইলের মধ্যে যাবতীয় কারখানায় সরবরাহ করতে পারলে বছরে নিদেন পক্ষে তিরিশশো কোটি ডলার আটকায় কে? আর এই লাভের বখরার বেশির ভাগটাই আসবে আঙ্কল প্রুডেন্টের পকেটে। অর্থাৎ যাকে বলে দাঁও মেরেছেন তিনি নায়েগ্রার ইজারা নিয়ে। বিয়ে-থা করেননি, এমনিতে বেশ নির্বিরোধী ভালোমানুষ গোছের, সাত চড়েও রা কাড়েন না, যাবতীয় গৃহকর্ম ও শাগরেদি করে ভৃত্য ফ্রাইকোলিন—যেমন প্রভু দুর্দান্ত দুঃসাহসী, তাঁর ভৃত্যটিও তেমনি দুরন্ত ডাকাবুকো।

আঙ্কল প্রুডেন্ট মস্ত ধনী, সেই জন্যে তাঁর ইয়ারদোস্ত বন্ধুবান্ধবও স্বভাবতই অনেক; কিন্তু তাঁর আবার শত্রুও ছিলো—যদিও তিনি ক্লাবের সভাপতি—বিশেষ ক'রে এমন অনেকে ছিলো—যারা তাঁকে এই পদের জন্যই ঈর্ষা করতো। তাঁর তিক্ততম শত্রু হিশেবে আমরা ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সচিবের নাম করতে পারি।

সচিব মহোদয় হলেন ফিল ইভানস—হুইলটন ওয়াচ কম্পানির ম্যানেজার ব'লেই ফিল ইভানসও বিরাট ধনীমানুষ। আঙ্কল প্রুডেন্ট না-থাকলে ফিল ইভানস জগতের, এমনকী আমেরিকারও, সবচেয়ে সুখী মানুষ হ'য়ে জীবনযাপন করতে পারতেন। প্রুডেন্টের মতো তাঁরও বয়েস ছেচল্লিশ; তাঁরই মতো ইভানসেরও স্বাস্থ্য অটুট, তাঁরই মতো তাঁরও সাহস আর স্পর্ধা গগনচুম্বী। দুজনের মধ্যে সবদিকেই এত মিল যে একজন আরেকজনকে হয়তো

অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে পারতেন, যেন তাঁরা একই মুদ্রার দুই পিঠ, কিন্তু আদত ক্ষেত্রে কেউই একে-অন্যকে বোঝবার চেষ্টা করতেন না, কারণ দুজনেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিলো মেরু ও মরুর ব্যবধান। প্রুডেন্ট সবসময়েই গরম হ'য়েই আছেন, তপ্ত ও উত্তেজিত; উলটো দিকে ফিল ইভানস হলেন ঠাণ্ডা মানুষ—শীতল ও সুবিবেচক।

প্রশ্ন উঠতে পারে ফিল ইভানস কেন ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হননি? দুজনেই সমান-সমান ভোট পেয়েছিলেন। কুড়িবার গোনা হয় ভোট, কিন্তু দেখা যায় সভ্যরা দুজনকেই সমভাবে সমর্থন করে। ব্যাপারটা বেশ গোল পাকিয়ে যাচ্ছিলো—হয়তো যাবজ্জীবন এই অবস্থাতেই কাটাতে হ'তো দুজনকে। কিন্তু এই অবস্থায় ক্লাবের একজন সদস্য একটা পথ বাৎলে দিলে। সে হ'লো জেম চিপ, ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের কোষাধ্যক্ষ। সে বললে যে ইনস্টিটিউটের সভাপতি নির্বাচিত করা হবে 'মধ্যবিন্দু' দিয়ে।

মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্রবিন্দু দিয়ে নির্বাচন করাটা যোগ্যতম ব্যক্তিকে বেছে নেবার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন বহু মার্কিন এই উপায়েই রিপাবলিক অভ ইউনাইটেড স্টেটস-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার কথা ভাবছেন। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—দুটি সুশুভ্র বোর্ডের গায়ে একটা ক'রে কালো রেখা আঁকা হয়—কালো রেখাটির দৈর্ঘ্য দু-ক্ষেত্রেই গাণিতিকভাবে এক; তারপর বোর্ড দুটিকে একই দিনে অধিবেশনকক্ষের ঠিক মাঝখানে টাঙিয়ে দেয়া হয়; প্রার্থী দুজন সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ সূঁচ হাতে একসঙ্গে এগোন সেই বোর্ড দুটির দিকে। সেই কালো রেখাটির মধ্যবিন্দুর যত কাছে যিনি সূঁচটা বিঁধিয়ে দিতে পারেন, তিনিই অবশেষে নির্বাচিত হন। অন্তত ওয়েলডন ইনস্টিটিউট এবার এইভাবেই সভাপতি নির্বাচন করবে ব'লে স্থির করলে।

কোনো মহড়া বা ট্রায়াল চলবে না, একবারেই যা-হয়-হবে। যে-মুহূর্তে আঙ্কল প্রুডেন্ট সূঁচটা তাঁর বোর্ডে বিঁধিয়ে দিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ফিল ইভানসের সূঁচটিও তাঁর বোর্ডে বিদ্ধ হ'লো। তারপর শুরু হ'লো মাপজোক—কে কতটা মধ্যবিন্দুর কাছে সূঁচ বিঁধিয়েছেন, তা হিশেব ক'রে দেখার তোড়জোড় শুরু হ'লো।

এবং কী আশ্চর্য! দুজনেই ঠিক মাঝখানটায় সূঁচ বিঁধিয়েছেন—কোনো ব্যবধান নেই—অন্তত শাদা চোখে কোনো তফাৎই ধরা গেলো না। ওয়েলডন ইনস্টিটিউট আরো তালেগোলে পড়লো। নির্বাচনের ব্যাপারটা আরো জট পাকিয়ে গেলো।

শেষটায় ট্রাক মিলনার ব'লে একজন সদস্য দাবি করলে মঁসিয় পেরো আবিষ্কৃত মাইক্রোমেট্রিক্যাল স্কেল দিয়ে মাপা হোক এটা। মঁসিয় পেরোর যন্ত্র এক মিলিমিটারকে পনেরোশো ছোটোভাগ ক'রে দেখাতে পারে। ওই যন্ত্র দিয়ে মেপে দেখা গেলো আঙ্কল প্রুডেন্ট ঠিক মধ্যবিন্দুর এক মিলিমিটারের পনেরোশো ভাগের ছ-ভাগের মধ্যে সূঁচ বিঁধিয়েছেন, আর ফিল ইভানস বিঁধিয়েছেন পনেরোশো ভাগের ন-ভাগের মধ্যে।

সেইজন্যই আঙ্কল প্রুডেন্ট যেকালে ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের স্বনামধন্য সভাপতি, সেকালে ফিল ইভানস কেবলমাত্র তাঁর সচিব। আর এই সামান্য ব্যবধানে এতটা তারতম্য হ'লো ব'লেই ইভানস চিরকালের মতো প্রুডেন্টের শত্রু হ'য়ে উঠলেন—তাঁর ঈর্ষা ও ঘৃণা অসীমে পৌঁছুলো।

৩

নিখিলেশ্বরো বা গগনেশ্বরো বা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছর ধ'রে বেলুনদের নিজের ইচ্ছেমতো চালিয়ে নেবার জন্যে অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন বেলুনবাজেরা। হেনরি গিফার্ড, দুপু দ্য লোম, তিসানদিয় ভ্রাতৃগণ, কাপ্তেন ক্রেবস আর রেনার—এঁদের নানা চেষ্টার ফলে বেলুনের গতি নিয়ন্ত্রণ অবিশ্যি আগের চেয়ে অনেক সহজ হ'য়ে উঠেছিলো, কিন্তু এখনও তাতে উন্নয়নের অবকাশ র'য়ে গিয়েছে। একটা হালকা অথচ অতি শক্তিশালী মোটর আবিষ্কারের জন্যে চেষ্টা চলছিলো সর্বত্র—আর মার্কিনরা এখানেই সাফল্যের সবচেয়ে কাছে চ'লে এলো। একজন অজ্ঞাতকুলশীল বস্টনবাসী রাসায়নিক ডায়নামো-চালিত একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যেটা দিয়ে নির্দিষ্ট মাপের একটি স্ক্রুকে ইচ্ছেমতো ঘোরানো যাবে—আর তার ফলে সেকেণ্ডে কুড়ি বাইশ গজ এগিয়ে যাওয়া যাবে।

'তাছাড়া এটা তেমন দামিও নয়,' আবিষ্কর্তাকে দশ লক্ষ ডলারের শেষ কিস্তি দিয়ে যন্ত্রটার পেটেন্ট কিনে নিতে-নিতে বলেছিলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

আর কিনে নেবার পরেই ওয়েলডন ইনস্টিটিউটে সাড়া প'ড়ে গিয়েছিলো ; যখনই কোনো জবর ব্যাবহারিক পরিকল্পনার কথা ছড়িয়ে পড়ে, মার্কিনদের পকেট থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে টাকা বেরোয়। কোনো সিণ্ডিকেট অব্দি তৈরি করতে হ'লো না—অজস্র চাঁদা উঠলো। প্রথম আবেদনেই ক্লাবের হাতে তিরিশ লক্ষ ডলার চ'লে এলো। আমেরিকার সবচেয়ে নামজাদা বৈমানিক হ্যারি ডাবলিউ. টিনডার—যিনি কিনা হাজার বার বেলুনে ক'রে আকাশে উড়েছেন, এবং একবার এমনকী বারোশো গজ উপরে উঠেছিলেন—স্বয়ং পুরো পরিকল্পনাটার তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন।

এই কাহিনী যখন শুরু হচ্ছে, তখন ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের কাজ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। ফিলাডেলফিয়ায় বানানো হয়েছে একটি অতিকায় বেলুন, চল্লিশ হাজার ঘন মিটার যার ব্যাস, এবং তাইতে সহজেই বোঝা যায় আঙ্কল প্রুডেন্টের সত্যি গর্ব করার অবকাশ ছিলো। বেলুনটার নাম দেয়া হয়েছিলো 'গো-অ্যাহেড'—অত্যন্ত সরল একটা নাম, কিন্তু সম্ভাবনাময়, তাৎপর্যপূর্ণ। সেই ডায়নামো-চালিত বৈদ্যুতিক যন্ত্র—ওয়েলডন ইনস্টিটিউট যার পেটেন্ট কিনে নিয়েছিলো—প্রায় তৈরি হ'য়ে এসেছে। আর ছ-সপ্তাহের মধ্যেই 'গো-অ্যাহেড' আকাশে উড়বে, তার চালকের ইচ্ছে অনুযায়ী যেদিকে খুশি সেদিকে যাবে।

কিন্তু আমরা একটু আগেই দেখেছি যে, সব যান্ত্রিক অসুবিধে এখনও দূরীভূত হয়নি। বহু সন্ধ্যায় বৈঠক বসেছে, আলোচনা হয়েছে, এবং সর্বক্ষণই আলোচ্য বিষয় ছিলো : স্ক্রুটা বসবে কোথায় ; পিছনে, না সামনে ? বলাই বাহুল্য দু-পক্ষের মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড

জুল ভের্ন-এর ছোটো গল্প 'শূন্য পুরাণ' দ্রষ্টব্য ; মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত ও সম্পাদিত *জুল ভের্ন-এর শ্রেষ্ঠ গল্প* বইতে গল্পটি পাওয়া যাবে, যেখানে সংক্ষেপে বেলুনচালনার একটি রোমাঞ্চকর ইতিহাস দেয়া আছে।

হচ্ছিলো।‘সম্মুখবর্তী’রা সংখ্যায় যত, ‘পশ্চাদ্বর্তী’রাও সংখ্যায় ততই। হয়তো আঙ্কল প্রুডেন্ট তাঁর কাস্টিং ভোট দিলে ব্যাপারটার একটা ফয়সালা হ’তো, কিন্তু আঙ্কল প্রুডেন্ট আবার অধ্যাপক বুরিদাঁর মেজাজের মানুষ—কোনো বিষয়েই সহজে মনস্থির করতে পারেন না।

ফলে কিছুতেই আর সুরাহা হয় না—স্ক্রুটা কোথাও বসানো হয় না। এই বিতণ্ডা হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হ’য়ে উঠবে, যদি-না সরকার কোনো ফতোয়া জারি করেন। কিন্তু আমেরিকার সরকার আবার লোকেদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কিছুতেই নাসা স্থাপন করতে রাজি নন—ফলে বাদ-বিসংবাদ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

১৩ই জুনের সন্ধেবেলায় বিতণ্ডা এমন-একটা স্তরে পৌঁছুলো যে বুঝি-বা দাঙ্গাই বেঁধে যায়। কিন্তু আটটা সাঁইত্রিশ মিনিটে এমন-একটা ঘটনা ঘটলো যে সভ্যদের মনোযোগ অন্তত সাময়িক ভাবে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হ’লো।

ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের একজন বেয়ারা অত্যন্ত ঠাণ্ডাভাবে প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে টেবিলের উপর একটা কার্ড রেখে দিলে। আঙ্কল প্রুডেন্ট কী বলেন, সেই অনুযায়ী সে কাজ করবে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট ঘণ্টা বাজালেন, যে-সে ঘণ্টা নয়, স্টীমের বাঁশি—কারণ ঘরে যে-রকম হৈ-হল্লা হচ্ছিলো তাতে ক্রেমলিনের ঘড়িও নিষ্ফল বাজতো। কিন্তু এই সিটি দেয়া সত্ত্বেও ঘরের হৈ-চৈ একটুও কমলো না। তখন সভাপতিমশাই তাঁর মাথার টুপি খুলে নিলেন। এই চূড়ান্ত ব্যবস্থায় অবশ্য একটা অর্ধ-স্তব্ধতা নেমে এলো ঘরে।

‘শুনুন! শুনুন!’ প্রুডেন্ট একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, ‘বার্তা আছে!’

‘বলুন!’ অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে দেখা গেলো ঊননব্বুইটি গলা একযোগে সায় দিলে।

‘বন্ধুগণ! একজন অচেনা ভদ্রলোক আজকে আমাদের সবায় যোগ দেবার অনুমতি চাচ্ছেন!’

‘অনুমতি! কক্‌খনো না!’ সবাই চেঁচিয়ে উঠলো একসঙ্গে।

‘তিনি নাকি প্রমাণ ক’রে দেবেন,’ আঙ্কল প্রুডেন্ট বললেন, ‘যে বেলুনের দিক নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনাটা কোনো উদ্ভট রামরাজ্যে বিশ্বাস করার মতোই অবাস্তব!’

‘আসতে দেয়া হোক ওকে! আসতে দেয়া হোক!’

‘তা, কী নাম এই অদ্বিতীয় ব্যক্তিটির, জানতে পারি?’ জিগেস করলেন ফিল ইভানস।

‘রবয়ু,’ প্রুডেন্ট নামটা জানিয়ে দিলেন।

‘রবয়ু!’ গোটা সভা একযোগে নামটা উচ্চারণ করলে। কার মগজে এমন তাজ্জব ধারণা খেলে ওয়েলডন ইনস্টিটিউট তাকে একবার চর্মচক্ষে দেখতে চায়। কতক্ষণ এই মাথা ধড়ের উপর থাকে, সেটাও তাদের দ্রষ্টব্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

...

‘যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ! আমার নাম রবয়ু। নামটা কেবল আমাকেই মানায়। দেখতে বছর তিরিশেকের যুবাপুরুষ, কিন্তু আসলে আমার বয়েস চল্লিশ। লোহাপেটানো শরীর আমার, অটুট স্বাস্থ্য, এমনকী পেশীর জোর এত যে অন্য লোকের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না—আর আমার হজম করার ক্ষমতা যে-কোনো উটপাখির কাছেও প্রথম শ্রেণীর ব’লে ধরা হয়!’

গোটা ঘরটা একেবারে চুপচাপ । সবাই উৎকর্ণ । বক্তৃতার এই অপ্রত্যাশিত ভঙ্গিমা সব দাঙ্গাহাঙ্গামাকে একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছে । কী এই লোকটা ? পাগল, না ফেরেব্বাজ ? কিন্তু মাথাখারাপ কি জোচ্চোর, যা-ই হোক না কেন, কেমন ক'রে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে হয় তা সে জানে । একটু আগে যে-সভায় একেবারে ঝড় ব'য়ে যাচ্ছিলো, সেখানে এখন এমনকী ফিশফিশ ক'রেও কথা বলছে না কেউ ।

আর, সত্যি, রবয়ুকে দেখতেও ঠিক সেইরকম । মাঝারি গড়ন , জ্যামিতিকভাবে চওড়া, আস্ত শরীরটা যেন একটা দ্বিসমান্তর চতুর্ভুজ, যার সমান্তরাল দিকগুলোর মধ্যে যেটি লম্বা, সেটি হচ্ছে তার কাঁধের রেখা । এই রেখার সঙ্গেই লাগানো রয়েছে বেশ স্বাস্থ্যকর ঘাড়গর্দান, যেখান থেকে উঠেছে এক বর্তুল গোলক—যেটা তার মাথা । মাথাটা দেখে মনে হয় ষাঁড়ের—কিন্তু ষাঁড়টি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাতে সন্দেহ নেই । একটু প্রতিবাদ শুনলেই চোখদুটো কয়লার টুকরোর মতো জ্ব'লে ওঠে--ভুরু দুটো কুঁচকেই আছে, কিন্তু সেই কোঁচকানো ভাবটাতেই প্রচণ্ড মনোবল ফুটে বেরুচ্ছে । ছোটো ক'রে ছাঁটা কোঁকড়া চুল মাথায়, আলো প'ড়ে কোনো ধাতুর মতো চকচক করছে । কামারের হাঁপরের মতো ওঠা-নামা করছে মস্ত বুকখানা । হাত-পা—সবই বৃষমুণ্ডের যোগ্য । নেই কোনো গোঁফের রেখা, জুলফি পর্যন্ত নেই, কেবল চিবুকে রয়েছে একটু ছাগলদাড়ি, যার তলায় চিবুকের শক্ত ও চোখা হাড়টা ঢাকা ।

এই অদ্ভুত জীবটি কোন দেশের সম্পত্তি ? বলা মুশকিল । একটা জিনিশ লক্ষ করা গেলো । বেশ ঝরঝরে ইংরেজি বলতে পারে রবয়ু, তাতে নিউ-ইংল্যাণ্ডের ইয়াঙ্কিদের জড়ানো নাকি টানটা নেই ।

বক্তৃতা চলছেই : 'এবং এখন আপনারা আমার মানসিক শক্তির কিঞ্চিৎ বিবরণ শুনুন । চোখের সামনে আপনারা যাকে দেখছেন, সে আসলে একজন এঞ্জিনিয়ার—যার স্নায়ুগুলো তার পেশীর চেয়ে মোটেই নিকৃষ্ট নয় । কাউকে আমি ভয় করি না—কোনো-কিছুকে না । আমার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি কখনও কারু কাছে নতিস্বীকার করেনি । আমি যখন কিছু করবো ব'লে ঠিক করি, তখন সারা আমেরিকা, সারা জগৎ যদি তাতে বাধা দেবার চেষ্টা করে, তবু আমাকে একফোঁটাও টলাতে পারবে না । আমার মাথায় কোনো আইডিয়া এলে, দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে আমি তা নিয়ে ভাবতে দিই না বা কোনোরকম প্রতিবাদ বা বিরোধিতাও আমি বরদাস্ত করি না । এইসব ছোটোখাটো অনুপুঙ্খগুলোর তলায় আমি বিশেষভাবে দাগ ক'রে দিতে চাই, কারণ আপনারা যাতে আমাকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন, এটাই সবচেয়ে অভিপ্রেত । হয়তো ভাবছেন যে আমি বড্ড বেশি আত্মপ্রচার করছি—বেশ একটা হাম্বড়া ভাব দেখা যাচ্ছে আমার মধ্যে । যদি তা ভেবে থাকেন, তাতে অবশ্যি কিছুই এসে-যায় না । সেইজন্যেই আমাকে বাধা দেবার আগে একটু ভেবে দেখবেন—কারণ আমি যা এখানে বলতে এসেছি তা আপনাদের মনঃপূত না-ও হ'তে পারে ।'

সামনের দিকের আসনগুলোর ঢেউ ফুলে উঠলো—বোঝা গেলো সমুদ্র আবার ঝড়ের পাল্লায় পড়বে ।

বহু কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে আঙ্কল প্রুডেন্ট বললেন, 'শুনি, কী বক্তব্য ।'

আরেকবারও শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়ার দিকে খেয়াল না ক'রে রবয়ু যা বললে, তা এই :

'হ্যাঁ, আমি ভালো ক'রেই জানি যে, একশো বছর ধ'রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে কোনো ফল না-পেলেও এখনও কোনো-কোনো ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে কোনো যন্ত্রের সাহায্যে বুঝি বেলুনকে ইচ্ছেমতো চালানো যাবে। বায়ুস্তরের নানা স্রোতের দয়ার উপর যে-চামড়ার থলিটা এখন নাস্তানাবুদ হচ্ছে, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বুঝি কোনো বৈদ্যুতিক মোটর জুড়ে দিলেই সেটাকে স্বাবলম্বী ক'রে তোলা যাবে। তাঁরা হয়তো ভাবেন যে সমুদ্রে যেমন মাঝি-মাল্লা, তেমনি তাঁরাও বুঝি কালক্রমে আকাশের ওস্তাদ নাবিক হ'য়ে উঠবেন। যেহেতু কয়েকজন আবিষ্কর্তা আবহাওয়া যখন শান্ত সেই অবস্থায় বেলুনকে চালিয়ে কারদানি দেখাতে পেরেছেন, সেইজন্যে তাঁরা ভাবেন যে হাওয়ার চেয়েও হালকা উড়ো-কলকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া বুঝি খুব ব্যাবহারিক ব্যাপার। তা শুনুন আপনারা একশোজনে! ভাবছেন বুঝি আপনাদের স্বপ্ন সফল হ'তে চল্‌লো—আর সেইজন্যে শতলক্ষ ডলার—না, জলে নয়, তার বদলে মহাশূন্যে—ছুঁড়ে ফেলছেন! কিন্তু শুনুন, মশাইরা—আপনারা একটা অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার করতে চাচ্ছেন!'

আশ্চর্য! এ-রকম একটা ঘোষণার পরেও ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সদস্যরা কিনা চুপচাপ ব'সে রইলো স্থিরভাবে! কালা হ'য়ে গেছে নাকি এরা, না কি ধৈর্যধারণ ক'রে আছে? না কি দেখতে চাচ্ছে এই উদ্ধত লোকটা কদ্দুর যাবার স্পর্ধা রাখে?

রবয়ু ব'লে চললো: 'কী পরিকল্পনা? না, একটু বেলুন ওড়াবো! যখন কিনা এক কিলোগ্রাম ভার ওঠাতেই এক ঘন-গজ গ্যাস লাগে! সামান্য একটা বেলুন কিনা ভাণ করছে যে সে তার কলকব্জা দিয়ে হাওয়াকে প্রতিরোধ করবে, যেকালে কিনা হালকা চাপকে জাহাজের পাল দিয়ে প্রতিরোধ করতে লাগে চারশো অশ্বশক্তি। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা কোথায় বেলুনের! কিন্তু তার মানে এই নয় যে মানুষ আকাশজয়ের চেষ্টা ছেড়ে দেবে! কারণ সারা জগতের রাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সম্পূর্ণই বদলে যাবে যদি মানুষ একবার নিরাপদে আকাশে উড়তে পারে। যেমনভাবে মানুষ সমুদ্রের রাজা হ'য়ে বসেছে জাহাজ বানিয়ে, দাঁড় তৈরি ক'রে, পাল তৈরি ক'রে, চাকা বানিয়ে, হাল ধ'রে, তেমনিভাবে সেও আকাশের অধীশ্বর হ'য়ে উঠতে পারবে যদি সে হাওয়ার চেয়েও ভারি কোনো যন্ত্র বানাতে পারে—কারণ আকাশে উড়তে গেলে যন্ত্রটাকে অবশ্যই হাওয়ার চেয়েও ভারি হ'তে হবে!'

আর এ-কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বিস্ফোরণটা ঘটলো। একেকটা মুখ থেকে এমন চীৎকার বেরুলো, যেন কামানোর মুখ থেকে সশব্দে গোলাগুলি বেরিয়ে এলো রবয়ুকে তাগ ক'রে! হালকা আর ভারি—এই কথা দুটি যেন জগৎজোড়া বেলুনবাজদের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিলে।

রবয়ু কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলো ভাবলেশহীন মুখে। হাতদুটি বুকের উপর ভাঁজ ক'রে সে দাঁড়িয়ে রইলো কতক্ষণে থামে এই হট্টগোল। শেষটায় বহুকষ্টে আঙ্কল প্রুডেন্ট রবয়ুর উদ্দেশে এই সমবেত অগ্নিবর্ষণ বন্ধ করলেন।

'ঠিক কথাই বলেছি আমি,' বললে রবয়ু, 'উড়ো—কলের হাতেই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ব্যোমমান ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই। আপনাদের, এই বেলুনবাজদের, দিয়ে কিচ্ছু হবে না—কোথাও পৌঁছুতে পারবেন না আপনারা—কিছুই করার সাহস হবে না। বেলুনবাজদের

মধ্যে যিনি সবচেয়ে দুঃসাহসী সেই জন ওয়াইজ আমেরিকায় বারোশো মাইল উড়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু অতলান্তিক সমুদ্র পাড়ি দেবার পরিকল্পনা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল ! তারপর থেকে আপনারা আর এক পাও এগোননি—এক পাও না ।'

'শুনুন,' বহু কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে আঙ্কল প্রুডেন্ট শান্ত গলায় বললেন, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন প্রথম আগুনভরা বেলুন দেখে অমর ফ্র্যাঙ্কলিন কী বলেছিলেন । এখনো ছোটো আছে, কিন্তু একদিন বড়ো হ'য়ে উঠবে । সত্যি, শিশু ছিলো একদিন—কিন্তু এখন বড়ো হ'য়ে উঠেছে ।'

'না, সভাপতিমশাই, সে বড়ো হ'য়ে ওঠেনি—বরং থপথপে মোটা ও কিম্ভূতকিমাকার হ'য়ে উঠেছে—বড়ো হওয়া আর ধুমশো হওয়া এক জিনিশ নয় !'

সরাসরি ওয়েলডন ইনস্টিটিউটকে আক্রমণ করা হ'লো এই কথায়, কারণ ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানেই অতিকায় বেলুনটিকে বানানো হয়েছে । সেইজন্যেই ঘরের মধ্যে পরক্ষণে হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হ'য়ে গেলো । আওয়াজ উঠলো : 'বের ক'রে দিন ওকে !' 'ছুঁড়ে ফেলে দাও প্ল্যাটফর্ম থেকে !' 'ও নিজেই যে হাওয়ার চেয়ে ভারি, সেটা এখন প্রমাণ হ'য়ে যাক ।'

কিন্তু এ-সব অর্ধচন্দ্র প্রদানের কথায় রবয়ু একেবারেই বিচলিত হ'লো না । 'বেলুনবাজ নাগরিকগণ !' সে ব'লে চললো, 'আপনাদের ওই বেলুনের আর-কোনো প্রগতির সম্ভাবনা নেই—এগিয়ে যাবে ব্যোমযানই । পাখি ওড়ে—দেখেছেন তো ? মনে রাখবেন, সে বেলুন নয়—সে একধরনের কৌশল জানে ।'

'হ্যাঁ, পাখি যে ওড়ে, তা আমরা জানি, তবে সে কিন্তু বলবিদ্যার যাবতীয় সূত্রকে অগ্রাহ্য ক'রে ওড়ে,' জ্বলন্ত স্বরে বললে ব্যাট টি. ফিন—ইনস্টিটিউটেরই একজন সভ্য ।

'তাই নাকি !' কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটু ব্যঙ্গের স্বরে বললে রবয়ু, 'যেদিন থেকে আমরা ছোটো-বড়ো পক্ষিশাবকের ওড়া দেখছি সেদিন থেকেই আমরা মনে-মনে ঠিক ক'রে নিয়েছি প্রকৃতির অনুকরণ করতে হবে—কারণ প্রকৃতিঠাকরুন কখনোই কোনো ভুল করেন না । অ্যালবাট্রস মিনিটে দশবার পাখা ঝাপটায়, পেলিকান ঝাপটায় সত্তরবার—'

'উঁহু, একাত্তর বার,' সভার মধ্যে একজন ভুল সংশোধন করে দিলে ।

'আর মৌমাছি তার ছোট্ট ডানা নাড়ে সেকেণ্ডে একশো বিরানব্বুই বার—'

'মোটেই না, একশো তিরানব্বুই বার !'

'আর সাধারণ মাছিরা নাড়ে তিনশো তিরিশ বার—'

'তিনশো সাড়ে তিরিশ বার —'

'আর মশা নাড়ে দশ লক্ষ বার—'

'না, মশায়—মশা নাড়ে দশ লক্ষ হাজার বার—'

কিন্তু রবয়ু এ-সব কথায় পাত্তা না-দিয়ে বললে, 'এই বিভিন্ন হারের মধ্যে—'

'যথেষ্ট ব্যবধান আছে,' একজন ব'লে উঠলো ।

'এই বিভিন্ন হারের মধ্যেই একটা ব্যাবহারিক সমাধান খুঁজে বার করা যেতে পারে । যখন দ্য লুসি প্রমাণ করেছিলেন যে দু-গ্রাম ওজনের একটা গঙ্গাফড়িং চারশো গ্রাম ওজন বহন করতে পারে—অর্থাৎ নিজের ওজনের দুশোগুণ ওজন বহন করারও ক্ষমতা

রাখে—আকাশ ওড়ার সমস্যাটার তখনই নিষ্পত্তি হ'য়ে গিয়েছিলো। তাছাড়া এটাও প্রমাণিত হয়েছিলো যে আকারের অনুপাতে পাখনার মাপ ও ওজনও বাড়ে-কমে। কাজেই যদি আমরা এ-রকম কোনো কল বানাতে পারি—'

'যেটা কোনোদিনই উড়বে না!' ফিল ইভানস আওয়াজ দিলেন।

'যেটা আকাশে উড়েছে, এবং চিরকাল উড়বে,' বিন্দুমাত্র অধীর না-হ'য়ে রবয়ু ব'লে চললো, 'এবং যাকে আমরা বলতে পারি স্ক্রিওফোর, হেলিকপ্টার বা অরথপটার, তাহ'লে মানুষ তিনশূন্য দখল ক'রে বসতে পারে। পেনো দেখিয়েছেন যে পাখিরা ঘুরে-ঘুরে আকাশে উড়ে যায়, আর ওড়ার ভঙ্গি হেলিকপ্টারাল বা স্পাইরাল। আর ভবিষ্যতের ব্যোমযান ও মোটর হচ্ছে সেই স্ক্রু—'

আঙ্কল প্রুডেন্ট চারপাশের কোলাহলের মধ্যে গলা চড়িয়ে বললেন, 'আগন্তুক! তোমাকে এতক্ষণ আমরা নির্বাধায় কথা বলতে দিয়েছি।' বোঝা গেলো ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি হই-চই, চ্যাঁচামেচি, কুকুর-বেরালের ডাক ও নানা জাতীয় আওয়াজকে বাধাপ্রদান ব'লে মনে করেন না, বরং তাঁর মতে এ-সব যুক্তিতর্কের অন্তর্ভুত। 'কিন্তু এখন বোধহয় তোমাকে মনে করিয়ে দেয়া দরকার যে এ-সব ব্যোমযানের তত্ত্ব এর আগেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে ও বেশির ভাগ মারকিন বা বৈদেশিক এঞ্জিনিয়ার এই তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেছেন। এই তত্ত্বটা যে কত লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তার লেখাজোখা নাই। কনস্তান্তিনোপলে উড়ে সারাসান, লিসবনের মোহান্ত ভোলাডর, দ্য লেতুর, দ্য প্রুফ—এ-সব ছাড়াও তোমাকে কিংবদন্তির ইকারুসের নাম শোনাতে পারি। ইকারুসের পর থেকেই কত লোক যে—'

'কিন্তু বেলুনে উড়তে গিয়েও যাঁরা শহিদ হয়েছেন, আমাকে কি এখানে তাঁদের তালিকা শোনাতে হবে? তাছাড়া, যত ভালো বেলুনই আপনারা বানান না কেন, তাতে আর কত দ্রুত যেতে পারবেন? আস্ত পৃথিবী ঘুরে আসতে ওই বেলুনে আপনাদের দশ বছর লাগবে—পক্ষান্তরে কোনো ব্যোমযানে আপনি এক সপ্তাহের মধ্যেই এই ভূ-মণ্ডল চ'ষে ফেলতে পারবেন!'

এ-কথার সঙ্গে-সঙ্গে তুমুল ঝড় উঠলো ঘরের মধ্যে। অবশেষে সব চীৎকার একটু কমলে ফিল ইভানস বললেন, 'বৈমানিকমশাই, আপনি তো ব্যোমযানের এত ব্যাখ্যানা করলেন—তা আপনি কি কখনো ব্যোমযানে ক'রে আকাশে উড়েছেন?'

'হ্যাঁ, উড়েছি।'

'এবং আকাশ জয় করেছেন?'

'হ্যাঁ—এভাবেও আমার কীর্তিকে বর্ণনা করতে পারেন।'

'আরশোলারও গজায় পাখা! রবয়ু হলেন আকাশরাজা!' একজন টিটকিরি করলে, 'নিখিলেশ্বরো বা গগনেশ্বরো বা!'

'তা মিথ্যে বলেননি। রবয়ুকে নিখিলেশ্বরো বা গগনেশ্বরো বা বলতেও পারেন। নামটা আমি গ্রহণ করলুম—কারণ এ-নাম নেবার অধিকার আমার আছে!'

'আমাদের দয়া ক'রে আপনার প্রস্তাবে সন্দেহ প্রকাশ করতে দিন,' বললে জেম চিপ।

'ভদ্রমহোদয়গণ,' রবয়ু ভুরু কুঁচকে গেলো, 'যখন আমি অত্যন্ত গভীরভাবে কোনো

কথা বলি তখন কাউকে আমি তার প্রতিবাদ করতে দিই না। আমাকে যিনি বাধা দিলেন, তাঁর নামটা জানতে পারলে আমি বাধিত হবো।

'আমার নাম চিপ, আমি নিরামিষ খাই।'

'তা শ্রীযুক্ত চিপ, আমি এটা জানি যে নিরামিষভোজীদের খাদ্যপ্রণালী বেশ লম্বা হয়, অন্যদের চেয়ে-ফুটখানেক বেশি তো হবেই। তা আপনার যথেষ্ট দীর্ঘ ব'লে মনে হয় না কি ? দয়া ক'রে আমাকে এতটা বাধ্য করবেন না যাতে আপনাকে কানমলা খাইয়ে কান থেকেই খাদ্যপ্রণালীর দৈর্ঘ্য মাপতে হয় —'

'বের ক'রে দাও ওকে। ছুঁড়ে ফেলে দাও ঘর থেকে !'

'রাস্তায় বের ক'রে দাও—'

'লিন্‌চ করো ওকে—'

'হেলিক্স করো ! শূন্যে ছুঁড়ে ঘোরাও পাখিদের মতো—'

এতক্ষণে বেলুনবাজদের রোষ গগনে পৌঁছুলো, আশমানে। তারা প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে এলো হুড়মুড় ক'রে। সেই সব উত্তোলিত উত্তেজিত মুষ্টির আড়ালে রবয়ু ঢাকা প'ড়ে গেলো। মিথ্যেই আঙ্কল প্রুডেণ্ট রেলগাড়ির সিটি দিলেন তাঁর স্টীমের বাঁশি বাজিয়ে। ফিলাডেলফিয়া ভাবতে পারতো যে কোথাও এমন অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে যেখানে আস্ত সমুদ্রের জল ঢেলে দিয়েও আগুন নেভাবার সম্ভাবনা নেই।

হঠাৎ উত্তেজিত বেলুনবাজরা সবাই কুঁকড়ে পিছিয়ে এলো। রবয়ুর দুটি হাত বিদ্যুৎবেগে পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে, হাতে এমন-একটি ছোট্ট চকচকে কালো জিনিশ, মারকিনরা যাকে রিভলবার ব'লে চেনে, যার ঘোড়ায় আঙুলের একটু চাপ পড়লেই গুলি বেরিয়ে আসে।

তারা যে সবাই পিছিয়ে পড়েছিলো, তাই নয়, হঠাৎ কী-রকম বোমকে গিয়ে ভড়কে গিয়ে চুপ ক'রে গিয়েছিলো। সেই সুযোগে রবয়ু চেঁচিয়ে বললে, 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আমেরিগো ভেসপুচ্চি সাহেব কখনও নতুন জগৎ আবিষ্কার করেননি, সত্যিই এর আবিষ্কর্তা ছিলেন ক্যাবট ! বেলুনবাজমশাইরা আপনারা কেউ আমেরিকান নন, আপনারা সবাই সামান্য ক্যাবটিস্ট—'

গুলির আওয়াজ হ'লো চার-পাঁচবার, শূন্য লক্ষ্য ক'রে। কারু গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগলো না। কিন্তু সেই ধোঁয়ার মধ্যে রবয়ু ঢাকা প'ড়ে গেলো। ধোঁয়া স'রে গেলে দেখা গেলো সেখানে রবয়ুব চিহ্নমাত্র নেই। গগনেশ্বরো রবয়ু সত্যি উড়েই গেছে যেন—যেন সত্যি কোনো ব্যোমযান তাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

৪

আরেকটি অন্তর্ধান

ঝোড়ো ও ক্ষুব্ধ আলোচনার পর ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সদস্যরা এবারই কেবল প্রথম ওয়ালনাট স্ট্রিট ও তার আশপাশটায় কোনো শোরগোল ও হুলুস্থুল তুললে না। কতবার

যে পাড়া-পড়শিরা এই সব হইচই-এর প্রতিবাদ করেছে তার হিশেব নেই—একবার তো যাতে পথিকরা নির্বিঘ্নে পথ দিয়ে যেতে পারে সেইজন্যে পুলিশ এসে চোটপাট করেছিলো। কিন্তু সব সত্ত্বেও এত গণ্ডগোল ও চ্যাঁচামেচি কস্মিনকালেও আগে কখনও হয়নি, প্রতিবাদের ভিত্তিও এর আগে কদাপি এতটা দৃঢ় ছিলো না, কিংবা পুলিশের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাও আগে কদাচ এমন তীব্রভাবে অনুভূত হয়নি।

কিন্তু ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সদস্যদের পক্ষেও দু-একটা কথা বলার ছিলো। নিজের দুর্গেই কিনা তারা আক্রান্ত হয়েছে আজ। কী-রকম চুপশে গিয়েছিলো তারা রিভলবার দেখে, বোমকে যাওয়া যাকে বলে, কিন্তু তারপরেই যখন নিজেদের সামলে নিয়ে ওই হতভাগা রবয়ুকে তারা শায়েস্তা করার জন্যে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে গেলো, তখন বিমূঢ়ভাবে আবিষ্কার করলে যে সব ভোঁভাঁ—কোনো পাত্তাই নেই রবয়ুর, সে যেন বেমালুম হাওয়ায় উবে গেছে।

কাজেই চীৎকার ক'রে শোধ নেবার কথা বলা ছাড়া আর উপায় কী? এ-রকম অপমানকে মুখ বুজে সহ্য করার কথা ভাবতেই তাদের ধমনীর ভিতর মারকিন রক্ত গরম হ'য়ে উঠলো। আমেরিগোর সন্তানদের লোকটা ক্যাবটনন্দন ব'লে ঠাট্টা ক'রে যায়নি কি? বিশেষ ক'রে ঐতিহাসিক হিশেবে এই টিটকিরি এত সত্যি ব'লেই আরো-বেশি গায়ে লাগে না কি?

সদস্যরা সব দলে-দলে ওয়ালনাট স্ট্রিটে বেরিয়ে এলো হুড়মুড় ক'রে—তারপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেলো আশপাশের গলিঘিঞ্জিতে, তারপর আস্ত পাড়াটাতেই দেখা গেলো ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ বেলুনবাজদের। গোটা পাড়াটাকে তারা জাগিয়ে তুললে, লোকজনকে ঘুম থেকে তুলে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখলে তাদের বাড়িঘর—পরে তাদের বাড়ির শান্তিভঙ্গ করার নালিশ করার সুযোগ দিয়ে এলো তারা একযোগে—কারণ সব খানাতল্লাশি ও সরেজমিন তদন্তই ব্যর্থ হ'লো: কোথাও রবয়ুর পাত্তা নেই—বেমালুম মিশিয়ে গেছে সে হাওয়ায়, চিহ্নটুকুও না-রেখে। হয়তো সেই অতিকায় বেলুন গো-অ্যাহেডে উঠে তার দোলনাতেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে হতভাগা—কিন্তু একঘণ্টা ধ'রে সমস্ত কোণাখামচি খুঁজেও তার দেখা মিললো না। শেষটায় তারা ঠিক করলে যে হাল ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না তাদের পক্ষে—উত্তর ও দক্ষিণ দুই আমেরিকাই তারা চ'ষে ফেলে খুঁজে বার করবে তাকে—আর এই সিদ্ধান্তে একমত হ'য়ে তারা তখনকার মতো যে যার বাড়ির দিকে রওনা হ'য়ে পড়লো।

এগারোটা নাগাদ অবশেষে ওয়ালনাট স্ট্রিটের চারপাশটা আবার শান্ত ও নিঃঝুম হ'য়ে এলো। ফিলাডেলফিয়া অবশেষে আবার শান্ত ঘুমে তলিয়ে যেতে পারলে, যেটা কলকারখানা বহুল নগরের একটা মস্ত সৌভাগ্য। ইনস্টিটিউটের সদস্যরা একে-অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের-নিজের বাড়ির দিকে চ'লে গেলো। কেবল দুজন মাস্তান বেলুনবাজ—কেবলমাত্র দুজনই—এত শিগগির বাড়ি ফেরার কথা ভাবছিলেন না। এই সুযোগে আবার তাঁরা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সমস্যাটা আলোচনা করার অবকাশ পেলেন। এই দুজন হলেন অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভানস—ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সচিব।

ইনস্টিটিউটের ফটকের কাছে ভৃত্য ফ্রাইকোলিন তার প্রভু আঙ্কল প্রুডেন্ট-এর জন্যে অপেক্ষা করছিলো; এতক্ষণে সুযোগ পেয়ে সে তাঁর উদ্দেশে ভিতরে ঢুকে পড়লো; যদিও

আদায়-কাঁচকলায় দুই সহযোগী যে-বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন, সে-বিষয়ে তার অতিসামান্যই কৌতূহল ছিলো ।

সভাপতি ও সম্পাদকের মধ্যে যেভাবে বিসম্বাদটা পরিচালিত হচ্ছিলো, তাকে 'আলোচনা' ব'লে অভিহিত করা মানে যথেষ্ট কমিয়ে বলা । বস্তুত দুজনের পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা আবার এই আকস্মিক উশকানিতে বেশ প্রবলভাবেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো । প্রতিদ্বন্দ্বিতা না-ব'লে দুশমনি বলাই বোধকরি সংগত হ'তো ।

'না, মশাই, না,' বললেন ফিল ইভানস, 'আমি যদি ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি হতুম, তাহ'লে কস্মিনকালে এমন একটা ছী-ছী কেলেঙ্কারি হ'তে পারতো না ।'

'তা আপনি সভাপতি হ'লে কী করতেন শুনি ?' আঙ্কল প্রুডেন্ট জানতে চাইলেন ।

'মুখ খোলার আগেই লোকটাকে আমি থামিয়ে দিতুম ।'

'কিন্তু মুখ না-খুললে তাকে থামানো কী ক'রে সম্ভব হতো, তা আমি বুঝতে পারছি না ।'

'আমেরিকায় সে-সব হয় না, মশাই, আমেরিকায় সে-সব হয় না ।'

এবং এ-জাতীয় বাণীবিনিময়ের মধ্য দিয়ে তাঁদের তিক্ততা ক্রমশ বেড়েই চললো, এবং এবম্বিধ কথাবার্তায় ব্যস্ত থেকেই তাঁরা দুজনে নিজেদের বাড়ি ছাড়িয়ে কেবল হেঁটেই চললেন, হেঁটেই চললেন । শেষটায় শহরের যেখানটায় গিয়ে তাঁরা পৌঁছুলেন, সেখান থেকে বাড়ি ফিরতে হ'লে অনেকটা হাঁটতে হয় ।

এ-রকম নির্জন ও নিঃঝুম এলাকায় প্রভু নিরুদ্বেগে হেঁটেই চলেছেন দেখে ফ্রাইকোলিন কিঞ্চিৎ অস্বস্তি অনুভব করছিলো । নিরিবিলি ফাঁকা জায়গাগুলো তার মোটেই পছন্দ নয়—বিশেষ ক'রে মাঝরাতের পর তো নয়ই । চারদিকে নিরেট অন্ধকার, প্রতিপদের চাঁদের একটা রোগা, বাঁকা, ক্ষীণ ফালি আকাশে । ফ্রাইকোলিন বারে-বারে ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে লক্ষ করতে লাগলো কেউ তাদের অনুসরণ করছে কিনা । তার মনে হ'লো পাঁচ-ছটি ষণ্ডামার্কা লোক আস্তে তাদের পাছু নিয়েছে—নিশ্চয়ই কোনো বদ মৎলব রয়েছে তাদের —আর ভাবতেই তার গাটা ছমছম ক'রে উঠলো । প্রায় স্বজ্ঞাপ্রসূত তাগিদের ফলেই সে তার প্রভুর একেবারে গা ঘেঁষে চলতে লাগলো—কিন্তু সারা জগতের বিনিময়েও সে তার প্রভুর এই শশব্যস্ত কথাবার্তায় বাধা দিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার সাহস পেলে না ।

সভাপতি ও সচিব ততক্ষণে ফেয়ারমাউন্ট পার্কের রাস্তায় এসে পড়েছেন । তর্কের উত্তেজনায় দুজনেই শুলকিল নদীর বিখ্যাত লোহার পুলটা পেরিয়ে গেলেন । দু-একজন নিশাচর লোকের সঙ্গে দেখা হ'চ্ছে মাঝে-মাঝে, কিন্তু তাঁরা কেউই এদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না । দু-পাশে মাঠ, মাঝখান দিয়ে খোলামেলা রাস্তা চ'লে গেছে, মাঝে-মাঝে রাস্তার দু-পাশে ঝাঁকড়ামাথা কালো গাছপালা । এখানে এসেই ফ্রাইকোলিনের ভয় একেবারে চরমে পৌঁছুলো, বিশেষ ক'রে যখন দেখলে যে পাঁচ ছটা ছায়ামূর্তি হঠাৎ হালকা পায়ে শুলকিল সেতু পেরিয়ে এলো হুড়মুড় ক'রে তখন সে প্রায় ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগলো ভয়ে । চোখ দুটো গোল-গোল হ'য়ে উঠলো, বিস্ফারিত, সন্ত্রস্ত, কারণ ফ্রাইকোলিনের চেয়ে ভিতু কেউ পৃথিবীতে ছিলো না বোধহয় কোনোকালে ।

দক্ষিণ ক্যারোলাইনার বিশুদ্ধ একজন নিগ্রো সে, মগজটা হস্তিমূর্খের, আর শরীরটা

অপদার্থের। বয়েস তার একুশ মাত্র, ক্রীতদাসও নয়—কোনো কালে ছিলোও না, কিন্তু তাতে তার অবস্থায় বিশেষ তারতম্য হয়নি। দাঁত-বার-করা লোভী ও অলস সে, আস্ত একটা ভাঁড় যাকে বলে, বছর তিনেক হ'লো আঙ্কল প্রুডেণ্টের কাছে চাকরি করছে। কতবার যে প্রভু তাকে তাড়িয়ে দেবার সংকল্প করেছেন, কিন্তু উজবুকটা যদি আরো ঝামেলা বাঁধিয়ে বসে, সেইজন্যে শেষটায় আর বরখাস্ত করেননি তাকে। বিশেষ ক'রে প্রভু যে-কালে ডাকাবুকো ও দুঃসাহসী, সেকালে তার মতো ভিতু লোকের পক্ষে তাঁর কাছে চাকরি করাটাই মস্ত এক ঝকমারি। তবে আঙ্কল প্রুডেণ্টের কাছে কাজ করার একটা সান্ত্বনাও আছে। তার উদরপূজা ও আলস্য সম্বন্ধে এখানে কেউ উচ্চবাচ্য করার নেই।

হায়, ভৃত্য ফ্রাইকোলিন, যদি তুমি একবার জানতে ভবিষ্যতের গর্ভে তোমার জন্যে কী তোলা আছে! কেন, হায় ফ্রাইকোলিন, কেন তুমি বস্টনে জেফেলদের বাড়ির চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল, কেবল তারা সুইৎজারল্যাণ্ড যাবার প্রস্তাব করেছিলো ব'লে! বিশেষত যেহেতু প্রুডেণ্টের বাড়িতে বিপদকে সবসময়েই স্বাগত জানানো হয় সেইজন্যে আঙ্কল প্রুডেণ্টের চেয়ে সেই বাড়িটাই অনেক বেশি মনোমতো হ'তো নাকি?

তার বদলে—হায়!—সে কিনা এখানেই প'ড়ে রয়েছে, এবং তাঁর প্রভু এতদিন ভৃত্যের যাবতীয় দোষত্রুটিতোই অভ্যস্ত হ'য়ে গেছেন। কেবল একটা সুবিধে তার আছে, এবং সেটাই কিঞ্চিৎ বিবেচ্য। নিগ্রো হ'লেও তার কথাবার্তা খুব-একটা নিগ্রোদের মতো নয়—আর নিগ্রোবুলির মতো আর-কোনো ভাষাই এতটা উত্ত্যক্ত করে না, কারণ নিগ্রোদের বুলিতে সব সর্বনামই সম্বন্ধঘটিত আর সব ক্রিয়াপদ মাত্রই নিত্যবৃত্ত বর্তমানের অধীন। এখানে অবশ্য কেবল এই কথাটাই বিশেষভাবে বলা হচ্ছে, ফ্রাইকোলিন যে মস্ত একটা ভিতুলোক সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

আর এখন কিনা মাঝরাতে প্রতিপদের চাঁদের একরত্তি ফালিটা বিতানের গাছপালার আড়ালে পশ্চিম আকাশে ডুবে যাচ্ছে। এক-আধটু যে চাঁদের আলো কাতরভাবে ডালপালার ফাঁক দিয়ে এসে ঝ'রে পড়ছে, তারা বরং সব ছায়াকেই আরো গাঢ় ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। ফ্রাইকোলিন অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে চারপাশে তাকিয়ে দেখলে। 'ব্-র্-র্-র্!' ব'লে উঠলো সে, 'ছায়াগুলো ফেউয়ের মতো লেগেই আছে দেখছি পিছনে! আরে, এরা দেখছি অনেকটা কাছে এসে পড়েছে। আঙ্কল, কর্তামশাই!' চেঁচিয়ে উঠলো সে। এই ব'লেই ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতিমশায়কে সম্ভাষণ করতো সে—এবং সভাপতিও তাঁর কাছ থেকে এই সম্ভাষণই দাবি করতেন।

সেই মুহূর্তে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর তর্ক একেবারে পঞ্চমে চড়েছে—পরস্পরের উদ্দেশে নানাবিধ সম্ভাষণ ছুঁড়ে মারছেন তাঁরা তখন, এবং সেই সঙ্গে চলার বেগও বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ, শুলকিল সেতু থেকে আরো দূরে চ'লে যাচ্ছেন তাঁরা। যেখানে এসে পৌঁছেছেন, সেখানে গোলভাবে একটা জায়গা ঘিরে বড়ো-বড়ো গাছ উঠেছে, আর গাছের ডগায় ডুবে যাবার ঠিক আগটায় লটকে আছে প্রতিপদের চাঁদ। গাছপালাগুলো ছাড়িয়েই বর্তুল একটি চত্বরের মতো—যেন আস্ত একটা অ্যাম্ফিথিয়েটার। দুম ক'রে কোথেকে কোনো ঘোড়সোয়ারবাহিনী এসে যদি হাজির হয়, তাহ'লে কোনো উত্তল বা অবতলভূমি নেই তাকে বাধা দেবার জন্যে। যদি চারপাশে দর্শকেরা তাকিয়ে ব'সে থাকে, তাহ'লে কিছুতেই তাদের

দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হবে না কোনো ঝোপঝাড়ে বা গাছেপালায় ।

আর আঙ্কল প্রুডেণ্ট ও ফিল ইভানস যদি কথাকাটাকাটিতে তখন এতটা তন্ময় না-থাকতেন এবং নিজেদের দৃষ্টিশক্তিকে কিয়ৎপরিমাণে কাজে খাটাতেন, তাহ'লে তাঁরা হয়তো দেখতে পেতেন যে ঝোপঝাড়ের পর যেখানটায় খোলা জায়গায় পৌঁছুনো যায়, সেটা ঠিক পূর্ব্ববৎ নেই তখন । রাতারাতি কোনো ময়দাকল বসেছে নাকি এখানে ? তা-ই তো মনে হচ্ছে—তেমনি পাখা, তেমনি পাল—গভীর-এক ছায়ান্ধকার নিশ্চল ও রহস্যময় প'ড়ে আছে এখানে ।

কিন্তু ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কি সচিব—কেউই ফেয়ারমাউণ্ট পার্কের স্থলচিত্রের অদ্ভুত পরিবর্তনটুকু লক্ষ করলেন না—এমনকী ফ্রাইকোলিনও সেটা একবারও তাকিয়ে দেখলে না । তার শুধু মনে হচ্ছে : ওই বুঝি এসে পড়লো চোরবাঁটপাড়গুলো, বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়লো হুড়মুড় ক'রে ! ভয়ে তার হাত-পাগুলো ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চাচ্ছে, জোড়াগুলো সব কেমন যেন অবশ, মাথার প্রত্যেকটা চুল শজারুর কাঁটার মতো খাড়া দাঁড়িয়ে গেছে ! হাঁটু যেন আর শরীরের ভার সামলাতে পারছে না, কিন্তু শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় ক'রে সে আরেকবার ডাক দিলে, 'আঙ্কল ! কর্তামশাই !'

'কী ব্যাপার তোমার, বলো দিকিন !' আঙ্কল প্রুডেণ্ট একটু ত্যক্ত স্বরেই ব'লে উঠলেন । দুর্ভাগা ভৃত্যটির উপরেই ভিতরের সব চাপা রাগ ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো । কিন্তু ওইটুকুই—মনের ঝাল ঝাড়ার আর-কোনো সময়ই পাওয়া গেলো না ।

শোনা গেলো চাপা তীক্ষ্ণ একটা বাঁশির শব্দ ! ঝোপের ওপাশ থেকে বৈদ্যুতিক মশালের আলো এসে পড়লো তক্ষুনি ।

কোনো সংকেত, সন্দেহ নেই ! হুড়মুড় ক'রে আধডজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়লো, একেকজনের দিকে একেকজোড়া । অবশ্য ফ্রাইকোলিনের জন্য একজোড়া লোকের মোটেই দরকার ছিলো না—যুঝবার কোনো ক্ষমতাই ছিলো না তার । আর আচমকা আক্রান্ত হ'য়ে ইনস্টিটিউটের হতভম্ব কর্মকর্তা দুজনও বাধা দেবার বিশেষ অবসর পেলেন না । আক্রমণকারীরা মুখের মধ্যে কাপড় পুরে দিয়ে এমনভাবে মুখ বেঁধে ফেললে যে টু শব্দ করারও কোনো জো রইলো না তাঁদের ; তারপর চোখে পট্টি বেঁধে দেয়া হ'লো—যাতে কিছুই দেখতে না পারেন : অতঃপর পাঁজাকোলা ক'রে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হ'লো কোথায় যেন । মৎলব কী এই ষণ্ডাগুলোর ? পকেট হাৎড়াচ্ছে না তো ! গুমখুন করতে চায় ? কিন্তু কেন ? একটু পরেই তাঁরা বুঝতে পারলেন কোথায় যেন তাঁদের চিৎ ক'রে শুইয়ে রাখা হ'লো ! না, ঘাসের উপর নয় বরং পাৎলা কোনো তক্তার উপর, কারণ তাঁদের দেহের ভারে তক্তাটা ক্যাঁচক্যাঁচ ক'রে ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ জানালে । তারপরে শব্দ হ'লো কোথায় কোন দরজা বন্ধ করার । তাঁরা বন্দী । কিন্তু কার ?

হঠাৎ এমন সময় ভোমরার মতো একটা গুঞ্জন উঠলো সেখানে, কেঁপে উঠলো পাটাতন—আর, একটা ফররর আওয়াজ কেবল—যার র্‌র্‌র্ শব্দটা একটানা হ'তেই থাকলো । রাত জুড়ে এই শব্দটা ছাড়া আর-কোনো সাড়াশব্দই পৌঁছুলো না তাঁদের কানে ।

৫

সচিব বনাম সভাপতি : আপাতত আপস

পরদিন প্রাতঃকালে আস্ত ফিলাডেলফিয়ার সে কী তুমুল শোরগোল ! ইনস্টিটিউটের সভায় কী হুলুস্থুল কাণ্ড হয়েছিলো, ছেলেবুড়ো নারীপুরুষ সবাই সেটা ততক্ষণে জেনে ফেলেছে। কোন-এক রহস্যময় কারিগর—তার নাম না কি রবয়ু—সে না কি আবার নিখিলেশ্বরো বা গগনেশ্বরো বা কিছু একটা—আবির্ভূত হয়েছিলো সেই সভায়, বেলুনবাজদের মধ্যে মস্ত উত্তেজনা তুলেছিলো—তারপর যেমনি আচমকা তার আবির্ভাব হয়েছিলো, তেমনি আচমকা সে নাকি নিখোঁজ হ'য়ে যায় ।

কিন্তু সারা শহর যখন জানলে যে সেইসঙ্গে রাতের অন্ধকারে ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সচিবও নিরুদ্দিষ্ট, তখন পুরো ব্যাপারটা আরো কেমন ঘোরালো হ'য়ে উঠলো । শোরগোল বর্ধিত হ'লো আরো ।

চালানো হ'লো দীর্ঘ ও তন্নতন্ন খানাতল্লাশ—শহর ও শহরতলির একটুকরো জমিও বাদ গেলো না ! কিন্তু খামকা ! ফিলাডেলফিয়ার যাবতীয় খবর কাগজ—সেই সঙ্গে পেনসিলভ্যানিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের ছোটো-বড়ো সব সংবাদপত্র—এই নিরুদ্দেশের খবর বেশ ফলাও ক'রে ছেপে তার একশোটা ব্যাখ্যা ও কারণ উপস্থিত করলে—কিন্তু কোনোটাতেই এই নিরুদ্দেশের সঠিক কারণ পাওয়া গেলো না । মোটা অঙ্কের ইনাম ঘোষণা করা হ'লো সর্বত্র, লটকে দেয়া হ'লো পোস্টার প্ল্যাকার্ড, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না । মাতা বসুমতী যেন হঠাৎ দু-ভাগ হ'য়ে এঁদের নিজের জঠরে আস্ত পুরে ফেলেছেন—ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি বা সচিবের চুলের ডগাটি পর্যন্ত কোথাও দেখা যাচ্ছে না ।

...

চোখের উপর পট্টি-মারা, মুখের মধ্যে দলাপাকানো কাপড় পোরা, কব্জি পেঁচিয়ে আছে শক্ত দড়ি, হাঁটুটাও তেমনি ক'রে বাঁধা : দেখা যাচ্ছে না কিছু, মনের ঝাল ঝাড়ার কোনো উপায় নেই, নড়াচড়াও করা যাচ্ছে না—এই অবস্থায় প'ড়ে আঙ্কল প্রুডেন্ট, ফিল ইভানস আর ফ্রাইকোলিন যে আদৌ সুখী হয়নি, লেখাই বাহুল্য । কে বা কারা এমনভাবে পাকড়ালে তাঁদের, কোন মালগাড়ির মধ্যে মস্ত পুলিন্দার মতো তাঁদের নিক্ষেপ করা হ'লো, কোথায় আছেন, ভবিতব্যের হাতেই বা কী তোলা আছে ইত্যাদি যাবতীয় প্রশ্নে গড্ডলপ্রবাহই উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে, আর এঁরা তো ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের কেউকেটা মাতব্বর ব্যক্তি । আঙ্কল প্রুডেন্ট যে কী পরিমাণ উত্তেজিত হ'য়ে উঠছিলেন, আমরা তাঁকে জানি ব'লে তা খানিকটা আঁচ করতে পারি । একটা জিনিশ সংশয়াতীত : তিনি আর ফিল ইভানস যে আগামী কাল সন্ধেবেলায় ইনস্টিটিউটের সভায় হাজিরা দিতে পারবেন না তাতে কোনো মতদ্বৈধ নেই । আর ফ্রাইকোলিন ? চোখে তাপ্পি, আর মুখেও অনুরূপ একটা-কিছু : এ-অবস্থায় তার পক্ষে কিছু চিন্তা করা অসম্ভব । যতটা-না জ্যান্ত, তার চেয়েও অনেক বেশি মড়া সে এখন ।

ঘণ্টাখানেক অব্দি বন্দীদের অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরম্ হ'য়েই রইলো। কেউ এসে কোনোরকম তদ্বির তদারকও করলে না—বা হাত-পা ছাড়াবার কি কথা বলবার সুযোগও ক'রে দিলে না। চাপা দীর্ঘশ্বাস আর ঘোঁৎঘোঁৎ বিরূপ আওয়াজেই তাঁদের প্রাণশক্তি খরচা হচ্ছিলো তখন। শেষটায় তাও একসময় বন্ধ হ'য়ে এলো : বালির বস্তার মতো হতাশ প'ড়ে রইলেন দুজনে। অবশেষে অনেক ভেবে স্থির করলেন : যেহেতু তাঁদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে, সেইজন্যে শ্রবণশক্তিকে তীক্ষ্ণ ও স্পর্শাতুর ক'রে তুলবেন, যাতে উৎকর্ণ হ'য়ে থেকেও ব্যাপারটা কী তা কথঞ্চিৎ অনুধাবন করা যায়। কিন্তু সেই একটানা, রহস্যময় ও ব্যাখ্যাতীত ফররর্ আওয়াজ ছাড়া আর-কিছুই কানে এলো না—এবং শুনতে-শুনতে এক সময় মনে হ'লো এই একঘেয়ে ক্লান্তিময় গুঞ্জনটি শেষটায় তাঁদের বুঝি আগাপাশতলা ঢেকে ফেলছে।

অবশেষে—কিছু-একটা ঘটলো। কোনোকরমে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ফিল ইভানস মণিবন্ধের বাঁধন অবশেষে আলগা ক'রে ফেললেন। আস্তে-আস্তে গ্রন্থি খুললেন, জট ছাড়ালেন, আঙুল নাড়লেন এবং শেষটায় হাতটাকে ছাড়িয়ে নিলেন। এতক্ষণ বেকায়দায় বেমক্কা দড়িবাঁধা থেকে হাতদুটোতে যেন রক্ত চলাচলই বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো। খুব-খানিকটা ডলাইমালাই ক'রে হাতদুটোয় সাড় ফিরিয়ে আনলেন ফিল ইভানস। চোখের পট্টি, মুখের তাপ্পি, হাঁটুর বাঁধন—পকেটের ছুরি বার ক'রে নিয়ে এগুলোর সদগতি করতে তারপর আর দেরি হ'লো না। কোনো মারকিনের পকেটে বাঁকানো ছুরি না-থাকলে সে আবার সত্যিকার মারকিন হয় না কি কখনও ?

কিন্তু ফিল ইভানস যদি নড়াচড়ার কি কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে থাকেন, তাতেই বা কী। চোখ দুটো তো এখনো কোনো কাজেই লাগছে না—অন্তত এইমুহূর্তে লাগছে না, কারণ এই জেলখানাটির মধ্যে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, যদিও ফিট ছয়েক উপর থেকে একটা ঘুলঘুলি দিয়ে অত্যন্ত রোগা, দুর্বল, মলিন এক চিলতে আলোর রেখা আসছে। লেখা বাহুল্য, ফিল ইভানস অতঃপর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকেও বন্ধনমুক্ত করতে দেরি করলেন না—এবং আঙ্কল প্রুডেণ্ট ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে প্রায় রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'ধন্যবাদ !'

'ফিল ইভানস !' একটু ভেবে আবার বললেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট।

'আঙ্কল প্রুডেণ্ট !'

'এখানে আমরা আর ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সচিব কি সভাপতি কিছুই নই। কাজেই আমাদের ঝগড়াও আর নেই।'

'এটা ঠিক কথা।' ইভানস বললেন, 'আমরা এখন তৃতীয় কোনো ব্যক্তির সঙ্গে লড়ছি একজোট হ'য়ে—বিশেষ ক'রে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটির ঘাড়ে ধ'রে জবাবদিহি চাইতে হবে আমাদের। আর সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি হ'লো—'

'রবয়ু !'

'রবয়ুই !'

এই একটা বিষয়ে দুজনের মধ্যে একচুলও অনৈক্য হ'লো না। মতবিরোধের কোনো আশঙ্কাই নেই এই বিষয়ে।

'আর আপনার এই ভৃত্যটি,' ফ্রাইকোলিনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন ফিল ইভানস,

'একেও আমাদের মুক্ত ক'রে দেয়া উচিত ।'

'উহু, এখন না,' বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট, 'তাহ'লে ওর চোখের জলে আমাদের সলিলসমাধি হবে, ওর নাকি কান্নায় আমাদের কানে তালা ধ'রে যাবে । এই মুহূর্তে ও-সব ঝুঁকি নেয়ার চেয়ে অন্য-কিছু করাই ভালো আমাদের ।'

'কী সেটা শুনি ।'

'সম্ভব হ'লে আত্মরক্ষা ।'

'ঠিক বলেছেন । অসম্ভব হ'লেও আত্মরক্ষাই হচ্ছে আদি কর্তব্য ।'

'হ্যাঁ, অসম্ভব হ'লেও !'

এই গুমখুনটি যে রবয়ুর নির্দেশেই ঘটেছে, এ-বিষয়ে এঁদের মনে কস্মিনকালেও কোনো সন্দেহ উদিত হ'লো না । কারণ সাধারণ চোর হ'লে যে ঘড়ি, সোনার বোতাম, আংটি, মানিব্যাগ—এ-সব দিকেই বিশেষ নজর দিয়ে তাঁদের মরদেহগুলি শুলকিল নদীতে ছুঁড়ে ফেলতো—তৎপূর্বে গলায় ছুরি বসিয়ে অবিশ্যি—এ-বিষয়ে কোনো সংশয় নেই । তার বদলে ধ'রে ফেললো কিনা—কোথায় ? না, এখানে ! কিন্তু এটা কী ? পালাবার ব্যবস্থা করার আগে এটা তাঁর সর্বপ্রথম জানা উচিত তাঁরা কোথায় আছেন ।

'ফিল ইভানস,' আঙ্কল প্রুডেন্ট শুরু ক'রে বললেন, 'সভা থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমরা যদি একটু চোখ-কান খোলা রাখতুম, তাহ'লে এ-ব্যাপারটা ঘটতে পারতো না । যদি এমনকী ফিলাডেলফিয়ার রাস্তাতেই আমরা তর্কাতর্কি করতুম, তাহ'লেও এই ঝামেলায় পড়তে হ'তো না । স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, রবয়ু ওই সভাতেই আঁচ করেছিলো কী ব্যাপার ঘটবে—এবং তার দলের কতগুলো যণ্ডাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো ইনস্টিটিউটের দরজায় । আমরা ওয়ালনাট স্ট্রিট ছেড়ে আসতেই এরা আমাদের পাছু নেয়—আর যেই বোকার মতো আমরা ফেয়ারমাউন্ট পার্কে ঢুকে পড়লুম, অমনি তারা ছোট্ট একটা ভোজবাজি দেখিয়ে দিলে আমাদের ।'

'মানলুম ।' বললেন ইভানস, 'সরাসরি বাড়ি ফিরে না-গিয়ে আমরা একটা মস্ত ভুল করেছি !'

'ঠিক কাজ না-করাটা সবসময়েই বেঠিক ।' আপ্তবাক্য আওড়ালেন প্রুডেন্ট ।

এমন সময়ে ওই ঘুটঘুট্টি জেলখানার এককোণে মস্ত একটা বুকচাপা দীর্ঘনিশ্বাস শোনা গেলো ফোঁ-ও-শ ।

'ও কী ? ইভানস জিগেস করলেন ।'

'ও কিছু না ! ফ্রাইকোলিন স্বপ্ন দেখছে ।'

'আমাদের ওরা পাকড়েছিলো ফেয়ারমাউন্ট পার্কের এক প্রান্তে—আর এখানে এসে বালির বস্তার মতো ছুঁড়ে ফেলেছিলো তার দু-মিনিটের মধ্যেই । তাতেই বোঝা যায় যণ্ডাগুলো আমাদের ফেয়ারমাউন্ট পার্কের বাইরে নিয়ে যায়নি ।'

'নিয়ে যদি যেতো, তাহ'লে নিশ্চয়ই টের পেতুম ।'

'নিশ্চয়ই । তার মানে নিশ্চয়ই আমাদের কোনো যানবাহনে তুলেছে ওরা—হয়তো প্রেয়ারিতে যে-ধরনের ওয়াগন চলে, বা সার্কাসের লোকেরা যে-ক্যারাভান ওয়াগন ব্যবহার করে, তারই কোনো-একটায়—'

'সে-তো বোঝাই যাচ্ছে। কারণ শুলকিল নদীতে নোঙর-ফেলা কোনো নৌকোয় তুললে স্রোত আর ঢেউয়ের দোলানি টের পেতুম !'

'ঠিক তাই। এবং যেহেতু আমরা এখনো ফেয়ারমাউন্ট পার্কেই রয়েছি, সেইজন্যে এখন মনে হয় পালাবার সময় হয়েছে। পরে ফিরে এসে রবয়ুর সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।'

'যুক্তরাষ্ট্রের দু-জন নাগরিকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার জন্যে তাকে মস্ত ঝামেলায় পড়তে হবে, ব'লে রাখছি।'

'মস্ত ব'লে মস্ত ! যাতে নিস্তার না-পায়, তারই ব্যবস্থা করবো !'

'কিন্তু লোকটা কে ? এলো কোত্থেকে ? ইংরেজ, না জর্মান ? নাকি ফরাশি—'

'লোকটা এক আস্ত ফেরেব্বাজ ! গুণ্ডা, বাঁটপাড়, বদমাশ—এবং এই পরিচয়ই যথেষ্ট !' বললেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট। 'কিন্তু এবার কাজে লাগা যাক।' এই ব'লে দুজনে হাৎড়ে-হাৎড়ে সেই দেয়ালের কোথায় জোড়া বা কোথায় কী, বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন অন্ধের মতো। উঁহু, কিছু নেই। কোনো ফাটল, চিড় বা জোড়ের সন্ধান পাওয়া গেলো না—এমনকী দরজার গায়ে পর্যন্ত নেই। তাহ'লে পকেট ছুরি দিয়ে একটা গর্ত-টর্ত করার চেষ্টা করা উচিত—ওই গর্ত দিয়েই পালাতে হবে আর-কি। তবে এই দেয়ালে ছুরির মতো কোনো পলকা জিনিশ, কতটুকু কাজে লাগবে, কে জানে !

'কিন্তু ওই একটানা ফর্‌র্‌র্‌ আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে।' এতক্ষণ একটানা ওই ফর্‌র্‌র্‌ আওয়াজ শুনে ফিল ইভানস সত্যি বেশ বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছিলেন।

'হাওয়ার শব্দ নিশ্চয়ই।' প্রুডেণ্ট জানালেন।

'হাওয়ার ? কিন্তু রাতটা বেশ শান্ত ব'লেই তো ঠেকছিলো।'

'শান্তই ছিলো। কিন্তু হাওয়ার না-হ'লে এটা আর কীসের শব্দ হ'তে পারে ?'

ফিল ইভানস তাঁর অনেকগুলো ফলাওলা মার্কিন ছুরির সেরা ফলাটি খুলে বাগিয়ে ধরলেন। দরজার কাছে দেয়ালে চিড় আছে, সেটা আবিষ্কার করার জন্যে অতঃপর তিনি অত্যন্ত উদগ্রীব হ'য়ে উঠলেন। যদি দরজার গায়ে একটা গর্ত করা যায় তাহ'লে ওখান দিয়ে হাত গলিয়ে বাইরে থেকে ছিটকিনিটা তোলবার চেষ্টা করা যেতে পারে—কিংবা যদি দেয়ালতালায় চাবিটা লাগানো থাকে, তাহ'লেও হাত গলিয়ে দরজাটা খোলা যেতে পারে এই উপায়ে।

কয়েক মিনিট ধ'রে ছুরিটা বাগিয়ে ধ'রে নিঃশব্দে কাজ ক'রে গেলেন ইভানস। এবং ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ছুরির ফলাটা ভোঁতা হয়ে গেলো, ডগাটা গেলো ভেঙে—এবং চকচকে ইস্পাতের ফলাটি রূপান্তরিত হ'লো সামান্য ও সাধারণ একটি ফালিতে।

'কাটছে না ?' জিগেস করলেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট।

'না।'

'দেয়ালটা কি ইস্পাতের চাদরে তৈরি না কি ?'

'না তো। ছুরি দিয়ে ঠুকবার সময় কোনো ধাতব আওয়াজ তো শুনিনি !'

'তাহ'লে কি কাঠের তৈরি ?'

'না—লোহারও নয়, কাঠেরও নয়।'

'তাহ'লে কীসের তৈরি, শুনি ।'

'বলা শক্ত । কিন্তু এটা ঠিক যে ইস্পাত এর গায়ে কোনো আঁচড় কাটতে পারে না ।'

হঠাৎ আঙ্কল প্রুডেন্টের যাবতীয় রোষ প্রবল পদাঘাতের আকারে সেই হালকা অথচ শক্ত দেয়ালের উপর গিয়ে পড়লো । সেই সঙ্গে দু-হাত বাড়িয়ে হাওয়ার মধ্যেই তিনি চেষ্টা করলেন কাল্পনিক রবয়ুর টুটি টিপে ধরতে ।

'শান্ত হও, প্রুডেন্ট, মাথা গরম কোরো না । বরং নিজেই তুমি চেষ্টা ক'রে দ্যাখো একবার ।'

প্রুডেন্ট চেষ্টা ক'রে দেখলেন, কিন্তু সেই বহু ফলাওলা ছুরিকাটির সেরা ফলাগুলো পর্যন্ত ভোঁতা হ'য়ে গেলো—তবু সেই দেয়ালে একটা আঁচড়ও পড়লো না । দেয়ালটা যেন কেলাস দিয়ে গড়া—স্ফটিকের মতোই কঠিন মসৃণ ও শক্ত ।

কাজেই একটু পরেই এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো যে দরজার পাল্লা না-খুলতে পারলে পলায়নের যাবতীয় চেষ্টাই ব্যর্থ হ'তে বাধ্য । এবং দরজাটি খোলবার উপায় যেহেতু তাঁদের জানা নেই, সেইজন্যেই আপাতত ভবিতব্যের হাতে নিজেদের সমর্পণ ক'রে দেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই । ইয়াঙ্কি মনোভঙ্গিমার পক্ষে এভাবে হাল ছেড়ে দেয়াটা মোটেই কোনো আরামপ্রদ অভিজ্ঞতা নয়—এবং উপরন্তু প্রুডেন্টদের মতো সুবুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান ও বিবেচনা সম্বল মানুষদের পক্ষে সেটা যথেষ্ট বিরক্তিকর ও বিশ্রী ব'লে ঠেকাটাই স্বাভাবিক । কিন্তু এই অবস্থায় না-পৌঁছে যেহেতু তখন কোনো উপায় ছিলো না, সেইজন্যে নানাবিধ গালভরা বাপ্বিধি রবয়ুর উদ্দেশ্যে হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়ে তাঁরা কিঞ্চিৎ শান্ত হলেন । ওয়েলডন ইনস্টিটিউটে রবয়ুর চামড়া যে-রকম পুরু ব'লে ঠেকেছিলো, তাতে অভিধান-ঘাঁটা এ-সব মস্ত আওয়াজে তার কিছু আসবে-যাবে ব'লে বোধ হ'লো না ।

হঠাৎ এমন সময় ফ্রাইকোলিন এমন-কতগুলো অস্বস্তিব্যঞ্জক ঘড়ঘড়ে আওয়াজ করতে-করতে ছটফট ক'রে উঠলো যে বোঝা গেলো সে আদৌ সুস্থ বোধ করছে না । পেটের ভিতর থেকে নাড়িভুড়ি উলটে আসতে চাচ্ছে যেন তার, কিংবা হাত-পাগুলোই ভিতরে সেঁধিয়ে যেতে চাচ্ছে । তার নানাবিধ কসরৎ ও ডিগবাজি দেখে আঙ্কল প্রুডেন্টের কর্তব্যবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো : তিনি তাকে বাঁধনমুক্ত ক'রে দিলেন । দিয়েই অবিশ্যি অনুতাপ করবার ইচ্ছে হ'লো তার, কারণ তক্ষুনি ফ্রাইকোলিনের হিজিবিজবিজ আওয়াজে তাঁর কান ঝালাপালা হ'য়ে গেলো : আতঙ্ক, বিভীষিকা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা—ইত্যাদি নানাবিধ অনুভূতির প্রকাশ পেলো ফ্রাইকোলিনের কণ্ঠনিঃসৃত প্রবল নির্ঘোষে । ফ্রাইকোলিনের মগজে-জঠরে কোনো তফাৎ নেই—অর্থাৎ মাত্রাগত বিচারে দুটোই সমান ; তার এই চ্যাঁচামেচির জন্যে আসলে যে কে দায়ী, তার মাথা, না তার উদর—তা বোঝা খুবই মুশকিলের ব্যাপার ।

'ফ্রাইকোলিন !' আঙ্কল প্রুডেন্ট একটা বাজখাঁই নিনাদ ছাড়লেন ।

'আঙ্কল—কর্তামশাই ! আঙ্কল—কর্তামশাই,' গেলুম গেলুম ধ্বনির মধ্যে এই দুটি সম্বোধন উৎসর্গ ক'রে দিলে ফ্রাইকোলিন ।

'শোনো, ফ্রাইকোলিন । এখানে বন্দী অবস্থায় আমরা যে না-খেয়ে ম'রে যেতে পারি, সে-সম্ভাবনাটা আমি মোটেই অস্বীকার করি না । কিন্তু আমরা যতক্ষণ সম্ভব বেঁচে থাকার

চেষ্টা করতে ছাড়বো না কখনও ।'

'কী খাবেন ? আমাকে ?' ফ্রাইকোলিন আবার আর্তনাদ ক'রে উঠলো ।

'এ-অবস্থায় সেটাই যদি সমীচীন বোধ হয়, তাহ'লে তা-ই করবো । তাই ও-রকম আওয়াজ ক'রে নিজেকে তুমি অতটা জাহির কোরো না ।'

'করলে, শেষটায় তোমার হাড়গোড়ও বাকি থাকবে না,' যোগ ক'রে দিলেন ইভানস ।

অবস্থাটা এতদূর বিমর্ষ ও শোচনীয় দেখে ফ্রাইকোলিন তৎক্ষণাৎ খপ ক'রে তার যাবতীয় আর্তনাদ গিলে ফেললে । এর পরে কেবল নিঃশব্দে গুমরোনো ছাড়া আর-কিছুই তার করণীয় থাকলো না ।

এদিকে সময় অবিশ্যি ব'সে থাকছে না, কেটেই চলেছে । দরজা খোলার কি দেয়াল ভাঙার সব চেষ্টাও এক-এক ক'রে নিষ্ফল প্রমাণিত হ'লো । দেয়ালটা যে কীসের তৈরি, সেটাই ঠিক ক'রে বোঝা যাচ্ছে না । কোনো ধাতুর পাতের নয় সেটা স্পষ্ট ; কাঠেরও নয় ; নয় পাথরের কিংবা কংক্রিটের । মনে হচ্ছে কোনো-একটা বিশেষ ধরনের কোষওলা পাত দিয়ে তৈরি দেয়ালটা । মেঝেয় লাথি মারতে অদ্ভুত আওয়াজ হ'লো একরকম, সে-আওয়াজটাকে বর্ণনা করার কোনো ভাষাই খুঁজে পেলেন না প্রুডেন্ট । মেঝেটা কি-রকম যেন ফাঁপা ঠেকলো, মনে হ'লো যেন মাটির উপরে নেই আর সেটা । আর সেই দুর্বোধ্য ফর্‌র্‌র্‌ প্রহেলিকাটি তার নিচেই সবকিছু ঝেঁটিয়ে সাফ ক'রে দিচ্ছে যেন । সব দেখে-শুনে এখন কি-রকম যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো ।

'আঙ্কল প্রুডেন্ট,' ফিল ইভানস ডাক দিলেন ।

'বলো,' এর মধ্যেই তাঁরা পরস্পরকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছেন ।

'তোমার কি মনে হয় আমাদের এই জেলখানাটা কখনো একবারেও সচল হ'য়ে উঠেছিলো ।'

'হ'য়ে থাকলেও টের পাইনি ।'

'আমাদের যখন ষণ্ডামার্কা লোকগুলো এ-ঘরে এনে পুরে দেয়, তখন দিব্যি গাছপালার টাটকা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিলো । কিন্তু এখন একবার হাওয়া শুঁকে দেখলুম সেই গন্ধটা আর নেই ।'

'সেটা তো আমিও খেয়াল করেছি ।'

'আমাদের এই জেলখানাটা স্থানান্তরিত করা হয়েছে, এটা ঠিক ক'রে জানার আগে পর্যন্ত এই "কেন"-র উত্তর আমরা দিতে পারবো না—কারণ কোনো নৌকোয় গেলেও আমরা টের পেতুম, কিংবা কোনো বড়ো রাস্তা দিয়ে গেলেও টের পাওয়া যেতো ।'

এখানটায় ফ্রাইকোলিনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার গলা দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো । আসলে একটা নয়, অনেকগুলো—কিন্তু প্রথমটা শুনে মনে হচ্ছিলো এটা বুঝি তার খাবি খাবার আওয়াজ—পরে অবিশ্যি আরো গোঙানি শুনে একটু আশ্বস্ত হওয়া গেলো ।

'মনে হচ্ছে শিগগিরই আমাদের রবয়ুর কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করা হবে,' বললেন ফিল ইভানস ।

'তা-ই হবে আশা করি ।' বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট, 'হতচ্ছাড়াকে একবার সামনে পেলে বলবো যে—'

'কী ?'

'বলবো যে লোকটার শুরু অভদ্রতায়, আর শেষ পুরোপুরি অসহ্য হ'য়ে-ওঠায় ।'

এখানে ফিল ইভানস লক্ষ করলেন আস্তে-আস্তে সকাল হ'য়ে আসছে। ঘুলঘুলি দিয়ে একটা ক্ষীণ স্বচ্ছ আলো এসে পড়ছে ঘরের মধ্যে । ভোর চারটে হবে বোধহয় । কারণ জুন মাসে চারটে নাগাদ ভোর হয় ফিলাডেলফিয়ায় ।

কিন্তু এমন সময় আঙ্কল প্রুডেন্টের এলারামের ঘড়ি—বন্ধুর কারখানার এই ঘড়িটা নিখুঁত সময় দেয় ব'লে সঙ্গে-সঙ্গেই রাখেন প্রুডেন্ট—ক্রিং ক্রিং ক'রে বেজে উঠে জানালো মাত্র পৌনে তিনটে বাজে ।

'ভারি আশ্চর্য তো !' ঘড়ি দেখে ফিল ইভানস বললেন, 'পৌনে তিনটেয় তো অনেক রাত !'

'নিশ্চয়ই ঘড়িটা ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো—কিংবা কোনো কারণে মন্থর চালে চলছে ।'

'হুইলটন ঘড়ি কম্পানির ঘড়ি স্লো যাচ্ছে !' ফিল ইভানসের গলায় রাজ্যের বিস্ময় জড়ো হ'লো ।

কিন্তু ঘড়ি যা-ই বলুক না কেন, সকাল যে হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ রইলো না। অল্পক্ষণেই ছোট্ট ঘুলঘুলিটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো—কামরার মধ্যে অন্ধকার ছিলো ব'লেই উজ্জ্বল দেখালো সেটা ।

'জানলাটার কাছে উঠে একবার দেখা যায় না আমরা কোথায় আছি ?'

'যায় বোধহয় ।' বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট । 'ফ্রাইকোলিন,' হাঁক পাড়লেন তিনি, 'উঠে দাঁড়াও ।'

বেচারা-বেচারা মুখ ক'রে ফ্রাইকোলিন দাঁড়ালো ।

'দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াও,' প্রুডেন্ট নির্দেশ দিলেন, 'ইভানস, তুমি ওর কাঁধে উঠে দাঁড়াও—যাতে প'ড়ে না-যাও সেইজন্যে আমি ফ্রাইকোলিনকে চেপে ধ'রে থাকবো ।'

তড়াক ক'রে ইভানস তক্ষুনি ফ্রাইকোলিনের কাঁধে ভর দিয়ে জানলা সমান উঁচু হ'য়ে দাঁড়ালেন । জানলাটা আদৌ কোনো জাহাজের জানলার মতো নয়—সাধারণ একটা মসৃণ ও সমতল কাচ লাগানো, আকারে ছোট্ট—এত ছোট্ট যে ফিল ইভানসের দৃষ্টি বেশিদূর পৌঁছুলো না ।

'কাচটা ভেঙে ফ্যালো,' প্রুডেন্ট পরামর্শ দিলেন, 'তাহ'লে মাথা গলিয়ে দিয়ে অনেক দূর দেখতে পাবে ।'

ফিল ইভানস ছুরিটা দিয়ে কাচটা ভাঙবার চেষ্টা করলেন ; একটা ঝনঝনে আওয়াজ হ'লো বটে, কিন্তু কাচটা আদৌ ভাঙলো না। আরো জোরে আরেকটা আঘাত করলেন ইভানস, কিন্তু ফল হ'লো পূর্ব্ববৎ ।

'এ-যে দেখছি অভঙ্গুর কাচ !' ইভানস ব'লে উঠলেন ।

কাচটি যে সীমেন্স পদ্ধতিতে প্রস্তুত, তা বার-বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভাঙলো না দেখে বোঝা গেলো ।

ততক্ষণে আরো আলো হয়েছে । ঘুলঘুলির ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে খানিক

দূর দেখে নিলেন ইভানস ।

'কী দেখতে পাচ্ছো ?' আঙ্কল প্রুডেন্ট জিগেস করলেন ।

'কিচ্ছু না ।'

'মানে ? গাছপালা নেই ?'

'না ।'

'একটাও না ? উঁচু ডালগুলো দেখা যাচ্ছে ?'

'উঁহু !'

'তাহ'লে আমরা ফেয়ারমাউন্ট পার্কের চৌহদ্দির মধ্যেই নেই ।'

'তাই তো মনে হচ্ছে ।'

'কোনো বাড়ির গম্বুজ দেখা যাচ্ছে ? কোনো মনুমেন্ট ?'

'উঁহু ।'

'কী ! গির্জের চুড়ো কি চিমনির নল ?'

'কিচ্ছু না—কেবল আকাশ, আর-কিছু না ।'

কথাগুলো শেষ হবার আগেই ঘরের দরজা খুলে গেলো । চৌকাঠের কাছে কে-একজন এসে দাঁড়িয়েছে । হ্যাঁ, রবয়ুই বটে !

'শ্রদ্ধেয় বেলুনবাজগণ !' রবয়ুর গলা বেশ গম্ভীর শোনালো, 'আপনারা এখন মুক্ত— ইচ্ছে মতো চলাফেরা করতে পারেন এখন ।'

'মুক্ত !'

'হ্যাঁ—অবিশ্যি *অ্যালবাট্রস*-এর চৌহদ্দির মধ্যে ।'

আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভানস সবেগে তাঁদের বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে এলেন । কিন্তু কী দেখলেন বেরিয়ে এসে ?

দেখলেন, তাঁদের থেকে চার হাজার ফিট নিচে শতরঞ্চের ছকের মতো কী-একটা অচেনা দেশ প'ড়ে আছে ; —কোন দেশ, সেটা অনেক চেষ্টা ক'রেও চেনা গেলো না ।

৬

অ্যালবাট্রস-এর পিঠে

'কবে যে লোকে মাটিতে হামাগুড়ি না-দিয়ে আকাশের নীলিমায় বাঁচতে শিখবে ?'

কামিল ফ্লামারিয়ঁর এই প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু মোটেই শক্ত নয় । যেদিন লোকে কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী হ'য়ে বিমান বানাতে পারবে, সেই দিনই এই নীল অন্তরীক্ষ তার আপন হ'য়ে উঠবে । বিদ্যুৎশক্তি যেদিন মানুষের আয়ত্তে এসেছে, তার পর থেকে সবই সম্ভাবনার এপারে—কেবল সময় লাগবে কথঞ্চিৎ ।

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে মোঁৎগোলফিয়ের ভ্রাতারা তাঁদের বেলুন ওড়াবার আগে, এবং

চিকিৎসক শার্ল প্রথম 'বিমান' বা 'এয়ারোস্টাট' তৈরি করার আগে, কয়েকজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী যান্ত্রিক উপায়ে আকাশ-বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন । প্রথম অভিযাত্রীরা কখনও তাঁদের বিমানকে হাওয়ার চেয়েও হালকা করার কথা ভাবেননি—তৎকালে বিজ্ঞান এতটা উন্নত ছিলো না যে তাঁদের পক্ষে এ-কথাটা ভাবা সম্ভব হ'তো । তাঁরা বরং পক্ষীকুলকে অনুকরণ করার চেষ্টাই করেছিলেন, ভেবেছিলেন পাখিদের মতো ডানা থাকলেই বুঝি আকাশ জয় ক'রে নেয়া যাবে । এটাই ভেবেছিলেন ডেডেলাসের খ্যাপা ছেলে ইকারুস—মোমের পাখনা কাঁধে লাগিয়ে আকাশে উড়েছিলেন ইকারুস, তারপর রোদ লেগে মোম গ'লে যেতেই প'ড়ে মরতে হয়েছিলো তাঁকে ।

কিন্তু সেই কিংবদন্তির যুগে ফিরে না-গিয়ে, কিংবা টারেনটুমের আর্কিটাসের কথা উত্থাপন না-ক'রেই, পেরুগিয়ার দান্তে এবং লেওনার্দো দা ভিঞ্চি আর জিদোত্তির রচনাবলিতে গগনবিহারী শকটের কল্পনা দেখতে পারি আমরা । তারও আড়াইশো বছর পর থেকে—অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি—দেখতে পাই একযোগে আরো বহু অভিযাত্রী আকাশে ওড়বার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন । ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে বাকেভিইয়ের মার্কি একজোড়া ডানা কাঁধে লাগিয়ে শেন নদীর উপরে ওড়াবার চেষ্টা করেছিলেন—শেষটায় প'ড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে দ হ'য়ে গিয়েছিলেন । ১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে পোক্তোঁ দুই চাকাওলা একটি বিমানের পরিকল্পনা করেছিলেন । ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে লোনয় আর বিলভেনু স্প্রিংওলা হেলিকপ্টারের কথা ভাবলেন । ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার জাক দেগেঁ ওড়বার চেষ্টা করলেন আকাশে । ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে এলেন কসুস তাঁর ঊর্ধ্বচালক চাকা নিয়ে । ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ফামিল ভেব্ ডানাওলা হেলিকপ্টার বানালেন, আর মিশেল লু আকাশে ভেসে-থাকার একটা উপায় বার করলেন । ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত জোসেফ প্লাইন একের পর এক পরীক্ষানিরীক্ষার অবতারণা করলেন । তারপর থেকে এ-যাবৎ যে কতজন কতরকম গবেষণা করেছেন, তার কোনো লেখাজোখা নেই । কিন্তু ইকারুসের এইসব চেলারা কেউই আকাশে ওড়বার কোনো বিমান তৈরি করতে পারেননি—শেষটায় তৈরি করলে কিনা এই রবয়ু !

ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সচিব মশাই বন্দীশালা থেকে ছুটে এসে ডেকে দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়েই কি-রকম যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন । তাঁরা কিনা এখন বেলুন ওড়াবার গবেষণা করছেন, যে-কালে এই রবয়ু একেবারে আকাশযান বানিয়ে দলবল সমেত নীলাকাশে উড্ডীন !

জাহাজের ডেকের মতো মস্ত একটা পাটাতনের উপর অনেকগুলো হালকা কিন্তু শক্ত থাম উঠে গেছে, খুঁটিগুলোর গায়ে অসংখ্য তার লাগানো, আর খুঁটির মাথায় বনবন ক'রে ঘুরছে অনেকগুলো প্রপেলার । মাথার উপর স্বচ্ছ নীল মহাশূন্য, নিচে শতরঞ্চের ছকের মতো অচেনা গ্রামনগর, জলস্রোত ।

ভ্যাবাচাকা বেলুননির্মাতাদের অবস্থা দেখে রবয়ুর মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো, কিন্তু একটু পরেই অত্যন্ত সহজভাবে সে তার আকাশযানের যাবতীয় তথ্য বিশদ ক'রে উদঘাটিত করলে তাঁদের কাছে । তার বোঝাবার ভঙ্গি দেখে ও কথাবার্তা শুনে বোঝা গেলো যে আস্ত আকাশযানটাই তার হাতে আমলকীর মতো ।

সেই মস্ত পাটাতনটির উপর রয়েছে নানা ধরনের কামরা আর খুপরি, মাস্তুলসমান উঁচু

সাঁইত্রিশটি খুঁটি । প্রত্যেকটা খুঁটির উপর অনুভূমিক অবস্থায় লাগানো একজোড়া ক'রে প্রপেলার—এই চাকা ঘুরেই হাওয়া কেটে উড়িয়ে নিয়ে যায় যানটিকে—উপরে-নিচে সাজানো এই সাঁইত্রিশ জোড়া ঘূর্ণ্যমান চাকার বেগে অত বড়ো একটা ভারি দেহ নিয়ে এই বিমান আকাশে উঠে পড়ে—আর সামনে ও পিছনে জুড়ে দেয়া অতিকায় দুটো চাকা তারপর ঠেলে চালিয়ে নিয়ে যায় বিমানটিকে । দিক নিয়ন্ত্রণের জন্যে জাহাজের মতো একটা হাল আছে নিচের দিকে । আসলে এটা যেন মস্ত একটা জাহাজই, তেমনি লম্বা আর চওড়া, পাটাতনটাও তেমনি বেশ প্রশস্ত ও রেলিঙ ঘেরা—কেবল জলের উপর দিয়ে না-গিয়ে এটা উড়ে যায় তিনশূন্যে । তাছাড়া মাস্তুলের সংখ্যাও অনেক বেশি—সাঁইত্রিশ ; আর পালের বদলে মাস্তুলে চাকা লাগানো—আর যেখানে গলুই, সেখানে হালের বদলে ঘুরছে অতিকায় আরো দুটি চাকা ।

কী সেই কঠিন জিনিশ, যা দিয়ে তৈরি এই আকাশযান, যার গায়ে এমনকী তীক্ষ্ণধার ছুরিকাও কোনো আঁচড় কাটতে পারে না ? তা আর-কিছু নয়—শুধু কাগজ !

কাগজ ?! হ্যাঁ, কাগজই ! কয়েক বছর ধ'রে কাগজের বুনোট ক্রমশ উন্নত হ'য়ে উঠছে । একের পর এক কাগজের তা ডেক্সট্রিন আর মণ্ড দিয়ে জুড়ে তাকে ঔদক বা হাইড্রলিক চাপের মধ্যে ফেললে ক্রমে তা ইস্পাতের মতো কঠিন হ'য়ে ওঠে । একই সঙ্গে হালকা অথচ নিরেট কঠিন এই বস্তুটি দিয়েই রবয়ু তার আকাশযান গ'ড়ে তুলেছে । সবকিছু এই কাগজ দিয়েই তৈরি—কাঠামোটা, হাল, কামরাগুলো, খুপরিগুলো—সবই এই প্রবল চাপ দিয়ে তৈরি কাগজে বানানো, যার আরেকটা গুণ—কঠিন ও হালকা ছাড়া—অদাহ্যতা, যেটা এই উড্ডীন শকটের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি । এঞ্জিন এবং স্ক্রুগুলো জিলাটিনের কোষ দিয়ে তৈরি ; রবয়ুর বিমানের বিদ্যুৎশক্তি নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে এটাও খুব আবশ্যিক ।

আর, রবয়ু, সেই বিশাল সামুদ্রিক পাখিকে স্মরণ ক'রে, তার বিমানের নাম দিয়েছে *অ্যালবাট্রস,* যে 'জাহাজের সহযাত্রী, সঙ্গদাতা, পথের বান্ধব' । রবয়ু, তার বন্ধু ও সহকারী টম টারনার, একজন এঞ্জিনিয়ার ও তার দুজন সহকারী, দুটি সারেঙ ও একটি রাঁধুনি—এই আটজনই হ'লো *অ্যালবাট্রসের* যাত্রী । প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে *অ্যালবাট্রসে,* শিকার করার জন্যে বন্দুক আছে, যুদ্ধের জন্যেও রাইফেল ইত্যাদি ; আছে মাছ ধরার সরঞ্জাম, বিজলি মশাল, পর্যবেক্ষণের পক্ষে জরুরি নানা যন্ত্রপাতি, কম্পাস ওরফে দিগ্দর্শক, সেক্সটান্ট, থারমোমিটার, নানা ধরনের ব্যারোমিটার, ঝড় হবে কিনা বোঝবার জন্যে রয়েছে স্টর্মগ্লাস ; তাছাড়া রয়েছে ছোট্ট একটা লাইব্রেরি, ছোটোখাটো একটি মুদ্রাযন্ত্র, ছোট্ট একটি কামান ও তার তিন ইঞ্চি লম্বা চুরুটের আকারের গোলাবারুদ, ডিনামাইট, বৈদ্যুতিক চুল্লি, কয়েক মাসের উপযোগী খাদ্যবস্তু—আর রয়েছে সেই শিঙাটি, যার আওয়াজে গোটা পৃথিবীতে এক সময় হুলুস্থুল প'ড়ে গিয়েছিলো ।

এছাড়া রয়েছে হালকা একটি ইণ্ডিয়া-রবারে তৈরি নৌকো, যেটায় ক'রে অন্তত আটজন লোকে সমুদ্রে ভেসে যেতে পারে ।

কিন্তু দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে কোনো প্যারাসুট নেই ? না । রবয়ু ও-সব কোনো দুর্ঘটনায় বিশ্বাস করে না । দু-একটা স্ক্রু কোনো কারণে বিকল হ'য়ে গেলেও অন্যগুলোর সাহায্যে *অ্যালবাট্রস* সহজেই ভেসে থাকতে পারবে ।

'এবং *অ্যালবাট্রস* আছে ব'লে,' অনিচ্ছুক অতিথিদের দিকে তাকিয়ে রবয়ু বললে,

'আমি জগতের সপ্তম মহাদেশের অধীশ্বর—যেটা আফ্রিকা, ওশিয়ানিয়া, এশিয়া, আমেরিকা ও ইওরোপের চেয়েও অনেক বড়ো—যাকে বলা যায় নভোলোক, ইকারুসের সমুদ্র—যেখানে একদিন কোটি-কোটি ইকারিয়ান নতুন বসতি স্থাপন করবে ।'

৭

ইকারুসের চেলা

ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতিমশাই ততক্ষণে হতচকিত ও স্তম্ভিত ; সচিবমহোদয়ও তথৈবচ । আর ফ্রাইকোলিনের চোখ তো ততক্ষণে কপালে উঠে গেছে । কিন্তু আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভানস প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে নিজেদের বিস্ময় চেপে রাখার চেষ্টা করলেন ; ভৃত্য ফ্রাইকোলিনের পক্ষে যেটা মোটেই সহজ হ'লো না—নিজেকে আকাশে আবিষ্কার ক'রে তার আতঙ্ক এমন-একটি অতিকায় আকার ধারণ করলে, যেটা চেপে-রাখার ব্যর্থ চেষ্টা সে কিছুই করলে না ।

যে-স্ক্রুগুলো *অ্যালবাট্রসকে* শূন্যে ভাসিয়ে রাখে, তারা লাট্টুর মতো ঘুরে যাচ্ছে মাথার উপরে । ঘণ্টায় প্রায় একশো মাইল গতি *অ্যালবাট্রসের*, সামনে-পিছনে প্রপেলার দুটি অনায়াসে এই বেগে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিমানটিকে ।

রেলিঙের উপর ঝুঁকে নিচে তাকিয়ে যাত্রীরা দেখলেন নিচে সরু আঁকাবাঁকা রুপোলি ফিতের মতো জলধারা ব'য়ে যাচ্ছে, গাছপালায় ভরা অথবা তৃণময় ভূমি কখনো চোখে পড়ে, কখনো-বা আরো বৈচিত্র্যময় হ'য়ে ওঠে । রোদ প'ড়ে মাঝে-মাঝে ঝিলের জল ঝিকিয়ে উঠছে । জলস্রোতের গা ঘেঁষে বামতীর ধ'রে গেছে সারি-বাঁধা শ্যামল পাহাড়, শেষটায় দূরে সেই পাহাড় ছোটো হ'তে-হ'তে চ'লে যাচ্ছে দৃষ্টির বাইরে ।

'এ আমরা কোথায় এসেছি ?' আঙ্কল প্রুডেন্টের জিজ্ঞাসা রাগে কেঁপে গেলো ।

'আপনাদের কিছুই বলার নেই?' রবয়ু উত্তর দিলে ।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা, অন্তত সেটা বলবেন কী ?' ফিল ইভানস জিগেস করলেন ।

'মহাশূন্য দিয়ে যাচ্ছি, এই আর-কি !'

'কতক্ষণ ধ'রে যাবো ?'

'যতক্ষণ-না শূন্য শেষ হ'য়ে যায় ।'

'সারা পৃথিবী ঘুরে আসছি না কি ?'

'তারও দূরে চ'লে যেতে পারি ।'

'যদি আমরা এই অভিযানে যেতে রাজি না-হই ?'

'রাজি না-হ'য়ে উপায় কী !'

অ্যালবাট্রসের কাপ্তেন ও তাঁর অতিথিদের মধ্যে কথাবার্তার নমুনাটা দেখেই পরস্পরের সম্বন্ধসূত্রটা বুঝে-ফেলা যায় । আসলে রবয়ু তাঁদের সময় দিতে চাচ্ছিলো, যাতে রাগ প'ড়ে

আসে, এবং তাঁরা তার আবিষ্কারের মহিমা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যান। বিমান আবিষ্কারের গৌরব সে-ই সত্যি দাবি করতে পারে। এইজন্যেই সে ডেকের অন্যপ্রান্তে চ'লে গেলো তাঁদের ওখানে ফেলে রেখে, যাতে যাত্রীরা আস্তে-আস্তে শান্ত হ'য়ে এই আশ্চর্য আবিষ্কারের মহিমা উপলব্ধি করেন।

'আঙ্কল প্রুডেন্ট,' ইভানস ব'লে উঠলেন, 'যদি ভুল না-হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আমরা যে মধ্য-ক্যানাডার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি, তাতে আর সন্দেহ নেই। উত্তর-পশ্চিমের ওই নদীটা হ'লো সেন্ট লরেন্স নদী। যে-শহরটা পিছনে ফেলে এসেছি, সেটা নিশ্চয়ই ক্যেবেক সিটি।'

শহরটা সত্যিই ক্যেবেক সিটি; তার দস্তায় গড়া ছাতগুলো সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে প্রতিফলকের মতো। *অ্যালবাট্রস* নিশ্চয়ই ছেচল্লিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে পৌঁছে গেছে এর মধ্যে, আর তাতেই বোঝা যায় সকালটা কেন এত তাড়াতাড়ি হ'লো—আর কেনই বা তার স্থায়িত্ব এত বিলম্বিত।

'ঠিকই—ক্যেবেকই বটে,' ফিল ইভানস বললেন, 'উত্তর আমেরিকার জিবরলটার বলা যায় একে। ওই-যে ক্যাথিড্রালগুলো। শুল্ক বিভাগের বাড়িটার গম্বুজে ব্রিটিশ পতাকা উড়ছে!'

কথা শেষ হবার আগেই কিন্তু ক্যানাডার এই শহরটি দিগন্তে মিলিয়ে গেলো। বিমানের নিচে হালকা মেঘ উড়ে যাচ্ছে—আর মেঘের পর্দায় ঢাকা প'ড়ে নিচে মাটির জগৎ দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলো।

রবয়ু যখন দেখলে যে ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের কর্তাব্যক্তি দুজন *অ্যালবাট্রসের* সব যন্ত্রপাতির দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছেন, তখন আবার তাঁদের কাছে এগিয়ে এলো। 'কী? এবার বাতাসের চেয়ে ভারি বিমানের সম্ভাবনাটা স্বীকার করছেন তো?'

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখে বিশ্বাস না-করার জো কী। কিন্তু আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভানস এ-প্রশ্নের কোনো উত্তরই দিলেন না।

'কী? চুপ ক'রে আছেন যে? খিদেয় কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে বুঝি? তাহ'লে চলুন, খাবার ঘরে আপনাদের জন্যে ছোটোহাজরি অপেক্ষা করছে।'

খিদের চোটে পেটের মধ্যে যেহেতু পাক দিচ্ছিলো, সেইজন্যে প্রুডেন্ট ও ইভানসকে আর বিশেষ সাধতে হ'লো না। এই লোকটার খাদ্য গলাধঃকরণ করলেই তো আর তার দাসানুদাস হ'য়ে পড়বেন না—পরে রবয়ু যখন তাঁদের মাটির পৃথিবীতে পুনর্বার নামতে দেবে, তখন হতভাগাকে একবার দেখে নেবেন—বুঝিয়ে দেবেন কাকে বলে সাজা দেয়া।

ফলে রবয়ুকে অনুসরণ ক'রে তাঁরা খাবার ঘরে গিয়ে হাজির হলেন, দেখলেন টেবিলে তাঁদের জন্য রুটি, মাংস, সুরুয়া আর গরম চা অপেক্ষা করছে। ফ্রাইকোলিনের কথাও অবিশ্যি বিস্মৃত হয়নি কেউ। এবং ফ্রাইকোলিন কিঞ্চিৎ রুটিমাংস চিবিয়েই ভয়ে আধমরা হ'য়ে পড়লো: 'যদি *অ্যালবাট্রস* ভেঙে পড়ে! ভাবো একবার! চার হাজার ফিট উপরে! অত উঁচু থেকে পড়লে তো একেবারে জেলি হ'য়ে যাবে, তালগোল পাকিয়ে।'

ঘণ্টাখানেক পরে ছোটোহাজরিটা বৃহৎ রকমেই সেরে আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভানস আবার ডেকে গিয়ে দাঁড়ালেন। রবয়ু তখন আর ডেকে নেই। কেবল একটা কাচের ঘরে ব'সে একটি লোক কম্পাস দেখে *অ্যালবাট্রসকে* চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যরা হয়তো তখনও

যে-যার ছোটোহাজরি সারছে। কেবল টম টারনার যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা পরখ ক'রে দেখছে।

অ্যালবাট্রস যে কত জোরে চলেছে, তা ঠিক বুঝতে পারেননি প্রুডেণ্টরা। হালকা মেঘের মধ্যে থেকে বিমান তক্ষণে আবার স্বচ্ছ-নীল আকাশে ভেসে যাচ্ছে—আর চার হাজার ফিট নিচে ফিতের মতো খুলে-খুলে যাচ্ছে খেলনার মতো ছোট্ট মানুষের জগৎ।

'এ কী! এ-যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!'

'বিশ্বাস কোরো না তাহ'লে।' ব'লে আঙ্কল প্রুডেণ্ট গলুইয়ের কাছে গিয়ে পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকালেন।

'এ-যে আরেকটা শহর,' বললেন ফিল ইভানস।

'চিনতে পেরেছো তুমি?'

'হ্যাঁ। মণ্টরিয়ল ব'লে মনে হচ্ছে শহরটাকে।'

'মণ্টরিয়ল! কিন্তু আমরা তো মাত্র খানিকক্ষণ আগে ক্যেবেক সিটি ছাড়িয়ে এলুম!'

'তাতে বোঝা যাচ্ছে আমরা প্রায় পঁচাত্তর মাইল বেগে চলেছি।'

সত্যি, ঘণ্টায় পঁচাত্তর মাইল বেগেই যাচ্ছে *অ্যালবাট্রস*, কেননা ফিল ইভানস নিচের শহরটাকে চিনতে মোটেই ভুল করেননি। ক্যানাডা ফিল ইভানসে নখর্পণে—সেই জন্যেই জায়গার নামগুলো জানবার জন্যে রবয়ুকে জিগেস করতে হচ্ছে না।

একটু পরেই মণ্টরিয়লও দিগন্তে মিলিয়ে গেলো—চোখের সামনে উন্মোচিত হ'য়ে গেলো নতুন প্রান্তর, বন, জনপদ। আর ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের কর্তাব্যক্তিরা মুগ্ধ, বিস্মিত ও চকিত চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কেমন ক'রে ছোটো-ছোটো ফুটকির মতো একেকটা নগর-গ্রাম পেরিয়ে চ'লে যাচ্ছে *অ্যালবাট্রস*—বাতাসের চেয়েও ভারি সেই আকাশযান, যা তাঁদের সমস্ত চিন্তাভাবনা ও থিয়োরিকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মেঘের মধ্য দিয়ে।

রবয়ুর দেখা পাওয়া গেলো ঘণ্টা দু-এক পরে। সঙ্গে তার বন্ধু সহকারী ও সচিব টম টারনার। এসে সে তিনটি শব্দে কী একটা নির্দেশ দিলে—অমনি সেই নির্দেশ অনুযায়ী সারেঙ *অ্যালবাট্রসকে* কিঞ্চিৎ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক অভিমুখে চালিত করলে—উপরন্তু প্রুডেণ্ট ও ইভানস অনুভব করলেন প্রপেলারের ঘুরুনিও অনেক বেড়ে গেলো।

বস্তুত গতি দুনো হ'য়ে গেলো—যা এতকাল আকাশচারীদের কাছে ছিলো কল্পনাতীত ও অবিশ্বাস্য, *অ্যালবাট্রস* এবার সেই ঝোড়ো বেগে এগিয়ে চললো। সেকেণ্ডে ১৭৬ ফিট বা ঘণ্টায় প্রায় সোয়াশো মাইল বেগে চলতে লাগলো *অ্যালবাট্রস*—যে-বেগে কখনো হাওয়া গেলে গাছ উপড়ে যায়, টেলিগ্রাফের খুঁটি ভেঙে পড়ে, চারপাশে তাণ্ডব লাগে। এই গতিতে চললে আস্ত পৃথিবী ঘুরে আসতে *অ্যালবাট্রসের* দুশো ঘণ্টাও লাগবে না—আশি দিনের আগেই তার ভূ-প্রদক্ষিণ শেষ হ'য়ে যাবে। এতকাল এটা ছিলো সম্ভবপরতার পরপারে; ফিলিয়াস ফগ নামে একজন ইংরেজ একবার আশি দিনে আস্ত পৃথিবী ঘুরে এসে সারা জগতে হুলুস্থুল তুলেছিলেন, রবয়ু তার দশ ভাগের এক ভাগও সময় নেবে না, দেখা যাচ্ছে।

অবশ্য এই তথ্যটি আর বিশদভাবে বলারই অপেক্ষা রাখে না। কারণ যে-বিস্ময়কর সংগীতমূর্ছনায় সমগ্র জগৎ সচকিত হ'য়ে উঠেছিলো, সাত দিনের মধ্যে তার রেশ ছড়িয়ে

পড়েছিলো এশিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকাতে। যে-শিঙা বেজেছিলো, সেটা টম টারনারের। পাঁচ মহাদেশের প্রধান স্তম্ভগুলিতে যে-পতাকা উড়েছিলো কিছুদিন আগে, সেটা এই রবয়ুরই—যে যুগপৎ নিখিলেশ্বরো বা গগনেশ্বরো বা ব'লে নিজেকে দাবি করে।

এতদিন পর্যন্ত রবয়ু অত্যন্ত সাবধানে চালিয়েছে *অ্যালবাট্রসকে*। রাতের আঁধারে বিজলি মশালে পথ দেখে সে *অ্যালবাট্রসকে* চালিয়েছে এতকাল, দিনের বেলায় লুকিয়ে পড়েছে মেঘের আড়ালে—যাতে কেউ তাকে চিনতে না-পারে। কিন্তু এখন আর নিজেকে সে অমন আড়াল রাখতে চাচ্ছে না। চাচ্ছে না নিজের চারপাশে রহস্যের আবরণ গ'ড়ে রাখতে, আর চাচ্ছে না গোপনীয়তার নিরাপদ অন্তরাল। সে-যে ফিলাডেলফিয়ায় এসে ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভায় ভাষণ দিয়েছিলো, তাতেই কি বোঝা যাচ্ছে না যে সে এখন নিজের আবিষ্কারের জন্যে শিরোপা পেতে চায়, ধমকে বলতে চায় সন্দেহপ্রবণ মানুষদের 'চুপ করো আবিশ্বাসী!' কিন্তু নিজের আবিষ্কারের কথা বলতে গিয়ে কী ব্যবহার সে লাভ করেছিলো তা তো আমরা জানি—এবং আরো জানি সেইজন্যেই সে ইনস্টিটিউটের অবিশ্বাসী ও বিদ্রূপ-মুখর সভাপতি ও সচিবকে বন্দী ক'রে এনে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে *অ্যালবাট্রসের* ক্ষমতা। কিন্তু প্রুডেন্ট ও ইভানস তাঁদের হোয়াইট অ্যাংলো-স্যাকসন মাথার চারপাশে ঔদ্ধত্য ও একগুঁয়েমির মোটা খোল লাগিয়েছেন যেন— অন্তত তাঁদের মুখেচোখে বিস্ময়ের কোনো চিহ্ন না-দেখে তা-ই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রবয়ু একবারও তাকিয়েই দেখলে না এঁরা কীভাবে তাকে গ্রহণ করেছেন, বরং দু-ঘণ্টা আগে এঁদের সঙ্গে সে যে-আলোচনা শুরু করেছিলো কোনো ভণিতা না-ক'রে তারই সূত্র সে আবার তুলে নিলে।

'নিশ্চয়ই নিজেদের আপনারা জিগেস করছেন যে *অ্যালবাট্রস* যদিও আশ্চর্যভাবে আকাশে উড়ে যেতে পারে, তবু বেশি জোরে চলতে থাকলে তার কোনো ক্ষতি হয় কি না। কারণ কেবল আকাশে উড়তে পারাটাই যথেষ্ট নয়, যদি-না আমরা তাড়াতাড়ি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারি। আমি চাই হাওয়া যাতে আমার নিরেট সমর্থন হ'য়ে ওঠে—এবং সত্যি তা-ই হয়েছে এখন। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হ'লে আমাকে হাওয়ার চেয়ে শক্তিশালী হ'য়ে উঠতে হবে—এবং এখন আমি তা-ই। কোনো পাল খাটাইনি আমি, নেই দাঁড় কিংবা চাকা, কিংবা নেই রেলগাড়ির লৌহবর্মর্ত্ম—তাড়াতাড়ি যেতে হ'লে বাতাসকে জয় করতে হবে আমায়। ডুবোজাহাজের চারপাশে যেমন জল থাকে, তেমনি *অ্যালবাট্রসের* চারপাশে রয়েছে বাতাস—প্রপেলারগুলি ঠিক স্টিমারের চাকার মতো কাজ করে সেইজন্যে। আকাশে ওড়বার সমস্যাকে আমি জয় করেছি—এবং জয় করেছি এইভাবেই, বেলুনের বা বাতাসের চেয়েও হালকা কোনো বিমানের পক্ষে যেটা করা কোনো দিনই সম্ভব হবে না।'

আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভানস চুপ ক'রে রইলেন। এমনভাবে চুপ ক'রে রইলেন যে স্তব্ধতাটা কেমন অস্বস্তিকর ঠেকাতে লাগলো। শেষটায় রবয়ুই মুচকি হেসে আবার বলতে লাগলো, '*অ্যালবাট্রস* যখন শোয়ানো বা অনুভূমিকভাবে চলে তখন একটা খাড়া বা উল্লম্ব গতিও যোগ হ'য়ে যায় তার সঙ্গে। আপনারা হয়তো জিগেস করবেন এর সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় *গো-অ্যাহেড* এঁটে উঠতে পারবে কি না। আমি অবশ্য পরামর্শ দেবে

গো-অ্যাহেড কে তার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় না-নামাতে ।'

প্রুডেন্ট ও ইভানস কোনো কথা না-ব'লে কেবল একটু কাঁধ ঝাঁকালেন । কিন্তু রবয়ু বোধহয় কেবল এইটুকু সাড়ার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো । সে কী-একটা ইঙ্গিত করলে, তৎক্ষণাৎ প্রপেলারগুলো সব থেমে গেলো—এবং মাইল খানেক এগিয়ে গিয়ে *অ্যালবাট্রস* নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো । তারপর রবয়ুর আরেক ইঙ্গিতে সাঁইত্রিশটি খুঁটির ওপর চাকাগুলি এমন তীব্রবেগে বন-বন ক'রে ঘুরতে শুরু করলে যাকে কেবল শব্দতত্ত্বের গবেষণা ব'লেই অভিহিত করা যেতে পারে । হাওয়া যতই তনুভূত বা হালকা হ'তে লাগলো ততই কেবল একটা ফর্‌র্‌র্‌ আওয়াজ উত্থিত হ'তে লাগলো—যেন কোনো মস্তপাখি গুঞ্জন ক'রে উড়ে যাচ্ছে আকাশে ।

'হায় ! হায় !' ফ্রাইকোলিন চীৎকার ক'রে উঠলো, 'বুঝি ভেঙে গেলো—বুঝি প'ড়ে গেলাম চিৎপাত !'

উত্তরে রবয়ুর মুখে একটি তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠলো । কয়েক মিনিটের মধ্যেই অ্যালবাট্রস উঠে পড়লো ৮৭০০ ফিট, তাকালে আশপাশে চোখ যায় সত্তর মাইল পর্যন্ত তাপমাত্রা ক'মে গেলো ৪৮০ মিলিমিটার । তারপরেই *অ্যালবাট্রস* আবার নামতে শুরু করলো । আকাশের যত উঁচুতে সে উঠেছিলো, ততই হাওয়ার চাপ ক'মে যাচ্ছিলো, সেইসঙ্গে কমছিলো উদ্‌জান গ্যাসও, আর রক্তেও এই চাপের তারতম্য অনুভূত হচ্ছিলো । আগে বহুবার বহু বেলুনবাজ দুঃসাহসীকে এত উঁচুতে উঠে দুর্ঘটনায় পড়তে হয়েছে— কাজেই রবয়ু সে-দিক দিয়ে ঝুঁকি নেয়াটা খুব যুক্তিযুক্ত মনে করলে না । একটু পরেই *অ্যালবাট্রস* আবার আগের উচ্চতায় ফিরে এলো, আবার শুরু হ'লো তার প্রপেলারের ঘূর্ণন এবং আবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ভেসে চলতে লাগলো এই আশ্চর্য বিমানটি ।

'এবার বলুন, আপনাদের কী বক্তব্য । এটাই তো আপনারা জানতে চাচ্ছিলেন ।' এই ব'লে রেলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে কী যেন ভাবতে লাগলো । একটু পরে মাথা তুলে তাকিয়ে দ্যাখে তার দু-পাশে দাঁড়িয়ে ওয়েলডন ইস্টিটিউটের সভাপতি ও সচিব ।

'এঞ্জিনিয়ার রবয়ু,' কোনোরকমে নিজের রাগ ভিতরে পুষে বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট, 'তুমি যা বিশ্বাস করো, সে-বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই । তবু আমরা কেবল একটা কথা জানতে চাচ্ছি—আশা করি ঠিক উত্তর দেবে ।'

'বলুন ।'

'কোন অধিকারে ফিলাডেলফিয়ার পার্কে তুমি আমাদের আক্রমণ করেছিলে ? কোন অধিকারে আমাদের বন্দী ক'রে রেখেছিলে অ্যালবাট্রসের একটা খুপরিতে ? কোন অধিকারে আমাদের তুমি এই আকাশযানে এনে উঠিয়েছো ?'

'আর কোন অধিকারেই বা আপনারা—শ্রীযুক্ত বেলুনবাজ মহোদয়গণ—আপনারা আমাকে আপনাদের ক্লাবঘরে পেয়ে অপমান করেছিলেন ? আমি যে সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছি, সেটাই আমাকে তাজ্জব ক'রে দিচ্ছে !'

'পালটা প্রশ্ন করা মানে কথার উত্তর দেয়া নয়,' বললেন ফিল ইভানস, 'আবারও জিগেস করি, কোন অধিকারে... '

'সত্যি জানতে চান ?'

'যদি দয়া ক'রে বলো ।'

'তাহ'লে বলতে হয় যে দুর্বলের উপর সবলের অধিকার খাটিয়েছি ।'

'সেটা তো রাগের কথা !'

'কিন্তু এটাই সত্যি কথা ।'

'আর কতদিন তুমি আমাদের উপর এই অধিকার খাটাতে চাও ?'

'কী আশ্চর্য ! এমন কথা আপনি বলতে পারলেন কী ক'রে ? চোখ নামালেই তো জগতের পরমাশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন—তারপরেও এ-কথা বলতে আপনার মন উঠলো ?'

সে-কথা শুনে নিচে তাকিয়ে ফিল ইভানস অবাক হ'য়ে মুগ্ধভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন : 'আরে ! এ যে দেখছি নায়েগ্রা জলপ্রপাত !'

আঙ্কল প্রুডেণ্টও নিচে তাকিয়ে জলের ঝর্ঝরে সূর্যরশ্মির বর্ণময় বিচ্ছুরণ ও আলোর খেলা দেখে মুগ্ধ না-হ'য়ে পারলেন না । সত্যি, ইকরুসের চেলাই এই বিশ্বজগতের সবচেয়ে বড়ো উপাসক—কারণ সে-ই দেখাতে পারে ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে জগতের কোথায় কী আছে ।

৮

তিনশূন্যের অভিযাত্রী

একটা ছোট্ট কুঠুরিতে দুটো চমৎকার বার্থ দেয়া হয়েছে আঙ্কল প্রুডেণ্ট ও ফিল ইভানসকে ; ধবধবে ফর্শা বিছানা, রাতকাপড়গুলোও পরিষ্কার ক'রে কাচা ও ইস্ত্রি-করা, মোটা কম্বল—পুরু ও মোলায়েম—ইত্যাদি বিষয়ে *অ্যালবাট্রসে* আরামের যতটা ব্যবস্থা, তা ইওরোপগামী অনেক জাহাজেও মিলবে কি না সন্দেহ । এর পরেও যদি রাত্তিরে এঁদের ভালো ঘুম না-হয়, তাহ'লে তার জন্যে এঁরা নিজেরাই দায়ী—উৎকণ্ঠা যদি তাঁদের চোখের পাতা থেকে ঘুম কেড়ে নেয়, তবে রবয়ু নিশ্চয়ই তার জন্যে দায়ী নয় ।

রবয়ু দায়ী না-হ'য়েও, এবং যথেষ্ট আরামপ্রদ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, রাত্রে কিন্তু এঁরা ভালো ঘুমোতে পারলেন না । এ-কোন দুর্বিপাকে জড়িয়ে পড়েছেন এঁরা ? অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোগ দিতে হচ্ছে সে-কোন রোমহর্ষক আভিযানে ? কোন পরীক্ষানিরীক্ষার সাক্ষী হবার জন্যে রবয়ু এঁদের জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে এসেছে ? এই আকাশভ্রমণের শেষই বা কোথায় ? এবং সর্বোপরি, রবয়ুই বা এদের নিয়ে শেষ অব্দি কী করবে ?

ফ্রাইকোলিনের আস্তানা ঠিক হয়েছিলো বাবুর্চির কামরায় । কামরাটা দেখে সে যে অসন্তুষ্ট হ'লো তা নয়—তাছাড়া মহাত্মাদের সঙ্গে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারলে তার আর ফুর্তির সীমা থাকে না । কিন্তু সেও যখন ঘুমোবার চেষ্টা করলে, তখন তারও ঘুমের মধ্যে এসে হানা দিলে বিরতিহীন স্বপ্ন—যেখানে তিন শূন্য থেকে পাক খেয়ে-খেয়ে সে কেবল পড়ছে

তো পড়ছেই । আর স্বপ্ন যখন এভাবে দুঃস্বপ্নে রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো, তখন আতঙ্কে ও বিভীষিকায় তারও ঘুম বার-বার ছিঁড়ে-ছিঁড়ে গেলো ।

আর *অ্যালবাট্রস* এই তিনজন অনিচ্ছুক আরোহীকে নিয়ে রবয়ুর নির্দেশ মতো সারাক্ষণ ছুটে চললো পশ্চিম দিকে । পরের দিন সারাক্ষণ চ'লে *অ্যালবাট্রস* পেরিয়ে গেলো ইলিনয় রাজ্য, মিসিসিপি নদী, আইওয়া নগরী—এবং অবশেষে মিশুরি-বিধৌত রকিমাউন্টেন অঞ্চল । আস্তে-আস্তে ক'মে এলো গ্রামনগরের সংখ্যা, দেখা দিলো উবড়োখাবড়ো পাহাড় ও তার উপত্যকা—তবু সূর্যাস্তের উদ্দেশে তার যাত্রা কিছুতেই থামলো না ।

সারা দিনের মধ্যে রবয়ুর সঙ্গে একবারও দেখা হয়নি প্রুডেন্ট ও ইভানসে, সারা দিন দুজনে আকাশযানের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখেছেন কেমন ক'রে বদলে গেছে দৃশ্যের পর দৃশ্য—আর অত নিচে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও ঘূর্ণিরোগে মাথা ঝিমঝিম করেনি তাঁদের, যেটা করতো কোনো মস্ত স্তম্ভের উপরে উঠে নিচের দিকে তাকালে ।

ক্রমশ এগিয়ে এলো নেব্রাস্কার সীমান্ত ; ওমাহা নগরী থেকে সাড়ে চার হাজার মাইল লম্বা প্যাসিফিক রেলোয়ের রেললাইন বেরিয়েছে—লোহার হাত বাড়িয়ে সান ফ্রানসিস্কোর কাছে নিউ-ইয়র্ককে এনে দিয়েছে বিজ্ঞান । একবার নিচে ঝলসে উঠলো মিশুরির হলুদ জল, তার পরেই ওমাহার বাড়িঘরগুলি । *অ্যালবাট্রস* তখন বেশ নিচে দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলো ; ফলে সহজেই বোঝা যায় যে অবাক হ'য়ে মাটির পৃথিবীর মানুষজনেরা এই আশ্চর্য বিমানটিকে সাগ্রহে নিরীক্ষণ করেছে । পরের দিন যে খবর-কাগজগুলো এই খবরটাকে ফলাও ক'রে প্রচার করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই । সারা জগৎ সম্প্রতি যে-রহস্যের কোনো কিনারা করতে না-পেরে এলোমেলো ও আবোল-তাবোল রব তুলে দিচ্ছে প্রত্যহ, এটা যে সেই খটকাটা ভেঙেই সব সমস্যার ও কৌতূহলের নিরসন ক'রে দেবে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই ।

একঘণ্টার মধ্যে *অ্যালবাট্রস* এমনকী ওমাহাও পেরিয়ে গেলো ; ওমাহার পরে প্লাট রিভারের গা ঘেঁষে প্রেয়ারির উপর দিয়ে গেছে প্যাসিফিক রেলোয়ের রেললাইন । পর-পর নিচে দেখা গেলো পাইন আর সিডার গাছে ঢাকা ব্ল্যাক মাউন্টেন, নেব্রাস্কার মন্দ জমি, উবড়োখাবড়ো অসমতল রুক্ষভূমি, প্লাট রিভারের শেষ শাখাটি । রাত্তিরেও অবিশ্রাম চলা তার থামলো না । *অ্যালবাট্রস* চলেছে তো চলেছেই—সোজা পশ্চিম দিগন্ত লক্ষ্য ক'রে ছুটে চলেছে, কার সন্ধানে কে জানে ।

পরের দিন, ১৫ই জুনের প্রাতঃকালে একেবারে ভোর পাঁচটাতেই ফিল ইভানস তাঁর কামরা ত্যাগ করলেন । হয়তো আজকে রবয়ুর সঙ্গে একবার কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে । কাল সারাদিন একবারও কেন রবয়ুর সঙ্গে দেখা হয়নি, জানবার বিশেষ কৌতূহল হচ্ছিলো ইভানসের, সেইজন্যেই রবয়ুর বন্ধু টম টারনারকে দেখে তার দিকে এগিয়ে গেলেন ফিল ইভানস ।

টম টারনার ইংরেজ, বয়েস ৪৫, কাঁধ চওড়া, বুকের খাঁচাটার তুলনায় পা দুটি ঈষৎ ছোটো ; মানুষটি যেন ইস্পাতের পাতে তৈরি এমন শক্ত ।

'আজকে মিস্টার রবয়ুর সঙ্গে দেখা হবে কি আমাদের ?'

'জানি না ।'

'তিনি কি অন্য-কোথাও গিয়েছেন ?'

'হয়তো গেছেন, হয়তো যাননি ।'

'কখন ফিরবেন ?'

'যখন তাঁর বাইরের কাজ-কারবার শেষ হ'বে ।' ব'লে টম টারনার নিজের কামরায় ঢুকে পড়লো ।

কাজেই এই উত্তরেই সন্তুষ্ট হ'তে হ'লো ইভানসকে । ব্যাপার-স্যাপার দেখে আশ্বস্ত হওয়া যাচ্ছে না একটুও । একবার গিয়ে দিগ্দর্শকটি দেখে এলেন ইভানস । অ্যালবাট্রস এখনও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ লক্ষ্য ক'রে ছুটে যাচ্ছে ।

এখন নিচে উন্মোচিত হচ্ছে রেড-ইণ্ডিয়ানদের ডেরাগুলি । ঠিক দক্ষিণাঞ্চলের কলোরাডো প্রদেশের মতো না-হ'লেও ব্ল্যাক মাউণ্টেনের রুক্ষ উষর অঞ্চলের চাইতে এখানটা অনেক বেশি বাসযোগ্য ।

ইয়েলোস্টোন রিভার, মাউণ্ট স্টিভেনসন, অরেগন—একের পর এক অঞ্চলগুলি চকিতের মতো নিচে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে ।

ততক্ষণে আঙ্কল প্রুডেন্ট এসে দাঁড়িয়েছেন ডেকে । সব প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও *অ্যালবাট্রসের* ক্ষমতা দেখে অনিচ্ছুকভাবেও তাঁদের মুগ্ধ হ'তে হ'লো । নিচে এখন প্যাসিফিক রেলোয়ের দীর্ঘ রেলপথ দেখা যাচ্ছে—বেশ নিচু দিয়েই যাচ্ছে এখন *অ্যালবাট্রস*; নিচের রাস্তাঘাট গাছাপালা পার্বত্যপ্রদেশ সব অনেক স্পষ্ট ও স্বাভাবিক আকারের দেখাচ্ছে । প্রায় কয়েকশো গজ নিচে নেমে এসেছে সে এখন । আর সেইজন্যেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শোনা গেলো ধাবমান রেলগাড়ির তীক্ষ্ণ চেরা বাঁশি, তার পরেই দেখা গেলো রেলের ধোঁয়া । সল্টলেক সিটির দিকে যাচ্ছে রেলগাড়িটি।

রেলগাড়িটিকে দেখেই *অ্যালবাট্রস* আরো নিচে নেমে এলো, যাতে রেলগাড়িটির সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় নামতে পারে । পূর্ণ বেগে ধাবমান লম্বা গাড়িটি থেকে ততক্ষণে দরজা-জানলা দিয়ে অনেক কৌতূহলী মুখ বেরিয়ে এসে সাগ্রহে নিরীক্ষণ করছে *অ্যালবাট্রসকে* । পরক্ষণেই দেখা গেলো পিল-পিল ক'রে আরো অনেক মুখ বেরিয়ে এলো জানলা দিয়ে—উৎসাহী অনেকে বাইরে এসে চলন্ত গাড়ির পাদানিতে দাঁড়ালো, আর কেউ-কেউ তাতেও তুষ্ট না-থেকে চটপট গাড়ির ছাতে চ'ড়ে বসলো ভালো ক'রে উড়োযানটিকে দেখা যাবে ব'লে । উল্লসিত চীৎকার, হইচই, লোকজনের হৈ-হল্লা ভেসে এলো, কিন্তু উত্তরে কোনো রবয়ু দেখা দিলে না ডেকে—হাত নেড়ে রেলযাত্রীদের সম্ভাষণ করার কোনো চেষ্টাই করলে না সে ।

অ্যালবাট্রস তখনও নিচে নেমে আসছে—গতিও অনেক কমিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে চট ক'রে রেলগাড়িটিকে পিছনে ফেলে না-আসতে হয় । যেন কোনো পৌরাণিক অতিকায় পাখি রেলগাড়িটিকে দেখে পছন্দ ক'রে ফেলেছে হঠাৎ, তাই তার আর সঙ্গ ছাড়ছে না ! ডানে-বামে, সামনে-পিছনে—নানা জায়গায় গিয়ে নানা কোণ থেকে এই আকাশযান রেলগাড়িটিকে নিজের সূর্য-আঁকা নিশেন দেখাতে চাচ্ছে । আর রবয়ুর পতাকার সোনালি সূর্য দেখেই রেলগাড়ির কণ্ডাকটার তারা আর ডোরা আঁকা যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা বার ক'রে জানলা দিয়ে নাড়াতে লাগলো ।

রেলগাড়িটিকে এত কাছে দেখে প্রুডেন্ট আর ইভানস যেন কেমন হ'য়ে গেলেন। মুক্তির সুযোগ কাছে এসেছে ব'লেই মনে হ'লো তাঁদের। চেঁচিয়ে-মেচিয়ে রেলযাত্রিদের নিজেদের কথা জানাবার চেষ্টা করলেন তাঁরা। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট, 'আমি ফিলাডেলফিয়ার আঙ্কল প্রুডেন্ট—ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি!' ফিল ইভানসও তৎক্ষণাৎ গলা মেলালেন, 'আমি ফিল ইভানস—তাঁর সহকর্মী!' কিন্তু রেলযাত্রীদের হৈ-হল্লায় তাঁদের গলা চাপা প'ড়ে গেলো—কেউ তাঁদের কথা শুনতেই পেলে না।

অ্যালবাট্রসের তিন-চারজন বৈমানিক ততক্ষণে ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের একজনের হাতে একটা মস্ত দড়ি—জাহাজের নাবিকেরা যেমন সমুদ্রে কোনো মন্থর পোতের দেখা পেলে ঠাট্টার ভঙ্গিতে মন্থর পোতটির উদ্দেশে দড়ি ছুঁড়ে দেয়, তেমনিভাবে *অ্যালবাট্রস* এই রেলগাড়ির উদ্দেশে সেই দড়ি ঝুলিয়ে দিলে। আর তারপরেই *অ্যালবাট্রস* আবার হঠাৎ আগের মতো জোরে চলতে শুরু করলো—আধঘণ্টার মধ্যেই রেলগাড়িটি চ'লে গেলো দৃষ্টির বাইরে।

বেলা একটা নাগাদ সল্ট লেক সিটি পিছনে ফেলে ক্যালিফরনিয়ার স্বর্ণ-রাজ্যের ও-পাশে সিয়েরা নেভাদার উপর দিয়ে চলতে লাগল *অ্যালবাট্রস*।

'এই গতিতে চললে রাতের আগেই সানফ্রানসিস্কো পৌঁছে যাবো আমরা,' বললেন ফিল ইভানস।

'কিন্তু, তারপর?' জিগেস করলেন আঙ্কল প্রুডেন্ট।

সত্যি, ছটা নাগাদ সিয়েরা নেভাদা পেরিয়ে গেলো *অ্যালবাট্রস*। সানফ্রানসিস্কো আর মাত্র পৌনে দুশো মাইল দূরে। আটটার মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া যাবে—বুঝলেন ফিল ইভানস।

ঠিক এ-রকম সময়ে রবয়ুর আবির্ভাব হ'লো ডেকে। হুড়মুড় ক'রে দুজনে গিয়ে তার কাছে দাঁড়ালেন।

'এঞ্জিনিয়ার রবয়ু!' আঙ্কল প্রুডেন্ট বললেন, 'আমরা এখন একেবারে আমেরিকার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি! তোমার রসিকতাটা এবার বন্ধ করো।'

'আমি কখনো পরিহাস করি না,' বললে রবয়ু। ব'লে সে হাত তুলে কী-একটা ইঙ্গিত করলে। অমনি *অ্যালবাট্রস* তীরবেগে মাটির দিকে নেমে গেলো। এত জোরে নামলে যে প্রুডেন্ট ও ইভানস ভয় পেয়ে নিজেদের কামরায় ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

রাগে ফুঁসছিলেন প্রুডেন্ট। দাঁত চেপে কেবল বললেন, 'হতভাগাটার টুঁটি টিপে মারতে পারলে হ'তো!'

'পালাতেই হবে আমাদের,' বললেন ফিল ইভানস।

'নিশ্চয়ই। যেভাবেই হোক পালাতে হবে।'

এ-কথার উত্তরে দীর্ঘ অবিশ্রাম গুঞ্জন তাঁদের সম্ভাষণ জানালে। বেলাভূমিতে ঢেউ আছড়ে-পড়ার শব্দ এটা। প্রাশান্ত মহাসাগরের বিক্ষুদ্ধ ঢেউয়ের শব্দ—বুঝতে পারলেন দুজনে।

...

পালাবেন ব'লেই মনস্থির ক'রে ফেছেন প্রুডেন্ট ও ইভানস। যদি আটজন ষণ্ডামার্কা লোক

না-থাকতো *অ্যালবাট্রসে*, তাহ'লে জোর জবরদস্তি করতেও পেছ-পা হতেন না তাঁরা। কিন্তু যেহেতু আটজনের বিরুদ্ধে তাঁরা সংখ্যায় মাত্রই দুজন—ফ্রাইকোলিনকে তো ধর্তব্যের মধ্যেই আনা যায় না—সেইজন্যে গায়ের জোরে এদের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে ওঠা যাবে না। কাজেই, পালাবার চেষ্টা করতে হবে তখন, যখন *অ্যালবাট্রস* আবার নিচে নামবে। অন্তত এটাই ফিল ইভানস তাঁর উত্তেজিত ও চীৎকৃত সহকর্মীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তাঁর ভয় হচ্ছিলো, প্রুডেন্ট যে-মেজাজের লোক, তাতে আগেভাগেই কিছু ক'রে না-বসেন। তাহ'লে আর উদ্ধারের আশা থাকবে না।

কিন্তু সে যা-ই হোক, এই মুহূর্তে সে-রকম কোনো চেষ্টা করাই যাবে না। কারণ *অ্যালবাট্রস* এখন প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর দিক দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ষোলোই জুন সকালবেলাতে উপকূলই দেখতে পাননি তাঁরা—ভ্যানকুভার দ্বীপটিকে পর্যন্ত দেখা যায়নি।

সকালবেলায় ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের কর্তাব্যক্তিদের দেখে রবয়ু নীরবে কেবল অভিবাদন করেছিলো—আর কোনো কথাই হয়নি তার সঙ্গে। বরং আজ ফ্রাইকোলিন তার কামরা থেকে ডেকে এসেছে। কেমন যেন ঘোরের মধ্যে আছে সে, পায়ের তলায় মাটি নেই—এমনি তার হাঁটাচলার ভঙ্গি। দু-হাত দিয়ে রেলিং ধ'রে-ধ'রে সে হেঁটে এলো তাঁদের কাছে। প্রায় সারাক্ষণই ভয়ে চোখ বুজে রইলো—নিচে তাকিয়েই মাথা ঘুরে গিয়েছিলো তার গোড়ায়। নিচে যে কী আছে তা ভালো ক'রে দ্যাখেইনি। কিন্তু পরে যখন নিচে তাকিয়ে দেখলে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ নীল জল, তখন এমনভাবে ভয় পেয়ে অন্ধের মতো ছুটে ফিরে গেলো তার কামরার দিকে যে বাবুর্চি তাকে ধ'রে না-ফেললে রেলিং ফুঁড়ে সোজা গিয়ে সমুদ্রে প'ড়ে যেতো নির্ঘাৎ।

বাবুর্চিটি ফরাশি, নাম ফ্রাঁসোয়া তাপাজ। ইংরেজি বলে চমৎকার। 'এই, ওঠো-ওঠো!' ফ্রাইকোলিনকে টেনে তুললো সে।

'মাস্টার তাপাজ!' ভয়ে কথা ফুটছিলো না ফ্রাইকোলিনের মুখে।

'কী ব্যাপার, ফ্রাইকোলিন!'

'এই উড়োজাহাজ—এটা কি কখনো ভেঙে গিয়েছিলো? এখন জোড়াতাড়া দিয়ে চলছে?'

'না। তবে একদিন ভেঙে যাবে নিশ্চয়ই।'

'কেন? কেন?'

'কারণ সবকিছুই একদিন ধ্বংস হ'য়ে যায়।'

'আর আমাদের নিচে যে সমুদ্র!'

'যদি *অ্যালবাট্রস* কখনও ভেঙে পড়ে, তখন নিচে সমুদ্র থাকলেই তো সবচেয়ে ভালো।'

'কিন্তু তাহ'লে যে ডুবে মরবো।'

'হাড়গোড় ভেঙে দ হ'য়ে যাওয়ার চেয়ে ডুবে-মরা নিশ্চয়ই অনেক ভালো।'

এ-কথা শুনে ফ্রাইকোলিন তার কামরা থেকে আর-কখনও বেরুবার পরিকল্পনা তক্ষুনি ত্যাগ করলে।

নিচে একঘেয়ে সমুদ্র—তার বিশাল নীলিমা, বিক্ষুব্ধ জলোচ্ছ্বাস, আর শাদা ফেনা।

উপরে একটানা নীল শূন্য—তার হালকা শাদা মেঘ। এই দৃশ্য মোটেই ভালো লাগছিলে না ব'লে প্রুডেন্ট আর ইভানসও কামরা ছেড়ে আর বেরুবার চেষ্টা করলেন না ; সেইজন্যে রবয়ুর সঙ্গেও আপাতত আর দেখা হ'লো না তাঁদের।

কখনো কখনো *অ্যালবাট্রস* সমুদ্রের গা ঘেঁষে চলে—এত নিচে নামে। বৈমানিকেরা তখন মাছ ধরে মাঝে-মাঝে।

প্রায়ই চোখে পড়ে তিমি জলে পিঠ ভাসিয়ে আকাশের উদ্দেশে জলের স্তম্ভ ছুঁড়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। এই উত্তুরে সাগরের তিমিরা কেবল বৃহদায়তনই নয়, তারা অন্যখানের তিমির চেয়ে স্বভাবেও হিংস্র। তাছাড়া একেকটা তিমির গায়ে এত জোর থাকে যে সাধারণ তিমিশিকারী জাহাজগুলো পর্যন্ত এদিকটায় তিমির খোঁজে আসে না। এইসব তিমির উদ্দেশে হারপুন, কি জ্যাভেলিন বোমা ছুঁড়ে মারতে গেলে *অ্যালবাট্রসের* বৈমানিদেরও বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া খামকা তিমিশিকার ক'রে *অ্যালবাট্রসের* কোন পরমার্থ সিদ্ধি হবে ? নিশ্চয়ই ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সদস্যদের কাছে ডাঁট দেখানো ছাড়া পিছনে আর-কোনো উদ্দেশ্যে নেই। কিন্তু দরকার থাক বা না-থাক রবয়ু একদিন একটা তিমি শিকারের আদেশ দিলে।

'তিমি ! তিমি !' এই রব শুনে প্রুডেন্ট ও ইভানস চটপট কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন ডেকে। ভাবলেন, বুঝি-বা কাছেই কোনো তিমিশিকারী জাহাজেরও দেখা মিলবে। সেক্ষেত্রে *অ্যালবাট্রস* থেকে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁৎরে ওঠা যাবে ওই জাহাজে।

কিন্তু—হা হতোস্মি !—আশপাশে কোথাও কোনো জাহাজের পাত্তা মিললো না। বরং দেখা গেলো ডেকে বেশ সাড়া প'ড়ে গিয়েছে সকলের মধ্যে, কারণ রবয়ু তিমিটাকে মারবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে। সে নিজেই গিয়ে ঢুকছে এঞ্জিনঘরে—*অ্যালবাট্রস* চটপট অনেকটা নিচে নেমে এসেছে। সমুদ্র আর মাত্র পঞ্চাশ ফিট নিচে।

তিমিরা যখন নিশ্বেস নিতে জলের উপরে উঠে শূন্যে জলের ধারা ছুঁড়ে মারলে, তখনই সেই জলস্তম্ভ লক্ষ্য ক'রে বোঝা গেলো কোনখানে কোন তিমি রয়েছে। টম টারনার দাঁড়িয়েছিলো গলুইয়ের কাছে, সঙ্গে আরেকটি লোক। হাতের কাছেই রয়েছে ক্যালিফরনিয়ার একটি কারখানার তৈরি জ্যাভেলিন বোমা—চুরুটের মতো একটা ধাতব জিনিশ, সামনেটা চোখা। রবয়ু সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে এঞ্জিনঘর থেকে—কতখানি নিচে নামবে *অ্যালবাট্রস,* গতিই বা কী-রকম হবে, সব তার নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালিত হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে *অ্যালবাট্রস* বুঝি জ্যান্ত কোনো প্রাণী, আর রবয়ু তারই প্রাণ।

কাছেই একটা জায়গায় একটা তিমি ভেসে উঠলো জলের উপর—আর অমনি শিকারী বাজের মতো ছোঁ মারতে তার দিকে এগিয়ে গেলো *অ্যালবাট্রস,* প্রায় পঞ্চাশ ফিট কাছে এসে নিশ্চল থেমে রইলো সামনে। টম টারনার অমনি জ্যাভেলিন বোমাটা ছুঁড়লো ; তিমিকে লক্ষ্য ক'রে দড়িবাঁধা বোমাটা ছুটে গেলো তিমির উদ্দেশে, তার পিঠে লেগে বোমাটা ফেটে যেতেই দু-মুখো হারপুন বেরিয়ে বিঁধে গেলো তিমিটার গায়ে।

'সাবধান ! সামাল !' টারনার চেঁচিয়ে জানালে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভানস ততক্ষণে তন্ময়ভাবে এই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি দেখছেন।

আহত তিমিটা তৎক্ষণাৎ পাক খেয়ে গেলো জলের মধ্যে ; যন্ত্রণায় ল্যাজ আছড়াতে

লাগলো ভীষণভাবে—আর তাতে এমনকী *অ্যালবাট্রসের* গায়ে পর্যন্ত জলের ঝাপটা এসে লাগলো। তারপরেই জলের মধ্যে ডুব দিলে তিমিটা—আর অমনি লাটাই থেকে যেমন দড়ি খুলে যায়, তেমনিভাবে দড়ি খুলে যেতে লাগলো জ্যাভেলিন বোমা ছোঁড়বার কলটা থেকে। তিমিটা কিন্তু ছটফট করতে-করতে আবার ভেসে উঠলো জলের উপর—বিদ্যুতের মতো ছুটে চলতে লাগলো উত্তরদিকে। অ্যালবাট্রস পিছনে ছুটে চললো গাধাবোটের মতো—কিংবা বলা যায় তিমিটাই গুণ টেনে নিয়ে যেতে লাগলো বিমানটিকে। প্রপেলারগুলো বন্ধ—তিমিটার হাতেই সব ভার ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাক সে যেখানে নিয়ে যেতে চায় *অ্যালবাট্রসকে*। যদি তিমিটা আবার জলে ডুব দেয়, তাহ'লে হয়তো *অ্যালবাট্রসকে* বিপদে পড়তে হবে—কারণ জ্যাভেলিন বোমার দড়ি আর নেই—সব খুলে গেছে। বেগতিক দেখলে দড়ি কেটে দেবার জন্যে টারনার ছুরি হাতে তৈরি হ'য়ে আছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে মাইল ছয়েক এমনিভাবে *অ্যালবাট্রসকে* টেনে নিয়ে সমুদ্রে পাক খেতে লাগলো সেই আহত তিমিটি। তারপর আস্তে-আস্তে তিমিটি কাহিল হ'য়ে পড়েছে, এটা বুঝেই রবয়ুর নির্দেশে উলটো দিকে টান দেবার জন্যে *আলবাট্রসের* প্রপেলার চালিয়ে দেয়া হ'লো। আর সেই টানে তিমিটা এবার একটু-একটু ক'রে আসতে লাগলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তিমি আর উড়োযানের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস পেয়ে-পেয়ে ফিট পঁচিশে গিয়ে দাঁড়ালো। তখনও জলে ল্যাজ আছড়াচ্ছে সেই অতিকায় তিমি—মাঝে-মাঝে পাক খাচ্ছে জলের মধ্যে—আর একেকটা পাহাড়প্রমাণ ঢেউ উঠছে সমুদ্রে।

হঠাৎ আবার তিমিটা ঘুরপাক খেয়ে আচম্বিতে এমন তীব্র বেগে *অ্যালবাট্রসের* দিকে ঝাঁপিয়ে এলো যে টারনার, তৈরি থাকা সত্ত্বেও দড়িটা কেটে দেবার অবসর পেলে না। এক হ্যাঁচকা টানে উড়োযানটা জলের উপর প্রায় আছড়ে পড়লো যেন। তিমিটা আবার ডুব দিয়েছে তখন, ঘূর্ণি দিয়ে জল আছড়াচ্ছে সেখানটায়, *অ্যালবাট্রসের* ডেকেও একটা ঢেউ আছড়ে পড়লো—মনে হ'লো তিমিটা *অ্যালবাট্রস* নিয়েই জলের তলায় চ'লে যেতে চাচ্ছে।

ছুরি ফেলে দিয়ে একটা কুড়ুল দিয়ে কোপ মেরে টারনার দড়িটা কেটে ফেললে। আর আচমকা ছাড়া পেতেই *অ্যালবাট্রস* যেন এক লাফে ছ-শো ফিট উঠে গেলো। এই বিপদের মধ্যেও রবয়ু আগাগোড়া মাথা ঠাণ্ডা রেখে নির্দেশ দিয়ে সাঁইত্রিশটা মাস্তুলের চাকা চালিয়ে রেখেছিলো।

কয়েক মিনিট পরেই মরা তিমিটা জলের উপর ভেসে উঠলো। আর কেমন ক'রে যেন টের পেয়ে সমুদ্রের পাখিরা সেই বিপুল ভুরিভোজের উদ্দেশে উড়ে চ'লে এলো পালে-পালে। হোয়াইট হাউসের বাগ্মীরা শুদ্ধু এই পাখিদের উল্লসিত চ্যাঁচামেচিতে লজ্জা পেতেন—যদি একবার এই চীৎকার শুনতেন। *অ্যালবাট্রস* তিমির দেহাবশিষ্টে ভাগ না-বসিয়ে আবার আগের মতো পশ্চিম দিকে ছুটে চ'লে যেতে লাগলো।

১৭ই জুন ছ-টা নাগাদ দিগন্তে ডাঙা দেখা গেলো। আলাস্কা ও অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ। ১৮ই জুন *আলবাট্রস* পেরিয়ে গেলো কামটস্কাটকা; ১৯ তারিখে তাকে দেখা গেলো শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তর জাপানের আকাশে। ২১ তারিখে আগুনে পাহাড় ফুজিয়ামা দেখা গেলো নিচে।

ফুজিয়ামা দেখে যখন প্রুডেন্ট আর ইভানস *অ্যালবাট্রসের* ক্ষমতায় মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডেকে, তখন হঠাৎ আবার রবয়ুকে দেখা গেলো পাশে ।

'জাপানের রাজধানী তোকিয়ো দেখতে পাবেন এক্ষুনি,' বললে সে তাঁদের ।

আঙ্কল প্রুডেন্ট কোনো সাড়া দিলেন না ।

'তোকিয়ো ভারি অদ্ভুত দেখতে আকাশ থেকে,' বললে রবয়ু ।

'হোক গে অদ্ভুত—' ফিল ইভানস বলতে চাইলেন ।

'কিন্তু পেইচিংয়ের মতো সুন্দর দেখতে নয় ?' রবয়ু কথা কেড়ে নিয়ে বললে । 'আমার ও তা-ই মনে হয় । তা আপনাদের আপশোশ করার কিছু নেই । কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা পেইচিং আর তোকিয়োর মধ্যে তুলনা ক'রে দেখার সুযোগ পাবেন ।'

নিচে ততক্ষণে তোকিয়ো দেখা যাচ্ছে ।

৯

ভারতদর্শন

হঠাৎ তাপমাত্রা ক'মে গেলো রাতে ; সারাদিন সমুদ্র ছিলো শান্ত, নীল, মসৃণ—সূর্যাস্তের সময় সেই নীলিমায় ছড়িয়ে পড়লো এক গভীর রক্তিম দীপ্তি । গত কয়েক দিন ছিলো কুয়াশা, আবহাওয়া ছিলো ভ্যাপসা, মেঘে-ঢাকা—হঠাৎ তা যেন বদলে গেলো মায়াবলে : আকাশ হ'য়ে উঠলো তামার মতো, আর তাতে বড়ো-বড়ো উপবৃত্তের মতো ঝুলে রইলো একেকটা মেঘের খণ্ড । আর পিছনে, একেবারে অন্য দিগন্তে, কীসের-যেন একটা থমথমে আশঙ্কা গুটিশুটি মেরে র'য়ে যাচ্ছে সারাক্ষণ । এই লক্ষণগুলো একটা কথাই বলছিলো : টাইফুন আসন্ন এবং অবশ্যম্ভাবী ।

সৌভাগ্যবশত টাইফুন ফেটে পড়লো একেবারে দক্ষিণ আকাশে—আর সেই কুয়াশার শেষ রেশ ও মেঘের টুকরোগুলোকে ঝেঁটিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলো *অ্যালবাট্রস*-এর আশপাশ থেকে । কিন্তু সেই এক ঘণ্টায় কোরিয়ান প্রণালী দিয়ে সোয়াশো মাইল পেরিয়ে গেলো *অ্যালবাট্রস* ; টাইফুন যখন চিনের উপকূলে গরজাচ্ছে, *অ্যালবাট্রস* তখন পীত সাগর পেরিয়ে গেছে ।

পরের তিন দিন ধ'রে *অ্যালবাট্রস* কেবল চিন সাম্রাজ্যের রাজধানীর উদ্দেশেই ছুটে চললো । ২৪শে রেলিঙের উপর থেকে ঝুঁকে প'ড়ে দুই সহকর্মী সেই বিপুল নগরীকে দেখতে পেলেন । নিচে পেইচিং দুই ভাগে বিভক্ত—একটা হচ্ছে মাঞ্চু নগরী আরেকটা চৈনিক পল্লি : আর বারোটা শহরতলি রয়েছে শহরটাকে ঘিরে, যার কেন্দ্র থেকে একেকটা বুলেভার বেরিয়ে গিয়ে শহরতলিগুলিকে ছুঁয়ে আছে । দেখা গেলো মাঞ্চু পল্লি ও পীত পল্লি, উদয়সূর্যের রশ্মিজ্বলা মন্দিরের পীত-সবুজ, প্যাগোডা, রাজোদ্যান, কৃত্রিম হ্রদ আর কয়লার পাহাড় । চিনে প্রহেলিকার মতো পীত পল্লির ঠিক মাঝখানে দেখা গেলো লোহিত পল্লিকে—সেটাই আসলে রাজপ্রাসাদ—আর তার যাবতীয় স্থাপত্যসৌন্দর্য ।

অ্যালবাট্রসের নিচে আকাশে গানের মূর্ছনা ভেসে আসছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন কোনো আইওলিয়ান হার্প বেজে চলেছে কোথাও। আর উড়ছিলো সহস্র ধরনের ঘুড়ি—একেকটা দেখতে একেকরকম।

অ্যালবাট্রস রবয়ুর খেয়ালে নিচে নেমে এইসব নানা-রঙের ঘুড়ির মধ্যে দিয়ে আলতো ভাবে ভেসে আসতে লাগলো। কিন্তু তার ফলে মুহূর্তের মধ্যে নিচে নগরীর মধ্যে একটা বিপুল সাড়া প'ড়ে গেলো। *অ্যালবাট্রসকে* দেখেই কাতারে-কাতারে লোক বেরিয়ে এলো রাস্তায়, বেজে উঠলো চৈনিক ঐকতানের বিপুল বাদ্যসম্ভার, তোপধ্বনি হ'লো কামানে-কামানে—আর সব চেষ্টাই নিয়োজিত হ'লো পুরাণের পাতা থেকে উড়ে-আসা এই অতিকায় পাখিটিকে ভয় দেখাবার উদ্দেশে। যদিও চৈনিক জ্যোতির্বিদই প্রথম আকাশযানের সম্ভাব্যতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, তবু লক্ষ-লক্ষ চৈনিক নর-নারী—তা সে দীনহীন তঙ্কাদিরিই হোক কি শৌখিন ঝলমলে মান্দারিনই হোক—ভাবলে যে এই বুঝি বুদ্ধের আকাশে কোনো প্রলয়কালের উড়ো দানব উড়ে এসেছে।

অ্যালবাট্রসের যাত্রীরা কিন্তু এতেও মোটেই বিচলিত হচ্ছিলো না। বরং তারা সাগ্রহে একটার পর একটা ঘুড়ি ধ'রে নিচ্ছিলো হাত বাড়িয়ে, সুতো ছিঁড়ে ফেলে নিজেরাই ওড়াবার চেষ্টা করছিলো *অ্যালবাট্রসের* ডেক থেকে। আর নিচের সমস্ত ঐকতানের পালটা জবাব দেবার জন্য বেজে উঠেছিলো টম টারনারের উদ্দীপ্ত শিঙাটি—যা এককালে সারা জগৎকে স্তম্ভিত, বিস্মিত, চকিত, উত্তেজিত ও বিমূঢ় ক'রে তুলেছিলো।

কিন্তু টম টারনারের শিঙাধ্বনিই বোধহয় কোনো গোলন্দাজকে উসকে দিয়ে থাকবে, কারণ হঠাৎ দেখা গেলো একটা কামানের গোলা শাঁ ক'রে ঠিক *অ্যালবাট্রসের* গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো। এই ইঙ্গিতের পর রবয়ু আর এত নিচু দিয়ে যাওয়াটা অভিপ্রেত ব'লে বোধ করলে না—তক্ষুনি *অ্যালবাট্রস* হু-হু ক'রে অনেকটা উঁচুতে উঠে গেলো।

পরের কয়েক দিনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটলো না—অন্তত প্রুডেন্ট বা ইভানসের দিক থেকে সে-দিনগুলোকে মোটেই বিশেষ দিন ব'লে চিহ্নিত করা যাবে না। পেইচিং পেরিয়ে যাবার বারো ঘন্টা পরে কেবল চেন-সি অঞ্চলে অতিকায় চিনের প্রাচীর দেখেছিলেন তাঁরা, আর দেখেছিলেন যে লুং গিরিমালার দিকে না-গিয়ে *অ্যালবাট্রস* হোয়াংহোর উপত্যকা পেরিয়ে সোজা সরাসরি তিব্বতের দিকে রওনা হয়েছে।

ব্যারোমিটার দেখে বোঝা গেলো যে সমুদ্রতল থেকে তেরো হাজার ফিট উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে *অ্যালবাট্রস*—আর এত উঁচু দিয়ে যাচ্ছে ব'লেই একটা কনকনে ঠাণ্ডা পুরো উড়োজাহাজটিকে ঘিরে আছে। ঠাণ্ডার জন্যেই গায়ে কম্বল জড়িয়ে নিজেদের কামরায় ব'সে থাকাই সমীচীন বোধ করলেন তাঁরা।

সাতাশে জুন একবার ডেকে টহল দিতে এসে প্রুডেন্ট ও ইভানস দেখলেন সামনেই এক বিপুল বাধা সহস্র তুষারমুণ্ড তুলে *অ্যালবাট্রসের* দিকে তাকিয়ে আছে। এই বিপুল তুষারচূড়াগুলি ক্রমশ যেন পিছিয়ে যাচ্ছে যতই *অ্যালবাট্রস* তাদের দিকে এগুচ্ছে। মেঘ ছিঁড়ে সূর্যের রশ্মি এসে পড়েছে সেই শুভ্র তুষারপিণ্ডের উপর—আর কেলাসের মতো সেগুলো প্রতিফলিত হচ্ছে সহস্র কিরণে—যেন চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

'নিশ্চয়ই হিমালয়,' বললেন ফিল ইভানস, 'সম্ভবত রবয়ু হিমালয়ের পাশ দিয়েই

ভারতের দিকে যাবে—নিশ্চয়ই হিমালয়ের উপর দিয়ে উড়ে যাবার খ্যাপা কল্পনা তার নেই।'

'ভারতের দিকে যাচ্ছে!' আঙ্কল প্রুডেন্ট আরো বিমর্ষ হ'য়ে পড়লেন, 'সে তো আরো খারাপ! ওই উপমহাদেশে আমরা কি—'

'ভারতে না-গেলে পুবদিকে ব্রহ্মদেশে গিয়ে পৌঁছুতে পারে। বা যদি পশ্চিম দিকে যায় তাহ'লে নেপালে গিয়ে পৌঁছুবে!'

'গোল্লায় যাক!' প্রুডেন্ট তাঁর উষ্মা প্রকাশ করলেন, 'হিমালয় পেরুতে গিয়েই শ্রীমানকে জব্দ হ'তে হবে। মানুষের সাধ্য কী ওই পর্বত পেরোয়!'

'সত্যি না কি!' টিটকিরির সুরে কে যেন কানের পাশ থেকে মন্তব্য করলে।

পরের দিন ২৮শে জুন রবয়ু নিজেই গিয়ে এঞ্জিনঘরে চাকা ধ'রে বসলো। ঠাণ্ডায় সব জ'মে যাচ্ছে। সমুদ্রতল থেকে আরো উপরে উঠেছে *অ্যালবাট্রস*, নিচে দেখা যাচ্ছে হিমালয়ের তুষারশুভ্রতা। গৌরীশৃঙ্গ, ধবলগিরি, নন্দা পর্বত— বিপুল চূড়াগুলি চোখধাঁধানো সূর্যের আলো ফিরিয়ে দিয়ে যেন সবিস্ময়ে রবয়ুর কাণ্ডকারখানা দেখছে।

কিন্তু কোনো পাখি যেখানে ওড়ে না, কোন প্রাণী যেখানে থাকে না, সেই নিষ্প্রাণ, বন্ধ্যা, তুষারমরুর শৃঙ্গময় বিশৃঙ্খলার উপর দিয়ে অত্যন্ত অনায়াসেই রবয়ু *অ্যালবাট্রসকে* চালিয়ে নিয়ে গেলো। কেমন ক'রে যে চূড়াগুলির মধ্যেকার সংকীর্ণ আকাশ দিয়ে সে এমন অনায়াসে—একবারও ঝাঁকুনি না-দিয়ে— *অ্যালবাট্রসকে* নিয়ে এলো সেটাই একটা প্রহেলিকা। তারপরেই হিমালয়ের ধবল মহিমা আস্তে-আস্তে বিপুল অরণ্যে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো—দেখা গেলো বিশাল তরাই। আর তরাইয়ের উপরে এসেই ঊর্ধ্বলোক থেকে ক্রমে নিচে নামতে শুরু করলো *অ্যালবাট্রস*।

নিরাপদ জায়গায় চালিয়ে এসেই *অ্যালবাট্রসের* এঞ্জিনঘর থেকে বেরিয়ে এলো রবয়ু। অনিচ্ছুক অতিথিদের অভিবাদন ক'রে বিনীত হাস্যমুখে চাপা অহমিকার সুরে বললে, 'আসুন, এবার আপনাদের ভারতদর্শনের ব্যবস্থা করি।'

...

ভারতদর্শনের কথা বললে কী হবে, হিন্দুস্থানের বিশাল ভূখণ্ডের উপর দিয়ে তার উড়োযান নিয়ে যাবার অভিপ্রায় রবয়ুর ছিলো না। সে-যে হিমালয় পেরিয়ে *অ্যালবাট্রসে* ক'রে ভারতে পৌঁছুতে পেরেছে, এটাই তার কাছে যথেষ্ট বাহাদুরি ব'লে গণ্য হয়েছিলো। যারা কিছুতেই *অ্যালবাট্রসের* আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হবে না ব'লে ঠিক ক'রে ব'সে আছে, তাদের তাক লাগিয়ে দেয়াই তার উদ্দেশ্য ছিলো।

আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভান্স অবিশ্যি মনে-মনে এই উড়োযানের তারিফ না-ক'রে পারলেন না; কিন্তু সেই মুগ্ধতার একভাগও তাঁরা বাইরে প্রকাশ করলেন না। বরং কী ক'রে পালানো যায়, এটাই ছিলো তাঁদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। *অ্যালবাট্রস* যখন পঞ্জাবের পঞ্চনদী-বিধৌত আশ্চর্য ভূখণ্ডের উপর দিয়ে উড়ে গেলো, সেইজন্যেই তাঁরা তখন এই রমণীয় দৃশ্যকে উপভোগ করতে পারলেন না।

২৯শে জুন সকালবেলায় তাঁদের চোখের সামনে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অতুলনীয় দৃশ্য উন্মোচিত হ'লো; হিদাস্পিসের (ঝিলম নদীকে গ্রীকরা এই নামেই রূপান্তরিত করেছিলো)

তীরে গ'ড়ে-ওঠা আশ্চর্য শহরটিকে দেখে তাঁদের ভেনিসের কথা মনে প'ড়ে গেলো। আর ভেনিসের কথা মনে হ'তেই ইওরোপের সেই নগরী থেকে আমেরিকার দূরত্বের কথাটাও আবার মনে জেগে উঠলো : কাশ্মীরের চেয়ে, ভেনিস থেকে আমেরিকা কত কাছে।

অ্যালবাট্রস কিন্তু ভারতের আকশে ঘুরে না-বেড়িয়ে পারস্য সীমান্তের উদ্দেশে চলতে লাগলো। এল বুরুজ পাহাড়ের তলায় তেহেরানি ; জুলাইয়ের দু-তারিখে পারস্য সীমান্তের অপর প্রান্তে বিশাল জলরাশি দেখা গেলো : 'কাস্পিয়ান সাগর'—দেখে ভূগোলবিদ্যায় পণ্ডিত ফিল ইভানস জানালেন।

পরের দিন কাস্পিয়ানের উপর দিয়ে *অ্যালবাট্রস* রওনা হ'লো : নিচে রুশী স্টীমারের চোঙ দিয়ে ধোঁয়া উঠছে ; কোথাও দু-মাস্তুলওলা তুর্কি পোত, কোথাও-বা মাছের নৌকোয় জেলেরা চলেছে বৃহৎ মৎস্য সংগ্রহে।

সেদিন সকালবেলায় টম টারনারের সঙ্গে বাবুর্চি তাপাজের কথা হচ্ছিলো। কী-একটা প্রশ্নের উত্তরে টম টারনার বললে, 'হ্যাঁ, প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা কাটাবো আমরা কাস্পিয়ানের উপরে।'

'তোফা !' বাবুর্চি বললে, 'তাহ'লে মাছ-টাছ ধরা যাবে এখানে।'

'ভালোই হবে।'

কাস্পিয়ান প্রায় সোয়া ছশো মাইল লম্বা ও দুশো মাইল চওড়া। *অ্যালবাট্রস* এখন আর আগের মতো জোরে যাচ্ছে না ব'লেই আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগবে এই উপসাগরটি পেরিয়ে যেতে। টারনার ও বাবুর্চির কথাবার্তা থেকে ফিল ইভানস আরো বুঝলেন মাছ ধরার সময় *অ্যালবাট্রস* একেবারে নিশ্চলই থাকবে প্রায়।

ব্যাপার বুঝে ইভানস তক্ষুনি আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন প্রুডেন্টকে। কী কথাবার্তা শুনেছেন, চুপি-চুপি তাঁকে সব খুলে বললেন। শুনে আঙ্কল প্রুডেন্ট বললেন, 'ফিল ইভানস, আমাদের নিয়ে ওই বদমাশটা যে কী করতে চাচ্ছে, তা আমি বেশ জানি—সে সম্বন্ধে আমার কোনোই ভ্রান্ত ধারণা নেই।'

'আমারও নেই,' বললেন ফিল ইভানস, 'মর্জি হ'লে যে-কোনোদিন আমাদের ছেড়ে দিতে পারে। আবার কোনোদিনও না-ও ছাড়তে পারে।'

'সে-ক্ষেত্রে *অ্যালবাট্রস* থেকে পালাবার জন্যে আমি সবকিছু করতে রাজি।'

'উড়োযানটা কিন্তু দিব্যি বানিয়েছে—মানতেই হয়।'

'না-হয় তোফা জিনিশই বানিয়েছে,' বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট, 'কিন্তু জিনিশটা এক বদমাশ ফেরব্বাজের সম্পত্তি। যণ্ডাটা আমাদের জবরদস্তি ক'রে এখানে আটকে রাখতে চায়। আইন-কানুনের বালাই নেই—যা খুশি তা-ই করে। আমাদের দিক থেকে যণ্ডাটা সবসময়েই বিপজ্জনক। যেমন সে, তেমনি তার এই *অ্যালবাট্রস*। আমরা যদি এই উড়োকলটাকে ধ্বংস করতে না-পারি—'

'আপাতত নিজেদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করলে হয় না ?' ফিল ইভানস বললেন, 'পরে না-হয় ভেবে দেখা যাবে *অ্যালবাট্রসের* কী সদ্‌গতি করা যায়।'

'তা অবিশ্যি ঠিক। সুযোগ একবার বৈ দু-বার আসবে না। কাজেই সবসময়ে তক্কে-তক্কে থাকতে হবে আমাদের—যাতে মুহূর্তের মধ্যে চম্পট দেয়া যায়। বোঝাই যাচ্ছে

অ্যালবাট্রস কাস্পিয়ান পেরিয়ে ইওরোপে ঢুকবে—ও রুশদেশ দিয়ে উত্তর-ইওরোপে ঢুকতে পারে—নয়তো পশ্চিম দিক দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যেতে পারে । কিন্তু যেখান দিয়েই ইওরোপে ও যাক না কেন, অ্যাটলান্টিকে ঢোকার আগে পর্যন্ত সবসময়ই পালাবার সম্ভাবনা থাকবে । কিন্তু একবার মহাসমুদ্রে ঢুকে গেলে—'

'কিন্তু,' ইভানস জিগেস করলেন, '*অ্যালবাট্রস* থেকে পালাচ্ছি কী ক'রে ?'

'শোনো আমার কথা ।' আঙ্কল প্রুডেণ্ট ফন্দি বাৎলালেন, 'কখনো রাত্তির বেলায় *অ্যালবাট্রস* হয়তো অনেক নিচে নেমে আসবে আকাশ থেকে—হয়তো শ-দুয়েক ফিট উপর দিয়ে যাবে । এখন, সেদিন *অ্যালবাট্রসে* দেখলুম ওই মাপের দড়ি রয়েছে—সাহস ক'রে ওই দড়ি ধ'রে অন্ধকারে ঝুলে পড়লেই—'

'হুম !' ফিল ইভানস বললেন, 'গতিক খারাপ দেখলে তা-ই করতে হবে—'

'নিশ্চয়ই । অবস্থা সঙিন হ'য়ে পড়লে তা ছাড়া আর উপায় কী । আমি লক্ষ করেছি রাত্তিরে ওই সারেঙ ছাড়া আর-কেউ ধারে-কাছে থাকে না । একবার যদি চুপিসাড়ে একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিতে পারি—'

'সাধু প্রস্তাব ! তোমার মাথা তো বেজায় ঠাণ্ডা দেখছি—তাতেই বোঝা যাচ্ছে আমরা সফল হবো । কিন্তু এখন তো আমরা কাস্পিয়ানের উপরে—কয়েকটা জাহাজ চোখে পড়ে নিচের দিকে তাকালে । এদিকে *অ্যালবাট্রসও* মৎস্যশিকারের জন্যে অনেকটা নিচে নেমে আসবে । এই ফাঁকে কিছু-একটা ক'রে ফেলা যায় নাকি ?'

'শ্ শ্ শ্ !' একটা সাবধান ক'রে দেবার আওয়াজ ছাড়লেন প্রুডেণ্ট । 'তুমি ভাবছো কেউ আমাদের পাহারায় নেই ? সেটা মস্ত ভুল ধারণা তোমার । একজন-না-একজন সবসময়েই আমাদের চোখে-চোখে রাখছে ।'

'তাহ'লে ?' ফিল ইভানস আবার বিমর্ষ হ'য়ে পড়লেন । 'রাত্তিরেও যে ওরা আমাদের উপর খেয়াল রাখে না, তা-ই বা তবে বলি কী ক'রে ?'

'রাখে, রাখুক । কিন্তু এই জেলখানা আমার আর ভালো লাগছে না । *অ্যালবাট্রস* ও রবয়ু—এই দুয়ের ব্যাপারটা যে-ক'রেই হোক চুকিয়ে ফেলতে হবে আমাদের ।'

আসলে প্রুডেণ্টদের যে এতটা আঁতে ঘা লেগেছিলো, তার একটা কারণ রবয়ুর ব্যবহার । কিছুতেই রবয়ু তাঁদের কোনো আমল দেয় না ; প্রায়ই এমনভাবে টিটকিরি দেয় যে সারা গায়ে যেন বিছের কামড়ের জ্বলুনি শুরু হ'য়ে যায় । লোকের কাছে পাত্তা পেয়ে-পেয়ে অভ্যস্ত ব'লেই অসহায়ভাবে এই ঠাট্টার হুল তাঁদের বুকে আরো বেশি ক'রে বেঁধে ।

সেদিনই এমন-একটা ঘটনা ঘ'টে গেলো যার জন্যে রবয়ুর সঙ্গে তার অনিচ্ছুক অতিথিদের খিটিমিটি আরো বেড়ে গেলো । গণ্ডগোলটার কারণ হচ্ছে ফ্রাইকোলিন । নিজেকে নিঃসীম সমুদ্রের উপর আবিষ্কার ক'রে আবার একদফা আতঙ্কে ভ'রে গিয়েছিলো সে । বাচ্চা ছেলের মতো হাউ-মাউ ক'রে কান্নাকাটি শুরু ক'রেই কেবল ঠাণ্ডা হয়নি, নানাভাবে ইনিয়ে-বিনিয়ে অবিশ্রাম নালিশ করতে লাগলো ভাগ্য নিয়ে, ভেউ-ভেউ ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে নাকি সুরে প্যাঁচাল পাড়তে লাগলো ।

'আমি এখানে থাকবো না—আমি বেরিয়ে পড়তে চাই এখান থেকে । আমি কি পাখি নাকি ! ও-হো-হো ! উড়তে চাই না—এখানে থেকে নেমে পড়তে চাই— সেই যে ঘ্যানর-

ঘ্যানর শুরু করলে, একেবারে কানের পোকা বার ক'রে ছেড়ে দিলে ।

বলাই বাহুল্য, আঙ্কল প্রুডেন্ট তাকে সান্ত্বনাও দিলেন না, শান্ত করারও চেষ্টা করলেন না। বরং তাকে উসকেই দিলেন গোপনে—যখন লক্ষ করলেন এই নাকি কান্নায় রবয়ু কেবলই উত্যক্ত হ'য়ে উঠছে ।

টম টারনার যখন তার স্যাঙাৎদের নিয়ে মাছ ধরার জন্যে সব উদ্‌যোগ-আয়োজন করছে, তখন ত্যক্ত-বিরক্ত রবয়ু আর থাকতে না-পেরে ফ্রাইকোলিনকে তার কুঠুরিতে আটকে রাখতে হুকুম দিলে । আর এটা শুনেই ফ্রাইকোলিনের মড়া কান্না আরো শতগুণ বেড়ে গেলো ।

তখন বেলা দুপুর । *অ্যালবাট্রস* তখন জল থেকে মাত্র উনিশ-কুড়ি ফিট উপরে । দু-একটা জাহাজ ইতিমধ্যেই আকাশে ওই বিকট চিলের ছা দেখে হুড়মুড় ক'রে জল কেটে পালিয়েছে । এদিকে বন্দীদের উপরও বেশ-একটা কড়া পাহারা রাখা হয়েছে । যদি জলে ঝাঁপ খেয়েও পড়েন, ইণ্ডিয়া রবারের নৌকো-নামিয়ে জল থেকে তাঁদের তুলে আনার ব্যবস্থা ক'রে রাখা হয়েছে । ফলে পালাবার সংকল্প আপাতত বাতিল ক'রে ইভানস ঠিক করলেন মাছ ধরাতেই যোগ দেবেন । প্রুডেন্ট অবিশ্যি যথারীতি রাগে গজ-গজ করতে-করতে নিজের কেবিনে গিয়ে ঢুকে পড়লেন ।

ঘন্টাখানেক ধ'রে নানাভাবে মাছ ধরা হ'লো—আর *অ্যালবাট্রসের* লোকজনেরাও বেশ খুশি, অনেক দিন পরে টাটকা মাছ খেয়ে মুখের রুচি ফিরিয়ে আনা যাবে ব'লে । বেশ জুত ক'রে মাছ-টাছ ধ'রে *অ্যালবাট্রস* আবার উত্তরমুখো যেতে শুরু করলে ।

এদিকে মাছ ধরার সময় আগাগোড়া নিজের কামরায় আটকা প'ড়ে ফ্রাইকোলিন চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একাকার কাণ্ড ক'রে ফেলেছে, দেয়ালে লাথি মারতে-মারতে একাই একশোজনের মতো শোর তুলেছে সে ।

রবয়ু একেবারে অস্থির হ'য়ে গেলো । 'ওই হতচ্ছাড়াটা তাহ'লে কিছুতেই চুপ করবে না ?'

'আমার তো মনে হয় । তার ও-রকম নালিশ করার বেশ যোগ্য কারণ রয়েছে,' বললেন ফিল ইভানস ।

'হুঁ । তবে আমারও নিজের কান বাঁচাবার অধিকার রয়েছে কি না !'

'এঞ্জিনিয়ার রবয়ু !' প্রুডেন্ট ততক্ষণে আবার ডেকে ফিরে এসেছেন ।

'বলুন, ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতিমশাই !'

দুজনেই দুজনেই দিকে এগিয়ে গেলেন—একে-অন্যের চোখের শাদার দিকে তাকিয়ে রইলেন, শেষটায় রবয়ু কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্যদের নির্দেশ দিলে, 'হতভাগাটাকে একটা দড়িতে বেঁধে ফ্যালো !'

টারনার তক্ষুনি এই নির্দেশের গূঢ়ার্থটা বুঝে ফেললে । টেনে-হিঁচড়ে ফ্রাইকোলিনকে তার কুঠরি থেকে বার ক'রে নিয়ে আসা হ'লো । যখন টারনার ও তার আরেক স্যাঙাৎ তাকে একটা দড়ি বেঁধে ফেললে, তখন তার বিকট নিনাদ বিকটতর হ'য়ে উঠতে লাগলো । ফ্রাইকোলিন গোড়ায় ভেবেছিলো তাকে বুঝি ফাঁস লাগিয়েই মারা হবে ; তার বদলে—রবয়ু জানালে—সেই একশো ফিট লম্বা দড়িতে বেঁধে তাকে *অ্যালবাট্রস* থেকে শূন্যে ঝুলিয়ে দেয়া

হবে। 'তারপর সে যদৃচ্ছা চ্যাঁচাতে পারে,' রবয়ু বললে। কিন্তু ভয়ে ততক্ষণে ফ্রাইকোলিনের গলা শুকিয়ে কাঠ। সে-যে বলবে এবার তাকে ছেড়ে দেয়া হোক, সে-ক্ষমতা পর্যন্ত তার হ'লো না। আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভানস এগিয়ে এসে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু তাঁদের পাত্তা না-দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হ'লো!

'ইতর কাণ্ড! কাপুরুষের কাজ!' আঙ্কল প্রুডেন্ট রাগে কাঁপতে লাগলেন।

'তাই নাকি?' রবয়ু ঠাট্টা করলে।

'এটা ক্ষমতার অপব্যবহার—আমি এর প্রতিবাদ করি!'

'করুন গিয়ে, যান!'

'এর শোধ একদিন নেবো!'

'যেদিন খুশি বলবেন—অধীন হাজির থাকবে!'

'নেবো, শোধ নেবো। কিছুতেই ছাড়বো না। দেখিয়ে দেবো, বদমায়েশির সাজা কী ক'রে দিতে হয়...'

'বাস, ঢের হয়েছে, আর না!' রবয়ুর গলা ভারিক্কি হ'য়ে এলো। 'মনে রাখবেন আরো-কয়েক গাছা দড়ি আছে *আলবাট্রসে*। আপনি যদি চুপ না-করেন, তাহ'লে আপনারও ও-রকম দশা হবে!'

আঙ্কল প্রুডেন্ট চুপ ক'রে গেলেন। না, ভয়ে নয়, রাগে তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথা ফুটলো না ব'লে। সামলে নিয়ে কিছু-একটা বলতেন হয়তো, কিন্তু তার আগেই ফিল ইভানস তাঁকে টেনে নিয়ে চ'লে গেলেন নিজেদের কামরায়।

এদিকে গত একঘণ্টা ধ'রে আবহাওয়া যেন কি-রকম বিষম হ'য়ে উঠেছিলো। লক্ষণগুলো দেখে ভুল হবার কিছু ছিলো না। ঝড় আসন্ন। আবহাওয়া থেকে যেন বিদ্যুৎ চুঁইয়ে পড়ছে—আর এই জাতীয় তড়িৎস্পৃষ্ট মেঘ-বাতাস রবয়ুর কাছে কিঞ্চিৎ নতুন ঠেকলো।

ঝড় আসছে উত্তর থেকে। মেঘের নানা স্তরে তড়িৎশক্তির তারতম্যের জন্যে বাতাস কি-রকম যেন দীপ্ত ও স্বতঃপ্রভ হ'য়ে উঠেছে—দেখে মনে হচ্ছে কী-একটা ভয়ংকর আভা যেন ঘুরে-ঘুরে এগিয়ে আসছে। আর তার ছায়া পড়েছে জলে, অমনি জলও যেন ঝিকিয়ে উঠছে। সেই দীপ্ত আভা আরো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আকাশ কালো মেঘে ভ'রে গেছে ব'লেই। আর *অ্যালবাট্রসের* সঙ্গে যে এই বিষম ঝড়ের দেখা হবে তাতে কোনো সংশয় নেই—কেননা *অ্যালবাট্রস* যাচ্ছে উত্তরদিকে, আর ঝড় আসছে সেই দিক থেকেই!

আর ফ্রাইকোলিন? ফ্রাইকোলিনকে সত্যি ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিলে *অ্যালবাট্রস* থেকে। দড়িটায় ঝুলতে-ঝুলতে সেও এগুচ্ছে ওই ঝড়ে দিকে।

চারদিকে একটা সাড়া প'ড়ে গেছে, সবাই ঝড়ের হাত থেকে উড়োযানকে বাঁচাবার জন্যেই ব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত। অ্যালবাট্রসকে ঝড়ের নাগাল এড়াতে হ'লে হয় এই ঝোড়ো হাওয়ার উপরে উঠে যেতে হবে, নয়তো সোজা আরো অনেক নিচে নেমে যেতে হবে। এখন সে যাচ্ছে সমুদ্রের তিন হাজার ফিট উপর দিয়ে। হঠাৎ এমন সময় গুমগুম আওয়াজ ক'রে একটা বাজ গড়িয়ে এলো—তার পরেই ঝড় ঘা দিলে তাকে প্রবল এক ঝাপটার মতো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অতঃপর বিষম রাগী, বৈদ্যুতিক মেঘ তাকে ফিরে ফেললো।

ফিল ইভানস ছুটে বলতে গেলেন ফ্রাইকোলিনকে দড়ি ধ'রে টেনে তোলবার জন্যে। গিয়ে দেখলেন রবয়ু ইতিমধ্যেই এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছে এবং টারনাররা দড়ি ধ'রে টেনে-টেনে ফ্রাইকোলিনকে উড়োযানে প্রায় তুলে ফেলেছে। এমন সময় হঠাৎ *অ্যালবাট্রসের* গতি কি-রকম মন্থর হ'য়ে গেলো : চাকাগুলো বন্ধ হবার দাখিল। রবয়ু এঞ্জিনঘরের দিকে ছুটে গেলো : 'চটপট জোরে চালাও—আরো বিদ্যুৎ চাই।' সে চীৎকার করলে, 'এক্ষুনি আমাদের আরো উপরে উঠে গিয়ে ঝড়ের পাল্লার বাইরে চ'লে যেতে হবে।'

'অসম্ভব!'

'কী হয়েছে?'

'বিদ্যুৎ ক'মে আসছে! কিছুতেই যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় আকাশের বিদ্যুৎ সব শুষে নিয়ে যাচ্ছে।'

ঝড়ের সময় টেলিগ্রাফের তার যেমন বাজ প'ড়ে বিকল হ'য়ে যায়, *অ্যালবাট্রসের* বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রেরও এখন সেই দশা। কিন্তু টেলিগ্রাফের তার বিকল হ'লে অসুবিধে হয় কেবল বার্তাপ্রেরণে—অ্যালবাট্রসের বেলায় সেটা হ'লো মরণবাঁচনের সমস্যা।

'তাহ'লে তাকে আরো নিচে নামিয়ে নিতে হ'বে,' বললে রবয়ু, 'শিগগিরই এই তড়িৎস্পৃষ্ট অঞ্চল থেকে বেরিয়ে পড়া চাই। মাথা ঠাণ্ডা রেখো সব্বাই—ভয় পেয়ো না।'

অ্যালবাট্রস কয়েকশো ফিট নিচে নেমে গেলে কী হবে, তখনো বিদ্যুৎভরা মেঘমণ্ডল ছাড়াতে পারেনি। চারপাশে তুবড়ির মতো বাজ ফাটছে, বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে আতশবাজি বা ফুলঝুরির মতো। বুঝি তড়িতাহত হ'য়ে *অ্যালবাট্রস* ধ্বংসই হ'য়ে যায়। ক্রমশ চাকাগুলো মন্থর হ'য়ে যাচ্ছে—ফলে যে-অবতরণ হ'তে পারতো নিরাপদ ও সহনীয়, তাই ক্রমশ আকাশ থেকে আছড়ে-পড়ার রূপ নিচ্ছে। বুঝি আরেকটু পরেই আছড়ে পড়তে হবে সমুদ্রে—আর একবার আছড়ে পড়লে সলিল সমাধির হাত থেকে আর রেহাই নেই।

হঠাৎ তাদের উপরে একটা বিদ্যুৎভরা মেঘ দেখা দিলে। *অ্যালবাট্রস* তখন ঢেউ থেকে মাত্র ষাট ফিট উঁচুতে। আরেকটু পরেই ডেকটা জলের তলায় চ'লে যাবে।

কিন্তু রবয়ু তখনিই গিয়ে প্রাণপণে লিভার ধ'রে টান দিলে সজোরে—অমনি হঠাৎ আবার বিদ্যুৎশক্তি ফিরে এলো, চাকাগুলো ঘুরতে শুরু করলে স্বাভাবিক বেগে, নিচে পড়াটা হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেলো। আর সেই অবস্থাতেই প্রপেলারগুলো পূর্ণবেগে *অ্যালবাট্রসকে* ঝড়ের পাল্লার বাইরে নিয়ে এলো।

ঝড়ের মধ্যে ফ্রাইকোলিন কয়েক মুহূর্তেই রীতিমতো স্নান ক'রে নিয়েছিলো—যখন তাকে টেনে তোলা হ'লো *অ্যালবাট্রসে*, সে একেবারে ভিজে একশা—যেন সমুদ্র থেকে ডুব দিয়ে উঠেছে। আর-যে সে কান্নাকাটি করছিলো না, সেটা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না।

চৌঠা জুলাই সকালবেলায় *অ্যালবাট্রস* কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরতীরের উপর দিয়ে চ'লে গেলো।

১০

দাহোমেতে খণ্ডযুদ্ধ

যদি কখনো প্রুডেন্ট আর ইভানস *অ্যালবাট্রস* থেকে পালাবার কথা ভেবে-ভেবে একেবারে মরীয়া হ'য়ে ওঠেন তো সে হলো পরের দু-দিনে। তার একটা কারণ হয়তো এই যে ইওরোপের উপর দিয়ে যাবার সময় বন্দীদের উপর নজর রাখাটা কঠিন ঠেকেছিলো রবয়ুর কাছে—কেননা এটা সে সহজেই বুঝতে পেরেছিলো যে এঁরা পালাবেন ব'লেই মনস্থির ক'রে ফেলেছেন।

কিন্তু ওই দু-দিনে পালাবার চেষ্টা করাটাই আত্মহত্যার শামিল হ'তো। ষাট মাইল বেগে চলেছে, এমন-কোনো এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে ঝাঁপ খাওয়াটাই একঅর্থে জীবন সংশয় করা; কিন্তু সোয়াশো মাইল বেগে চলছে এমন-কোনো উড়োযান থেকে লাফিয়ে-পড়ার মানেই হ'লো মৃত্যুকে ডেকে-আনা। *অ্যালবাট্রস* সারাক্ষণই এই গতিতেই উড়াল দিচ্ছিলো, একেবারে পুরোদমে। সোয়ালো পাখির চেয়েও তার গতি বেশি, কারণ সোয়ালো ওড়ে ঘণ্টায় একশো বারো মাইল।

আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে অ্যালবাট্রস; মেঘের আড়াল থেকে নিচে কখনো উঁকি দিচ্ছে ভোলগার তীর, ডননদীর স্তেপভূমি কি বিশাল উরাল—কখনো আবার সব ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছে মেঘের পাৎলা পর্দায়। চৌঠা জুলাই সন্ধেবেলায় চোখে পড়লো মস্কোভার ক্রেমলিন প্রাসাদ—রাত দুটোয় নেভার তীরে সেন্ট পিটার্সবুর্গ। তারপর পর-পর দেখা দিলে আর মিলিয়ে গেলো বলটিক সাগর, স্টকহোম, ক্রিস্টিয়ানা। এই বারোশো মাইল পেরিয়ে যেতে সময় লাগলো মাত্র দশঘণ্টা। এইভাবে গেলে পৃথিবী ঘুরে আসতে তার ক-দিনই বা লাগবে?

আর ইওরোপের উপর দিয়ে এই আশ্চর্য গতিতে উড়ে-চলার সময় প্রুডেন্ট বা ইভানসের পক্ষে ডেকে দাঁড়ানোও অসাধ্য ছিলো, দড়ি ধ'রে ঝুলে-পড়া তো দূরের কথা। কারণ *অ্যালবাট্রস* এত জোরে যাচ্ছিলো যে ডেকে গিয়ে দাঁড়ালে হাওয়ার ধাক্কায় বেমালুম উড়ে-যাওয়াটাও অসম্ভব ছিলো না। তবু তাঁরা মনে-মনে একটা মৎলব খাড়া ক'রে ফেললেন।

আঙ্কল প্রুডেন্ট নস্যি নিতেন—কোনো মারকিনের এই বদভ্যেসটা ক্ষমা করাই উচিত, কারণ এর চেয়েও মন্দ অভ্যেস যে নেই এটাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট গুণের। এই ক-দিনের উত্তেজনায় বারে-বারে মোটা-মোটা আঙুলে নাকে পুরে-ফেলায় নস্যি আর নেই এখন—নস্যিদানিটাই কেবল ফাঁকা প'ড়ে আছে। প্রুডেন্টের এই নস্যির কৌটোটা অ্যালুমিনিয়ামের। তাঁরা স্থির করলেন জাহাজ থেকে লোকে যেমন ক'রে বোতলে 'এস.ও. এস,' বা বিপদবার্তা লিখে ভালো ক'রে ছিপি আটকে জলে ফেলে দেয়, তেমনি তাঁরাও একটা কাগজে রবয়ু, *অ্যালবাট্রস* ও নিজেদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য লিখে নিচে ফেলে দেবেন। নিচে কারু হাতে পড়লে সে নিশ্চয়ই সেটা কোতোয়ালিতে কি থানার বড়ো-কর্তার কাছে নিয়ে যাবে—আর তা থেকেই 'গগনেশ্বর' রবয়ুর দুই বন্দীর কথা জগৎজনে জেনে ফেলতে পারবে।

কিন্তু *অ্যালবাট্রসের* তীরগতির জন্য আপাতত যেহেতু ডেকে যাওয়াটাই অসাধ্য হ'য়ে উঠেছে, সেই জন্যে দুই বন্ধু কামরায় ব'সে-ব'সে আরো নানারকম ফন্দি আঁটবার চেষ্টা করতে লাগলেন ।

আস্তে-আস্তে সকাল হ'য়ে গেলো । *অ্যালবাট্রস* ওইভাবেই সমানে চলেছে । নিচের উত্তর সাগরের বিশাল জলরাশি । সারা দিন কেটে গেলো, তবু একবারও ডেকে আসার সুযোগ পেলেন না প্রুডেন্ট ও ইভানস ।

রাত দশটা নাগাদ *অ্যালবাট্রস* ডানকার্কের কাছে ফরাশি সীমান্ত অতিক্রম করলো । তিন হাজার ফিট উপর দিয়ে সেই একশো কুড়ি মাইল বেগেই চলেছে সে তখনো—যেন হাউইয়ের মতো উত্তর-ফ্রানসের ছোটো-ছোটো গ্রামগুলির উপর দিয়ে চ'লে যাচ্ছে সে ।

হঠাৎ পারীর উপর এসে *অ্যালবাট্রসের* গতি অনেকটা মন্থর হ'য়ে গেলো, অনেক নিচেও নেমে এলো আকাশ থেকে—মাটি থেকে মাত্র কয়েকশো ফিট উপরে সে ভাসতে লাগলো । কেন-যে রবয়ু হঠাৎ পারীনগরীর উপর *অ্যালবাট্রসকে* থামালে, কোন খেয়ালে, তা কেউ জানে না । থামতেই *অ্যালবাট্রসের* সমস্ত লোক ভালো ক'রে নিশ্বেস নেবার জন্যে ডেকে এসে দাঁড়ালে—আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভানসও এই চমৎকার সুযোগটি হাতছাড়া করলেন না । শুধু একটা বিষয়ে দুজনে খুব সাবধান হলেন—নস্যির কৌটোটা নিচের ফেলে দেবার সময় কারু যেন তা চোখে না-পড়ে ।

আস্তে সেই মস্ত শহরের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে *অ্যালবাট্রস* । নিচে এডিসন-বাতিতে ঝলসে-ওঠা বুলভার, নানা ধরনের শকটের শব্দ, নগরীর আশপাশে রেলগাড়ির বাঁশি আর ধোঁয়া । সম্ভবত ফ্রানসের হাসিখুশি আড্ডাবাজ শৌখিন নাগরিকদের কাছে দেখা দিয়ে জাঁক দেখাতে চাচ্ছিলো রবয়ু—সেইজন্যেই এখানটায় এত মন্থরভাবে এত নিচে দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিলো । কেবল তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকেনি—সেই সঙ্গে টম টারনারও বের ক'রে নিয়েছিলো তার শিঙা, আর তার শিঙার শব্দে চমকে উঠেছিলো আস্ত পারীনগরী ।

আর ঠিক সেই সময়ে, সচকিত পারীবাসিন্দারা উপরে চোখ তুলে তাকাতেই আঙ্কল প্রুডেন্ট রেলিঙের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তাঁর নস্যির কৌটোটা ফেলে দিলেন ।

আর তারপরেই দুম ক'রে আবার উপরে উঠে গেলো *অ্যালবাট্রস*, আলো নিভিয়ে দেয়া হ'লো বাড়িয়ে দেয়া হ'লো তার গতি—আর নতুন-কোনো দেশের উদ্দেশে চলতে লাগলো সে । কোথায় যাবে সে এখন ? আমেরিকার পরে গেছে এশিয়ার । এশিয়ার পরে, ইওরোপে । তেইশ দিনের মধ্যে তিন মহাদেশ ঘুরে এসেছে সে । এখন যাবে কোথায় ? কালো আফ্রিকার জানা-অজানা দিগন্তের উদ্দেশেই কি এবার তার যাত্রা !

...

সেই বিখ্যাত নস্যির কৌটোটার কী হ'লো, সেটা জানবার জন্যে পাঠকের কৌতূহল হ'তে পারে ।

নস্যির কৌটোটা পড়েছিলো রু দ্য রিভোলির দুশো নম্বর বাড়ির উলটো দিকটায় । রাস্তাটায় তখন কেউ ছিলো না । সকালবেলায় এক ঝাড়ুদার রাস্তা সাফ করতে এসে পেলে সেটাকে । সে-ই নস্যির কৌটোটা কোতোয়ালিতে পৌঁছে দিলে ।

কোতোয়ালির লোকেরা প্রথমটায় তাকে ভাবলে বুঝি কোনো হাতবোমাটোমা হবে—কাল রাত্তিরে আকাশে ওই পৌরাণিক পক্ষী দেখেই তাদের হ'য়ে গিয়েছে। শেষটায় অনেক সাবধানে সেটাকে খোলা হ'লো।

খুলতেই মস্ত এক বিস্ফোরণ। ইন্‌সপেক্টর সাহেব এত জোরে হেঁচে ফেললেন যে জানলার খড়খড়ি প'ড়ে গেলো, টেবিলের ফুলদানিটা চিৎপটাং, এক শাগরেদ কফি খাচ্ছিলো—পেয়ালাটা তার হাত থেকে মাটিতে প'ড়ে চৌচির।

অতঃপর সেই নস্যির কৌটো থেকে বেরুলো এক চমকপ্রদ ইশতেহার। সাবধানে সেটা খুলে পড়া হ'লো :

'ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সচিব আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভানস রবয়ু নামে এক এঞ্জিনিয়ার তার মস্ত বিমান *অ্যালবাট্রস*-এ বন্দী ক'রে নিয়ে চ'লে গেছে। দয়া ক'রে যেন এই সংবাদ প্রুডেন্ট ও ইভানসের বন্ধুবান্ধবদের পৌঁছে দেয়া হয়।'

খবরটা বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে পড়তেই ইওরোপ ও আমেরিকা অনেকটা শান্ত হ'লো। অনেক প্রহেলিকার সমাধান পাওয়া গেলো, দুটো গুমখুনের রহস্যভেদ হ'লো—আর জ্যোতির্বেত্তাদেরও সেই আশ্চর্য নভোচারী বস্তুটির অর্থ ভেবে-ভেবে মাথা গরম করতে হ'লো না।

...

অ্যালবাট্রসের বিশ্বভ্রমণের এই পর্যায়ে এসে মনে হয় কতগুলো জরুরি প্রশ্নের উত্তর জেনে নেয়া আবশ্যিক হ'য়ে উঠেছে। অন্তত সদুত্তর পাওয়া না-গেলেও প্রশ্নগুলোকে সাজিয়ে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে নেয়া উচিত। কে এই রবয়ু, যার নামটুকু ছাড়া আর-কিছুই আমাদের জানা নেই? সে কি তার সারা জীবনই আকাশে কাটিয়েছে? তার এই উড়োযান কি কখনোই বিশ্রাম নেয় না? কোনো দুর্গম অঞ্চলে তার কি কোনো আশ্রয় আছে, যেখানে গিয়ে মাঝে-মাঝে সে জিরিয়ে নেয়—কিংবা *অ্যালবাট্রসের* কলকব্জাগুলিকে ঠিকঠাক করে? না যদি থাকে, তাহ'লে বড্ড কিন্তু অবাক লাগবে। সবচেয়ে শক্তিশালী নভোচর প্রাণীরও একটা বাসা থাকে, কোথাও-না-কোথাও।

আর, তাছাড়া, তার বন্দীদের নিয়েই বা সে কী করবে? সে কি তাঁদের আজীবন আটকে রাখবে? চিরন্তন আকাশ-ওড়াই কি তাঁদের ভবিতব্য? এই উড়ান কি চিরকাল চলবেই? না কি সে কেবল তাঁদের পাঁচ মহাদেশ সাত সাগর ঘুরিয়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দেবে?—আর ছেড়ে দেবার আগে বলবে, 'তাহ'লে এবার তো মশায়রা দেখলেন বাতাসের চেয়ে ভারি বিমান সম্ভব কি না?'

এ-সব খটকা সহজে মিটবে ব'লে মনে হয় না। এ-সব প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে লুকিয়ে আছে। হয়তো উত্তরগুলি আপনা থেকেই উদ্‌ঘাটিত হবে—হয়তো কোনো-দিন হবেই না।

অন্তত এটা ঠিক যে উড্ডীন রবয়ু আর যা-ই হোক, উত্তর-আফ্রিকায় বিশ্রাম নিতে যাচ্ছে না। যে-গতিতে সে গিয়ে টেল পর্বত পেরিয়ে শাহারা মরুভূমিতে শুকতারার উত্থান দেখলে, তাতে বোঝা গেলো এখানে কোথাও থেমে জিরিয়ে নেবার সংকল্প বা পরিকল্পনা তার আদৌ নেই।

অ্যালবাট্রস পুরোদমে উড়ছে, পেরিয়ে যাচ্ছে চেটকা, ওয়ারগ্লা, এল গোলিয়া, কর্কটক্রান্তি, নাইজার নদী।

নাইজার নদীর তীরে যখন নিচের শহরটি দেখা যাচ্ছে, তখন রবয়ু এসে প্রুডেন্টদের কাছে দাঁড়ালে মৃদু হেসে। 'ওই দেখুন, টিমবাকটু।' এমনভাবে সে বললে যে প্রুডেন্টদের মনে প'ড়ে গেলো ঠিক বারো দিন আগেই এইভাবেই সে বলেছিলো, 'এবার আপনাদের ভারত দর্শন করাই।'

'টিমবাক্‌টু কিন্তু খুব পুরোনো শহর, নানা কারণে বেশ বিখ্যাত। হাজার তেরো লোক থাকে এখানে—এককালে কলা ও বিজ্ঞানে টিমবাকটুর খুব খ্যাতি ছিলো। দু-একদিন থাকবেন নাকি এখানে? দেখতে চান শহরটা।

রবয়ুব প্রস্তাবে যে-টিটকিরির ভঙ্গি ছিলো, সেটা প্রুডেন্টের শরীরে আবার জ্বালা ধরিয়ে দিলে। 'কিন্তু,' উত্তর না-শুনেই সে আবার বললে, 'আকাশ থেকে নামছেন দেখে কাফ্রিরা কিন্তু কুসংস্কারের বশবর্তী হ'য়ে আপনাদের যা-তা ক'রে বসতে পারে।'

'শুনুন মশাই,' ফিল ইভানস যেন বিনয়ে বিগলিত হলেন, 'আপনার আতিথেয়তা থেকে রক্ষা পেলে কাফ্রিদের দুরন্ত অভ্যর্থনাও মধুর ঠেকবে। জেলখানাই যদি বরাতে জোটে, তাহ'লে বরং *অ্যালবাট্রসের* চেয়ে টিমবাকটুর জেলখানাই অনেক বেশি অভিপ্রেত বোধ হবে।'

'যার যেমন রুচি,' রবয়ু বললে, 'তবে আমি অবশ্য ওই ধরনের অ্যাডভেনচারে সম্মতি দিতে পারবো না। কারণ আমার সম্মানিত অতিথিদের নিরাপত্তার দায়িত্বটাও আমারই কি না।'

'অর্থাৎ কেবল জেলের ওয়ার্ডেন হ'য়েই আপনি খুশি হচ্ছেন না—আমাদের যথেচ্ছ অপমান করাটাও নিত্যকর্মের অন্তর্ভূত ক'রে নিয়েছেন?'

'না-না, অপমান কোথায়! এই একটু বিনীত ব্যঙ্গের অবতারণা করেছিলুম আর-কি।'

'*অ্যালবাট্রসে* কোনো বন্দুক-টন্দুক আছে?' প্রুডেন্ট জিগেস করলেন।

'সে তো ভাঁড়ার ভর্তি!'

'দুটো রিভলবার হ'লেই চলবে—যদি আপনি একটা নেন, ও আমি একটা নিই!'

'ডুয়েল লড়বেন? দ্বন্দ্বযুদ্ধ? তাতে তো আমাদের একজন অক্কা পাবে!'

'সেইজন্যেই তো প্রস্তাবটা করলুম।'

'উঁহু! শুনুন ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতিমশাই, আপনাকে জিইয়ে রাখতেই চাই আমি।'

'যাতে নিজের বেঁচে-থাকাটা নিশ্চিত হয়? তা এটা সুবুদ্ধির লক্ষণ বটে!'

'সুবুদ্ধির কথা হচ্ছে না—আমার যা পছন্দ তা-ই বলছি। আপনি যা-ইচ্ছে তা-ই ভাবতে পারেন—ইচ্ছে হ'লে যারা আপনাদের সাহায্য করতে পারে,—তাদের কাছে আমার বিরুদ্ধে ঘ্যানঘেনে নালিশ করতে পারেন—আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।'

'আপনার অবগতির জন্যে বলি: আমরা তাও করেছি।'

'সত্যি!'

'এটা কি এতই অসম্ভব ? যখন ইওরোপের ঘন বসতি পেরিয়ে আসছিলুম, তখন একটা চিরকুট নিচে ফেলে দেয়া কি খুব কঠিন কর্ম ?'

রবয়ু হঠাৎ রাগে অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠলো । 'আপনি এ-কাজ করেছেন ?'

'যদি ক'রে থাকি—,'

'যদি ক'রে থাকেন—যদি ক'রে থাকেন তো আপনাদের—'

'থামলেন কেন, ব'লে ফেলুন । আমাদের ?'

'তো আপনাদেরও ওই চিরকুটকেই অনুসরণ করতে হবে ।'

'নিচে ফেলে দেবেন আমাদের ? তা বেশ তো, তা-ই করুন । কারণ আমরা ও-কাজ সত্যি করেছি ।'

রবয়ু তাঁদের দিকে এক পা এগিয়ে গেলো । তার ইঙ্গিতে ততক্ষণে টারনার ও আরো-কয়েকজন সে-দিকে ছুটে আসছে । কিন্তু বহুকষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে সে ছুটে নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকলো ।

'বেশ হয়েছে !' বললেন ফিল ইভানস ।

'বদমায়েশটা যে-কাজ করতে সাহস পেলো না,' আঙ্কেল প্রুডেন্ট বললেন, 'সেটা আমিই করবো । হ্যাঁ, আমিই করবো ।'

সেই মুহূর্তে নিচে পিল-পিল ক'রে বেরিয়ে এসেছে টিমবাকটুর লোকজন, সেই উড়ো ড্র্যাগনের উদ্দেশে কী-ভীষণ চ্যাঁচামেচি তাদের ! রাইফেলের বুলেটের চেয়ে সেইসব চীৎকার অবিশ্যি অনেক নিরাপদ, তবে এটা তাদের ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেলো যে *অ্যালবাট্রস* যদি নিচে নামতো তো তারা তাকে ছিঁড়েই ফেলতো ।

সন্ধে হ'য়ে এলো । নিচে থেকে হাতির বৃংহিত শোনা যাচ্ছে, মোষের রাগী গর্জন ; নাইজারের তীরে গাছপালার ঘন সারি । যদি কোনো ভৌগোলিক *অ্যালবাট্রসের* মতো কোনো উড়োযান পেতেন তাহ'লে কত সহজে এই মস্ত মহাদেশের মানচিত্র এঁকে নিতে পারতেন ।

এগারো তারিখ সকালবেলায় উত্তর-গিনির পাহাড় পেরিয়ে গেলো *অ্যালবাট্রস* ; সুদান আর গিনি উপসাগরের ওপাশে দিগন্তে তখন দাহোমে রাজ্যের কং পর্বত দেখা যাচ্ছে ।

টিমবাকটু পেরিয়ে আসার পর থেকেই সোজা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলো *অ্যালবাট্রস* । এইভাবে এগুতে থাকলে শেষ অবধি অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পড়বে উড়োযান । আর অ্যাটলান্টিকে পৌঁছুলে প্রুডেন্ট ও ইভানসের পালাবার আশা একেবারে নাস্তি ।

কিন্তু *অ্যালবাট্রসের* গতি এদিকে হঠাৎ কিছুটা মন্থর হ'য়ে এসেছে, যেন আফ্রিকা ছেড়ে যেতে তার বিশেষ ইচ্ছে নেই—একটু যেন দোমনা ভাব । রবয়ু কি তবে ফিরে যাবার মৎলব আঁটছে না কি ? না ; কিন্তু যে-অঞ্চলটা দিয়ে তারা এখন উড়ে যাচ্ছে, রবয়ু কেন যেন তার প্রতি হঠাৎ বিশেষভাবে আকৃষ্ট বোধ করছে ।

এটা সে জানে যে আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূলে দাহোমে রাজ্য বেশ শক্তিশালী ; প্রতিবেশী অশান্ত রাজ্যের সঙ্গে বহু সংঘর্ষ সত্ত্বেও সে নিজের অধিকার বজায় রাখতে পেয়েছে এতাবৎকাল ; আয়তনের দিক থেকে রাজ্যটা মোটেই বৃহৎ নয়—উত্তরে-দক্ষিণে মাত্র তিনশো ষাট লিগ, আর পুবে-পশ্চিমে একশো-আশি লিগ ; কিন্তু তার লোকসংখ্যা সাত-আটশো হাজার তো হবেই ।

দাহোমে কোনো বৃহৎ রাজ্য না-হ'লেও নানা প্রসঙ্গে তার কথা প্রায়ই উঠে থাকে। এখানকার বার্ষিক উৎসবগুলোর বিষম নিষ্ঠুর প্রথার কথা অনেকেই জানে—নরবলি হয় তখন, শত্রুদের মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয়। এক রাজার পর আরেক রাজার অভিষেকের সময় পূর্ববর্তী রাজার অনুচরদের ছিন্ন দেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোয়। এই তথ্যগুলো নানা শ্বেতাঙ্গ পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্তে এতই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে এখানে তার পুনরাবৃত্তি ক'রে লাভ নেই।

অ্যালবাট্রস যখন দাহোমে রাজ্যের উপর উড়ে যাচ্ছে, বুড়ো রাজা বাহাদু তখন সদ্য মারা গেছেন, এবং সারা দেশ নতুন রাজার অভিষেক-উৎসবে উত্তেজিত ও অস্থির। সেই জন্যেই রবয়ু তার বিমান থেকে দেখলে চারদিকেই কেমন-একটা তাড়াহুড়ো ছুটোছুটির ভাব। রাজধানী আবোমের দিকে দলে-দলে ছুটেছে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা।

রেলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রবয়ু যেন কোনো বিশেষ চিন্তায় গভীরভাবে তলিয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ টম টারনারের সঙ্গে কী নিয়ে কিছু কথাবার্তা হ'লো তার। *অ্যালবাট্রস* নিচের গড্ডলস্রোতের মতো ব্যস্ত উত্তেজিত মানুষের চোখে পড়েছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছিলো না। সম্ভবত পড়েনি, কেননা চোখে পড়লে নিচের সেই উত্তেজনার ধরনটা সম্ভবত অন্যরকম হ'তো। বোধহয় আকাশে হালকা মেঘের আড়াল দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো ব'লেই *অ্যালবাট্রসকে* দাহোমের নরনারী তখনও লক্ষ করেনি।

বেলা এগারোটার সময় দেয়াল দিয়ে ঘেরা রাজধানীকে দেখা গেলো নিচে ; শহরটা গ'ড়ে উঠেছে সমতল জায়গায়, উত্তরদিকে একটা মস্ত স্কোয়ারের মধ্যে রাজবাড়ি। রাজবাড়ির মস্ত দালানকোঠার কাছেই হ'লো নরবলির স্থান। উৎসবের সময় মস্ত উঁচু চাতালটা থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বন্দীদের নিচে ছুঁড়ে ফেলা হয়, আর উন্মত্ত জনতার হাতে মুহূর্তে সেই বন্দীরা টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায়। দরবারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে চার হাজার যোদ্ধা, রাজকীয় বাহিনীরই একটা দল।

আমাজোন নদীর আশপাশে কোনো আমাজোন থাকে কিনা সন্দেহ ; যদি-বা থাকেও, দাহোমেতে যে আমাজোনদের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, সে-বিষয়ে কোনো সংশয়ই নেই। এদের কারু পরনে নীল জামা, শাদা আর নীল ডোরা কাটা পাৎলুন, আর নীল কি লাল স্কার্ফ গলায়, মাথায় শাদা টুপি। কোনো-কোনো মেয়ে আবার হাতিশিকারী—তাদের সঙ্গে রয়েছে গাদা বন্দুক, তীক্ষ্ণধার খর্বাকার কৃপাণ, মাথায় একটা লোহার আংটা—তাতে অ্যাণ্টিলোপের শিঙ লাগানো। যে-সব তরুণী গোলন্দাজ, তাদের উর্দি লাল-নীল, ঢালাই লোহার কামান চালায় তারা। আরেকটি বাহিনী দেবী ডায়ানার মতো শুদ্ধাচারিণী—তারা পরে নীল উর্দি আর শাদা পাৎলুন। এই আমাজোনদের অর্থাৎ প্রমীলাবাহিনীর, সঙ্গে যদি সুতির উর্দি পরা পাঁচ-ছ হাজার পুরুষ সৈন্য যোগ ক'রে দিই, তাহ'লেই দাহোমের সেনাবাহিনীর একটা মোটামুটি ছবি পাওয়া যাবে।

সেদিন রাজধানী আবোমের রাস্তাঘাটে জনমানব নেই। ঝেঁটিয়ে রাজধানীর নরনারী গেছে কয়েক মাইল দূরে জঙ্গল ঘেরা একটা মস্ত মাঠে—এই মাঠেই নতুন রাজার অভিষেক হবে। সাম্প্রতিক নানা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংঘর্ষে যে-কয়েক হাজার বন্দী জুটেছিলো, এখানেই তাদের ছিন্ন দেহ ভূমিশয্যা লাভ করবে।

বেলা যখন প্রায় দুটো *অ্যালবাট্রস* তখন এই মাঠের উপর এসে দাঁড়ালো। দাঁড়ালো, মানে তার চলা বন্ধ হ'য়ে গেলো, আর মেঘের আড়াল থেকে সে সোজা নেমে আসতে লাগলো মাঠের দিকে। এতক্ষণ মেঘ তাকে ঢেকেছিলো ব'লেই দাহোমীয়রা তাকে দেখতে পায়নি।

রাজ্য ঝেঁটিয়ে অন্তত ষোলো হাজার লোক এসে জমা হয়েছে সেখানে। নতুন রাজা একটা ছোটোখাটো পাহাড়ের মতো দেখতে, বয়েস পঁচিশ, নাম বউ-নাদি; সে ব'সে আছে একটা টিবির উপর গাছপালার ছায়ায়—আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কাতারে-কাতারে নরনারী, তার পুরুষ সৈন্য, তার প্রমীলাবাহিনী।

টিবির নিচে চলছে উত্তেজিত গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান—ঢাক, শিঙা, কালাবাশ, গিটার, লোহার ঘণ্টা, বাঁশি—এইসব যন্ত্রের সমবেত নিনাদে সেই জায়গাটা যেন উন্মত্ত ও নেশাতুর হ'য়ে উঠেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর-পরই তোপ ফাটছে; তারই সঙ্গে তাল রেখে উত্থিত হচ্ছে জনতার কোলাহল। এই বিষম হট্টগোলের মধ্যে যদি প্রচণ্ড বজ্রপাত হয়, তাহ'লেও কেউ শুনতে পাবে কি না সন্দেহ।

মাঠের একপ্রান্তে সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে বন্দীদের—এরাই কিছুক্ষণ পরে মৃতরাজাকে পরলোক পর্যন্ত অনুসরণ করবে। বাহাদু-র বাবা থোজো মারা গেলে বাহাদু তিন সহস্র বন্দীর শিরশ্ছেদ করেছিলেন; বউ-নাদি তো আর কিছুতেই তার পূর্বপুরুষের চেয়ে কম মানুষ উৎসর্গ করতে পারে না। এক ঘণ্টা ধ'রে সেইজন্যেই পুরোহিতেরা মন্ত্রপাঠ করেছে, সমবেতনৃত্যে অংশ নিয়েছে আমাজোনেরাও—আর ক্রমেই বলির সময় এগিয়ে আসছে। রবয়ু যেহেতু দাহোমের এই নিষ্ঠুর প্রথার কথা জানতো সেইজন্যেই সে কখনো সেই দুর্ভাগা আবালবৃদ্ধবনিতাকে চোখের আড়াল করলে না, যারা বলির পাঁঠার মতো একপাশে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত লোচনে নিজেদের শিরশ্ছেদের অনুষ্ঠান নিরীক্ষণ ক'রে যাচ্ছে। প্রধান জল্লাদ খাঁড়া হাতে সেই টিবির উপর দাঁড়িয়ে। ভারি ধারালো খড়্গটা রোদে ঝিকিয়ে উঠছে—আর প্রতিফলিত রশ্মিগুলো বন্দীদের চোখে পরলোকের আলো ব'লে ঠেকছে তখন।

জল্লাদ শুধু সে-ই একা নয়। এতগুলি লোকের মুণ্ডচ্ছেদ তার একার কর্ম নয়। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে খোলা তলোয়ার হাতে আরো একশোজন জল্লাদ—এক কোপে গলা কাটতে এরা সবাই এক্কেজন মহা ওস্তাদ।

অ্যালবাট্রস আস্তে-আস্তে মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো—এখন সে মাটি থেকে মাত্র তিনশো ফিট উপরে; এই প্রথম নিচের সতেরো হাজার নরনারী তাকে দেখতে পেলে। আর, দেখেই, সম্মিলিত জনতা ভূমিষ্ঠ হ'য়ে সাষ্টাঙ্গে তাকে প্রণিপাত করলে। তারা ভাবলে বুঝি স্বর্গ থেকে কোনো দেবতা স্বয়ং এসেছেন তাদের পুজো নিতে। উৎসাহ, উদ্দীপনা, চীৎকার, প্রার্থনা—সব যেন পরাকাষ্ঠায় পৌঁছুলো। দাহোমীয় আকাশ এতকাল পরে তাদের উপর কৃপা করেছেন—অন্তরিক্ষের এই দেবতাকে সোৎসাহ পুজো ছাড়া আর কী-ই বা দেবে তারা?

আর অপেক্ষা করা হ'লো না। প্রথম বলি তার ঘাড় পেতে দিলে প্রধান জল্লাদের উদ্যত খড়্গের নিচে; অন্যদেরও নিয়ে-আসা হ'লো বাকি জল্লাদদের কাছে।

জল্লাদের খাঁড়া বিদ্যুৎবেগে নিচে নেমে আসছে, এমন সময় *অ্যালবাট্রস* থেকে একটা বন্দুক গ'র্জে উঠলো। তৎক্ষণাৎ প্রধান জল্লাদের মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

‘শাবাশ তাগ, টম !’ টারনারের তাগের তারিফ করলে রবয়ু ।

অ্যালবাট্রসের অন্য অনুচরেরাও বন্দুক তাগ ক’রে অপেক্ষা করছে রবয়ুর নির্দেশের। কিন্তু হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে নিচের উন্মাদ জনতার মধ্যে একটা রূপান্তর দেখা দিয়েছে । এতক্ষণে তারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে । ওই ডানাওলা জীবটা কোনো দেবতা নয়, দানব—বিরুদ্ধ শক্তি, অপদেবতা ছাড়া আর-কিছু নয় । জল্লাদের ভূলুণ্ঠিত দেহটা দেখেই চারধারে তখন প্রতিশোধের গর্জন উত্থিত হয়েছে—‘রক্তের বদলে রক্ত চাই’, এই আওয়াজটা প্রমীলাবাহিনীর কামানগুলো থেকে গোলার আকারে বেরিয়ে এলো *অ্যালবাট্রসকে* লক্ষ্য ক’রে।

তারই মধ্যে এঁকেবেঁকে *অ্যালবাট্রস* আরো দেড়শো ফিট নিচে মেনে এলো । এমনিতে রবয়ুকে অত্যন্ত অপছন্দ করলে কী হবে, প্রুডেন্ট ও ইভানস এই ব্যাপারে রবয়ুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে কোনো দ্বিধা করলেন না ।

‘বন্দীদের মুক্ত ক’রে দিলে হয় না ?’ তাঁরা চীৎকার ক’রে পরামর্শ দিলেন ।

‘সেটাই আমার অভিপ্রায়,’ জানালে রবয়ু ।

ততক্ষণে টারনার ও তার সাগরেদরা একযোগে রাইফেল চালাতে শুরু করেছে—আর নিচে কাতারে-কাতারে উত্তেজিত লোক ছিলো ব’লেই একটা গুলিও নষ্ট হচ্ছে না ।

সাহায্যটা কোত্থেকে এলো, কেন এলো, এ-সব কিছুই তখন বন্দীদের লক্ষ্য করার অবসর ছিলো না । তারা চটপট নিজেদের বাঁধন খুলতেই ব্যস্ত । আর দাহোমের সেনাবাহিনীও বন্দীদের উপর নজর রাখার বদলে তখন ওই উড়ো-দৈত্যের উদ্দেশে বন্দুক চালাতে ব্যস্ত । কয়েকটা গুলি হাল ফুটো ক’রে চ’লে গেলো ; মাস্তুলের পাশে একজন দাঁড়িয়েছিলো—তার গায়ে একটা গুলি লাগলো । একটা গুলি এসে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে ভূলুণ্ঠিত কম্পমান ফ্রাইকোলিনের গা ঘেঁষে চ’লে গেলো ।

টারনার ততক্ষণে এক ডজন হাতবোমা আর ডাইনামাইট নিয়ে এসেছে । ‘এবার বাছাধনেরা টের পাবে,’ ব’লে সে তার সাগরেদদের মধ্যে সেগুলো বিলিয়ে দিলে । রবয়ুর নির্দেশে একযোগে যখন এক ডজন বোমা পড়ল নিচে, তখন প্রবল বিস্ফোরণে পুরো মাঠটা কেঁপে উঠলো ।

রাজা ও তার সভাসদেরা তখন এই অদ্ভুত ও বিরোধী ঘটনাগুলোয় হতভম্ব হ’য়ে প’ড়েছে । বোমাগুলো পড়তেই তারা পড়িমরি ক’রে জঙ্গলের দিকে ছুটলো : বন্দীরাও একেকজনে ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিলে, কেউই তাদের আর তাড়া ক’রে যাবার সাহস পেলে না ।

অভিষেক উৎসবের এই পরিসমাপ্তি দেখে প্রুডেন্ট ও ইভানস উড়োযানের অসীম ক্ষমতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হলেন : মানবজাতির কত উপকার করতে পারে উড়োযান, সে-বিষয়ে আর-কোনো প্রশ্ন রইলো না তাঁদের মনে । বিশেষ ক’রে পরীক্ষাটা যখন চালানো হ’লো কালা আদমিদের ওপর । যেন শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে কোনো বর্বর বা নৃশংস প্রথা নেই !

উৎসব পণ্ড ক’রে আবার উপরে উঠে গেলো *অ্যালবাট্রস* । দাহোমে রাজ্য পেরিয়ে সে চ’লে এলো জলোচ্ছ্বাসে ভরা উপকূলে, যেখানে অ্যাটল্যান্টিকের প্রবল জল বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে বারে-বারে !

১১

অ্যাটলান্টিকের উপর দিয়ে

হ্যাঁ অ্যাটলান্টিক মহাসাগর ! দুই বন্ধুর আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হ'লো । কিন্তু রবযুকে দেখে মোটেই ভাবিত মনে হ'লো না—এই বিপুল সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাবার কথা ভাবতে একফোঁটাও ভয় হচ্ছে না তার । সে আর তার অনুচরেরা অ্যাটলান্টিকের বিশালতাকে কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না—কোনোকিছুর কোনো তোয়াক্কা না ক'রেই নিশ্চিন্ত মনে আবার যে-যার কাজে লেগে গিয়েছে ।

কোথায় যাচ্ছে *অ্যালবাট্রস* ? কোনদিকে ? সে কি যেতে চাচ্ছে পৃথিবী পেরিয়ে—কেবল বিশ্বভ্রমণ ক'রেই সে সন্তুষ্ট নয় ? কিন্তু যা-ই তার লক্ষ্য থাক, একজায়গায় না একজায়গায় গিয়ে তার এই আশ্চর্য অভিযান তো থামবেই । এটা তো হ'তেই পারে না যে রবযু সারা জীবন এই উড়োযানেই কাটিয়েছে । প্রথমত উড়োযানটা সে নিশ্চয়ই হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে তৈরি করেনি । সব কলকব্জা ও যাবতীয় রসদ তাকে মাটির পৃথিবী থেকেই নিশ্চয়ই জোগাড় করতে হয়েছে । নিশ্চয়ই তার কোনো গোপন ডেরা আছে, কোনো লুকোনো আস্তানা—কোনো দুর্গম ও অজানা জায়গায় নিশ্চয়ই এই বিমান তৈরির কারখানা সে স্থাপন করেছিলো । মাটির পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক সে ছিন্ন ক'রে ফেলেছে, এ-কথা হয়তো সর্বাংশে মিথ্যে নয়—কিন্তু একটা জায়গা কোথাও নিশ্চয়ই আছে, মনুষ্যচক্ষুর অন্তরালে ও একান্তই সংগোপনে, যেখানে গিয়ে মাঝে-মাঝে তাকে আশ্রয় নিতে হয় । কিন্তু প্রশ্ন হ'লো, কোথায় তার সেই গোপন গুহা ? কেমন ক'রেই বা সে জায়গাটা সে খুঁজে বার ক'রে পছন্দ করেছিলো ? না কি কোথাও কোনো ছোটো উপনিবেশ রয়েছে, সে যার বিদ্রোহী নেতা ? সেখান থেকেই কি সে *অ্যালবাট্রসের* জন্য বৈমানিক জোগাড় ক'রে নেয় ? *অ্যালবাট্রস* আর এই কারখানার কথাই বা সে কেমন ক'রে সমস্ত জগতের সন্দেহচক্ষুর অগোচরে রেখেছিলো ? এটা সত্যি যে সে বিলাসী নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসনে তার আসক্তি নেই, আসক্তি নেই আড়ম্বরে কি প্রাচুর্যে । কিন্তু আসলে সে কে ? কোত্থেকে তার এই আকস্মিক উদয় ? কী তার অতীত ইতিহাস ? এই সব হিংটিংছটের জবাব কে জানে । অন্তত রবযু সে-ধরনের মানুষ নয় যে এ-সব ধাঁধার উত্তর দিতে সাহায্য করবে ।

এ-সব প্রশ্ন যে ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের কর্তাব্যক্তিদের মাথার মধ্যে কুটকুট ক'রে কামড়াচ্ছিলো, সেটা নিশ্চয়ই বিশদ ক'রে বলার দরকার নেই । কোত্থেকে এলো এক অজ্ঞাত হাওয়া—উড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো তাঁদের সারা পৃথিবীর উপর দিয়ে—এই অবস্থাটা কিছুতেই তাঁদের মনঃপূত হচ্ছিল না ।

আর যখন এই প্রশ্নগুলো তাঁদের বিমূঢ় ও পাগল ক'রে দেবার জোগাড় করছে, *অ্যালবাট্রস* তখন উড়ে যাচ্ছে অ্যাটলান্টিকের উপর দিয়ে । সমুদ্রের নীলে আর আকাশের নীলে দিগন্ত মাখামাখি । বর্তুল সুডৌল লাল চাকার মতো সূর্য ওঠে জলের মধ্য থেকে নিয়মিত—আবার নিয়মিত সেটা একসময়ে রক্তাভায় দিগন্ত রঞ্জিত ক'রে ডুবেও যায় । পিছনে

আফ্রিকা দিগন্তে বিলীন—সামনে কিছুই চোখে পড়ে না উচ্ছল জল ছাড়া। ফ্রাইকোলিন একবার তার কামরা থেকে বেরিয়ে যেই এই প্রকাণ্ড নীলসবুজ ফেনিল কাণ্ড সামনে দেখলে, অমনি আতঙ্কে কম্পিত কলেবরে পুনর্বার গিয়ে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লো সেই কামরার মধ্যেই।

১৮ই জুলাই *অ্যালবাট্রস* পেরিয়ে এলো মকরক্রান্তি। ২৩শে জুলাই কুমারী দেবীর অন্তরীপের কাছে ম্যাগেলান প্রণালীর কাছে দিগন্তে দেখা গেলো ডাঙার ক্ষীণ রেখা। তারপর একসময় ম্যাগেলান দ্বীপপুঞ্জের শেষ ছোটো দ্বীপটাও দিগন্তে মিলিয়ে গেলো—তার সঙ্গে মিলিয়ে গেলো কেপ হর্নের অশান্ত চিরন্তন ঘূর্ণিজলের প্রকোপ।

২৪শে জুলাই—দক্ষিণ গোলার্ধের ২৪শে জুলাই আসলে ঋতুর হিশেবে উত্তর গোলার্ধের ২৪শে জানুয়ারি—৫৬ ডিগ্রি অক্ষরেখাও পিছনে ফেলে এলো *অ্যালবাট্রস*। সঙ্গে-সঙ্গে তাপমান যন্ত্রও জ'মে যাবার দাখিল করলে কনকনে ঠাণ্ডায়। ফলে কৃত্রিম যান্ত্রিক উপায়ে কামরাগুলিতে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করলে রবয়ু। যদিও দক্ষিণ গোলার্ধে ২১শে জুনের পর থেকেই দিন বড়ো হ'য়ে শুরু করে, তবু *অ্যালবাট্রস* যেহেতু ক্রমশ মেরুবিন্দুর দিকেই অগ্রসরমান, তাই দিন বড়ো হচ্ছে কিনা তা স্পষ্ট ক'রে কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিলো না—অন্তত আকাশযাত্রীদের সেটা অনুধাবন করার সুযোগ ছিলো না কিছুই। দিনের আলো থাকে অল্পক্ষণ। রাত্তিরে থাকে কনকনে ঠাণ্ডা। যদিও পশমে আগাগোড়া নিজেদের মুড়ে রেখে দুই বন্ধু ডেকে দেখা দেন পলায়নের শলাপরামর্শ করতে তবু আলোর স্বল্পতার জন্যে কিছুই দেখা যায় না। রবয়ুকেও আজকাল ডেকে দেখা যায় না : টিমবাকটুতে গরম-গরম বাণীবিনিময় হবার পর রবয়ু আর তার অতিথিদের সঙ্গে কথা বলে না।

ফ্রাইকোলিনও রন্ধনশালা থেকে কম বেরোয়—সেখানে তাপাজ তাকে যথাসাধ্য হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করে ভালোমন্দ খাইয়ে, এক শর্তে যে ফ্রাইকোলিনকে তার সহকারী বাবুর্চির কাজ করতে হবে। ফ্রাইকোলিনও এককথাতেই তার শর্তে রাজি হয়েছে। তাতে একদিক থেকে এই সুবিধে হয়েছে রান্নাঘরেই আটকে থাকে ব'লে বাইরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে তা তার নজরে পড়ে না : আর উটপাখির মতো মরুভূমির ঝড়ে বালিতে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকাই তার পছন্দ—চোখে না-দেখলেই আর বিপদের আশঙ্কা কোথায়?

কিন্তু *অ্যালবাট্রস*—সে কোথায় চলেছে? কুমেরুর দীর্ঘ হিমরাত্রির দিকে কেন তার এই অনিঃশেষ যাত্রা? গ্রীষ্মকালে কুমেরু পেরুবার চিন্তা করাই রবয়ুর পক্ষে পাগলামি হ'তো—সে কিনা তৎসত্ত্বেও এই শীতকালে দীর্ঘরাত্রির মধ্যে উন্মাদের মতো হিম মৃত্যুর দিকে ধাবমান!

এখন আবার তাঁরা আমেরিকাতেই এসে পড়েছেন—কিন্তু এই আমেরিকা—দক্ষিণ গোলার্ধের এই অঞ্চল মোটেই মার্কিন মুলুক নয়, ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের নয়। এই অদ্ভুত, একরোখা, বেপরোয়া রবয়ু কী-যে করতে চাচ্ছে কে জানে। যদি পারা যেতো, তাহ'লে এখানেই *অ্যালবাট্রস* শুদ্ধু বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিলে ভালো হ'তো—এ-রকম অস্থির ও অশান্তভাবে ঘুরে মরতে হ'তো না তাহ'লে।

এদিকে সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে রবয়ু তার প্রধান সাগরেদ টারনারের সঙ্গে বারে-বারে কী-সব যেন শলাপরামর্শ করছে। বারে-বারে তাপমান যন্ত্র পরীক্ষা ক'রে দেখছে

আবহাওয়ায় কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় কি না। নিশ্চয়ই এমন-কিছু পরিবর্তন তারা লক্ষ করেছে, যেজন্যে এ-রকম বারংবার পর্যবেক্ষণ করাটা তাদের কাছে জরুরি হ'য়ে পড়েছে। তাছাড়া রবয়ু একবার গিয়ে তদারক ক'রে এলো কী-পরিমাণ রসদ আছে *অ্যালবাট্রসের* ভাঁড়ারে। হয়তো এ-সব আসলে তাদের প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ। হয়তো তারা ভাবছে মেরু পর্যন্ত না-গিয়ে ফিরে যাবে কি না।

'ফিরে যাবে!' ফিল ইভানস প্রুডেন্টের সন্দেহ শুনে কিঞ্চিৎ বিস্মিতই হলেন। 'কিন্তু কোথায়?'

'যেখানে গিয়ে আবার *অ্যালবাট্রসে* রসদ তোলা যাবে,' প্রুডেন্ট তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন।

'সে-জায়গাটা নিশ্চয়ই প্রশান্ত মহাসাগরে—প্রশান্ত মহাসাগরেই তো অসংখ্য নির্জন দ্বীপ রয়েছে, সবগুলোর সন্ধান এমনকী ভৌগোলিকেরাও রাখেন না। হয়তো সে-রকম কোনো দ্বীপেই এই বদমাশটার আস্তানা।'

'আমারও তা-ই মনে হয়। মনে হচ্ছে এবার পশ্চিম দিকে *অ্যালবাট্রসকে* চালাচ্ছে সে—আর যে-গতিতে যাচ্ছে তাতে তার আস্তানায় পৌঁছুতে খুব বেশি সময় লাগবে না।'

'কিন্তু তাহ'লে আমরা পালাবো কী ক'রে? একবার যদি সে *অ্যালবাট্রসে* আবার রসদ বোঝাই ক'রে নেয়—'

'আমরা সেখানে যাবোই না!'

রবয়ুর অভিপ্রায়টা তাঁরা অংশত বুঝতে পেরেছিলেন। খানিকক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেলো অ্যান্টার্কটিক সমুদ্রে পৌঁছে *অ্যালবাট্রস* দিক বদলাবে। অন্তত রবয়ুদের ভাবভঙ্গি এই সন্দেহটাকেই দৃঢ়তর করলে।

সকালের দিকে তাপ মোটামুটি একরকম ছিলো—হঠাৎ একসময়ে বলা-নেই-কওয়া-নেই ভীষণ ঠাণ্ডা প'ড়ে গেলো। এ-রকম লক্ষণ দেখলে কোনো জাহাজের অধ্যক্ষ অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে পড়তেন—যদিও কোনো উড়োযানের কাপ্তেন তাকে তেমন গুরুত্ব নাও দিতে পারে। তবে একটা বিষয় বোঝা গেলো যে প্রশান্ত মহাসাগরের কোথাও নিশ্চয়ই সম্প্রতি ভীষণ ঝড় তুলকালাম কাণ্ড ক'রে গেছে।

একটা নাগাদ টম টারনার এসে রবয়ুকে বললে, 'দিগন্তে একটা কালো ফুটকি দেখা যাচ্ছে না কি? ঠিক উত্তরে, আমাদের নাক-বরাবর। সেটা কোনো পাহাড় নয় তো?'

'না, টম। ওখানে কোনো ডাঙা নেই।'

'তাহ'লে ওটা নিশ্চয়ই কোনো জাহাজ হবে।'

প্রুডেন্ট আর ইভানস দাঁড়িয়েছিলেন গলুইয়ের কাছে। টারনারের কথা শুনে উত্তর দিকে তাকালেন তাঁরা।

রবয়ু তখন দুরবিন চোখে ভালো ক'রে সেই কালো ফুটকিটাকে নিরীক্ষণ করছে। 'জাহাজ নয়, একটা নৌকো,' বললে সে, 'নৌকোয় আবার কয়েকজন মানুষ রয়েছে।'

'জাহাজডুবি হয়েছে তাহ'লে?' টম জিগেস করলে।

'হ্যাঁ ! জাহাজ ছেড়ে নৌকোয় ভেসে পড়তে হয়েছে তাদের কোনো কারণে । কাছে ডাঙা কোথায় জানে না । হয়তো ক্ষুধায়-তৃষ্ণয় তারা এখন মরো-মরো । না, এমন কথা আমি শুনতে চাই না যে, *অ্যালবাট্রস* দুর্গতদের সাহায্য করে না । কারু দুরবস্থা দেখেও *অ্যালবাট্রস* কোনো দৃকপাত করেনি—এমন কথা আমি কক্‌খনো শুনতে চাই না !'

তক্ষুনি নির্দেশ দেয়া হ'য়ে গেলো । *অ্যালবাট্রস* ক্রমশ নিচের দিকে নেমে এলো—নশো ফিট নেমে আসার পর পুরোদমে সেই লক্ষ্যহারা একা বেচারি নৌকোটার দিকে ছুটে চললো ।

নৌকোই, জাহাজ নয় । ঢেউয়ের তোড়ে একবার উঠছে একবার নামছে সমুদ্রের জলে খেলনা নৌকোর মতো—আর মাস্তুলে নেতিয়ে আছে তার শাদা পাল । হাওয়া নেই ব'লে পাল ফুলে উঠে তাকে চালিয়ে নিতে পারছে না । আর নৌকোর মধ্যেও নিঃসন্দেহে এমন-কোনো তাগড়া জোয়ান নেই যে ইচ্ছে করলে দাঁড় বাইতে পারতো । পাঁচটি অসহায় মানুষ প'ড়ে আছে নৌকোয়—হতাশ, হতচেতন বা ঘুমন্ত—যদি-না এরই মধ্যে ম'রে গিয়ে থাকে ।

নৌকোটার ঠিক উপরে এসে *অ্যালবাট্রস* বন্ধ ক'রে দিয়ে ধীরে-ধীরে নিচে নামতে লাগলো । নৌকোটা কোন জাহাজের, সেটা বোঝাবার জন্যে মাস্তুলে জাহাজের নাম লেখা : ফরাশি জাহাজ, *জানেৎ* ।

'কে আছো ! সাড়া দাও,' টারনার চেঁচিয়ে বললে । নৌকোটা তখন মাত্র আশি ফিট নিচে ।

কোনো সাড়া নেই ।

'একটা ফাঁকা আওয়াজ করো তো,' রবয়্ নির্দেশ দিলে ।

বন্দুক গ'র্জে উঠলো শূন্য লক্ষ্য ক'রে—সমুদ্রে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হ'তে-হ'তে মিলিয়ে গেলো ।

একটি লোক দুর্বলভাবে মাথা তুলে তাকালে । চোখ দুটো তার কোটরে বসা, হতাশায় ভরা ; মুখটা যেন কোনো কঙ্কালের । *অ্যালবাট্রসকে* দেখেই সেই অবস্থাতেও সে আঁৎকে উঠলো ।

'ভয় পেয়ো না,' ফরাশিতে বললো রবয়্, 'আমরা তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি । কে তোমরা ?'

'আমরা *জানেৎ* জাহাজের নাবিক—আমি ছিলুম ফার্স্ট মেট । পনেরো দিন আগে আমাদের জাহাজ ডুবে যায়—তখন আমরা এই নৌকোটায় কোনোরকমে আশ্রয় নিই । আমাদের সঙ্গে না-আছে কোনো খাবার, না-আছে পানীয় জল ।'

অন্য চারজনও তখন উঠে বসেছে । বিবর্ণ, অবসন্ন, একেবারে কাহিল দেখতে । কাঙালের মতো হাত তুলে তারা যেন ভিক্ষে চাচ্ছে *অ্যালবাট্রসের* কাছ থেকে ।

'দেখো, সাবধান !' রবয়্ চেঁচিয়ে বললে ।

দড়িতে বেঁধে এক বালতি টাটকা পানীয় জল নামিয়ে দেয়া হ'লো নৌকোয় । লোকগুলো কাড়াকাড়ি ক'রে সেই জল এমনভাবে পান করলে যা দেখে বুকের ভিতরটায় কেমন ক'রে ওঠে ।

'রুটি ! রুটি !' কাতর স্বরে তারা চাইলে ।

তক্ষুনি একটা ঝুড়িতে ক'রে কিছু খাবার ও পাঁচ গেলাশ কড়া কফি নামিয়ে দেয়া হ'লো

তাদের দিকে। সেই বুভুক্ষু মানুষদের বহু কষ্টে সামলে ফার্স্ট মেট সবাইকে সমান ভাগে খাবার ভাগ ক'রে দিলে। তারপর জিগেস করলে, 'আমরা কোথায় আছি ?'

'চিলের উপকূল থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে,' রবয়ু উত্তর দিলে।

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের সেখানে যাবার কোনো ক্ষমতা নেই —'

'আমরা তোমাদের নৌকোটা আমাদের সঙ্গে বেঁধে টেনে নিয়ে যাবো।'

'তোমরা কে ?'

'যারা তোমাদের সাহয্য করতে পেরেই খুশি,' এই ব'লে রবয়ু প্রশ্নটার পাশ কাটিয়ে গেলো।

ফার্স্টমেট বুঝতে পারলে এই অপরিচয়কেই শ্রদ্ধা জানাতে হবে—তাই সে আর কোনো উচ্চবাচ্য করলে না। কিন্তু সত্যি কি কোনো উড়োযান কোনো নৌকোকে টেনে নিয়ে যাবার শক্তি রাখে ?

হ্যাঁ, রাখে। একশো ফিট লম্বা একটা দড়ির সঙ্গে নৌকোটা বেঁধে নিয়ে *অ্যালবাট্রস* পুবদিকে যেতে লাগল। রাত দশটা নাগাদ ডাঙা দেখা গেলো—ডাঙা, মানে ডাঙার উপরকার আলো।

জানেৎ—এর নাবিকদের কাছে এই আকাশ-থেকে-পড়া সাহায্য অলৌকিক ঠেকছিলো। ডাঙার একেবারে কাছে এসে রবয়ু যেই বললে নৌকো থেকে দড়িটা খুলে নিতে, তারা তৎক্ষণাৎ সেটা খুলে দিয়ে *অ্যালবাট্রসের* উদ্দেশে অজস্র শুভেচ্ছা জানালে।

অ্যালবাট্রস পুনর্বার নিজের পথ ধ'রে চলতে লাগলো। আর দুই অনিচ্ছুক অতিথি বুঝলেন যে কোনো বেলুন এইভাবে কোনো সাহায্য দিতে পারতো না কিছুতেই। পারলে তাঁরা *অ্যালবাট্রসের* এই সাহায্যদানকে অস্বীকার করতেন—কিন্তু তবু চোখে-কানে পুরো ব্যাপারটা দেখেশুনে মনে-মনে *অ্যালবাট্রসের* ক্ষমতার তারিফ না ক'রে তাঁরা পারলেন না।

১২

অবশেষে নোঙর পড়লো

সমুদ্র আগের মতোই ক্ষুব্ধ ও অশান্ত ; লক্ষণগুলোও দস্তুরমতো ভয় দেখাচ্ছে। ব্যারোমিটার কয়েক মাত্রা নেমে এসেছে। একেকটা দমকা হাওয়া আসছে প্রবল বেগে, তারপরেই আবার মুহূর্ত খানেকের জন্যে হাওয়া একেবারে প'ড়ে যাচ্ছে। এ-রকম অবস্থায় পড়লে কোনো পালতোলা জাহাজকে বেশ বিপদে পড়তে হ'তো। সবকিছু দেখেই বোঝা যাচ্ছে উত্তর-পশ্চিমে হাওয়া ক্রমশ প্রমত্ত হ'য়ে উঠছে। ঝড়-নির্দেশক যন্ত্রটি কি-রকম যেন অস্থির হ'য়ে উঠেছে, যা দেখে সত্যি বিচলিত না-হ'য়ে উপায় নেই।

আবার রাত একটায় বাতাস একটা রাগী আদিম বুনো জন্তুর মতো গ'র্জে উঠলো ; আবার ফিরে এলো নতুন উৎসাহে—লম্ফমান ও হিংস্র ! উড়োযান যদিও ঠিক তার মুখেই

ঢুকে যাচ্ছে, তবু এখনো তার বেগ সব যুদ্ধের পরেও ঘণ্টায় পনেরো মাইল—এই গর্জমান বাতাসের বিরুদ্ধে এর চেয়ে বেশি জোরে যাবার ক্ষমতা তার নেই।

ঘূর্ণিঝড়ের জন্যে তৈরি হ'তে হবে তাড়াতাড়ি। আশ্চর্য—এই অঞ্চলে অথচ কিনা সাধারণত ঘূর্ণিঝড় ওঠে না। একেক অঞ্চলে তার একেক নাম : অ্যাটলান্টিকে তার নাম টাইফুন, প্রশান্ত মহাসাগরে সাইক্লোন, চীন সমুদ্রে হারিকেন, শাহারায় সাইমুম বা পশ্চিম উপকূলে টরনাডো। কিন্তু নানান নামে ডাকলেও সব জায়গাতেই তার চরিত্র একই রকম : পাক খেয়ে-খেয়ে হাওয়া উঠতে থাকে, দম-আটকানো ঘূর্ণি তুলে এগিয়ে আসে—আর সেই প্রমত্ত ঊনপঞ্চাশ পবনের নাগালে পড়লে কারুরই রক্ষে থাকে না।

এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ডতা অন্তত রবয়ুর অজানা ছিলো না। বাতাসের উপরের স্তরে উঠে গিয়ে ঝড়ের নাগাল এড়িয়ে যাওয়াটাই যে সবচেয়ে অভিপ্রেত, এ-বিষয়ে তার সন্দেহ ছিলো না। এ-পর্যন্ত ঝড়ের পাল্লায় পড়ার সম্ভাবনা যখন দেখা দিয়েছে, চটপট *অ্যালবাট্রসকে* সে বাতাসের ঊর্ধ্বতর স্তরে তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু এখন আর একঘণ্টাও সময় হাতে নেই। ঝড় উঠলো ব'লে। এক মিনিট এদিক-ওদিক হ'লে আদিম পবনদেব তাকে নিয়ে হাজার হাতে লোফালুফি খেলতে থাকবেন।

সত্যিই, একেকটা দমকা হাওয়া আসছে, আর বোঝা যাচ্ছে হাওয়ার বেগ আরো বেড়ে গেছে। সমুদ্র পর্যন্ত সাড়া দিচ্ছে পবনের আহ্বানে : বাতাসে-বরুণে যেন এক ক্রুদ্ধ চক্রান্ত চলেছে, এই ভঙ্গিতে ঢেউ আছড়ে উঠে তাল দিচ্ছে হাওয়াকে, উৎসাহ দিচ্ছে, উদ্দীপনা জোগাচ্ছে। কোনো সন্দেহই নেই যে সাইক্লোন এখন প্রচণ্ডবেগে মেরুবলয়ের দিকে ধাবমান।

'উঁচুতে, আরো উঁচুতে ওঠো,' রবয়ু নির্দেশ দিলে।

'উঠছি—কেবলই তো উপরে উঠছি,' উত্তর দিলে টম টারনার।

ঊর্ধ্বগামী সবগুলো চাকা পুরোদমে চালিয়ে দেয়া হয়েছে *অ্যালবাট্রসে* : কোনো অতিকায় ভোমরার গুঞ্জনের মতো চুয়াত্তরটি চাকার অস্থির গুঞ্জন হাওয়ার রাগী ফোঁশফোঁশানির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। প্রায় কাৎ হ'য়ে উঠছে উপরে—হঠাৎ ব্যারোমিটার আরো-কয়েক মিলিমিটার নেমে গেলো, আর অমনি *অ্যালবাট্রসের* উত্থানও বন্ধ হ'য়ে গেলো।

কেন হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেলো তার উপরে-ওঠা ? বোঝা গেলো হাওয়া তাকে হাজার হাতে টানছে—শিকার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ক্ষুধাতুর বুনো জন্তু যেমন তাকে প্রবল থাবায় আঁকড়ে ধরে ! কোনো অদম্য হাওয়ার স্রোত চাকার ঘুরুনি থামিয়ে দিচ্ছে—আর সেইজন্যেই *অ্যালবাট্রস* পক্ষে আর উপরে-ওঠা সম্ভব হচ্ছে না।

কিন্তু রবয়ু তা ব'লে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তার চুয়াত্তরটি চাকাকে সে একেবারে চূড়ান্ত বেগে চালিয়ে দিলে। কিন্তু তবু *অ্যালবাট্রসর* পক্ষে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হ'লো না। সাইক্লোন তাকে ভীষণ চুম্বকের মতো টেনে ধরেছে। হাওয়ার বেগ এক মুহূর্ত কমলেই *অ্যালবাট্রস* উঠতে শুরু করে, কিন্তু পরক্ষণেই সাইক্লোন তাকে টেনে নামায়। যদি সাইক্লোনের বেগ আরো বেড়ে ওঠে, তাহ'লে স্রোতের মুখে কুটোর মতো *অ্যালবাট্রস* উড়ে যাবে—তারপর হাওয়া তাকে যেখানে ছুঁড়ে ফেলবে সেখানেই তার শতখণ্ড পরিসমাপ্তি।

রবয়ু আর টম তখন কেবল ইঙ্গিতে কথা বলছে, কারণ এই বিষম হাওয়ায় কোনো

কথাই শোনবার উপায় নেই। আঙ্কল প্রুডেণ্ট আর ফিল ইভানস কোনোরকমে রেলিঙ আঁকড়ে ধ'রে ভাবছেন ঊনপঞ্চাশ হাওয়াই বুঝি তাঁদের চক্রান্ত সফল করবার ভার হাতে নিয়েছে—সে-ই বুঝি *অ্যালবাট্রস* আর তার আবিষ্কারককে ধ্বংস করবার ভার নিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু অ্যালবাট্রস যদি সাইক্লোনের নাগাল থেকে সোজা উপরে উঠে যেতে না-পারে, তাহ'লে কি অন্য-কোনো উপায়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না? ঘূর্ণির মাঝখানে একটা জায়গা থাকে স্থিরকেন্দ্র, তাকে বলে 'ঝড়ের চোখ'—চারপাশে বিষম অস্থিরতা, মধ্যখানটায় শান্ত অবকাশ—*অ্যালবাট্রস* কি সেই স্থিরবিন্দুতে গিয়ে শান্ত হ'য়ে দেখতে পারে না ঘূর্ণির তাণ্ডব? পারে: কিন্তু সেই স্থিরবিন্দুতে পৌঁছুতে হ'লে আগে তাকে পেরুতে হবে ঘূর্ণির স্তর। এই ঘূর্ণি পেরিয়ে যাবার জন্য যথোচিত যান্ত্রিক শক্তি কি তার আছে?

হঠাৎ মেঘের উপরের স্তর যেন হুড়মুড় ক'রে নেমে পড়লো। পেঁচিয়ে উঠছিলো বাষ্প, এখন নেমে পড়লো মুষলধারে বর্ষণ হ'য়ে! রাত তখন দুটো। ব্যারোমিটার কখনো উঠছিলো, কখনো নামছিলো—এখন দেখা গেলো ২৭·৯৭-তে এসে স্থির হ'য়ে আছে। আর তা থেকে ইচ্ছে করলে বোঝা যেতে পারে সমুদ্রতল থেকে কত উপরে আছে এখন *অ্যালবাট্রস*।

টম টারনার ব'সে আছে চালকের আসনে; *অ্যালবাট্রস* যাতে পথভ্রষ্ট না-হ'য়ে পড়ে, সেইজন্যেই তার প্রাণপণ চেষ্টা। একটু যখন আলো ফুটলো শেষরাতে, *অ্যালবাট্রস* তখন অন্তরীপের পনেরো ডিগ্রি নিচে— আর বারোশো মাইল পেরুতে পারলেই কুমেরু বলয় সে অতিক্রম ক'রে যাবে। এখন সে যেখানে আছে, জুলাই মাসে, রাত সেখানে সাড়ে-উনিশ ঘণ্টা লম্বা। সূর্য ওঠে বর্তুল—নিস্তাপ, নিস্তেজ একটা গোল-কিছু যেন; আসল সূর্যের নকল—ওঠে, আর যেন পরক্ষণেই ডুবে যায় আবার দিগন্তে। মেরুতে রাত থাকে একশো ঊন-আশি ঘণ্টা। *অ্যালবাট্রস* সেই অন্ধকার কালো হাঁ লক্ষ ক'রেই ছুটে যাচ্ছে—ঠাণ্ডা এক কালো গহ্বরই যেন তার গন্তব্য!

এছাড়া, ওই অন্ধকার মেরুতে যাওয়া ছাড়া, ওই সাইক্লোনের হাত এড়িয়ে পালিয়ে যাবার আর-কোনো উপায়ই নেই। প্রায় যেন কোনো অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মেরুবিন্দুর দিকে—যেখানটায় কোনো মানুষ কোনোদিনও যায়নি, সেই অজ্ঞাত কুমেরু তাকে টান দিয়েছে—যেন তার এই গতিই তাকে গিলে খাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন চুয়াত্তরটি চাকা না-হ'লেও তার চলতো—ঝড়ই উড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো হালকা কুটোগাছাটির মতো। ঝড় তখন এমন এক চরম অবস্থায় পৌঁছেছে যে রবয়ু চাকাগুলির গতি অনেকখানি কমিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। যতটুকু বেগ থাকলে রেডারটাকে কাজে লাগানো যায়, কেবল ততটুকুই রাখবার ব্যবস্থা করলে রবয়ু।

রবয়ু লোকটা অদ্ভুত। এই বিষম অবস্থাতেও কি-রকম মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে সে। অনুচরেরাও তার হুকুম এমনভাবে তামিল ক'রে যাচ্ছে যেন সে কোনো আশ্চর্য উপায়ে তাদের মধ্যেও নিজের সুস্থিরতা সংক্রমিত ক'রে দিয়েছে। আঙ্কল প্রুডেণ্ট আর ফিল ইভানস এর মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যেও ডেক ছেড়ে নড়েননি। তাঁদের কেউ ত্যক্ত করছে না—কেবল হাওয়ার ঝাপটাতেই যা একটু কষ্ট হচ্ছে। রবয়ুর উড়োযান এখন যেন কোনো বেলুনের মতোই অসহায় হ'য়ে পড়েছে।

অবাচী যে আসলে কী, কে তা জানে ? কোনো মহাদেশ, না কি কোনো দ্বীপপুঞ্জ ? নাকি কোনো তুষার সমুদ্র, দীর্ঘ গ্রীষ্মবেলাতেও যেখানে তুহিন গ'লে যায় না ? এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই । শুধু জানি যে অবাচী উদীচীর থেকেও হিমার্ত ।

দিন এলো—কিন্তু ঝড়ের তোড় একটুও কমলো না, বা কমবার কোনো লক্ষণও দেখা গেলো না । *অ্যালবাট্রস* যতই অবাচীর দিকে এগুচ্ছে, দিনও ততই ছোটো হ'য়ে যাচ্ছে । একটু পরেই সে অনিঃশেষ রাত্রির মধ্যে ঢুকে পড়বে, যেখানে চাঁদের ঝাপসা আলো অন্ধকারকে গাঢ়তর ক'রে তোলে—কিংবা কখনো জ্ব'লে ওঠে অরোরা বোরিয়ালিস । কিন্তু অমাবস্যা গেছে সেদিন মাত্র, চাঁদ এখনও নতুন—কাজেই রবয়ু বা তার সঙ্গীরা এই অজানা অঞ্চলের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ।

যতটা ঠাণ্ডা লাগবে আশা করা গিয়েছিলো আসলে কিন্তু ততটা ঠাণ্ডা লাগছে না । সম্ভবত ঝড়ের জন্যেই ।

সবচেয়ে মনস্তাপের কারণ এটাই যে অবাচীতে এসে-পড়া সত্ত্বেও অন্ধকারের জন্যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না । এমন নয় যে পূর্ণিমা হ'লেও বিশেষ-কিছু চোখে পড়তো । কারণ বছরের এই সময়ে কেবল তুহিন স্তব্ধতার শাদা পর্দা ঢেকে রাখে সবকিছু—মানুষের অদম্য কৌতূহলও যে পর্দার ঢাকা সরাতে পারে না ।

মাঝরাতের পরেই অন্ধকারের মধ্যে জ্ব'লে উঠলো দেয়ালি—অরোরা বোরিয়ালিস । তার রুপোলি ঝালর আর বিচ্ছুরণ যেন আকাশ-জোড়া কার দীপ, পাখনার মতো ঝলমল ক'রে উঠেছে । আর বিপুল হীরকচ্ছুরিত মহিমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন সব ভয়, সব বিপদ, রাগ-দ্বেষ ভুলে গেলো সবাই ।

না-বললেও চলে নিশ্চয়ই মেরুর যত কাছে এগুচ্ছে *অ্যালবাট্রস*, দিগ্‌দর্শকও ততই অস্থির হ'য়ে উঠেছে । তা সত্ত্বেও কাঁটা দেখে নানা-রকম হিশেব ক'রে রবয়ু একসময় ব'লে উঠলো, 'অবাচী আমাদের নিচে এখন—*অ্যালবাট্রস* এখন ঠিক দক্ষিণ মেরুর উপরে ।'

সঙ্গে-সঙ্গে নিচে দেখা গেলো একটা শাদা টুপি—কিন্তু সেই তুহিন শীর্ষের নিচে কী যে লুকিয়ে আছে, তা বোঝার কোনো উপায় নেই । বিশেষত অরোরাও যখন পরক্ষণেই নিভে গেলো, তখন বোঝবার জো রইলো না ঠিক কোন বিন্দুটায় জগতের সব মধ্যরেখা একে-অন্যকে ছুঁয়ে গেছে ।

তখনও হারিকেন গরজাচ্ছে প্রবল রাগে—যদি কোনো পাহাড় থাকতো এখানে আর তার চূড়োর সঙ্গে সংঘর্ষ হ'তো *অ্যালবাট্রসের*, তাহ'লে হাজার টুকরো হ'য়ে উড়োযান ছড়িয়ে পড়তো তুহিনধবল মেরুদেশে ।

অবাচীতে কিন্তু সত্যিই পাহাড় থাকা অসম্ভব নয় । যে-কোনো মুহূর্তে কোনো-একটার সঙ্গে ঘা লেগে *অ্যালবাট্রস* চুরমার হ'য়ে যেতে পারে । সম্ভাবনাটা ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হ'য়ে উঠলো তখন, যখন নিচে হঠাৎ দুটো উজ্জ্বল বিন্দু জেগে উঠলো । এরা আর-কিছু নয় —রস্ পর্বতের দুটো আগ্নেয়গিরি—একটার নাম এরেবুস, আরেকটার নাম টেরর । কোনো অতিকায় প্রজাপতির মতো তাহ'লে *অ্যালবাট্রস* কি তাদের শিখাতেই ঝাঁপ খেতে যাচ্ছে ?

পরের ঘণ্টাটা কাটলো বিপুল উত্তেজনার মধ্যে । যেন এরেবুস সবেগে ছুটে আসছে *অ্যালবাট্রসের* দিকে—এমনি মনে হ'লো নিচের দিকে তাকিয়ে । আগুনের শিখা লকলকে

জিভ বার ক'রে মেঘ চাটছে লোলুপভাবে । আর হাজার ফুলঝুরি জ্ব'লে উঠেছে শূন্যে চারপাশে । দীপ্ত আভায় ভ'রে আছে চারদিক । সেই আলোয় মধ্যে *অ্যালবাট্রসের* উপরকার অস্থির মানুষগুলোকে দেখাচ্ছে অন্য কোনো জগতের লোকের মতো । অস্থির, কিন্তু নিশ্চল দাঁড়িয়ে, তারা অপেক্ষা করছে সেই ভীষণ মুহূর্তের, কখন এরেবুসের গনগনে উনুনটা তাদের গিলে ফ্যালে ।

কিন্তু যে-হারিকেন *অ্যালবাট্রসের* ঝুঁটি ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে-ই তাকে ঝলসে-মরা থেকে বাঁচালো । ঝড় যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে আগুন, আর সেই মুষলধার বর্ষণ ঝ'রে গেলো সেই ক্ষুধাতুর অলাতচক্রের উপর । *অ্যালবাট্রস* নিরাপদেই উড়ে গেলো তার উপর দিয়ে ।

একঘণ্টা পরে পিছনের দিগন্ত সেই জ্বলন্ত মশাল দুটিকে গিলে ফেললো—*অ্যালবাট্রস* ডিসকভারি ল্যাণ্ড পেরিয়ে মেরুবলয় থেকে বেরিয়ে একশো পঁচাত্তর ডিগ্রি মধ্যরেখায় । হিমবাহের উপর দিয়ে ঝড় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে । তাকে এতক্ষণ চালিয়ে এনেছে কোনো সারেং বা কোনো টম টারনার নয়—স্বয়ং ঈশ্বর । আর ঈশ্বরই সত্যিই সবচেয়ে ভালো যানচালক ।

আর তারপরেই—আশ্চর্য ! ঝড় আস্তে-আস্তে ক'মে এলো । ক্রমশ *অ্যালবাট্রস* আবার ফিরে এলো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে । আর তার চেয়েও বড়ো কথা, সেই দীর্ঘ মরুরাত্রি অতিক্রম ক'রে আবার দিনের বেলায় এসে পৌঁছেছে এই উড়োযান । দিন দেখা দিলে,—অবশেষে বেলা আটটায় ।

ঝড় রবয়ুকে তাড়িয়ে এনে প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলে দিয়েছে—উনিশ ঘণ্টায় পার ক'রে দিয়েছে চার হাজার সাড়ে-তিনশো মাইল—অর্থাৎ মিনিটে পার করিয়েছে তিন মাইল—*অ্যালবাট্রসের* সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে যে-গতি পাওয়া যেতো, তার একেবারে দুনো, ডবোল । কিন্তু তা সত্ত্বেও, দিগ্‌দর্শককে চুম্বক টেনেছিলো, বিকল হ'য়ে গিয়েছে, রবয়ু এটা বুঝতে পারছিলো না যে সত্যি সে কোথায় আছে । যতক্ষণ-না সূর্য ওঠে, ততক্ষণ বোঝবারও কোনো উপায় নেই । আর, দুর্ভাগ্য যাকে বলে, সারা দিন আকাশে ভেজা, নিচু, কালো মেঘ ঝুলে রইলো, একবারও দেখা গেলো না সূর্যকে ।

এদিকে ঝড়ের প্রকোপে *অ্যালবাট্রসের* চাকা আর প্রপেলার অনেকটাই কাহিল হ'য়ে পড়েছে । সারা-দিনে টিকিয়ে-টিকিয়ে টিমে তেতালায় চলা ছাড়া আর-কোনো উপায় ছিলো না । কোথাও নোঙর ফেলে টুকিটাকি মেরামতগুলো সেরে নেবে কি না ভাবতে লাগলো রবয়ু ।

২৭শে জুলাই সাতটা নাগাদ উত্তর দিকে ডাঙা দেখা গেলো । একটা ছোট্ট দ্বীপ, কালো ফুটকির মতো জেগে আছে জলের উপর । কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের অগুনতি দ্বীপের মধ্যে এটা কোনটা ? না-জানলেও রবয়ু স্থির করলে এখানেই নোঙর ফেলবে—মাটিতে নামবে না অবিশ্যি তবুও—সারা দিনে মেরামতির কাজ সেরে নিয়ে আবার সন্ধেবেলায় রওনা হবে ।

হাওয়া তখন একেবারেই ম'রে গেছে । আর তার ফলে নোঙর ফেলতে সুবিধেই হ'লো তাদের—অন্তত *অ্যালবাট্রসকে* হাওয়া তো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না—এটাই যা নিশ্চিন্তি ।

দেড়শো ফিট লম্বা একটা নোঙর লাগানো লোহার তার ফেলে দেয়া হ'লো নিচে। নোঙরটা দ্বীপের নানা পাহাড়ের চুড়োর মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ দুটি বড়ো পাথরের খাঁজে শক্ত ক'রে আটকে গেলো।

ফিলাডেলফিয়া থেকে আকাশপথে রওনা হবার পর এই প্রথম আবার ডাঙার সঙ্গে বাঁধা হ'লো *অ্যালবাট্রসকে*।

...

অ্যালবাট্রস যখন ছিলো আকাশে, অনেক উঁচুতে, তখন দ্বীপটাকে দেখে বেশ মাঝারি গোছের ব'লেই হয়েছিলো আয়তনে। কিন্তু কোন অক্ষরেখায় পড়েছে দ্বীপটা? কোন মধ্যরেখা ভেদ ক'রে গেছে একে! দ্বীপটা কি অস্ট্রেলিয়ার কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে? না কি আসলে এটা ভারত মহাসাগরেরই একটা দ্বীপ? সূর্য উঠলে রবয়ু নানাভাবে মাপজোক নিয়ে সব তথ্য জোগাড় করেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রুডেন্টদের জানবার কোনো উপায় নেই। তাঁরা কেবল অনুমান করলেন সব দেখেশুনে, যে দ্বীপটা প্রশান্ত মহাসাগরেই জানা-অজানা দ্বীপগুলোর অন্যতম। এখন দেড়শো ফিট উঁচু থেকে মাইল পনেরো লম্বা দ্বীপটাকে সমুদ্রের উপর একটা তিনবিন্দু তারার মতো দেখাচ্ছে।

দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তে একটা পার্বত্যময় চোখা কোণ বেরিয়েছে দ্বীপটা থেকে। উত্তরপশ্চিমে আকাশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে দুশো ফিট উঁচু একটি শঙ্কুল পাহাড়। দ্বীপে কোথাও যে জনমানব আছে এমন-কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। অন্য তীরে লোকবসতি আছে কি না কে জানে। থাকলে *অ্যালবাট্রসকে* দেখে আতঙ্কিত হ'য়ে তারা নিশ্চয়ই লুকিয়ে পড়বে, নয়তো দ্বীপ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করবে।

অ্যালবাট্রস নোঙর ফেলেছিলো দ্বীপের দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তে। কাছেই একটা পাহাড়ি নদী গড়িয়ে নেমে গেছে। নদীর ওপারে ঘুরে-ঘুরে গেছে একাধিক উপত্যকা : কত ধরনের গাছপালা, কেউ জানে না। পাখিও রয়েছে অনেক। দ্বীপটায় যদি কেউ বাস নাও করে; এটা যে বাসযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। রবয়ু ইচ্ছে করলে নোঙর না-ফেলে নেমেই পড়তে পারতো; হয়তো জমি বন্ধুর ও প্রস্তরময় ব'লে নামবার চেষ্টা করেনি।

অন্যরা যখন মেরামতির কাজে ব্যস্ত, রবয়ু আর টম টারনার সূর্যোদয় দেখে দ্বীপের অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করেছে। শেষটায় সূর্য যখন মধ্যগগনে এলো, তখন রবয়ু অঙ্ক ক'রে দ্বীপটার অবস্থিতি নির্ণয় করলে :

১৭৬ ডিগ্রি ১০ মিনিট পশ্চিম দ্রাঘিমা

৪৪ ডিগ্রি ২৫ মিনিট দক্ষিণ অক্ষাংশ

এ থেকে বোঝা যায় দ্বীপটা চ্যাটহ্যাম আইল্যাণ্ডস-এর কাছে অবস্থিত—সম্ভবত পিট আইল্যাণ্ডের খুব কাছে।

'যতটা ভেবেছিলুম, তার চেয়েও অনেক কাছে এসে পড়েছি,' টম টারনারকে বললে রবয়ু।

'কতদূরে আছি এখন?'

'এক্স আইল্যাণ্ডের ছেচল্লিশ ডিগ্রি দক্ষিণে—আটাশশো মাইল ঘুরে।'

'তাহ'লে প্রপেলারগুলো ভালো ক'রে সারিয়ে নেয়া দরকার। রাস্তায় আবার ঝড়

উঠলেই দফারফা। তাছাড়া রসদও ফুরিয়ে এসেছে—খুব তাড়াতাড়িই এক্স আইল্যাণ্ডে আমাদের পৌঁছুনো দরকার।'

'হ্যাঁ, টম। আশা তো করি আজ রাতেই রওনা হতে পারবো। অন্তত একটা প্রপেলার কাজ করলেই রওনা হ'য়ে পড়বো—পরে, রাস্তায়, বাকিগুলো সারিয়ে নিতে হবে।'

'কিন্তু ওই দুই ভদ্রলোক আর তাদের ভৃত্যটি সম্বন্ধে কী করা হবে?'

'তোমার কি মনে হয় এক্স আইল্যাণ্ডে গিয়ে বসবাস করতে তাদের আপত্তি হবে?'

কিন্তু এই 'এক্স' দ্বীপটি কোথায়? বিষুবরেখা আর কর্কটক্রান্তির মাঝখানে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল তরঙ্গে লুকিয়ে-থাকা একটা দ্বীপ; রবয়ু তাকে গণিতের সাংকেতিক নামেই ডাকে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরে অবস্থিত এই দ্বীপেই রবয়ু স্থাপন করেছে তার ছোট্ট উপনিবেশ। *অ্যালবাট্রস* যখন আকাশ ওড়ার ধকল কাটিয়ে ওঠার জন্যে বিশ্রাম চায়, তখন এই দ্বীপে গিয়েই আশ্রয় নেয়। সেখানেই রসদ বোঝাই করা হয় *অ্যালবাট্রসে*। এই 'এক্স' দ্বীপেই অতুল বিত্তের অধীশ্বর রবয়ু তার উড়োযান বানিয়েছে। সেখানেই সে তাকে মেরামত করে। ইচ্ছে করলে নতুন আরেকটা উড়োযানও বানাতে পারে সেখানে। তার এই ছোট্ট উপনিবেশের পঞ্চাশজন মানুষ যাবতীয় দরকারি জিনিশ সেখানে জড়ো ক'রে রেখেছে। এই দ্বীপেই এখন ফিরে যেতে চায় ব'লে তার অনুচরেরা অবিশ্রান্ত খেটে *অ্যালবাট্রসকে* মেরামত করতে লাগলো।

আর যখন সবাই গলুইয়ে প্রপেলার সারাতে ব্যস্ত, তখন *অ্যালবাট্রসের* একপ্রান্তে ব'সে আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভানস একটা ছোটো মন্ত্রণাসভার অবতারণা করেছিলেন।

'ফিল ইভানস,' আঙ্কল প্রুডেন্ট জিগেস করলেন, 'আমার মতো দরকার হ'লে প্রাণ দিতে পারবে তুমি? মরতে পেছ-পা হবে না তো?'

'হবো না।'

'বোঝাই তো যাচ্ছে রবয়ুর কাছে আমাদের প্রত্যাশা করার কিছু নেই।'

'সে-তো অতি স্পষ্ট।'

'তাহ'লে শোনো ফিল ইভানস—আমি মনস্থির ক'রে ফেলেছি। আজ রাতে যদি *অ্যালবাট্রস* এখান থেকে নোঙর তোলে, তাহ'লে রাতের মধ্যেই আমাদের কাজ হাঁসিল ক'রে ফেলতে হবে। রবয়ুর এই পক্ষীশাবকের পাখনা ছিঁড়ে ফেলতে হবে আমাদের। আজ রাতেই আমি *অ্যালবাট্রসকে* বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেবো!'

'শুভস্য শীঘ্রম্,' ফিল ইভানস ফোঁড়ন কাটলেন।

কে বলবে এই দুজন কিছুকাল আগেও ছিলেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী! যেভাবে দুজনে এমনকী মৃতুবরণ করার ব্যাপারেও একমত হ'য়ে উঠেছেন, তাতে তাদের একপ্রাণ দুই দেহ ব'লেই মনে হ'তে পারে এখন।

'সব মালমশলা হাতে আছে তো? জোগাড়যন্তর সব হ'য়ে গেছে?' জিগেস করলেন ইভানস।

'হ্যাঁ। কাল রাতে রবয়ু আর তার সাগরেদরা যখন ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত, আমি তখন চুপিসাড়ে বারুদঘরে ঢুকে পড়েছিলুম। কতগুলো ডাইনামাইট হাতিয়ে নিয়ে

এসেছি আমি ।'

'তাহ'লে কাজে লেগে পড়লেই তো হয়, আঙ্কল প্রুডেন্ট ।'

'না । আগে রাত হোক । সন্ধে হ'লেই আমরা আমাদের কামরায় ঢুকে পড়বো । তারপর যা দেখতে পাবে তাতে তোমার তাক লেগে যাবে ।'

সন্ধে ছ-টার সময় যথারীতি দুই বন্ধু নৈশভোজ সেরে নিলেন । দু-ঘন্টা পরে তাঁরা দুজনে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে নিজেদের কামরায় ঢুকে পড়লেন : কাল রাতে একেবারেই ঘুম হয়নি, ভাবটা সেই নিদ্রহীনতা আজকে সুদে-আসলে পুষিয়ে নেবেন । রবয়ু কিংবা তার সাগরেদেরা কেউই স্বপ্নেও ভাবতে পারলে না এঁদের আসল মৎলবটা কী ।

ফন্দিটা বেরিয়েছে প্রুডেন্টরই উর্বর মস্তিষ্ক থেকে । রবয়ু যখন দাহোমেতে ডাইনামাইট ব্যবহার করেছিলো, তখন থেকেই তাকে-তাকে ছিলেন প্রুডেন্ট : এবার ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন ; কয়েকটা ডাইনামাইট হাতিয়ে এনে নিজের কামরায় লুকিয়ে রেখেছেন—এগুলো দিয়েই উড্ডীন *অ্যালবাট্রসকে* উড়িয়ে দিতে চান তিনি ।

ফিল ইভানসকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালেন প্রুডেন্ট—যাতে হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ এসে কামরায় ঢুকে পড়লে কিছু দেখতে না-পায় । কারণ ইভানস তখন ডাইনামাইটগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখছিলেন । *অ্যালবাট্রস* আকাশে উড়ে যাচ্ছে, এই অবস্থায় ডাইনামাইট ফাটালে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্তি : বিস্ফোরণে যদি শতখণ্ড না-ও হয়, উপর থেকে নিচে প'ড়েই তার দফা রফা হ'য়ে যাবে । এর চেয়ে সহজ কাজও আর-কিছু নেই ; এই কামরার এককোণে ডাইনামাইটগুলো লুকিয়ে রেখে পলতের আগুন ধরিয়ে দিলে আস্ত ডেকশুদ্ধু হাল টাল সমেত সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে ।

'এই কারট্রিজগুলো সরাবার সময়,' প্রুডেন্ট বললেন, 'কিছু বারুদও হাতিয়ে নিয়ে এসেছি । ওই বারুদ দিয়েই পলতে বানাবো আমি —একটু সময় নেবে পুড়তে, আর তাতে ভালোই হবে—সেই ফাঁকে আমরা স'রে পড়তে পারবো । আমার ইচ্ছে, ঠিক মাঝরাতে পলতেয় আগুন দিই ; তাহ'লে বিস্ফোরণ ঘটবে রাত তিনটে-চারটে নাগাদ ।

'দিব্যি প্ল্যান হয়েছে,' ফিল ইভানস তারিফ করলেন ।

এঁরা দুজনে এমন-একটা মানসিক অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন যে ভালো-মন্দের বোধটাও এঁদের একেবারে লোপ পেয়েছে । রবয়ু আর তার সাগরেদদের উপর এঁদের ঘৃণা এমনই প্রবলতর রূপ নিয়েছে *অ্যালবাট্রস* ও তার আরোহীদের ধ্বংস করতে গিয়ে এমনকী নিজেদের যদি মরতেও হয় তাতেও এঁরা গররাজি নন । পাগলের কাজ—পুরো উন্মাদ না-হ'লে এই জঘন্যভীষণ কাজে কেউ হাত দেয় ? কিন্তু পাঁচ সপ্তাহে তাঁদের ক্রোধ ও রোষ এমন-একটা তীব্র রূপ নিয়েছে, হিংস্র চরিতার্থতা ছাড়া তার আর অন্য-কিছু কাম্য নেই ।

'আর ফ্রাইকোলিন ?' জিগেস করলেন ফিল ইভানস, 'তার কী হবে ? তার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কি আমাদের আছে ?'

'আমরা তো নিজেদের জীবন নিয়েই ছিনিমিনি খেলছি !' এর বেশি আর-কিছু বলা দরকার আছে ব'লে আঙ্কল প্রুডেন্টের মনে হ'লো না ।

ব'লেই, আর সময় নষ্ট না-ক'রে আঙ্কল প্রুডেন্ট কাজে লেগে গেলেন, আর ইভানস কামরার আশপাশে ঘুরঘুর করতে লাগলেন, উদ্দেশ্য রবয়ুদের উপর নজর রাখা । তার অবিশ্যি

দরকার ছিলো না, কারণ তখনও সবাই *অ্যালবাট্রসকে* মেরামত করতেই ব্যস্ত। হঠাৎ এসে সব পরিকল্পনা ভেস্তে দেবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই কারু। প্রথমে অল্প-একটু বারুদ নিয়ে মিহি ক'রে গুঁড়ো ক'রে নিলেন প্রুডেন্ট, তারপরে তাদের একটু ভিজিয়ে নিয়ে একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে সলতে পাকিয়ে সেই বারুদটাকে তার মধ্যে মুড়ে নিলেন। দেশলাই জ্বেলে দেখা গেলো এক ইঞ্চি জ্বলতে পাঁচ মিনিট সময় নেয়—অর্থাৎ তিন ঘণ্টায় জ্বলবে এক গজ। সে-রকম এক গজ সলতে বানিয়ে ডাইনামাইটের গায়ে এমনভাবে পেঁচিয়ে রাখা হ'লো, যাতে আঁচ লেগে সেটা ফেটে পড়ে। কারু মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না-ক'রে দশটার মধ্যেই প্রুডেন্টের সব কাজ শেষ হ'য়ে গেলো।

সামনের দিকের প্রপেলারটা *অ্যালবাট্রস* থেকে খুলে নিয়ে সারাদিন ধ'রে কাজ করেছে রবয়ুরা। আর মেরামত করতে-করতে রাত হ'য়ে গেছে। *অ্যালবাট্রসকে* চালাতে হ'লে প্রপেলারটা আবার জুড়ে দিতে হয়। কিন্তু সে-কাজটা এত সূক্ষ্মতার সঙ্গে করতে হয় যে রাতের বেলায় বৈদ্যুতিক বাতি জ্বেলে করার জো নেই। কাজেই তারা ঠিক করেছিলো যে রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিয়ে পরদিন আলো ফুটলে প্রপেলারটা জুড়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।

ইতিমধ্যে রবয়ুরা যে পরিকল্পনা বদ্‌লে ফেলেছে, প্রুটেন্টেরা তা জানতেন না। তাঁরা ভেবেছিলেন রাত্তিরেই বুঝি *অ্যালবাট্রস* আবার রওনা হ'য়ে পড়বে।

চাঁদ ওঠেনি রাত্তিরে; বোধহয় কৃষ্ণপক্ষ। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভারি মেঘ ঝুলে আছে আকাশে: তাতে অন্ধকার আরো-গাঢ় হয়েছে। হঠাৎ একটু হাওয়া দিলো দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে। তাতে অবশ্য *অ্যালবাট্রসের* কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হ'লো না: সে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চল, মাটি থেকে দেড়শো ফিট উপরে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভানস তখন নিজেদের কামরায় ব'সে-ব'সে ভাবছেন *অ্যালবাট্রস* আবার নোঙর তুলেছে। চুয়াত্তরটা ঊর্ধ্বমুখ চাকার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে ফ র্ র্ র্—আর তাতে বাইরের সব কথাবার্তা চাপা প'ড়ে গেছে। ভিতরে ব'সে-ব'সে তাঁরা কেবল অপেক্ষা করছেন কখন সময় আসে।

বারোটা নাগাদ প্রুডেন্ট ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন। 'জিরো আওয়ার আসন্ন।'

কামরার দেয়ালে ছিলো ছোটো-একটা কুলুঙ্গি। সেখানেই প্রুডেন্ট ডাইনামাইট আর পলতে রেখেছেন। পলতে যখন জ্বলবে, তখন কুলুঙ্গির মধ্যে ব'লে বাইরে থেকে ধোঁয়া দেখা যাবে না। প্রুডেন্ট সাবধানে পলতের প্রান্তটা জ্বালিয়ে দিলেন—তারপর সেটাকে কুলুঙ্গির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'চলো, এবার *অ্যালবাট্রসের* পিছন দিকে গিয়ে অপেক্ষা করি—কী হয়।'

বেরিয়ে গিয়ে তাঁরা খুব অবাক হ'য়ে গেলেন, যখন দেখলেন সারেঙ তার জায়গায় নেই। ফিল ইভানস রেলিঙ থেকে ঝুলে প'ড়ে নিচে তাকালেন।

'আরে! *অ্যালবাট্রস* তো ছাড়েনি—যেখানে ছিলো সেখানেই আছে।' নিচু গলায় ফিল ইভানস বললেন, 'ওদের কাজ নিশ্চয়ই শেষ হয়নি। ওরা তো রওনাই হয়নি।'

আঙ্কল প্রুডেন্ট কি-রকম হতাশ হ'য়ে পড়লেন। 'পলতেটা নিভিয়ে ফেলতে হবে তাহ'লে।'

'না,' ফিল ইভানস এবার নেতৃত্ব দিলেন, 'আমাদের পালাতে হবে।'

'পালাতে হবে ?'

'হ্যাঁ। ওই নোঙরের দড়ি ধ'রে-ধ'রে। দেড়শো ফিট তেমন-কিছু নয় !'

'দেড়শো ফিট সত্যি তেমন-কিছু নয়। ইভানস, তুমি ঠিকই বলেছো। একবার যখন সুযোগটা হাতে এসেছে তখন তাকে কাজে না-খাটানো আহাম্মুকি হবে।'

আবার তাঁরা কামরায় ফিরে গেলেন। এই দ্বীপে কত দিন কাটাতে হবে কে জানে। তাই পালাবার আগে যতটা-সম্ভব জরুরি জিনিশ সঙ্গে ক'রে নেয়া চাই। তারপর নানা জিনিশ সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সাবধানে বাবুর্চি তাপাজ-এর ঘরের দিকে গেলেন। ফ্রাইকোলিনকেও সঙ্গে ক'রে নিতে হবে। নিঃশব্দে, পায়ে-পায়ে এগুতে লাগলেন তাঁরা ফ্রাইকোলিনের কামরার দিকে, অত্যন্ত সাবধানে—যাতে কেউ দেখে না-ফ্যালে।

অন্ধকার যেন নিরেট দেয়াল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, এমনি ঘন। নিচু ভারি মেঘ ভেসে যাচ্ছে, হাওয়া আগের চেয়ে একটু জোর হয়েছে—নোঙরের দড়িটা কাঁপছে হাওয়ায়। কোথাও কোনো শব্দ নেই। রবয়ু আর তার সাগরেদরা বোধহয় ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ফ্রাইকোলিনের কামরার কাছে এসে প্রথমে বাইরে থেকে দুজনে কান পেতে শুনলেন ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় কি না। কেবল তাপাজ-এর নাক ডাকার শব্দ আসছে : তাতে বরং আশ্বস্তই হওয়া গেলো।

কামরার দরজাটা—আশ্চর্য !—খোলাই ছিলো। প্রুডেন্ট ভিতরে ঢুকলেন, তাকিয়ে দেখে ফিশফিশ ক'রে বললেন, 'কেউ তো নেই এ-ঘরে ?'

'এ-ঘরে নেই ? আশ্চর্য ! তাহ'লে কোথায় গেলো হতভাগা ?'

গলুইয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন তাঁরা। ভাবলেন ফ্রাইকোলিন বুঝি গলুইয়ের এক-কোনায় ঘুমিয়ে পড়েছে। উঁহু, সেখানেও কেউ নেই।

'গেলো কোথায় লোকটা ?' বিস্মিত প্রুডেন্ট বিড়বিড় ক'রে বললেন।

'গোল্লাতেই যাক কি অন্য-কোথাও যাক—আর দেরি করার সময় নেই আমাদের।' বললেন ফিল ইভানস, 'এক্ষুনি নেমে পড়তে হবে আমাদের।'

আর ইতস্তত না-ক'রে তাঁরা নোঙরের দড়ি ধ'রে ঝুলে পড়লেন। মাটিতে নামতে তারপর আর বেশি সময় লাগলো না।

মাটিতে পা দিয়ে কী যে ভালো লাগলো। আঃ, কদ্দিন পরে শক্ত মাটিতে পা পড়লো !

পাহাড়ি নদীটার দিক থেকে অন্ধকারে কে একজন এগিয়ে এলো তাঁদের দিকে। আর-কেউ না, ফ্রাইকোলিন ! তারও মাথায় পালাবার মৎলবটা বিদ্যুদ্বেগে খেলে গিয়েছিলো —ফলে সে আর একমুহূর্তও দেরি করেনি। কিন্তু তখন কোনো কথা বলার সময় নেই। তাড়াতাড়ি দ্বীপের অন্যধারে গিয়ে একটা আশ্রয় খুঁজে বার করতে হবে।

প্রুডেন্টের তাড়াহুড়োয় বাধা দিলেন ইভানস। 'আঙ্কল প্রুডেন্ট, এখানে আমরা রবয়ুর হাত থেকে নিরাপদ। সাগরেদদের সঙ্গে-সঙ্গে তারও জন্যে সর্বনাশ অপেক্ষা ক'রে আছে। জানি যে, এই শাস্তির জন্যে সে-ই দায়ী। কিন্তু সে যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে আর আমাদের বন্দী—'

'ওর আবার প্রতিশ্রুতি ! একটা বদমাশ—'

প্রুডেন্টের কথা শেষ হবার আগেই *অ্যালবাট্রসে* একটা তুমুল শোরগোল উঠলো। বোঝা

গেলো, ওরা সব টের পেয়ে গেছে । প্রুডেন্টরা যে পালিয়েছেন এ-খবর আর চাপা প'ড়ে নেই ।

তক্ষুনি উপর থেকে নিচের দিকে সন্ধানী আলো ঘুরে এলো ।

'ওই যে ! ওই-যে তারা !' টম টারনারের গলা শোনা গেলো । পলাতকদের দেখে ফেলেছে তারা ।

কী যেন নির্দেশ দিলে রবয়ু ! অমনি *অ্যালবাট্রস* নিচের দিকে নেমে আ'তে লাগলো ।

ফিল ইভানস চেঁচিয়ে জিগেস করলেন, 'এঞ্জিনিয়ার রবয়ু, তুমি কি কথা দেবে যে আমাদের আর তুমি ধ'রে নেবে না—এই দ্বীপেই থাকতে দেবে স্বাধীনভাবে ?'

'কক্‌খনো না !' রবয়ুর গলা শোনা গেলো । পরক্ষণেই শোনা গেলো একটা বন্দুকের শব্দ । ইভানসের কাঁধ ঘেঁষে একটা গুলি চ'লে গেলো ।

'জানোয়ার !' ব'লে আঙ্কল প্রুডেন্ট ছুরি হাতে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন । *অ্যালবাট্রস* তখন মাটি থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফিট উপরে । নোঙরের দড়িটা কেটে ফেলতে একমিনিটও লাগলো না । তক্ষুনি দক্ষিণপশ্চিমের প্রবলতর হাওয়া *অ্যালবাট্রসকে* নিয়ে গেলো সমুদ্রের দিকে ।

১৩

চৌচির *অ্যালবাট্রস*

তখন বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট । উড়োযান থেকে পাঁচ-ছটা গুলি 'গুড়ুম ! গুড়ুম !' ক'রে ছুটে এলো । কিন্তু ফ্রাইকোলিনকে নিয়ে দুজনে ততক্ষণে পাথরের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন । আঁচড়টুকুও লাগেনি কারু গায়ে । আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত ভয়ের কিছু নেই ।

হাওয়া যখন *অ্যালবাট্রসকে* সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো, তখন একযোগে চুয়াত্তরটি ঊর্ধ্বারোহী চাকা চালিয়ে দেয়া ছাড়া রবয়ুর আর-কোনো উপায় ছিলো না । কারণ না-হ'লে হাওয়া একেবারে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলতো *অ্যালবাট্রসকে* । আর চুয়াত্তরটি চাকা আস্তে-আস্তে *অ্যালবাট্রসকে* তিন হাজার ফিট উপরে তুলে আনলো ।

'পালিয়েছে বটে !' রবয়ু তখন রাগে ফুঁসছিলো, 'কিন্তু যাবে কোথায় ? ওই দ্বীপ থেকে তারা নড়বে কী ক'রে ? দু-একদিনের মধ্যেই আমি আবার ফিরে আসবো । তারপর আবার বন্দী ক'রে আনবো তাদের । তারপর দেখবো—' রবয়ু আর কথা শেষ করতে পারলে না, রাগে এতটাই কাঁপছিলো ।

সে তখনও জানে না যে *অ্যালবাট্রসের* জন্যে ভবিষ্যতের হাতে কী তোলা আছে ! একটা কুলুঙ্গিতে যে ডাইনামাইট দু-ঘন্টার মধ্যেই ফেটে পড়বে, তা সে তখনও জানে না !

এদিকে হাওয়া ক্রমশই প্রবলতর হচ্ছে: দ্বীপে ফিরে যেতে হ'লে প্রপেলার লাগানো

চাই—বিশেষ ক'রে গলুইয়ের গায়ে যে-প্রপেলারটা আছে, সেটাকে জুড়ে না-দেয়া অব্দি *অ্যালবাট্রসকে* ঠিক মতো চালানোই যাবে না। 'টম,' রবয়ু বললে, 'সব আলোগুলো জ্বেলে দাও।'

'দিচ্ছি '

'সব্বাইকে কাজে লাগিয়ে দাও এক্ষুনি।'

'দিচ্ছি।'

সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার আর দরকার নেই—অবসাদের কথা ভুলে এক্ষুনি কাজে না-লাগলে চলবে না।

সবাই তক্ষুনি প্রপেলারটাকে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

টম টারনার রবয়ুর কাছে এসে দাঁড়ালে। রাত তখন সোয়া একটা। 'হাওয়ায় আর তেমন জোর নেই—পশ্চিম দিকে ফিরে যাচ্ছে এবার,' বললে সে, 'উলটো দিকে।'

আকাশের দিকে তাকালে রবয়ু। 'ব্যারোমিটার কী বলে ?'

'ব্যারোমিটারে তেমন-কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। *অ্যালবাট্রস*-এর নিচে মেঘ জমা হচ্ছে।'

'তা-ই তো দেখছি। সমুদ্রে বৃষ্টি পড়ছে বোধহয়। আমরা যদি বৃষ্টিবাদলের উপরের স্তরে থাকি, তাহ'লে আমাদের তেমন অসুবিধে হবে না।'

'বৃষ্টি যদি হয়ও তাহ'লে সেটা তেমন প্রবল নয়।' টম বললে, 'মেঘ দেখে তো তা-ই মনে হচ্ছে। নিচে হয়তো হাওয়া একেবারেই নেই।'

'হয়তো ঠিকই ধরেছো তুমি। কিন্তু আমার মনে হয় না এখনও আমাদের নিচে নামা উচিত। আগে প্রপেলারটা লাগিয়ে নিই—তারপর ও-সব তুচ্ছ ব্যাপারকে পরোয়া না-করলেও চলবে।'

আরো খানিকক্ষণ পরে সববাই মিলে প্রাণপণে খেটে প্রপেলারটাকে যথাস্থানে বসিয়ে দিলে। *অ্যালবাট্রস* আবার দ্বীপ লক্ষ্য ক'রে চলতে শুরু করলো ; প্রথমটায় আস্তে যাচ্ছিলো, ক্রমশ গতি বাড়িয়ে দেয়া হ'লো।

'টম,' রবয়ু বললে, 'প্রায় আড়াই ঘণ্টা হ'লো আমরা অসহায়ভাবে হাওয়ার তোড়ে ভেসে এসেছি। মনে হয় এবার এক ঘণ্টাতেই ফিরে যেতে পারবো।'

'হ্যাঁ। সেকেণ্ডে চল্লিশ ফিট যাচ্ছি এখন। সাড়ে-তিনটের মধ্যেই আমাদের দ্বীপে পৌঁছে যাওয়া উচিত।'

'ভালোই হ'লো। অন্ধকার থাকতেই ফিরে যেতে পারবো আমরা। দরকার হ'লে মাটিতে নামতেও পারি বেলাভূমিতে। ওই আহাম্মুকগুলো হয়তো ভাবছে যে আমরা অনেক দূরে চ'লে গেছি—আমরা যে ফিরে এসেছি তা তারা জানতেও পারবে না।'

হঠাৎ একটু পরে ডেকে একটা শোরগোল উঠলো।

'কী ব্যাপার ?' রবয়ু জিগেস করলে।

হাওয়ায় কিসের গন্ধ শুঁকবার চেষ্টা করলে টম। 'একটা অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না ? বারুদের গন্ধ ব'লে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, বারুদেরই গন্ধ !'

'ওই কামরাটা থেকে গন্ধ আসছে !'

'ওই কামরাটা ? ওখানে তো ওরা থাকতো !'

'ওরা কি আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে নাকি ?'

'যদি আরো-কিছু ক'রে দিয়ে থাকে !' রবয়ু চেঁচিয়ে উঠলো, 'টম দরজাটা খুলে ফ্যালো। দরকার হ'লে ভেঙে ফেলতে হবে !'

কিন্তু টম দরজাটার দিকে এক পা এগুবার আগেই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আস্ত *অ্যালবাট্রস* থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো। কামরাগুলো ভেঙে পড়েছে। বাতি নিভে গেছে। তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ। অন্ধকার পূর্ণাঙ্গ ও ভয়ংকর। সাঁইত্রিশটা খুঁটির মধ্যে প্রায় সবগুলোই উড়ে গেছে—মাত্র দু-একটা উর্ধ্বারোহী চাকা কাজ করছে।

পরক্ষণেই *অ্যালবাট্রসের* এঞ্জিন আর হাল ভেঙে পড়লো—বলা ভালো শূন্যে উড়ে গেলো। তক্ষুনি শেষ চাকাটাও বন্ধ হ'য়ে গেলো। *অ্যালবাট্রস* যেন কোন পাতালে ধ্ব'সে পড়ছে।

দশ হাজার ফিট থেকে প্রবল বেগে নেমে আসছে *অ্যালবাট্রস*—অভিকর্ষের টান তাকে পাতালে নিয়ে গিয়ে টুকরো-টুকরো ক'রে দেবে। আর আটটা লোকে তখনো প্রাণপণে আঁকড়ে আছে সেই চৌচির উড়োযান। পুরো উলটে গেছে উড়োযান, গলুইয়ের প্রপেলারটা তখনো ঘুরছে—আর সেজন্যে *অ্যালবাট্রস* দ্রুততর বেগে নেমে আসছে।

এই অবস্থাতেও রবয়ু দিশা হারালে না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সেই ভাঙা গলুইয়ের কাছে গিয়ে প্রপেলারটাকে উলটে দিলে ; যাতে ঘূর্ণ্যমান প্রপেলারটা এখন পতনের বেগ কমিয়ে দেয়।

অ্যালবাট্রস নেমে আসছে বটে, আস্তে-আস্তে। অভিকর্ষের টানের বিরুদ্ধে কাজ করছে সেই উলটে-দেয়া প্রপেলার। অন্তত সমুদ্রে আছড়ে প'ড়ে মরতে হবে না তাদের।

বিস্ফোরণের আশি সেকেণ্ড পরে *অ্যালবাট্রসের* ধ্বংসাবশেষ ঢেউয়ের উপর আছড়ে পড়লো।

১৪

এবার উড়বে *গো-অ্যাহেড*

কয়েক সপ্তাহ আগে, জুন মাসের ১৩তারিখে, ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সেই ঝোড়ো সভার পরদিন সকালবেলায়, আস্ত ফিলাডেলফিয়া দু-দুটি নিরুদ্দেশের সংবাদে কি-রকম চঞ্চল, মুখর ও উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলো, তা আগেই জানিয়েছি। পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করলো ওয়েলডন ইনস্টিটিউট : সভাপতি ও সচিবের কোনো হদিশ দিতে পারলেই কেউ এই টাকাটা পেয়ে যাবে। কিন্তু না, কোনো সন্ধানই তাঁদের মিললো না। ইনস্টিটিউটের কোষাগারেই ওই পাঁচ হাজার ডলার প'ড়ে রইলো—তা দিয়ে কোনো সুরাহাই করা

গেলো না।

সভাপতি আর সচিব—আসল কর্তাব্যক্তি দুজন উধাও হ'তেই ইনস্টিটিউটের কাজকর্মও যে ভণ্ডুল হ'তে বসলো, তা নিশ্চয়ই না-বললেও চলে। *গো-অ্যাহেডের* কাজ আটকে ছিলো কয়েক দিন ; একটা জরুরি সভা আহ্বান ক'রে সেই কাজ একেবারে স্থগিত করা হ'লো। কারণ গত সভায় রবয়ুর আবির্ভাবের ফলে *গো-অ্যাহেড*-এর কাজ কী-রকমভাবে এগুবে, তা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তই নেয়া সম্ভব হয়নি কারু পক্ষে। পুরো পরিকল্পনাটিরই প্রধান উদ্যোক্তা যাঁরা, যাঁদের অর্থ ও সময় হরণ ক'রে এই পরিকল্পনার কাজ এগুচ্ছিলো, তাঁদের অনুপস্থিতির সময় এ-কাজ শেষ করাই বা যায় কী ক'রে। তার চেয়ে বরং কিছুকাল অপেক্ষা করাও ভালো।

এমন যখন অবস্থা, তখনই নানা স্থান থেকে বার্তা আসতে লাগলো আকাশে একটি অদ্ভুত উড়োযান দেখা গেছে ব'লে। যে-রহস্যময় ব্যাপারটি নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধ'রে হুলুস্থুল চলছিলো, তারই জের টেনে যেন উড়োযানটিকে আবার পর-পর নানাস্থানে দেখা গেলো। তেমনি রহস্যময় তার আনাগোনা—তেমনি রহস্যময় তার কাণ্ডকীর্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নিরুদ্দেশের সঙ্গে উড়োযানের আনাগোনার মধ্যে যে কোনো যোগাযোগ আছে, এই কথাটা কারু মাথাতেই খেললো না। কয়েক ঢোঁক কল্পনারসের আরক না-মিললে এই যোগসূত্র আবিষ্কার করা সত্যি কারু পক্ষে অসম্ভবই ছিলো।

কিন্তু সত্যি কি উড়োযান, না আরো-কিছু ? কোনো উড়ো দানব ? গ্রহান্তরের উড্ডীন ভগ্নখণ্ড ? কেউ তা জানে না। প্রথমে তাকে দেখা গেলো ক্যানাডায়, অটোয়া আর ক্যেবেকের মধ্যস্থলে, তারপরে দূর-পশ্চিমের মালভূমির আকাশে। একবার নাকি ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেল কম্পানির গাড়ির সঙ্গে সে দৌড়ের পাল্লাতেও নেমেছিলো।

তারপরেই বিদগ্ধ সমাজের সব সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে পর-পর তার খবর এলো নিপ্পন, চিন, ভারত, রুশদেশের স্তেপভূমি থেকে। কোনো সংশয়ই রইলো না যে এটা আসলে মনুষ্যচালিত একটি উড়োযান। 'বাতাসের চেয়েও ভারি' কোনো বিমানের জলজ্যান্ত উদাহরণ যে এটি, তাতে আর-কোনো সন্দেহই রইলো না। কিন্তু কে সেই দুঃসাহসী বৈমানিক, যে এই আশ্চর্য উড়োযানটি তৈরি করেছে ? কে সেই ব্যক্তি, যার কাছে আস্ত জগৎ একটা খেলনার দেশে পরিণত ? কোনো দেশের সীমান্ত তাকে বাধা দিতে পারে না, সমুদ্র তার বিশালতা নিয়েও তার কাছে পরাস্ত, আকাশ যেন তার মস্ত জমিদারি। কিন্তু কে সেই ব্যক্তি ? সে কি রবয়ু, যে একদিন ওয়েলডন ইনস্টিটিউটে ভাষণ দিতে এসে নাজেহাল হয়েছিলো ? হয়তো রবয়ুই এই আশ্চর্য বৈমানিক— কেউ-কেউ ভাবলে। কিন্তু তারা পর্যন্ত এই উড়োযানের সঙ্গে দু-দুটি নিরুদ্দেশের কোনো যোগাযোগ আছে ব'লে কল্পনাও করতে পারলে না।

জুলাই মাসের তেরো তারিখে রাত এগারোটা সাঁইত্রিশ মিনিটের সময় ফ্রান্স থেকে হঠাৎ এক তারবার্তা এসে হাজির নিউ-ইয়র্কে। পারীর সেই নস্যির কৌটোয় যে-চিরকুটটি পাওয়া গিয়েছিলো, তারই সারমর্ম ছিলো এই তারবার্তায়।

আর-কোনো সন্দেহই রইল না। তাহ'লে রবয়ুই এই বেলুনবাজ দুজনকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছে। *গো-অ্যাহেডের* পরিকল্পনা ডিম্বাকারেই ভেস্তে দেয়া তার উদ্দেশ্য ? সে-ই তবে *অ্যালবাট্রস* নামক উড়োজাহাজের আবিষ্কারক ও প্রধান চালক ?

উত্তেজনায় ওয়েলডন ইনস্টিটিউট যেন বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লো । প্রথমটায় কেউই বিশ্বাস করতে চায়নি খবরটা । 'নিশ্চয়ই কারু ঠাট্টা,' বললে কেউ । কেউ বললে, 'যত গাঁজাখুরি ব্যাপার ।' ও-রকম একটা ব্যাপার প্রকাশ্যে সকলের নাকের ডগায় ফিলাডেলফিয়ার ঘ'টে গেলো ? হ'তেই পারে না । ফেয়ারমাউন্ট পার্কে *অ্যালবাট্রস* আস্ত পেনসিলভানিয়ার চোখ এড়িয়ে এসে হাজির হয়েছিলো ?

'তা, বিশ্বাস করার মাথার দিব্যি তো কেউ দেয়নি—' অন্য-অনেকে বললে । কিন্তু সাত দিন পরে যখন *নরম্যাণ্ডি* জাহাজটি পারী থেকে সেই বিখ্যাত নস্যির কৌটোটা নিয়ে এলো, তখন অবিশ্বাসীদের মুখ চুন হ'য়ে গেলো । এটা যে ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতিমশাইয়েরই নস্যির কৌটো তাতে কোনো সন্দেহই নেই । জেম চিপ তো নস্যির কৌটোটা চিনতে পেরেই মূর্ছিত হ'য়ে পড়লেন । কতবার বক্তৃতার সূত্রে কত টিপ নস্যি নিয়ে নাকে পুরেছেন তিনি এই কৌটো থেকে । অন্যান্য সদস্যরাও চিনতে ভুল করলে না । বিশেষ ক'রে সভাপতিমশাইয়ের হাতের লেখা না-চেনার কোনো কারণ তাদের ছিলো না ।

তখন আর আকাশের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে মনস্তাপ প্রকাশ না-ক'রে উপায় কী ! কোন-এক ভয়ংকর উড়োযান ওই অসীম নীলিমায় তাঁদের উড়িয়ে নিয়ে গেছে—আর কি কোনোদিন তাঁদের ফিরিয়ে দেবে ?

আঙ্কল প্রুডেন্টের সবচেয়ে বেশি শেয়ার ছিলো নায়াগ্রা ফলস কম্পানিতে—তারা ব্যাবসা গুটিয়ে ফেললে । ফিল ইভানস ছিলেন হুইলটন ওয়াচ কম্পানির ম্যানেজার—তারা কারখানা বন্ধ ক'রে দিলে । উড়োযানেরও আর-কোনো খবর নেই । কেটে গেলো জুলাই—কোনো বার্তা নেই । আগস্ট মাসও শেষ হ'য়ে গেলো—রবয়ুর বন্দীদের কোনো খবরই নেই । তাহ'লে কি ইকারুসের মতো *অ্যালবাট্রসকেও* একদিন মাটিতে প'ড়ে গুঁড়িয়ে যেতে হয়েছে ?

হঠাৎ ২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ধেবেলায় ফিলাডেলফিযায় এক মস্ত গুজব ছড়িয়ে পড়লো । সেদিকে বিকেলে কারা নাকি দেখেছে আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভানস ফ্রাইকোলিনকে সঙ্গে নিয়ে প্রুডেন্টের বাড়িতে ঢুকতে । গুজব ব'লেই সবাই খবরটা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করলে, কিন্তু কেউই তা বিশ্বাস করলে না । অথচ—কিমাশ্চর্য—এটা আসলে ভিত্তিহীন জনরবমাত্রই ছিলো না—খবরটা ছিলো নির্জল সত্যি ।

কিন্তু গুজব ব'লে উড়িয়ে দেয়া সত্ত্বেও দলে-দলে লোক গিয়ে ভিড় করলে আঙ্কল প্রুডেন্টের বাড়ির সামনে । এবং তাঁরা সমবেত জনতার সামনে দেখাও দিলেন । বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন তাঁরা—হাত নাড়তে-নাড়তে কাঁধে ব্যথা হ'য়ে গেলো । বন্ধুরা কেউ ও-তল্লাট ছাড়বার নামও করলে না ।

সেদিন সন্ধেবেলায় ছিলো ইনস্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন । দুজনের কেউই যখন তাঁদের অ্যাডভেনচার সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না, তখন সবাই ভাবলে তাঁরা নিশ্চয়ই ওই অধিবেশনেই তার বিস্তৃত প্রতিবেদন দেবেন । এমনকী ফ্রাইকোলিনের কাছ থেকেও কোনো খবর বার করা গেলো না—সে শুদ্ধু মুখে কুলুপ এঁটে ব'সে আছে । একবার আকাশে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ঝাঁকানি খেয়েই চিরকালের মতো বাচালতা সেরে গেছে তার ।

কিন্তু আঙ্কল প্রুডেন্টরা থলি থেকে কোনো বেড়াল বার না-করলেও, আমরা কেন সব খবর জানবার চেষ্টা করবো না ? ২৮শে জুলাই রাত্তিরে কী হয়েছিলো, আমরা তো সবই

জানি। দুঃসাহসে ভর ক'রে নোঙর বেয়ে মাটিতে নেমে-পড়া, হুটোপাটি ক'রে পাথরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে-থাকা, ফিল ইভানসকে লক্ষ্য ক'রে গর্জমান বন্দুক, ছুরি দিয়ে কেটে-ফেলা নোঙর, প্রপেলারহীন টালমাটাল *অ্যালবাট্রস*....সবই আমরা আগেই জেনে গিয়েছি।

প্রুডেন্টদের কোনো ভয়-ডর ছিলো না। প্রপেলার লাগানো নেই— কাজেই তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে দ্বীপে ফিরে-আসার সম্ভাবনা নেই *অ্যালবাট্রসের*। আর ওই তিন-চার ঘণ্টায় তার তো বিস্ফোরণে শত টুকরো হ'য়ে-পড়ার কথা। সমুদ্রে যে-মৃতদেহগুলি আছড়ে পড়বে, অতল জল তাদের কোনোদিনই ফিরিয়ে দেবে না। প্রুডেন্টদের মনে অনুতাপের লেশমাত্রও ছিলো না। পুরো ব্যাপারটাকেই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন শ্বেতাঙ্গ জাতির স্বাভাবিক আত্মরক্ষার চেষ্টা হিশেবে। তাঁরা আর সেখানে কালক্ষপ না-ক'রে দ্বীপের অপরপ্রান্তের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়েন। ভরসা ছিলো, নিশ্চয়ই অচিরেই দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে। হ'লোও তা-ই। দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে ছিলো পঞ্চাশজন জেলের বাস—মাছ ধরাই ছিলো তাদের জীবিকা। তারা উড়োযানটাকে দ্বীপে আশ্রয় নিতে দেখেছিলো। এই ক্লান্ত পলাতক তিনজনকে দেখে তারা ভাবলে বুঝি কোনো অলৌকিক দেবতা হবেন—তারা প্রায় পুজো করলে তাঁদের, এমনি হ'লো তাদের সমাদরের ভঙ্গি। নিজেদের কুটিরেই তারা তাঁদের বাসের ব্যবস্থা ক'রে দিলে।

উড়োযানটির কোনো পাত্তাই আর পাওয়া গেলো না। নিশ্চয়ই সেটা বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছে, মনে-মনে ভাবলেন প্রুডেন্টরা। আর-কোনো-দিন রবয়ুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে না, এ-কথা ভেবে তাঁদের বেশ ফূর্তিই হ'লো। এখন কেবল আমেরিকা ফেরার সুযোগের অপেক্ষায় ব'সে-থাকা ছাড়া করার আর-কিছু নেই। চ্যাটহ্যাম দ্বীপপুঞ্জের দিকে আবার জাহাজেরা বিশেষ আসে না। আস্ত আগস্ট মাস কেটে গেলো, দিগন্তে কোথাও জাহাজের চিহ্নমাত্রও দেখা গেলো না। শেষকালে কি একটা জেলখানা থেকে আরেকটা জেলখানাতেই এসে পড়লেন তাঁরা?

খেদ ও মনস্তাপ যখন অসীমে পৌঁছেছে, তখন হঠাৎ চ্যাটহ্যাম দ্বীপপুঞ্জের কাছে একটা জাহাজ দেখা গেলো। আঙ্কল প্রুডেন্টদের যখন রবয়ুর অনুচরেরা পাকড়েছিলো, তখন প্রুডেন্টের মানিব্যাগে কয়েক হাজার ডলারের নোট ছিলো। আমেরিকায় নিয়ে যাবার পক্ষে ও-টাকা যথেষ্ট। প্রুডেন্টরা ওই জাহাজে ক'রে নিউ-জিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ড বন্দরে গিয়ে পৌঁছুলেন : জাহাজে তাঁরা *অ্যালবাট্রসের* সমস্ত খবর চেপে গেলেন, রবয়ু সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্যই করলেন না।

অকল্যাণ্ডে গিয়ে একটি ডাকের জাহাজের সঙ্গে তাঁদের ব্যবস্থা হ'লো : জাহাজটি তাঁদের সানফ্রান্সিসকোতে পৌঁছে দিলে। জাহাজের কারু কাছেই তাঁরা নিজেদের পরিচয় ফাঁস করেননি ; কোত্থেকে এসেছেন, নামধাম কী—এ-সব কোনো তথ্যই তাঁদের দিতে হয়নি। যেহেতু পুরো ভাড়াটাই আগাম চুকিয়ে দিয়েছিলেন, সেইজন্যে কাপ্তেনও আর তা নিজে ঘ্যান-ঘ্যান করেননি। সানফ্রান্সিসকোতে পৌঁছেই প্যাসিফিক রেলোয়ের প্রথম ট্রেনটাতে চেপেই অতঃপর ফিলাডেলফিয়া ফিরলেন তাঁরা।

সেদিন সন্ধেবেলায় ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সচিব যখন আসন গ্রহণ করলেন, তখন ইনস্টিটিউট ভবনে তিল ধারণের স্থানই নেই— ভবনের বাইরে রাস্তাতেও

বিষম ভিড় । আস্ত ফিলাডেলফিয়া ঝেঁটিয়ে ছেলেবুড়ো এসেছে তাঁদের ভাষণ শুনতে—আর ভিড়ের *ঠেলাঠেলি* সামলাতে গিয়ে শহরের পুলিশবাহিনীকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে ।

আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভানসকে কিন্তু মোটেই উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো না—বরং এত শান্ত তাঁদের কস্মিন কালেও দেখায়নি । ১২ই জুনের সেই সন্ধ্যার পর যে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে, তাঁদের ভাবভঙ্গি দেখে তা মনে হ'লো না । মাঝখানের সাড়ে-তিনমাস সময় যেন কর্পূরের মতো হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে—কোনো দাগই কাটেনি কোথাও । বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে যথা-সময়ে অতঃপর আঙ্কল প্রুডেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে মাথার টুপি খুলে নিলেন : 'এবার আমাদের সভার কাজ শুরু হচ্ছে ।'

বিপুল করতালিতে আস্ত ফিলাডেলফিয়া গুমগুম ক'রে উঠলো । 'এবার সভার কাজ শুরু হচ্ছে,' এই কথাটা মোটেই অসাধারণ কিছু নয়, বরং অসাধারণত্ব নিহিত এই তথ্যটায় যে কথা কটি বললেন আঙ্কল প্রুডেন্ট ।

আঙ্কল প্রুডেন্ট চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন কখন এই করতালি এই হর্ষধ্বনি বন্ধ হয় । তারপর তিনি শুরু করলেন : 'আমাদের গত অধিবেশনে আলোচনা কিঞ্চিৎ জ্যান্ত হ'য়ে উঠেছিলো (সমবেত হর্ষধ্বনি)—আমাদের বেলুন *গো-অ্যাহেডের* কোনদিকে চাকা থাকবে, সামনে না পিছনে— তা নিয়ে দুটো দলের মধ্যে বেশ উত্তেজিত বাণী-বিনিময় হচ্ছিলো (বিস্ময়ের অস্ফুট প্রকাশ) । এই অগ্র-পশ্চাৎ মিলিয়ে দেবার একটা পরিকল্পনা আমরা করেছি । তাতে দুই দলের সমর্থকদেরই মনরক্ষা হবে । আমরা স্থির করেছি : দুটো চাকা লাগানো হবে, একটা সামনে একটা পিছনে !' (ইনস্টিটিউট ভবনে নিরেট স্তব্ধতা ও পরিপূর্ণ স্তম্ভিত ভাব ।)

বাস, অধিবেশন শেষ ।

হ্যাঁ, শেষ ! ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সচিবের নিরুদ্দেশ যাত্রা সম্বন্ধে একটা কথাও নেই ! টু শব্দ নেই রবয়ু কিংবা তার *অ্যালবাট্রস* সম্বন্ধে ! কেমন ক'রে *অ্যালবাট্রস* থেকে তাঁরা পালিয়েছেন, সে-সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য অব্দি নেই ! কী হ'লো সেই উড়োযানের ? সে কি এখনো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, না কি আবার ইনস্টিটিউটের সদস্যদের গুম করার মৎলব আঁটছে ? কিছু না—এ-সম্বন্ধে একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারিত হ'লো না !

সদস্যরা প্রায় উত্তেজিতভাবে জিগেস করতে যাচ্ছিলো এ-সব তথ্য, কিন্তু সভাপতি ও সচিবের গম্ভীর ও চিন্তান্বিত মুখচ্ছবি দেখে শেষপর্যন্ত আর প্রশ্ন করার সাহস সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারলে না । যখন মর্জি হবে তখনই না-হয় বলবেন ; তাঁদের মুখ থেকে কথা শোনাই তো সৌভাগ্য ! জিগেস ক'রে বিরক্ত না-করাই ভালো । আর তাছাড়া, ব্যাপারটা হয়তো কোনো কারণে গোপন ক'রেই রাখতে চান তাঁরা —গোপনীয়তার নিশ্চয়ই কোনো জরুরি কারণ আছে ।

ওয়েলডন ইনস্টিটিউটে যে-ধরনের স্তব্ধতা এর আগে কোনোদিনই বিরাজ করেনি, তার মধ্যে আঙ্কল প্রুডেন্টের ভাষণের শেষ কথাটা ভেসে এলো : 'ভদ্রমহোদয়গণ ! এবার কেবল *গো-অ্যাহেডকে* ওড়াবার জন্যে জরুরি কাজ সারতে হবে আমাদের । আকাশবিজয়ের অধিকার কেবল তারই আছে । আকাশজয়ের দায়িত্ব এখন তারই উপর বর্তেছে ।...আমাদের অধিবেশন এখানেই শেষ হ'লো !'

সাত মাস পরে, ২৯শে এপ্রিল, আবার আস্ত ফিলাডেলফিয়ায় হুলুস্থুল প'ড়ে গেছে। কোনো নির্বাচনের জন্যে ভোটাভুটিও নয়, ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের নতুন-কোনো অধিবেশনও নয়। ওয়েলডন ইনস্টিউটের *বেলুন গো-অ্যাহেড* আজ আকাশে উড়বে। যাত্রী মাত্র দুজন—ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সচিব ; আর বেলুনচালক হলেন বিখ্যাত হ্যারি ডাবলিউ. টিনডার, এই কাহিনীর সূচনায় আমরা যার নাম করেছিলুম।

প্রুডেন্ট আর ইভানসের চেয়ে যাত্রী হবার যোগ্যতা আর কার বেশি ? 'বাতাসের চেয়েও ভারি,' এই তত্ত্বের সমর্থকদের প্রতিবাদ জানাবার জন্যে তাঁদের সশরীরে আকাশে-ওড়ার দাবি সবচেয়ে বেশি।

এই সাত মাসে ঘুণাক্ষরেও তাঁরা তাঁদের আকাশ ভ্রমণের কোনো কথা কাউকে বলেননি। এমনকী ফ্রাইকোলিন শুদ্ধু রবয়ু আর তার আশ্চর্য উড়োযান সম্বন্ধে টু শব্দটি করেনি। সম্ভবত প্রুডেন্টরা চান না যে লোকে *গো-অ্যাহেড*-এর সঙ্গে *অ্যালবাট্রস*-এর তুলনা করুক। *গো-অ্যাহেড* যদিও এই দাবি করছে না যে সে-ই প্রথম আকাশ উড়েছে, তবু অন্য আবিষ্কারকের কীর্তি সম্বন্ধে তাঁরা কোনো মন্তব্য করতে রাজি নন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, আকাশজয়ের ক্ষমতা রয়েছে কেবল বেলুনেরই—আর *গো-অ্যাহেড* হচ্ছে তাঁদের সেই বিশ্বাসের উড্ডীয়মান প্রতিমূর্তি।

আর তাছাড়া, রবয়ু তো আর বেঁচে নেই। সাগরেদদের নিয়ে সলিল সমাধি হয়েছে—*অ্যালবাট্রস*-এর গোপন কথা সব ডুবে গেছে প্রশান্তের অতল জলে !

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে কোথাও আছে একটা ছোট্ট দ্বীপ, যেটা রবয়ুর আস্তানা, যেখান থেকে আবার নতুন উড়োযান ওড়াবার ক্ষমতা ছিলো তার—এ-সমস্তই কেবল অনুমান। পরে একসময়ে না-হয় তদন্ত ক'রে দেখা যাবে এই অনুমানে কতটা সত্য লুকিয়ে আছে।

অবশেষে এবার আকাশে উড়বে *গো-অ্যাহেড*, এতদিন ধ'রে যার প্রস্তুতি ও প্রচার চলেছিলো। আকারে সে এতই বড়ো যে আকাশের সর্বোচ্চ স্তরে ওঠবার ক্ষমতা তার আছে। এমন দুর্ভেদ্য তন্তু দিয়ে তার খোল তৈরি যে যতক্ষণ ইচ্ছে সে আকাশে থাকতে পারবে। তার ভয় নেই গ্যাসের হ্রাসবৃদ্ধিকে—ভয় নেই পবনদেব বা বরুণদেবকে। একটা লম্বা ছুঁচলো ধরনে তৈরি হয়েছে এই বেলুন—তার ফলে সহজেই তার পক্ষে হাওয়ায় ভেসে যাওয়া সম্ভব হবে। ক্রেব আর রেনার তাঁদের বেলুনে যে-ধরনের দোলনা ব্যবহার করেছিলেন, তেমনি একটা বৃহদাকার দোলনার উপর তার প্ল্যাটফর্ম বসানো। আর সেখানে রয়েছে যাবতীয় দরকারি জিনিশ—নানা যন্ত্রপাতি, দড়ি-দড়া, যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে কলকব্জা। তারই সামনের দিকটায় রয়েছে একটা প্রপেলার, পিছনের দিকে রয়েছে রেডার আর প্রপেলার। এটা সত্যি যে *অ্যালবাট্রস*-এর যান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। কিন্তু এও কি ফ্যালনা নাকি ?

গো-অ্যাহেডকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফেয়ারমাউন্ট পার্কে, ঠিক যেখানে একদিন সাড়ে দশ মাস আগে *অ্যালবাট্রস* নোঙর ফেলেছিলো। আজ ঊনত্রিশে এপ্রিলে সব তৈরি। এগারোটা থেকেই এই বিশাল বেলুন মাটি থেকে কয়েক ফিট উপরে উঠে আছে—তার ফোলা পেটের মধ্যে ৪৪,০০০ কিলোগ্রাম গ্যাস তাকে শূন্যে টেনে তোলার জন্যে উৎসুক হ'য়ে

আছে। দিনটাও চমৎকার—যেন এই গবেষণার জন্যেই অর্ডার মাফিক তৈরি ক'রে দিয়েছেন প্রকৃতিঠাকরুন। অবশ্য হাওয়ার আরেকটু জোর থাকলে বেলুনের পক্ষে উড়তে সুবিধে হ'তো—তাছাড়া বেলুনের ক্ষমতাটাও বোঝা যেতো। হাওয়ার বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছেমতো চলার ক্ষমতা তা আছে কি না, তা তাহ'লে স্পষ্ট ক'রে জেনে নেয়া যেতো।

ফেয়ারমাউন্ট পার্কে আর তিলধারণের জায়গা নেই। আশপাশের শহর থেকে উৎসুক দর্শকদের পেনসিলভ্যানিয়ার রাজধানীতে উগরে দিয়েছে ট্রেনগুলি; কেউ বাকি নেই—সবাই সব কাজে-কর্মে ইস্তফা দিয়ে জড়ো হয়েছে। কংগ্রেসের সদস্য, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সৈন্যবাহিনী, বিচারবিভাগের কর্তা, সাংবাদিক, আবালবৃদ্ধবনিতা; একেবারে ঝেঁটিয়ে সব জড়ো হয়েছে এখানে। লোকজনের হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি, চীৎকার, খোশগল্প—এ-সব দেখবার-শোনবার অপেক্ষা না-ক'রে আমরা বরং শুনি সেই উচ্ছ্বসিত করতালি যখন যুক্তরাষ্ট্রের নিশেন-ওড়ানো বেলুনটিতে গিয়ে উঠলেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট ও ফিল ইভানস।

এগারোটা কুড়িতে প্রথম তোপ ফাটলো। বোঝা গেলো প্রস্তুতি শেষ। এগারোটা পঁচিশ মিনিটে ফাটলো দ্বিতীয় তোপ। *গো-অ্যাহেড* তখন মাত্র দেড়শো ফিট উঁচুতে হালকা হাওয়ায়—একটা মাত্র দড়ি দিয়ে সে বাঁধা। প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন ফিল ইভানস ও আঙ্কল প্রুডেণ্ট, বাঁ হাত বুক ছুঁয়ে আছে, ডান হাত শূন্যে প্রসারিত—ভঙ্গিটা এমন যে এই বিপুল শুভেচ্ছার বদলে কৃতজ্ঞতায় তাঁরা একেবারে গদগদ হ'য়ে পড়েছেন। এমন সময়, ঠিক সাড়ে এগারোটায়, তৃতীয়বার গর্জন ক'রে উঠলো কামান। এটাই ছাড়বার সংকেত।

অমনি বিপুল কোনো রাজহাঁসের মতো হেলেদুলে *গো-অ্যাহেড* উঠতে লাগলো আকাশে। সত্যি, তুলনাহীন দৃশ্য। আটশো ফিট উপরে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো *গো-অ্যাহেড*, এবার তার আকাশ দিয়ে হাওয়া কেটে ভেসে-চলা শুরু হবে। প্রপেলারগুলি ঘুরতে শুরু করলো: সেকেণ্ডে বারো গজ, এই বেগে ভেসে গেলো 'গো-অ্যাহেড'। তিমি মাছ এই বেগে জলে সাঁতার দেয়। তুলনাটা সত্যি অযোগ্য নয়: কারণ সত্যি তখন উত্তর সাগরের সেই জলদানবদের মতোই দেখাচ্ছিলো *গো-অ্যাহেড*কে।

নিচে থেকে বিপুল হর্ষধ্বনি ভেসে এলো। আর সেটা শুনেই *গো-অ্যাহেড*-এর চালক নানারকম কসরৎ দেখাতে করলে। কতরকম ভাবে *গো-অ্যাহেড*কে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তারই দৃষ্টান্ত একের পর এক দেখালে সে নিচের সমবেত জনতাকে। ছোট্ট বৃত্তের মতো ঘুরলো কয়েকবার; গেলো সামনে, ফিরে এলো পিছনে। খাড়া উঠলো উপরে, লম্বালম্বি; ভেসে গেলো সামনে, শোয়ানোভাবে। আস্তে-আস্তে শূন্য তার বৃহদায়তন গিলে খেলো, নিচের মানুষের চোখে সেটা ছোটো হ'য়ে এলো। কিন্তু তবু রইলো জয়ধ্বনি, হর্ষনাদ, বিপুল উচ্ছ্বাস।

কিন্তু হঠাৎ সেই জয়ধ্বনির মধ্যে একটা অদ্ভুত চীৎকার উঠলো ফেয়ারমাউন্ট পার্কে। তারপরে সমবেত জয়ধ্বনিই সেই অদ্ভুত ও উত্তেজিত শোরগোলে রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো। দিগন্তের দিকে হাত তুলে কী যেন দেখাতে চাচ্ছে প্রত্যেকে। উত্তরপশ্চিম দিগন্তে—নীলিমা যেখানে মাটি ছুঁয়েছে, সেখানে—কী যেন উড়ছে। শুধু-যে উড়ছে তা নয়, এদিকেই উড়ে আসছে। ক্রমশ তার আকার বড়ো হ'য়ে উঠলো। কোনো পৌরাণিক পাখি—আকাশে তার অধিকার খর্ব হ'তে যাচ্ছে ব'লে ধাবমান? কোনো বিপুল উল্কা? যা-ই হোক, তীব্র তার গতি। এক্ষুনি তা পার্কের উপর এসে পড়লো ব'লে।

প্রায় যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেলো, এমনিভাবে এক গভীর সন্দেহে জনতা লাফিয়ে উঠলো ।

ততক্ষণে *গো-অ্যাহেড*ও তাকে দেখতে পেয়েছে । মনে হচ্ছে *গো-অ্যাহেড* যেন কোন-এক বিপুল ভয়ে শিউরে উঠেছে । তার গতি আরো বেড়ে গেলো, যত জোরে পারে পুবদিকে ছুটে চললো *গো-অ্যাহেড* ।

আর তার সেই দ্রুত পলায়ন দেখেই জনতা মুহূর্তে সব বুঝে নিলে । ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের এক সদস্য অস্ফুট স্বরে একটা নাম উচ্চারণ করলে শুধু, *অ্যালবাট্রস* ! অমনি সমস্ত জনতা তার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো :

'*অ্যালবাট্রস* ! *অ্যালবাট্রস* !'

১৫

চমৎকার উৎখাত

সত্যি, *অ্যালবাট্রসই* ! আকাশে ওটা সত্যি রবয়ুই পুনরাবির্ভাব ! মস্ত শিকারী পাখির মতো সে-ই ছোঁ মেরে পড়তে যাচ্ছে *গো-অ্যাহেড*-এর উপর !

অথচ ন-মাস আগে সে কিনা তার *অ্যালবাট্রস* শুদ্ধু সলিল সমাধি লাভ করেছিলো !

রবয়ু যদি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাঙা *অ্যালবাট্রস*-এর প্রপেলারটার মুখ ঘুরিয়ে না-দিতো, তাহ'লে পতনের বেগেই তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিলো । কিন্তু তার বদলে আস্তে এসে ঢেউয়ের উপর পড়েছিলো *অ্যালবাট্রস*, আর তার ডেক তখন পরিণত হয়েছিলো একটা ছোট্ট ভেলায় । কোনো পাখি আহত হ'য়ে যখন জলে পড়ে, তখন তার ছড়ানো ডানা দুটিই তাকে জলের উপর ভাসিয়ে রাখে । প্রথম কয়েক ঘণ্টা রবয়ুরা তেমনি ভাবেই জলে ভেসে গিয়েছিলো । তারপরে তারা হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলো যে *অ্যালবাট্রস*-এর ইণ্ডিয়া রবারের নৌকোটায় গায়ে একটা আঁচড় লাগেনি ।

ওই নৌকোটা থেকেই কয়েক ঘণ্টা পরে একটা জাহাজ তাদের তুলে নেয় । রবয়ু জাহাজের লোকদের বলে যে তার জাহাজ ঝড়ে ডুবে গিয়েছে ব'লেই তাদের এই দশা —এ-কথার পরে উদ্ধারকারী জাহাজের কাপ্তেন আর তাকে কোনো কথা জিগেস করেননি ।

জাহাজ ছিলো ত্রিমাস্তুল, ইংরেজ জাহাজ, নাম *দুই বন্ধু* অর্থাৎ *টু ফ্রেণ্ডস*; তার গন্তব্য : মেলবোর্ন । কয়েকদিন পরেই সে মেলবোর্নের জেটিতে গিয়ে নোঙর ফেললো ।

রবয়ু অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছুলো বটে, কিন্তু তার এক্স আইল্যাণ্ড থেকে তখনও অনেক দূরে ! সেখানে পৌঁছুবার জন্যে সে অত্যন্ত উদগ্রীব হ'য়ে উঠেছিলো । ভাগ্যিশ, ভাঙা *অ্যালবাট্রস*-এর কামরা থেকে তার জমানো টাকা উদ্ধার করতে পেরেছিলো, তাই আর-কারু কাছে তাকে সাহায্য চাইতে হয়নি । কয়েক দিনের মধ্যেই একটা ছোটো একশো টন জাহাজ সে

কিনে ফেললে—তারপর সেটাতে ক'রেই পাড়ি জমালে এক্স আইল্যাণ্ডের উদ্দেশে । তার মাথায় তখন কেবল একটাই চিন্তা : যে ক'রেই হোক প্রতিশোধ নিতে হবে । কিন্তু তার জন্যে আগে তাকে বানাতে হবে আরেকটা *অ্যালবাট্রস* । একটা যখন বানাতে পেরেছে, তখন আরেকটা বানানো তার পক্ষে অসাধ্য কী । আট মাসের মধ্যেই আরেকটা আনকোরা উড়োযান শূন্যে পাড়ি দেবার জন্যে তৈরি হ'য়ে গেলো । এবারও আগের সঙ্গীদেরই রবয়ু সঙ্গে নিলে ।

নতুন উড়োযান এক্স আইল্যাণ্ড ছেড়েছিলো এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে । এবার সে সারাক্ষণ মেঘের আড়াল দিয়ে চালিয়েছে তার উড়োযান ; নিচে থেকে কেউ তাকে দেখে ফেলুক, এটা তার মনঃপূত হয়নি । উত্তর আমেরিকায় এসে একটা নির্জন পোড়ো জমিতে সে নোঙর ফেললে প্রথমে । সেখান থেকে ছদ্মবেশে লোকালয়ে গিয়ে সে জানতে পারলে যে ২৯শে এপ্রিল ফিলাডেলফিয়া থেকে ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের অতিকায় বেলুন আকাশে উড়বে—আর তার যাত্রী হবেন আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভানস ।

এই-তো সুযোগ প্রতিশোধ নেবার ! এমনভাবে শোধ নিতে হবে যে জীবনে যেন তাঁরা না-ভোলেন রবয়ুকে । প্রকাশ্যে, সকলের চোখের সামনে হেয় করতে হবে তাঁদের—দেখাতে হবে যে আকাশ-জয়ের অধিকার আছে কেবল *অ্যালবাট্রস*-এরই, কোনো বেলুনের নয় !

আর সেইজন্যেই এখন আকাশ থেকে শঙ্খচিলের মতো ছোঁ মেরে নামলো 'অ্যালবাট্রস' !

হ্যাঁ, অ্যালবাট্রসই ! আগে কস্মিনকালেও *অ্যালবাট্রসকে* না-দেখেও সবাই তাকে চিনে নিতে পারলে ।

গো-অ্যাহেড তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে উড়ে পালাচ্ছে । কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেলো সে যেখানেই যাক *অ্যালবাট্রসের* ছোঁ এড়াবার ক্ষমতা তার নেই । সোজা উপর দিকে উঠতে শুরু করলো *গো-অ্যাহেড* । হয়তো মেঘের আড়ালে এমন একটা জায়গায় *গো-অ্যাহেড* চ'লে যাবার ক্ষমতা রাখে, *অ্যালবাট্রস* যার নাগালই পাবে না । কিন্তু *অ্যালবাট্রসও* তার উদ্দেশে সোজা উঠতে শুরু করলো । *গো-অ্যাহেড*-এর চেয়ে আকারে সে অনেক ছোটো, তবু এটা যেন কোনো তরোয়ালমাছের সঙ্গে কোনো বিপুল তিমিঙ্গিলের লড়াই ।

নিচে থেকে এই আকাশযুদ্ধের প্রতিটি স্তর সাগ্রহে লক্ষ করছে সবাই । উদ্বেগে হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে ! কী হয়, কী হয়—একটা রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় সকলের স্নায়ু যেন অস্থির হ'য়ে ছিঁড়ে যাবে ।

গো-অ্যাহেড যেন চুম্বকের মতো টেনে তুলছে *অ্যালবাট্রসকে* । তারপর *অ্যালবাট্রস* তার চারপাশে পাক খেতে লাগলো—আর দুটোর মধ্যে ব্যবধানও ক'মে আসতে লাগলো । একটা ছোট্ট আঘাত—তাতেই সে *গো-অ্যাহেডকে* শেষ ক'রে দিতে পারে—তাহ'লে প্রুডেন্টরা সবেগে নেমে আসবেন মর্তধামে এবং চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যাবেন ।

আতঙ্কে লোকেদের চোখ কপালে উঠেছে—তবু কেউ দৃশ্যটা থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না । প্রত্যেকেই মনে হচ্ছে সে যেন কোনো বিপুল উঁচু থেকে প'ড়ে যাচ্ছে—বুকের মধ্যে সে-রকম একটা দমআটকানো ভাব, হাত-পা-গুলো আশঙ্কায় তেমনি ঠাণ্ডা । জলযুদ্ধেও তবু বাঁচার উপায় থাকে, কিন্তু আকাশযুদ্ধে ? নৈব নৈব চ । মানুষের ইতিহাসে এটাই প্রথম আকাশযুদ্ধ, কিন্তু নিশ্চয়ই এটাই শেষ নয় । প্রগতির লক্ষণই তো হচ্ছে জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে

যুদ্ধের অবতারণা করা। আমেরিকার তারাভরা ডোরা-কাটা নিশেন উড়ছে *গো-অ্যাহেড*-এ ; আর *অ্যালবাট্রসের* পতাকার সোনালি সূর্য আর জ্বলজ্বলে তারা এখনও দেখা যাচ্ছে নিচে থেকে।

গো-অ্যাহেড সব ভার ফেলে দিয়ে আরো উঁচুতে চ'লে যাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু *অ্যালবাট্রস* তার পিছু ছাড়লো না। এখন দুটোই মেঘের আড়ালে চ'লে গেছে—কিছুই দেখা যাচ্ছে না হালকা মেঘের আড়াল থেকে।

হঠাৎ একটা সম্মিলিত আতঙ্ক আর্তচীৎকার হ'য়ে আকাশ লক্ষ্য ক'রে উঠে গেলো। *গো-অ্যাহেড* কি-রকম অতিকায় হ'য়ে উঠছে ক্রমশ, কি-রকম যেন টালমাটাল। আর তারই সঙ্গে-সঙ্গে নেমে আসছে *অ্যালবাট্রস*। না, *গো-অ্যাহেড* মাটিতে আছড়ে পড়বেই—কারণ বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তরে গ্যাস বিস্ফারিত হ'য়ে বেলুনের এই দুর্ভেদ্য খোলটাকে ফাটিয়ে দিয়েছে—এখনো সব গ্যাস বেরিয়ে যায়নি বটে, কিন্তু যে-তীব্র গতিতে *গো-অ্যাহেড* নিচে নেমে আসছে, তাতে কাউকে আর আস্ত থাকতে হবে না। কিন্তু *অ্যালবাট্রসও* তেমনি দ্রুতবেগে নিচে নেমে আসছে।

কেন, রবয়ু কি এখন তাকে ছেড়ে দিতে চায় না ?

না ! আরে ! সে যে *গো-অ্যাহেড*-এর আরোহীদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে !

এমন সুকৌশলে সে তার উড়োযান বেলুনের কাছে নিয়ে এলো যে বেলুনের চালক টিনডার *অ্যালবাট্রস*-এর উপর লাফিয়ে নামতে কোনো বেগ পেলে না।

আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভানস কী করবেন ? তাঁরাও কি ও-রকম ক'রে *অ্যালবাট্রস*-এ আশ্রয় নেবেন নাকি ? যে-রকম মানুষ, তাতে সে তাঁদের না-ও নিতে পারে। কিন্তু নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হ'লো না তাঁদের। *অ্যালবাট্রসের* বৈমানিকরাই তাঁদের জোর ক'রে উড়োযানে তুলে নিলেন।

আর তারপরেই উড়োযান নিচে-নামা বন্ধ ক'রে দিলে, কিন্তু বেলুন—চুপসোনো, গ্যাসহীন—একটা বিপুল ছিন্নবস্ত্রের মতো ফেয়ারমাউণ্ট পার্কের গাছপালার উপর এসে পড়লো।

নিচের লোকেরা তখন উত্তেজনায় আশঙ্কায় এমনকী বাক্‌স্ফূর্তির ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। প্রুডেন্ট আর ইভানস আবার রবয়ুর হাতে বন্দী হয়েছেন। রবয়ু কি তাঁদের নিয়ে নীল শূন্যে মিলিয়ে যাবে ? কী করবে সে এঁদের নিয়ে গিয়ে ?

কিন্তু *অ্যালবাট্রস* হঠাৎ আবার নিচে নেমে আসতে লাগলো। মাটি থেকে মাত্র ছ-ফিট উপরে এসে নিশ্চল ভাসতে লাগল উড়োযান। তারপর গভীর স্তব্ধতার মধ্যে রবয়ুর গম্ভীর গলা গমগম ক'রে উঠলো :

'যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ ! ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সচিব আবারও আমার কুক্ষিগত হয়েছেন। তাঁদের যদি আমি বন্দী ক'রে রাখি, তাহ'লে সেটা মোটেই ক্ষমতার অপব্যবহার হবে না। কিন্তু *অ্যালবাট্রসের* সাফল্য দেখে তাঁরা যে-রকম কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে এখনো আকাশজয়ের মানসিক প্রস্তুতি তাঁদের হয়নি—এখনো আকাশ জয় করার যোগ্যতা অর্জন করেননি তাঁরা, সেই বিপ্লবকে অনুধাবন করার কোনো বোধশক্তি তাঁদের নেই। আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভানস, আপনাদের আমি ছেড়ে

দিচ্ছি !'

প্রুডেন্ট, ইভানস আর টিনডার তক্ষুনি মাটিতে লাফিয়ে পড়লেন ।

রবয়ু তখনও ব'লে চলেছে : 'যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ ! আমার গবেষণা শেষ হ'লো । কিন্তু এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের একটা পরামর্শ আমি দিয়ে যাই : কোনো-কিছুর জন্যে তাড়াহুড়ো করবেন না, প্রগতির জন্যেও নয় । সব-কিছুরই একটা সময় আছে । তার চেয়ে তাড়াহুড়ো করার মানেই হ'লো অঘটন । কিন্তু আমরা অঘটন চাই না, চাই বিবর্তন —কারণ সেটাই জগতের ধর্ম । সংক্ষেপে : আমরা যেন শুভ লগ্নের আগেই অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে উপস্থিত না-হই । আমি-যে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে উড়ে এসেছি, তা শুধু এই কথাই বলতে যে পৃথিবী এখনো যোগ্য হয়নি । এখনো একতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি জাতিতে-জাতিতে । ঐক্যের বদলে সর্বত্রই সংঘর্ষ, সবখানেই সংঘাত ।

'সেইজন্যেই আমাকে চ'লে যেতে হবে । যাবার সময় আমার রহস্যও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই—আমার গোপন কথা কাউকে খুলে বলবো না । কিন্তু মানবজাতি এই গোপন অস্ত্রকে কখনো হারাবে না । যেদিন মানুষ উড়োযান ব্যবহার করার যোগ্য হ'য়ে উঠবে, সেদিন সব গোপন কথাই সে জানতে পারবে । যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ ! আপনারা আমার বিদায় অভিনন্দন নেবেন !'

চুয়াত্তরটি চাকা গুঞ্জন ক'রে উঠলো কোনো অতিকায় ভোমরার মতো ! প্রপেলারের ঘূরুনি শুরু হ'লো তীব্র ও প্রবল । সকলের হর্ষধ্বনির মধ্যে *অ্যালবাট্রস* পূর্ব দিগন্তের দিকে ছুটে চ'লে গেলো ।

প্রুডেন্ট আর ইভানস—আর সেই সঙ্গে আস্ত ওয়েলডন ইনস্টিটিউটই—যেন লজ্জায়-ক্ষোভে ধুলোয় মিশিয়ে গেলেন । কারু দিকে মুখ তুলে তাকাবার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিলো না তাঁদের । মাথা নিচু ক'রে তাঁরা যে যাঁর বাড়ি ফিরে গেলেন । কিন্তু বাড়ি ফিরে গেলেও সমস্ত ঠাট্টা, টিটকিরি, ব্যঙ্গের হুল তাঁদের সারা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিতে লাগলো ।

১৬

হে বিজয়ী বীর !

কে এই রবয়ু ? কোনোদিনই কি সে-কথা আমরা জানতে পারবো ?

আমরা কেবল বর্তমানকেই জানি । কিন্তু রবয়ু হ'লো ভবিষ্যতের বিজ্ঞান । হয়তো কালকে বিজ্ঞান যে-রূপ নেবে, তারই প্রতীক রবয়ু ! নিশ্চয়ই সেই বিজ্ঞান আসন্ন অবশ্যম্ভাবী !

অ্যালবাট্রস কি এখনো মেঘের আড়ালে ঘুরে বেড়ায়—যে স্বাধীন অনন্ত নীলিমাকে কেউ তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না ? এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই । রবয়ু বিজয়ী, নীলিমার সন্তান—একদিন কি সে তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আবির্ভূত হবে ? হ্যাঁ । সেদিন সে এসে নিশ্চয়ই তার আবিষ্কারের গোপন কথা খুলে ব'লে যাবে—আর সেদিন

জগতের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়া একেবারেই বদলে যাবে ।

এই কথাটাই এখানে কেবল বলা যায় : আকাশ-বিজয়ের গৌরব কেবল *অ্যালবাট্রস*-এরই প্রাপ্য : কোনো বেলুন নয়, বাতাসের চেয়েও ভারি কোনো বিমান অভিকর্ষের টান ছাড়িয়ে নীলিমার অনন্ত মুক্তির মধ্যে বিচরণ করবে । সেই দিন আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী ।

দ্য মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড ১

আকাশ থেকে পতন

১

ঝড়ের মধ্যে বেলুন

ঝোড়ো হাওয়ার গর্জনকে ছাপিয়ে হাওয়ায় একটা আর্ত স্বর বেজে উঠল, 'আমরা কি উপরে উঠেছি আবার ?'

উত্তর এল, 'না, আমরা নেমে যাচ্ছি ।'

অন্য আর-একটা গলা শোনা গেল, 'বেলুনের বোঝাগুলো কেউ তাড়াতাড়ি ফেলে দাও!'

'অনেক আগেই বেলুন খালি ক'রে সব বোঝা ফেলে দেয়া হয়েছে ।'

'তবু বেলুন একটুও উপরে উঠছে না ?'

সে-কথার কোনো উত্তর এল না, বরং আবার সেই প্রশ্নটাই ক'রে বসলেন অন্য-কেউ:

'বেলুনটা কি একটু-একটু ক'রেও উপরে উঠছে না ?'

'না । নিচে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে ।'

একটা চীৎকার শোনা গেল, 'সর্বনাশ ! বেলুনের ঠিক নিচেই সমুদ্র ! বেলুন বোধহয় সমুদ্র থেকে পাঁচশো ফুটও উপরে নেই !'

তখন কে-একজন দ্রুত উত্তেজিত গলায় ব'লে উঠল, 'বেলুনের উপর থেকে সব ভার ফেলে দাও—যা আছে সব ফেলে দাও ! একটুও দেরি কোরো না !'

...

আঠারোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দের তেইশে মার্চ বিকেল চারটের সময় তরঙ্গময় প্রশান্ত মহাসাগরের মাত্র পাঁচশো ফুট উপরে এই কথাগুলো শোনা যাচ্ছিল ।

ওই বছর উত্তর-পুব দিক থেকে যে-সাংঘাতিক ঝড় ব'য়ে গিয়েছিল, এখনো হয়তো অনেকের সে-কথা মনে আছে । আঠারোই মার্চ থেকে ছাব্বিশে মার্চ পর্যন্ত—ন-দিন ধ'রে তুমুল ঝড় যে-সব উন্মত্ত কাণ্ড ক'রে গিয়েছিল, বুড়োদের মুখে প্রায়ই তার ভয়াবহ বর্ণনা পাওয়া যায় । ওই ঝড়ে আমেরিকা, এশিয়া আর ইওরোপের অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছিল । কত গাছপালা উপড়ে গেল, বড়ো-বড়ো নগর ধ্বংস হ'য়ে গেল, তার কোনো পরিমাণ করা যায় না । এই অপরিমেয় ক্ষতির সামান্য যে-বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল তা প'ড়েই শিউরে উঠতে হয় । প্রায় একশোটি জাহাজ তীরে আছড়ে প'ড়ে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল, কত লোক যে মারা গিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই ।

জলে-স্থলে যখন এই ভয়ংকর ধ্বংসলীলা চলছিল, তখন ঝোড়ো আকাশে যে-রোমাঞ্চকর নাটকের যবনিকা উঠেছিল, তাও তুলনায় কম রোমহর্ষক নয় ।

সেই ঝোড়ো হাওয়ার তাড়নে আকাশ থেকে একটি বেলুন ঘুরতে-ঘুরতে নিচে নেমে আসছিল । বেলুনের তলায় ঝুলে ছিল একটি দোলনা । কুয়াশায় আকাশ এমনভাবে আচ্ছন্ন

হ'য়ে ছিল যে, বেলুনের আরোহী পাঁচজনকে দেখাই যাচ্ছিল না ।

গন্তব্য পথের কোনো হদিশই নেই আরোহীদের । দিশেহারা হাওয়ায় তাঁরা যে কোন্ পথে ভেসে চলেছেন, তার কিছু ঠিক ছিল না । তবে—অবাক শোনালেও কথাটা সত্যি যে—এত ঝড়েও তাঁদের খুব-একটা কষ্ট পেতে হয়নি ।

মাতালের মতো ঘুরতে-ঘুরতে নিচে নামছে বেলুন । নিচে সমুদ্রের রাগি, বুনো, হিংস্র আওয়াজ, যার ভিতর ভয়ংকরের উদ্দাম দামামা বেজে চলেছে । বেলুন যে আর-কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্রের উপর আছড়ে প'ড়ে তলিয়ে যাবে, সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই । কিন্তু যাত্রীদের অবস্থাও এমনি অসহায় যে করবারও কিছুই নেই । উপরে প্রচণ্ড ঝড় বেলুনের ঝুঁটি ধ'রে নিষ্করুণভাবে নাড়ছে, নিচে রাগি সমুদ্র ।

আরোহীরা আতঙ্কে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন । আরোহীদের একজন প্রশ্ন করলে : 'এখন কী করা যাবে ?'

উত্তর হ'ল : 'বাজে জিনিশপত্র সব ফেলে দাও ।'

যাত্রীরা বেলুন থেকে সব জিনিশ ফেলে দিতে আরম্ভ করল । তুলনামূলকভাবে বিচার ক'রে যে-জিনিশগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম জরুরি ব'লে মনে হল, প্রথমটায় সে-সবই ফেলে দেয়া হ'ল । কিন্তু তবু যখন বেলুন একটুও উপরে উঠল না, তখন খাবার-দাবার প্রভৃতি ফেলে দিতে পর্যন্ত কেউ কোনো দ্বিধা করলেন না । সলিল-সমাধির হাত থেকে উদ্ধার পেলে তারপর তো খাবার-দাবারের ভাবনা ।

কাছাকাছি কোথাও ছোটোখাটো কোনো দ্বীপ আছে কি না তা বোঝা গেল না । নিচে শুধু জল আর জল—বেলুনের যাত্রীদের গ্রাস করবার জন্যে সমুদ্র যেন অধীর হ'য়ে উঠেছে । যেন প্রশান্ত মহাসাগরের সীমাহীন আলুথালু জলে কোনো ভয়ংকর পরিণামের অশুভ ইঙ্গিত ফেটে পড়তে চাচ্ছে ।

অনেক জিনিশ ফেলে দেয়া হয়েছে ব'লে বেলুন একটু উপরে উঠল । হাওয়ার তাড়নে কাঁপতে-কাঁপতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল । কিন্তু সেখানেই তো আর মহাসাগরের শেষ নয় । সুতরাং আবার যখন 'আমরা আবার নামছি' এই তথ্য ঘোষণা ক'রে একটি আর্তনাদ শোনা গেল, তখন সকলের শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল ।

'তাহ'লে শেষ পর্যন্ত সমুদ্র-সমাধিই আমাদের ভাগ্যে !' আর্ত কণ্ঠে একজন ব'লে উঠল । আরেকজনের গলা শোনা গেল, 'সমুদ্র ! ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি ?

'আমরা ডুবে মরব !'

কে যেন ক্লান্ত স্বরে সাহস দিতে চেষ্টা করলেন, 'হতাশ হোয়ো না, এখনো সময় আছে ।'

'কোথায় সময় !' হতাশ গলায় আরেকজন ব'লে উঠল, 'আর আমাদের রেহাই নেই !'

'সব ফেলে দেয়া হয়েছে তো ?'

'না । আমাদের কাছে দু-হাজার টাকা আছে, তা এখনও ফেলে দেয়া হয়নি ।'

কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই দু-হাজার টাকা সমুদ্রে ফেলে দেয়া হ'ল । ভার খানিকটা কমল বটে, কিন্তু বেলুন তবু উপরে উঠল না । আশঙ্কায় অবসাদে সবাই প্রায় নির্জীব হ'য়ে

পড়ল। বেলুন খুব নিচে নেমে এসেছিল । প্রায় দুশো ফুট নিচে ক্ষুব্ধ মহাসাগরের ক্রুদ্ধ গর্জন বাজের মতো গড়িয়ে যাচ্ছে । প্রশান্ত মহাসাগর যেন উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে । যা-কিছু তার কবলে পড়বে, নিমেষের মধ্যে তা আত্মসাৎ ক'রে নিজের অতলে টেনে নিতে এক মুহূর্তও দেরি করবে না ।

দৃঢ়স্বরে একজন ব'লে উঠলেন, 'একটা কাজ করলে হয় না ? বেলুন থেকে যে-দড়িগুলো ঝুলছে, সেই দড়িগুলোতে নিজেদের শরীর বেঁধে নিয়ে যদি এই বসবার দোলনাটাকে খুলে ফেলে দিই, তাহ'লে, আমার বিশ্বাস, অনেকটা ভার ক'মে যাওয়ায় বেলুন ফের উপরে উঠবে।'

জলে ডুবে মরতে বসলে লোক খড়কুটোকেও শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে । আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একটা সম্ভাবনার সন্ধান পেয়ে সকলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন !'

বেলুনের দড়ির সঙ্গে নিজেদের শরীর কঠিনভাবে বেঁধে নিলে সকলে । ক্যাপ্টেনের প্রভুভক্ত কুকুর টপ্‌কেও একটা দড়িতে বেঁধে দেয়া হ'ল । তারপর খুলে দেয়া হ'ল দোলনাটাকে ।

বিপুল ভার ক'মে যাওয়ায় বেলুন এবার হু-হু ক'রে উপরে উঠতে লাগল । প্রায় দু-হাজার ফুট উপরে উঠে গিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলল ঝোড়ো হাওয়ায় । এমনিতেই প্রচণ্ড ঝড় আর ঘন কুয়াশা, তার উপর আবার রাত্রি ঘনিয়ে আসছে । পাঁচটি মানুষ বেলুনের দড়িতে ঝুলতে-ঝুলতে চলেছে । কারু মুখেই টু-শব্দ নেই, শুধু মাঝে-মাঝে ক্যাপ্টেনের কুকুর টপ্ চেঁচিয়ে উঠছিল । এ-ভাবে ঝুলে যেতে তার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছিল ।

কয়েকশো মাইল নির্বিঘ্নে অগ্রসর হবার পর আবার তাদের ভাগ্যের আকাশে ঝড়ের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল । তীব্র পাক খেয়ে নিচে নেমে এল বেলুন । এবার আর নিষ্কৃতি নেই, সকলে হতাশ হ'য়ে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হ'ল । দৈব সহায় না-হ'লে এবার আর রক্ষা নেই। বেলুন যেন নিশ্চত মৃত্যুর দিকে তীব্র বেগে নেমে আসছে ।

নিচে, অনেক নিচে নেমে এল বেলুন । সমুদ্র আর একশো ফুট তলায়, তবু এখনো নামছে। বিপদের আর দেরি নেই বুঝে সবাই ভয়ে চোখ বুজল ।

হঠাৎ প্রবল এক ঘূর্ণিহাওয়া বেলুনটার ঝুঁটি ধ'রে নাড়িয়ে গেল । ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে বললেন, 'শরীর থেকে বেলুনের দড়িগুলো শিগগির সবাই খুলে ফ্যালো, সাঁতার দেয়ার সুবিধে হবে। না-হ'লে ডুবে মরার আশঙ্কা আছে ।'

শরীর থেকে দড়ির বাঁধন খুলে হাতের মুঠোয় শক্ত ক'রে ধ'রে রইলেন সকলে । টপ্ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠল । আর-একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বেলুনটা আছড়ে পড়ল সমুদ্রে । সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'টপ্ নিশ্চয়ই কিছু একটা দেখতে পেয়েছে !'

কিন্তু হঠাৎ সমুদ্রের তীরে আরেকটা বিপরীত তরঙ্গের ধাক্কা খেয়ে বেলুনটা ছিটকে আকাশে উঠে পড়ল। তারপর সমুদ্রের সামান্য উপর দিয়ে আরোহীদের নিয়ে উড়ে চলল। কয়েকশো ফুট চ'লে যখন বেলুনটা আবার নিচে পড়ল, তখন আরোহীরা পায়ের তলায়

জলের বদলে ডাঙার স্পর্শ পেলে ।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল একজন, 'মাটি ! মাটি ! ডাঙা ! আমরা কোনো মহাদেশে বা দ্বীপে এসে নেমেছি !'

রাত্রির দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে দৃষ্টি চলল না । কিছুই দেখবার উপায় নেই । যেখানে সবাই নামল সেটা ছোটোখাটো কোনো দ্বীপ, না কোনো মহাদেশের একাংশ, তা কেউ জানতে পারল না । কিন্তু দ্বীপই হোক আর মহাদেশই হোক, প্রাণ যে বেঁচেছে এইটেই ঢের । পায়ের তলায় ডাঙার স্পর্শ পেয়ে যেন নতুন জীবন পেলে সবাই । এবার কী করা যায় তার পরামর্শ করবার যখন উদ্যোগ হ'ল, তখন একজন ব'লে উঠল : 'আরে ! ক্যাপ্টেন কোথায় ? তাঁর গলার আওয়াজ তো পাচ্ছি না ।'

সে-কথায় সকলের চমক ভাঙল । 'সত্যিই তো, ক্যাপ্টেন তাহ'লে গেলেন কোথায় ? টপকেই বা দেখা যাচ্ছে না কেন ?'

২

কে, কেন, কবে, কোথায়

আরোহী ক-জনকে নিয়ে বেলুনটা কোত্থেকে এসেছে, সে কথা জানবার জন্যে অনেকের কৌতূহল হ'তে পারে । বিশেষ ক'রে এইরকম দুর্যোগের মধ্যে আকাশে ওঠবারই বা এমন কী দরকার পড়েছিল, সে-প্রশ্ন ওঠাও অস্বাভাবিক নয় ।

ঝড় শুরু হয়েছে পাঁচদিন হ'ল । আঠারোই মার্চ থেকেই ঝড়ের কিছু-কিছু আভাস পাওয়া গিয়েছিল । এই তীব্র ঝড়ের পাল্লায় প'ড়ে বেলুনটা যে অনেক দূরের দেশ থেকে তীরবেগে ছুটে এখানে পড়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।

শখ করে এঁরা কেউই এই ভয়ংকর ঝড়ের মধ্যে আকাশ-বিহারে বের হননি, বা নেহাৎ দৈবাৎও এ-ঘটনা ঘটেনি । যে ক-জন আরোহী এই বেলুনের, তাঁরা সবাই ছিলেন রিচমণ্ড শহরের বন্দী । বন্দিত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই তাঁরা এই বেলুনের সাহায্য নিয়েছিলেন । আসল ঘটনাটি হ'ল এইরকম :

আঠারোশো পঁয়ষট্টি খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকায় যে-গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তার মূলে ছিল ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের সংকল্প । লড়াইয়ের বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা যাবো না । শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, গৃহযুদ্ধ বন্ধ করবার জন্যে দাসপ্রথা উচ্ছেদকারীদের দল বিশেষভাবে মরিয়া হ'য়ে উঠেছিল । তাঁদের একজনই হলেন জেনারেল গ্র্যান্ট । জেনারেল গ্র্যান্ট মরিয়া হ'য়ে রিচমণ্ড শহর আক্রমণ করেন । কয়েক জায়গায় জায়লাভ হ'ল বটে কিন্তু রিচমণ্ড কিছুতেই দখল করা গেল না ।

এই লড়াইয়ের সময় জেনারেল গ্র্যান্টের জনকয়েক বড়ো অফিসার শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়েন । ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং তাঁদের অন্যতম । সাইরাস হার্ডিংএর মতো সুদক্ষ

এঞ্জিনিয়ার বিরল। সরকারের তরফ থেকে তাঁকে লড়াইয়ের এলাকায় রেলপথ নির্মাণের জন্যে নিযুক্ত করা হয়। সাইরাস হার্ডিংএর বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর। অনতিদীর্ঘ দেহ, ছিপছিপে চেহারা। শরীরের গড়ন যেন লোহা পেটানো।

সাইরাস হার্ডিংএর কর্মজীবন শুরু হয় অতি সামান্যভাবে। তাঁর বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ ছিল, কর্মক্ষমতাও ছিল তেমনি আশ্চর্য। এইজন্যেই অল্প দিনের মধ্যেই হার্ডিং জীবনে উন্নতি করতে পেরেছিলেন। যে উদগ্র অভীপ্সার বলে চিরকাল সব কাজে জয়লাভ করা যায়, সেই দৃঢ় অভীপ্সার ছিল হার্ডিংএর।

যেদিন হার্ডিং গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, সেদিন আরো-একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড'-এর প্রধান সাংবাদিক গিডিয়ন স্পিলেটও সেদিন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁকেও রিচমণ্ডে আনানো হয়েছিল।

অকুতোভয় গিডিয়ন স্পিলেট সংবাদ সংগ্রহের জন্যে ভয়ংকর বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেও ইতস্তত করতেন না। অন্যান্য খবরের কাগজের চেয়ে অনেক আগেই যাতে 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' খবর জোগাড় করতে পারে, সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। শালপ্রাংশু দেহ তাঁর। বয়স বছর চল্লিশের মতো। তাঁর অনন্যসাধারণ বুদ্ধি, প্রচণ্ড উদ্যম আর উৎসাহ অন্যান্য সাংবাদিকদের ঈর্ষার বস্তু হ'য়ে উঠেছিল। সে-সময় যতগুলো লড়াই হয়েছিল তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই খবর জোগাড় করবার জন্যে স্পিলেট উপস্থিত থাকতেন। অগুনতি গোলা-গুলির মাঝখানে ঠাণ্ডা মাথায় খবর জোগাড় করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর কর্তব্যজ্ঞান ছিল প্রখর। একহাতে রিভলভার আর অন্যহাতে পেন্সিল নিয়ে খবর লিখতেন তিনি। বিপদের মুহূর্ত পর্যন্ত খবর লিখে চলতেন। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে তাঁর ডায়েরিতে এই পর্যন্ত লেখা ছিল: 'একজন সৈনিক আমার দিকে তার বন্দুক উঁচিয়ে লক্ষ্য স্থির করছে, কিন্তু—' লাইনটা আর শেষ হয়নি। এরপর স্পিলেট কী লিখতেন, তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। তিনি লিখতেন: 'কিন্তু সে আমায় শেষ পর্যন্ত গুলি না-ক'রে গ্রেপ্তার করল।'

এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁর সাহস আর কর্তব্যজ্ঞান কী অনন্যসাধারণ। তিনি গুলি খেতে চলেছেন, কিন্তু তবু খবর লিখতে তাঁর বিরতি নেই।

ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং আর গিডিয়ন স্পিলেট যখন রিচমণ্ডে বন্দী হলেন, তখন এঁদের মধ্যে কোনো আলাপ-পরিচয়ই ছিল না। কিন্তু দুজনেই দুজনের বিপুল খ্যাতির কথা শুনেছিলেন। সুতরাং দুজনের মধ্যে আলাপ জ'মে উঠতে দেরি হ'ল না। বিশেষ ক'রে তাঁরা দুজনেই একই দলের লোক, আর দুজনেরই উদ্দেশ্য হ'ল, কী ক'রে পালানো যায়।

কিন্তু পালাবার কোনো পথ ছিল না। শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর অধিকার অবিশ্যি তাঁদের ছিল, কিন্তু শহরের বাইরের বেরুনোর পথ ছিল বন্ধ। শহরের প্রত্যেকটি বহির্দ্বারে কড়া পাহারা, ভেতরেও পাহারা। সেই পাহারাদারদের চোখ এড়িয়ে পালানোর কোনো জো ছিল না। বাইরের লোকের পক্ষে ভিতরে আসা অবিশ্যি ততটা অসুবিধের ছিল না, কিন্তু রিচমণ্ড ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছিল একেবারে অসম্ভব।

সাইরাস হার্ডিংএর প্রভুভক্ত নিগ্রো ভৃত্য একদিন রিচমণ্ডে হার্ডিংএর কাছে পালিয়ে এল। এতদিন সে হার্ডিংএর বাড়িতেই ছিল। কিন্তু যখন সে শুনল যে সাইরাস হার্ডিংকে শত্রুপক্ষের

লোকেরা গ্রেপ্তার করেছে, তখন সে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না-ক'রে টপকে সঙ্গে ক'রে চ'লে এল। ভৃত্যটির নাম 'নেবুশ্যাডনেজার', ওরফে 'নেব্' ।

এদিকে জেনারেল গ্র্যান্ট রিচমণ্ড দখল করবার জন্যে মরিয়া হ'য়ে উঠেছিলেন । তিনি রিচমণ্ড দখল করলে শহরের লোকদের পক্ষে বেরুনোর পথ সুগম হ'ত, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সে-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত ছিল । যারা ব্যাবসা-বাণিজ্যের জন্যে রিচমণ্ডে এসেছিল, লড়াই শুরু হওয়ায় ভেতরে আটকা প'ড়ে তারাও দারুণ অসুবিধেয় পড়ল । রিচমণ্ডের অনেকেই পালানোর জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠল ।

এর কিছুদিন বাদেই গ্র্যান্টের ফৌজ বাইরে থেকে রিচমণ্ড অবরোধ করল । শহরের শাসনকর্তা জেনারেল লী তখন প্রমাদ গুনলেন । এমনভাবে শহরটা অবরোধ করা হয়েছিল যে বাইরে কোনো খবর পাঠানোও অসম্ভব হ'য়ে উঠল, কাজেই জেনারেল লীও আর বাইরে তাঁর ফৌজের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারলেন না । বাইরে লড়াইয়ের হালচাল যে কেমন, তাও তিনি জানতে পারলেন না ।

অনেক ভেবেচিন্তে জেনারেল লী বাইরে খবর পাঠানোর জন্যে এক উপায় বের করলেন। তখনকার দিনে বেলুনই ছিলো একমাত্র আকাশ-যান । বেলুনে ক'রে কয়েকজন লোককে বাইরে পাঠিয়ে লড়াইয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, আর ফৌজের অধিনায়ককে সকল খবর জানানো হবে ঠিক হ'ল । সেইজন্যে শিগগিরই একটা বেলুন তৈরি করা হ'ল । কয়েকজন লোকের উপযোগী চলনসই-গোছের একটা দোলনা বেলুনের তলায় ঝুলিয়ে দেয়া হ'ল । আঠারোই মার্চ রওনা হওয়ার কথা, কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা দেখা গেল ।

রিচমণ্ডের অনেকেই যে পালানোর জন্যে উদ্গ্রীব হ'য়ে উঠেছিল, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে । পেনক্র্যাফ্‌ট নামে একটি নাবিক এই বেলুন তৈরির খবর শুনে একটু উৎসাহিত হয়েছিল । সে খবর নিয়ে জানলে যে ক্যাপ্টেন ফরেস্টারের নেতৃত্বে কয়েকজন সৈনিক বেলুনে ক'রে আঠারোই মার্চ সকালবেলা রওনা হবে । ঘুম থেকে উঠেই আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাস দেখে পেনক্র্যাফ্‌ট উৎসাহিত হ'য়ে উঠল । যে-ময়দানে বেলুনটা যাত্রার জন্যে তৈরি হয়েছিল, সেই সাত-সকালেই পেনক্র্যাফ্‌ট সেখানে গিয়ে হাজির হ'ল। সে আড়াল থেকে দেখতে পেলে, জেনারেল লী, ক্যাপ্টেন ফরেস্টার এবং কয়েকজন সৈনিক বেলুনের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে । সে একটু দূর থেকে ওদের কথা শোনাবার চেষ্টা করলে । সে শুনতে পেলে ক্যাপ্টেন ফরেস্টার বলছেন : 'যতক্ষণ-না এই ঝোড়া হাওয়া কমছে, ততক্ষণ রওনা হওয়া যাবে না, জেনারেল । এ-যে দেখছি রীতিমত হারিকেন !'

জেনারেল লী সে-কথায় সায় দিলেন : 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ক্যাপ্টেন ফরেস্টার। এই ঝড়ের মধ্যে রওনা হ'লে নির্ঘাত মরতে হবে । বরং কাল সকালে রওনা হ'লে ভালো হবে ।'

'তাহলে সবাই তৈরি হ'য়ে থেকো । কাল সকালেই রওনা হওয়া যাবে । কিন্তু দেখো, বেলুনটা নিয়ে যেন অন্যরা আবার না-পালায় ।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জেনারেল, এই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সাধ ক'রে মরতে কেউ বেলুনে উঠবে না ।'

ওদের এই কথা শুনে পেনক্র্যাফ্‌ট মনে-মনে বললে : 'আমি নিশ্চিত জানি ক্যাপ্টেন হার্ডিং এই সুযোগ ছাড়বেন না। আবহাওয়া অবিশ্যি বিচ্ছিরি নোংরা হ'য়ে আছে। কিন্তু সেইটেই তো আমাদের সুযোগ!' তক্ষুনি পেনক্র্যাফ্‌ট হার্ডিংএর খোঁজে রওনা হ'য়ে পড়ল।

হার্ডিং তখন দু-একটি দরকারি জিনিশপত্র কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলেন। রাস্তাতেই পেনক্র্যাফ্‌টের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। পেনক্র্যাফ্‌ট তাঁকে বললে :

'আমার একটা কথা শুনবেন, ক্যাপ্টেন হার্ডিং?'

হার্ডিং পেনক্র্যাফ্‌টের মুখের দিকে তাকালেন।

পেনক্র্যাফ্‌ট তখন বললে : 'আপনি কি এখান থেকে পালিয়ে যেতে চান?'

অন্যমনস্কভাবে হার্ডিং শুধোলেন : 'কখন?'

'আজকেই—' ব'লে পেনক্র্যাফ্‌ট তাঁর জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

সাইরাস হার্ডিং পালানোর জন্যে এত উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছিলেন যে, পালানোর নামেই ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। একটু বাদেই তাঁর হুঁশ হ'ল। পেনক্র্যাফ্‌টের নীল কামিজের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে তিনি বললেন : 'কী বলছিলে তুমি?'

পেনক্র্যাফ্‌ট উত্তর করলে : 'এখান থেকে পালানোর কথা বলছিলুম, ক্যাপ্টেন। আমাকে আপনি সন্দেহ করবেন না, কোনো বদ মৎলব আমার নেই। আমি আপনার নাম জানি এবং আপনাকে চিনিও। অবিশ্যি আপনাকে কে-ই বা না-চেনে? তবে আমার মতো একজন সামান্য নাবিককে অবিশ্যি আপনি চিনবেন না। যা-ই হোক, আজ সে-সুযোগ পাওয়া গেছে—'

অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলেন হার্ডিং। পেনক্র্যাফ্‌টের কথায় বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন : 'সুযোগ! কী এমন সুযোগ তুমি পেয়েছো?'

'বেলুন, ক্যাপ্টেন হার্ডিং, বেলুন! বেলুনে ক'রে উড়ে পালানোর সুযোগ পাওয়া গেছে! আপনি রাজি হ'লে আজ রাত্রেই আমরা পালিয়ে যেতে পারি!'

জেনারেল লী-র বেলুনের কথা হার্ডিংও শুনেছিলেন, কিন্তু তারই সাহায্যে পালানোর মৎলব তাঁর মাথায় আসেনি! উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'বাঃ! চমৎকার! এই সহজ ব্যাপারটা এতক্ষণ আমার মগজে আসেনি! আমি একটা গাধা! আমার নতুন বন্ধুটির নাম জানতে পারি কি।'

'পেনক্র্যাফ্‌ট। নাবিক পেনক্র্যাফ্‌ট।'

তারপর দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল। পেনক্র্যাফ্‌ট জানালে, অনেকদিন রিচমণ্ডে আটকা থেকে সে অস্থির হ'য়ে উঠেছে। ব্যাবসা উপলক্ষে সে রিচমণ্ডে এসেছিল। তার সঙ্গে তার স্বর্গত প্রভুর একটি কুড়ি বছরের ছেলে আছে। আগে সে এই যুবকটির বাবার জাহাজে কাজ করত। বছর কয়েক আগে প্রভুর মৃত্যু হয়, এবং বদ লোকে নানানভাবে প্রভুপুত্রকে একেবারে সর্বস্বান্ত ক'রে ফ্যালে। সে এখন নিজেই একটা ব্যাবসা খুলে প্রভুপুত্রকে নিজের কাছে রেখেছে। ব্যাবসা উপলক্ষে এই শহরে আসবার পর আর বেরুতে না-পেরে তারা অসুবিধেয় পড়েছে।

কথা বলতে-বলতে পেনক্র্যাফ্‌টকে সঙ্গে নিয়ে সাইরাস হার্ডিং গিডিয়ন স্পিলেটের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। সব কথা শুনে স্পিলেটও আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর তিনজনে

ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে শলা-পরামর্শ চলল। ঠিক হ'ল, দরকারি জিনিশপত্র সঙ্গে নিয়ে সেদিনই রাত দশটায় যাত্রা করা হবে। রাত্রে কোথায় সবাইকে মিলতে হবে, তাও ঠিক করা হ'ল।

হার্ডিং শুধু বললেন : 'ঈশ্বর করুন, ঝড় যেন না-কমে !'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'আশ্চর্য সুযোগ পাওয়া গেছে ! ঝড়ের জন্যে রাত্রে বেলুনের কাছে পাহারাও থাকবে না।'

একটা শক্ত খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেলুনটাকে খুব ভালো ক'রে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সকাল থেকেই জোরে হাওয়া বইছিল, আকাশের হালচালও ভালো ছিল না। হার্ডিংএর ভয় হ'ল, পাছে দড়ি ছিঁড়ে বেলুনটা আকাশে উড়ে যায়। তাই তিনি শহরতলির ময়দানে গিয়ে দূর থেকে বেলুনটাকে একবার দেখে এলেন।

রাত্রির নিরেট অন্ধকারে যখন সারা রিচমণ্ড ঢাকা প'ড়ে গেল, তখন যাওয়ার জন্যে তৈরি হ'তে লাগলেন সবাই। খাবার-দাবার, জল ইত্যাদি দরকারি জিনিশ গুছোতে-গুছোতে হার্ডিং কুকুর টপকে বললেন, 'আকাশে উড়তে তোর ভারি মজা লাগবে, না রে টপ ? এ কিন্তু ভারি বিপজ্জনক। আমরা মারাও পড়তে পারি।'

স্পিলেট তখন তৈরি হ'য়ে হার্ডিংএর বাসায় এসে হাজির হয়েছিলেন। হার্ডিংএর কথা শুনে বললেন, 'আপনি যখন আমাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন আমি অসাফল্যের ভয় করি না, ক্যাপ্টেন।'

একটু পরেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং আর স্পিলেট নেব্ আর টপকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বেলুনটাকে যে-মাঠে রাখা হয়েছিল, সেই মাঠের কাছেই নির্দিষ্ট জায়গায় পেনক্র্যাফ্‌ট আর তার প্রভুপুত্র হার্বার্টের সঙ্গে তাঁদের দেখা হ'ল। হার্ডিংদের আসতে দেরি দেখে পেনক্র্যাফ্‌ট তখন বলছিল, 'ক্যাপ্টেন হার্ডিংরা এখনও এলেন না। যে-তুমুল ঝড় তাতে যে-কোনো মুহূর্তে বেলুনটা ধ্বংস হ'য়ে যেতে পারে।' কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই টপের গলার ডাক শুনে সে চেঁচিয়ে বললে, 'একটু শিগগির করুন, ক্যাপ্টেন হার্ডিং ! নইলে পরে হয়তো পস্তাতে হবে, সব প্ল্যানই ভেস্তে যাবে।'

মাঠে তখন একজনও পাহারাওলা ছিল না। ওই দুর্যোগের রাতে বেলুন পাহারা দেয়া তারা দরকার মনে করেনি। সবাই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে নির্বিঘ্নে গিয়ে বেলুনে চেপে বসলেন। এক-এক ক'রে বেলুনের সবগুলো দড়ি কেটে দেয়া হ'ল। অমনি শাঁ-শাঁ ক'রে মহাশূন্যে উঠে গেল বেলুন, তারপর তীব্র গতিতে হাওয়ার টানে ভেসে চলল।

এরই কয়েকদিন পরের ঘটনা আগেই বলা হয়েছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সবাই যখন মুখর হ'য়ে উঠেছেন, তখুনি দেখা গেল, তাঁদের অধিনায়ক সাইরাস হার্ডিং নিখোঁজ। হার্ডিংএর কুকুর টপ—টপই বা গেল কোথায় ? হার্ডিং হয়তো কাছাকাছি কোথাও আছেন, এই ভেবে সবাই অনেক ডাকল তাঁর নাম ধ'রে। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

সাইরাস হার্ডিং তবে গেলেন কোথায় ?

৩

নেব্ কোথায় গেল

'ক্যাপ্টেন হার্ডিং কোথায় গেলেন ?'

দুনিরীক্ষ্য অন্ধকারে স্পিলেটের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ক্যাপ্টেন হার্ডিং কোথায় গেলেন ?'

বেলুন সমুদ্রে আছড়ে পড়বার আগের মুহূর্তে ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গিয়েছিল। সুতরাং সমুদ্রে আছড়ে পড়ার পর থেকেই তিনি দল-ছাড়া হ'য়ে পড়েছেন। কাজেই সকলেরই আশা ছিল, ক্যাপ্টেনকে শিগগিরই খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু তবু একটা ভাবনার বিষয় ছিল। বেলুনটা যখন জলে আছড়ে পড়েছিল তখন যদি তিনি জলে প'ড়ে গিয়ে থাকেন, তাহ'লে সমুদ্রের ঢেউয়ে সাঁতার কেটে তীরে ওঠা সহজ ব্যাপার হবে না। তাছাড়া তিনি জানতেও পারবেন না কাছে কোথাও তীর আছে কি না। চারদিকেই সীমাহারা বিস্তীর্ণ সমুদ্র ভেবে হতাশ হ'য়ে সাঁতার কাটবার চেষ্টা না-ও করতে পারেন। এই সন্দেহটাই ভাষা পেল পেনক্র্যাফটের গলায় : 'উনি নিশ্চয়ই সমুদ্রে প'ড়ে গেছেন।'

হার্বার্ট বললে, 'কিন্তু আমরাই বা কোথায় এসে নামলুম ?'

'সে-প্রশ্নের উত্তর পরে খুঁজলেও চলবে।' স্পিলেট বললেন, 'এখন সবাই চলো দেখি। হয়তো ক্যাপ্টেন হার্ডিং সাঁৎরে তীরে এসে উঠেছেন।'

তারপর সেই অন্ধকার রাত্রেই ক্যাপ্টেন হার্ডিংএর খোঁজে সবাই এগিয়ে চললেন। রাত্রির অন্ধকারে তাঁরা দিক ঠিক করতে পারলেন না, তবু বেলুনটা যেদিক থেকে এসেছিল মনে হ'ল, ক্যাপ্টেনের খোঁজে সেদিকেই পা চালালেন সকলে। অন্বেষণ শুরু হ'ল।

নেব্ প্রভুকে না-দেখতে পেয়ে ক্রমশই অধীর হ'য়ে উঠছিল। সকলে যাতে ভালো ক'রে অনুসন্ধান করে, সেইজন্যে সে বললে, 'ক্যাপ্টেনকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে! নইলে এই অজ্ঞাত দ্বীপে আমাদের পদে-পদেই বিপদের সম্ভাবনা।'

'নিশ্চয়ই!' ব'লে স্পিলেট নেব্‌কে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই কী-একটা কথা মনে হ'তে নেব্ শিউরে উঠল। যে-সন্দেহটা সে অনেক্ষণ জোর ক'রে চেপে রাখবার চেষ্টা করছিল, এবার সেই প্রশ্নটাই সে জিগেস ক'রে বসল: 'কিন্তু তাঁকে আর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে কি? আপনাদের কী মনে হয়?'

সকলের মনেই এই সন্দেহটা তোলপাড় করছিল, আর সকলেই এই সন্দেহকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছিল। এবার নেব্ সরাসরি তার সন্দেহ প্রকাশ করবার পর কেউই কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। দেবার সাহসও করলেন না। সমুদ্রে যদি প'ড়ে থাকেন, তবে ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে আর না-পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। তবে যদি কাছেই কোথাও ডাঙায় প'ড়ে গিয়ে থাকেন তাহ'লে তাঁকে পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

থেকে-থেকে সাইরাস হার্ডিংএর নাম ধ'রে জোর গলায় ডাকতে-ডাকতে সবাই অন্ধকারে

আস্তে-আস্তে পথ চলতে লাগলেন। প্রতি পদক্ষেপেই বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কারণ সেই ভূখণ্ডে কোথায় কী আছে, তা তাঁরা জানতেন না। সুতরাং একবার অন্ধকারে অসাবধানে কোথাও পা দিলেই কোত্থেকে কী হ'য়ে যাবে, কে জানে? হার্বার্ট বললে, 'হয়তো ক্যাপ্টেন হার্ডিং আহত হ'য়ে অজ্ঞান অবস্থায় কোথায় প'ড়ে আছেন, তাই আমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারছেন না।'

'তবে এক কাজ করা যাক—' পেনক্র্যাফট বললে, 'যদি তা-ই হয়, তবে পথের মধ্যে জায়গায়-জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে যাওয়া উচিত। তাহ'লে জ্ঞান ফিরলে সকালে উঠে হাঁটতে-হাঁটতে ক্যাপ্টেনের মতো বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন আমরা কোন্ পথে গেছি।'

স্পিলেট এ-কথায় সায় দিলেন: 'ঠিক বলেছো, পেনক্র্যাফট। দ্যাখো তো নেব্, আশপাশে কোথাও শুকনো ডালপালা কাঠকুটো কিছু পাও কি না।'

হার্বার্ট শুধোলে, 'কারু কাছে দেশলাই আছে কি?'

'আছে, আমার কাছে।' পেনক্র্যাফট উত্তর দিলে: 'দেশলাইটা আমি পোশাকের ভিতর এমন যত্ন ক'রে রেখেছিলুম যে, জলে পড়বার সময়ও সেটা ভেজেনি।'

কিন্তু, দেশলাইটা থাকলেও শুকনো বা কাঁচা কোনোরকম ডালপালা পাওয়া গেল না। কাঠকুটোর সন্ধানে খানিকক্ষণ খামকা এদিক-ওদিক খুঁজে ফিরে এসে নেব্ জানালে, 'না। গাছপালা কাঠকুটো কিচ্ছু পেলুম না।'

'জায়গাটা তবে বোধহয় মরুভূমির মতো, উদ্ভিদবিহীন,' স্পিলেট বললেন: 'কোনো গাছপালাই বোধহয় এই পাথুরে জমিতে জন্মায় না।'

খুঁজতে-খুঁজতে আরো কিছু দূর তাঁরা এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ সামনে আওয়াজ শুনে বোঝা গেল যে কাছেই জল রয়েছে, এবং এগুবার পথ বন্ধ। নেব্ খুব জোরে-জোরে হার্ডিংএর নাম ধ'রে ডাকতে লাগল। অবাক হ'য়ে সবাই শুনলেন, দূর থেকে নেব্এর ডাকের প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে।

পেনক্র্যাফট নাবিক। সে বললে, 'নিশ্চয়ই এইটে একটা নদী। এর ওপারে আর-একটা ভূখণ্ড আছে। নইলে নেব্এর ডাকের প্রতিধ্বনি কক্ষনো ভেসে আসতো না। যদি আমাদের ওপাশে ভূখণ্ড বা দ্বীপ না-থাকত, তবে বিশাল সমুদ্রে নেব্এর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি উঠত না—সেই স্বর অনেক দূরে চ'লে যেত।'

স্পিলেটও তার কথার সমর্থন করলেন: 'আমারও তা-ই মনে হয়। কারণ, যদি এর চারদিকেই সমুদ্র থাকত, তাহ'লে আমাদের কথার প্রতিধ্বনি না-উঠে তা মিলিয়ে যেত।'

নিরেট অন্ধকার ভেদ ক'রে এপারেই দৃষ্টি চলছিল না, ওপারে তো দূরের কথা। চারধারেই ছোটো-ছোটো পাহাড়। তাতে একটাও গাছপালা না-থাকায় হিংস্র জন্তুর অনস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আর খামকা না-ঘুরে ক্লান্ত দেহে সবাই একটা পাথরের চাতালের উপর ব'সে পড়লেন।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। তারপর নীরবতা ভেঙে সর্বপ্রথম কথা বললে নাবিক পেনক্র্যাফট: 'ক্যাপ্টেনকে আর পাওয়া যাবে ব'লে তো আমার মনে হয় না। বোধহয়

আমরা তাঁকে মহাসমুদ্রেই হারিয়েছি ।'

স্পিলেট নিজেও মনে আশা পাচ্ছিলেন না । তবু তিনি বললেন, 'আমরা ক্যাপ্টেনকে খুঁজে বার করতে পারবো, পেনক্র্যাফট । হতাশ হওয়াটা আমাদের ঠিক হবে না । হয়তো তিনি কোথাও আহত হ'য়ে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে আছেন, তাই আমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারছেন না ।'

কেউ আর কোনো কথা বললে না । সবাই চুপ ক'রে ব'সে রইল । শুধু খানিকক্ষণ বাদে হার্বার্ট একবার বললে, 'ইশ্ ! কী বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা ! একেবারে জ'মে যাওয়ার জোগাড় !'

পেনক্র্যাফট নিজের সন্দেহের কথা খুলে বলতেই নেব্ মনে-মনে উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। ক্যাপ্টেন হার্ডিংএর মৃত্যুর কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না নেব্ ।

অসম্ভব ! এইভাবে কখনোই ক্যাপ্টেন হার্ডিংএর মৃত্যু হ'তে পারে না ! উনি যে-রকম কৌশলী ও বুদ্ধিমান, তাতে ডাঙার এত কাছে এসেও কি তাঁর মৃত্যু হ'তে পারে ? না-না, তা কখনোই হ'তে পারে না। নেব্ সেইদিনই ক্যাপ্টেন হার্ডিংএর মৃত্যুকে বিশ্বাস করবে, যেদিন সে ক্যাপ্টেনের স্পন্দন-রহিত শরীর নিজে ছুঁয়ে অনুভব করবে তাঁর শীতল স্পর্শ, আর অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন ক'রে সিক্ত ক'রে দিতে পারবে সেই দেহ । ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ নিজে স্পর্শ না-করা পর্যন্ত নেব্ তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বাস করতে পারবে না । ক্যাপ্টেন হার্ডিংএর মৃত্যু কি এতই সহজ? এমন অজ্ঞাতসারে কি তাঁর মৃত্যু হ'তে পারে ?

একটা তীব্র অধীরতায় ভ'রে উঠতে লাগল নেব্এর মন । তারপর হঠাৎ একসময় অসহিষ্ণু কণ্ঠে ব'লে উঠল, 'আমি কিন্তু ও-কথা মোটেই বিশ্বাস করতে পারছি না । যে-মানুষ এর চেয়েও সাংঘাতিক সংকটের মধ্যে প'ড়েও এতদিন প্রাণরক্ষা ক'রে এসেছেন, তাঁর পক্ষে এত সহজে প্রাণ হারানো বিশ্বাসযোগ্য নয় ।'

স্পিলেট বললেন, 'তোমার কথাই যেন সত্যি হয়, নেব্ ! পেনক্র্যাফট শুধু তার একটা অনুমানের কথা বলছিল । তার কথায় রাগ কোরো না ।'

তারপর স্পিলেট, পেনক্র্যাফট আর হার্বার্ট পরামর্শ করতে বসলেন । রাত্রি তখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল । ভোরের আর বেশি দেরি ছিল না । সুতরাং ভোরবেলা থেকেই যাতে অন্যভাবে সাইরাস হার্ডিংএর অনুসন্ধান করা যায়, সে-কথাই ভাবতে লাগলেন সকলে ।

বিমর্ষ নেব্ একটু দূরে চুপ ক'রে ব'সে রইল । সাইরাস হার্ডিং সম্পর্কে সে তখন আকাশ-পাতাল ভাবতে শুরু ক'রে দিয়েছে । যে-হার্ডিংএর গ্রেপ্তার হওয়ার কথা শুনে সে অবরুদ্ধ রিচমণ্ড শহরে ছুটে এসেছিল, সেই হার্ডিংকেই, তার সেই প্রভুকেই এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ! এর চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার আর কী হ'তে পারে ?

একটু বাদেই ফুটফুটে এক ভোরের সোনালি আলো দেখা দিল আকাশে । আর-একবার সাইরাস হার্ডিংএর অনুসন্ধান করবার জন্যে পা চালিয়ে দিলেন সবাই । এটি যে একটি ছোটো দ্বীপ তা বুঝতে অসুবিধে হ'ল না । নেব্এর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি গত রাত্রিতে যেখান থেকে শুনতে পাওয়া গিয়েছিল, তাঁরা ক্রমে সেই জায়গায় এসে হাজির হলেন । দেখা গেল, ওপারে সত্যি-সত্যিই একটু বড়ো আর-একটা দ্বীপ রয়েছে । দ্বীপদুটির মধ্য দিয়ে ব'য়ে চলেছে

খরস্রোতা অপ্রশস্ত একটি নদী। দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ ক'রে তীব্র কৌতূহলের সঙ্গে অপলক চোখে সবাই ওপারের দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় হঠাৎ পিছনে ঝপাং ক'রে একটা আওয়াজ হ'ল। চমকে সবাই তাকিয়ে দেখলেন, নেব্ সেই খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দেখে সকলে স্তম্ভিত হ'য়ে পড়লেন।

হতভম্ব ভাবটা কেটে যেতেই চেঁচিয়ে উঠলেন স্পিলেট : 'কোথায় যাচ্ছো তুমি, নেব্? শিগগির ফিরে এসো!'

নেব্এর কিন্তু ফিরে আসার ইচ্ছে মোটেই ছিল না। সেই তীব্র স্রোতের মধ্যেই সুকৌশলে সাঁতার কাটতে-কাটতে নেব্ উত্তর করলে, 'ওপারে গিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে খুঁজে বেড়াবো। হয়তো তিনি সাঁতার কেটে এসে এই দ্বীপেই উঠেছেন।'

নেব্এর দেখাদেখি স্পিলেটও জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পেনক্র্যাফট তাঁকে ধ'রে ফেলল। গম্ভীর গলায় সে বললে, 'প্রাণটা এত শস্তার নয় মিস্টার স্পিলেট, যে অমনভাবে আগাগোড়া না-ভেবেই নষ্ট ক'রে ফেলবেন। এই তীব্র স্রোতের মধ্যে সাঁতার কাটতে যাওয়া মানেই হ'ল প্রাণ হারানো। আমরা নেব্এর মতন অত ভালো সাঁতারুও নই। আমার মনে হয়, ঘণ্টাখানেক পরেই ভাঁটার টানে নদীর জল একদম ক'মে যাবে, তখন আমরা অনায়াসেই ওপারে যেতে পারবো।'

স্পিলেট নিরস্ত হ'লে সবাই ওপারের দিকে তাকালেন। দেখলেন, নেব্ ওপারে গিয়ে পৌঁছেছে। ভিজে কাপড়ে শীতে ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপতে-কাঁপতে সে তাঁদের বিদায় অভিনন্দন জানালে।

পাহাড়ের আড়ালে নেব্ অদৃশ্য হ'য়ে না-যাওয়া অব্দি নিমেষহীন চোখে তাঁরা তাকে দেখতে লাগলেন। নিগ্রো ভৃত্যটির অসাধারণ প্রভুভক্তি দেখে তিনজনের চোখে জল এল। তারপর তিনজনেই ক্যাপ্টেনকে খুঁজতে-খুঁজতে সর্বত্র চ'ষে বেড়ালেন। তন্ন-তন্ন ক'রে চারদিকে খোঁজাখুঁজি চলল। কিন্তু হার্ডিংএর কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না।

খিদেয়, তেষ্টায় ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন সবাই। তারপর আবার সেই নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেন তিনজনে।

নদীর জল তখন খুব তাড়াতাড়ি কমতে শুরু করেছে। এই ফাঁকে কিছু খাবার-দাবার পাওয়া যায় কি না দেখবার জন্যে তাঁরা চারদিকে তাকালেন। কিন্তু গলাধঃকরণ করা যায় এমন-কিছুই নজরে পড়ল না। তেষ্টায় এদিকে তালু শুকিয়ে আসছে। কিন্তু নোনা জল তো আর পান করা যায় না। বেলুনে যে খাবার-দাবার ও জল ছিল বেলুনকে হালকা করার জন্যে তা আগেই ফেলে দেয়া হয়েছিল। গত রাত্রি থেকে একটুও খাবার বা জল পেটে পড়েনি। তাই, এই পরিশ্রমের পর তাঁরা অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়লেন। শ্রান্তিতে শরীর যেন এলিয়ে পড়তে চাইল।

নদীর জল যেভাবে কমছিল, তাতে তাঁদের মনে হ'ল আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নদী প্রায় জলশূন্য হ'য়ে পড়বে। সেই খিদে-তেষ্টার সময় একমাত্র আশা হ'ল ওপারের এলাকাটি —হয়তো সেখানে কিছু খাবার-দাবার পাওয়া যেতে পারে, সেই ভরসায় সতৃষ্ণ চোখে সবাই নদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিকেলের দিকে জল একেবারে ক'মে গেল। দ্বীপদুটির মাঝখান দিয়ে স্রোতহীন যে-সরু জলধারা বর্তমান রইল তাকে আর কোনোরকমে নদী বলা চলে না—নিছকই একটা খাল মাত্র।

তিনজনে হেঁটেই খালটুকু পার হ'য়ে গেলেন। আহার্যের আশায় ব্যাকুল হ'য়ে তাঁরা দ্বীপে উঠে এলেন।

স্পিলেট উপরে উঠে বললেন, 'আমি নেব্‌এর খোঁজে যাচ্ছি। সন্ধেবেলা আবার এখানেই দেখা হবে। তোমরা যদি কিছু খাবার জোগাড় করতে পারো, আমার জন্যেও রেখে দিও। আমিও যদি পথে কিছু খাবার পাই নিয়ে আসবো।'

হার্বার্ট শুধোলে, 'আমি আপনার সঙ্গে যাবো কি ?'

'না। তোমরা বরং মাথা গোঁজবার মতো একটা আস্তানা, আর কিছু খাবার জোগাড় করো।' এই ব'লে নেব্ যে-পথে গিয়েছিল, স্পিলেট সেই পথে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

স্পিলেট প্রস্থান করবার পর হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফট নদীতীর থেকে খানিকটা দূর এগিয়ে গেল। চারদিকে গ্র্যানাইট পাথরের ছোটো-বড়ো পাহাড় শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা এদিক-সেদিক ঘুরতে-ঘুরতে একটা বেশ বড়ো পাহাড়ের নিচে এসে থামল। পেনক্র্যাফট বললে, 'হার্বাট, এসো, আমরা পাহাড়টায় উঠে একবার চারদিকটা দেখে নিই। কিছু খাবারের জোগাড়ও তো আমাদের ক'রে নিতে হবে।'

তাঁরা দুজনে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল। একটু উঠতেই দেখা গেল অনেকগুলো নাম-না-জানা পাখি ব'সে আছে। পাখিগুলো বোধহয় কখনও মানুষ দ্যাখেনি, তাই ওদের দেখে ভয় পেল না। ওরা দুজনে যখন পাখিগুলোর কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখনও তারা ভয় পেল না, বা উড়ে যাওয়ার উপক্রম করল না।

ওদের কাছে এমন-কোনো হাতিয়ার ছিল না যা দিয়ে দু-একটা পাখি মারা যায়। রাত্রের আহারের জন্যে আপাতত গুটিকতক পাখি নিতান্তই প্রয়োজন। পেনক্র্যাফ্‌ট হাত বাড়িয়ে দু-একটাকে ধরতে গেল, কিন্তু তারা তাড়া খেয়ে উড়ে গেল। হতাশ হ'য়ে পড়ল পেনক্র্যাফট। বললে, 'নাঃ, এরা আমাদের আজকেও কিছু খেতে দেবে না দেখছি!'

হার্বার্ট কোনো কথা না-ব'লে চুপচাপ উপরে উঠতে লাগল। পাহাড়ের মাথার উপর উঠে চারদিকে তাকিয়ে দুজনেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। দূরে সবুজ গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। গাছ যখন দেখতে পাওয়া গেছে, তখন এই দ্বীপে কিছু-না-কিছু আহার পাওয়া যাবে ব'লে তাদের আশা হ'ল।

দুজনেই তখন নামতে শুরু করলে। নামতে-নামতে পাহাড়ের গায়ে চিমনির মতন একটা বড়ো গুহা দেখতে পেয়ে পেনক্র্যাফ্‌ট বললে, 'রাত্তিরে এই গুহাতেই আমরা থাকতে পারবো।'

আস্তে-আস্তে তখন সন্ধে নেমে আসছিলো। সূর্য ডুবেছিল সমুদ্রের সেই সীমান্তে, যেখানে আকাশ আর সমুদ্র মিলে-মিশে একাকার হ'য়ে গিয়েছে।

ক্রমেই সন্ধে হ'য়ে আসছে দেখে পেনক্র্যাফ্‌ট বললে, 'তাড়াতাড়ি গুহাটা একবার দেখে নিয়ে নিচে যেতে হবে। আমাদের হাতে এখনও ঢের কাজ প'ড়ে আছে। কোনো খাবার জিনিশ বা জল এখনো জোগাড় করা হয়নি।'

কিন্তু আর-বেশিক্ষণ খাবারের ভাবনায় মাথা গরম করতে হ'ল না ওদের।

গুহা পরীক্ষা করতে গুহার ভেতরে কতকগুলো সামুদ্রিক ঝিনুক দেখতে পাওয়া গেল। ইংরেজিতে এদের বলে 'মাসেল'। গুহার এক জায়গায় পাঁক আর জল দেখা গেল। সেই পাঁকের মধ্যে ঝিনুকগুলো প'ড়ে ছিল। দেখে মনে হ'ল, সমুদ্রের জল যখন বেড়ে ওঠে, তখন গুহার মধ্যেও জল ঢোকে।

হার্বার্ট বললে, 'যাক, বাঁচা গেল। খাওয়ার ভাবনা আপাতত আর ভাবতে হবে না। এই ঝিনুকগুলো খেতে নাকি খুব ভালো। আজ আগুনে পুড়িয়ে দিব্যি খাওয়া যাবে।'

গুহাটি পরীক্ষা ক'রে দুজনেই খুব খুশি হ'য়ে উঠল। তারা ঠিক করলে গুহার মুখে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে, তাহ'লে আর বাইরে থেকে সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া ভেতরে ঢুকে তাদের জ্বালাতন করতে পারবে না।

পেনক্র্যাফট বললে, 'খাওয়ার ভাবনা না-হয় ঘুচল, কিন্তু এবারে জল পাওয়া যাবে কোথায়? এখানে কোথাও তো ভালো জল পাওয়ার কোনো উপায়ই দেখছি না। অথচ জল না-হ'লে চলবেই বা কী ক'রে?'

হার্বার্ট বললে, 'চলো, নিচে গিয়ে কোথাও জল পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখি। শেষ পর্যন্ত যদি একান্তই ভালো জল না-পাওয়া যায়, তবে এই নদীর ঘোলা জল খেয়েই কোনোরকমে থাকতে হবে।'

দুজনে ঢাল বেয়ে নিচে নামতে লাগল। নামতে-নামতে পাহাড়ের পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে কয়েকটা শাদা রঙের গোল-গোল জিনিশ পেনক্র্যাফটের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটা সে হাতে তুলে নিলে। পরীক্ষা ক'রে সে বুঝতে পারলে যে জিনিশটা পাখির ডিম। অমনি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। বললে, 'এই দ্যাখো হার্বার্ট, আমরা খাবারের জন্যে আরেকটা জিনিশ পেয়েছি—পাখির ডিম!'

ডিম দেখে হার্বার্টও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। হালকা গলায় বললে, 'কয়েকদিন বাদে আজ আমাদের আহার খুব ভালোভাবেই হবে দেখছি! এ-যে দেখছি রীতিমতো ভোজ!'

কয়েকটা ডিম কুড়িয়ে তারা আবার নামতে লাগল। এবং জলের খোঁজেও তাদের আর খুব বেশি দূরে যেতে হ'ল না। তারা দেখতে পেলে, নেব্‌কে সঙ্গে নিয়ে স্পিলেট একটা পাহাড়ের ভেতর থেকে বের হলেন। তাদের দেখতে পেয়েই স্পিলেট চীৎকার ক'রে বললেন, 'নেব্‌কে পেয়েছি, কিন্তু ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর কোনো খোঁজ পেলুম না।'

একটু বাদেই নেবের সঙ্গে স্পিলেট এসে উপস্থিত হলেন। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, 'কিছু খাবার জোগাড় করতে পারিনি, তবে জলের সন্ধান পেয়েছি। ওইদিকে খানিকটা দূরে একটা বড়ো হ্রদ আছে। খেয়ে দেখলুম, তার জল বেশ মিষ্টি। কিন্তু তোমাদের জন্যে কী ক'রে জল নিয়ে আসবো ভেবে পেলুম না। শেষটায় আর-কোনো উপায় না-দেখে দুটো রুমাল ভিজিয়ে এনেছি, সেই জল নিংড়ে তোমাদের খেতে হবে। আমার আর আপাতত জলের দরকার নেই, পেট পুরে খেয়ে এসেছি। নেবও একটু খেয়ে নিয়েছে।'

'ভালোই করেছেন,' হার্বার্ট বললে, 'আমরাও খাবারের জোগাড় ক'রে রেখেছি।'

পাহাড়ের তলা থেকে কিছু শুকনো কাঠকুটো সংগ্রহ ক'রে সবাই আবার ওপরে উঠতে

লাগলেন। গুহায় হাজির হ'য়ে পেনক্র্যাফট দেশলাই বার ক'রে দেখল, দেশলাইয়ে মাত্র একটা কাঠি আছে ।

কাঠিটা হাতে ক'রে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলে পেনক্র্যাফ্‌ট। একটামাত্র কাঠি—একবার নিভে গেলে আর রেহাই নেই । এই নির্জন দ্বীপে না-খেয়ে ঠাণ্ডায় জ'মে মরতে হবে সবাইকে। আগুন জ্বালিয়ে খুব ভালো ক'রে খেয়াল রাখতে হবে, সেই আগুন যাতে কোনোমতেই নিভে না-যায় । একটু বাদে-বাদেই আগুনে কাঠ গুঁজে দিয়ে জিইয়ে রাখতে হবে আগুনকে।

গুহার এককোণে কতগুলো শুকনো গাছের পাতা জড়ো ক'রে খুব সাবধানে তাতে আগুন ধরালে পেনক্র্যাফ্‌ট । তারপর সরু ডালপালা আগুনে নিক্ষেপ করতেই দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠল ।

হার্বার্ট ডিম আর ঝিনুকগুলোকে তাড়াতাড়ি আগুনে ঝলসে নিতে লাগল। পেনক্র্যাফ্‌ট আর স্পিলেট ব'সে-ব'সে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে আলাপ করতে লাগলেন । নেব্‌ কিন্তু কোনো কথা বললে না। চুপ ক'রে একপাশে ব'সে রইল। সারাদিন আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজেও সাইরাস হার্ডিং-এর কোনো চিহ্নই দেখতে পায়নি সে। সন্দেহে আশঙ্কায় সে একেবারে মুষড়ে পড়েছে।

স্পিলেট কী ক'রে নেব্‌কে খুঁজে পেয়েছিলেন সে-কথাই বলতে লাগলেন পেনক্র্যাফ্‌টকে : 'তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই আমি নেবের দেখা পাই। ও তখন চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ক্যাপ্টেনের নাম ধ'রে ডাকছিল, আর কাঁদছিল। আমরা দুজনে যতদূর খুঁজেছি ততদূরের মধ্যে কোথাও কোনো মানুষের পদচিহ্ন দেখতে পাইনি । অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমি নেব্‌কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি। কিছুতেই আসতে চাইছিল না ।'

ইতিমধ্যে খাবার তৈরি হ'য়ে গিয়েছিল। সকলে মিলে সেই ঝলসানো ঝিনুক আর ডিমই খেলেন । নেব্‌ বিশেষ কিছু খেল না। তখন স্পিলেট তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন, 'নেব্‌, তুমি উতলা হচ্ছো কেন ? আমি ঠিক জানি ক্যাপ্টেনকে আমরা খুঁজে পাবোই ।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে অগ্নিকুণ্ডের কাছে সবাই ঘেঁষাঘেষি ক'রে শুয়ে পড়লেন । পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় সবাই একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন । কাজেই শুতে-না-শুতেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু শুধু একজন সারা রাত না-ঘুমিয়ে অস্থিরভাবে ছটফট করতে লাগল। কষ্ট ক'রে না-বললেও চলে যে, সেই অস্থির-হৃদয় তন্দ্রাবিহীন লোকটি হ'ল ক্যাপ্টেন সাইরাস হাডিং-এর প্রভুভক্ত ভৃত্য ভাগ্যহত নেব্‌ ।

সকালে উঠে পেনক্র্যাফ্‌টই প্রথম আবিষ্কার করলে যে নেব্‌ গুহার ভিতরে নেই ।

সে বিস্মিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, 'আরে ! নেব্‌ কোথায় গেল ?'

সবাই মিলে গুহার চারপাশে খোঁজাখুঁজি করলেন । কিন্তু কোথাও নেব্‌কে দেখা গেল না।

প্রথমটা তাঁরা মনে করলেন হয়তো সে কাছেই কোথাও গেছে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, অথচ নেব্‌ তবু ফিরে এল না । এতক্ষণের মধ্যেও সে যখন ফিরে এল না, তখন সবাই আন্দাজ করলেন যে সাইরাস হার্ডিংএর খোঁজেই সে কোথাও চ'লে গেছে । কিন্তু

যেতে হ'লে ব'লে যেতে তো পারতো ! না-ব'লে এইভাবে অদৃশ্য হ'য়ে গেল কেন ? আর, গেলই বা কোথায় ? এ-প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর কেউ বার করতে পারলে না।

৪

আশ্চর্য ঘটনা

ঝড়ের বেগ একটু ক'মে এসেছিলো, এবার সেই ঝড় আবার একটু-একটু ক'রে বেড়ে উঠতে লাগল। মহা গর্জনে গুহার বাইরে ফেটে পড়তে লাগল হাওয়া। একে শীতকাল, তার উপর সমুদ্রের ধারের ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া। গুহার ভিতরে আগুনের কুণ্ডের কাছে ব'সেও সবাই ঠকঠক ক'রে কাপতে লাগল, হার্বার্ট শুধু একবার বাইরে গিয়ে কোনোরকমে কিছু শুকনো ডালপালা আর গোটাকতক ডিম কুড়িয়ে নিয়ে এল। সারাদিনটা এইভাবে গুহায় ব'সেই কেটে গেল। তবে, একেবারে ব'সে রইলেন না কেউই। এই নির্জন দ্বীপের এই গুহাটাকে বাসযোগ্য ক'রে তোলবার জন্যে খুব খাটতে লাগলেন তিনজনে।

সন্ধেবেলায় ঝড়ের তর্জন-গর্জন খুব বেড়ে গেল। সমুদ্রের উত্তাল বাতাস যেন পাগল হ'য়ে উঠল। আর ঝড়-বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। সে-কী বৃষ্টি ! সারাটা আকাশ ফুটো ক'রে কে যেন তুমুলভাবে জল ঢেলে চলেছে ! যাঁরা কখনও দ্যাখেননি, তাঁরা এই সামুদ্রিক মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ের কথা কল্পনাও করতে পারবেন না। গুহায় ব'সে তিনজনে উন্মাদ ঝড়ের তাণ্ডবলীলা দেখতে লাগলেন।

কালো রঙের মেঘে সারা আকাশ ছাওয়া। কাজেই সন্ধের অন্ধকার একেবারে নিরেট হ'য়ে উঠল যেন। নিশ্ছিদ্র, দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে ঝড়ের পাখসাটে পাহাড়ের উপরকার বড়ো-বড়ো পাথরের চাঁইগুলো মধ্যে-মধ্যে ভীষণ আওয়াজ ক'রে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। দ্বীপদুটির মাঝখানের নদীটাও কানায়-কানায় ভর্তি হ'য়ে উঠেছে। কী সেই জলের তোড় ! আর সেই ছোটো নদীতেই ঢেউয়ের কী ক্রুদ্ধ গর্জন ! গুহার ভিতর থেকেই জলের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

এমন দারুণ দুর্যোগের রাতে একলা নেব্ অসহায়ভাবে কোথায় প'ড়ে আছে—সেই কথা ভেবে সকলেরই মন দুঃখে ভ'রে উঠল। সাইরাস হার্ডিংকে তো আর পাওয়ারই আশা নেই। তিনি বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন—কে জানে ! কোনো দুর্ঘটনায় হয়তো প্রাণ খুইয়ে বসেছেন। নেবের কথা ভেবে সকলেই বিচলিত হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু খামকা অস্থির হ'য়ে উঠেও বা কী লাভ। তাঁদের হাতে তখন করবার মতো কিছুই ছিল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে নিদারুণ ভাগ্যকে মেনে নেয়া ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই। সবাই বিমর্ষ হ'য়ে উঠলেন। বাইরের ঝড়ের তুমুল গর্জনে শুধু থেকে-থেকে গুহার ভিতরের নীরবতা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

রাত্রি তখন অনেক গভীর। ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে তিন জনে তখন গুহার ভিতরে নিবিড়

নিদ্রায় আচ্ছন্ন। বাইরে তেমনি তুমুল গর্জনে ফেটে পড়ছে দুর্যোগ। হঠাৎ কেন যেন স্পিলেটের ঘুম ভেঙে গেল। তাঁর মনে হ'ল বাইরে ঝড়ের গর্জন ছাড়াও অন্য কী-একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। স্পিলেট তাড়াতাড়ি পেনক্র্যাফ্‌টকে ডেকে তুললেন। 'পেনক্র্যাফট, ওঠো ওঠো! শুনছো বাইরে ও কীসের শব্দ ?'

ঘুমজড়ানো চোখে পেনক্র্যাফট একটু হকচকিয়ে রইল। তারপর সংবিৎ ফিরতেই কান পেতে খানিকক্ষণ কী শোনবার চেষ্টা করলে। তারপর বললে, 'কই ? কোনো শব্দই তো শুনতে পাচ্ছি না! ও কিছু না, ঝড়ের আওয়াজ বোধহয়।'

'না, না,' স্পিলেট আবার বললেন, 'আরো-একটু ভালো ক'রে শোনো দিকিনি। টপের গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না ?'

সতর্কভাবে কান পাতল পেনক্র্যাফ্‌ট। বাইরে ঝড়ের তুমুল গর্জন। তবু পেনক্র্যাফ্‌ট কান পেতে কী যেন শুনতে লাগল। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠিক ঠিক! টপের গলাই তো বটে!'

ওদের কথা শুনে হার্বার্টও জেগে উঠেছিল। সেও সায় দিলে 'হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হচ্ছে!'

উত্তেজনায় সকলের মন ভ'রে উঠল। একটা জলন্ত কাঠ হাতে নিয়ে দ্রুতপায়ে হার্বার্ট গুহার মুখে এসে হাজির হ'ল, তারপর টপকে নাম ধ'রে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল—'টপ্‌, টপ্‌! এই-যে! এদিকে!'

টপ্‌কে ডাকবার পর দেখা গেল, যেন তার চীৎকার ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে। আরো-খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই ভিজে-জবজবে শরীরে টপ তাঁদের কাছে এসে হাজির। অস্থিরভাবে ডাকতে লাগল সে। চঞ্চলভাবে বার-বার গুহার বাইরে ছুটে যেতে লাগল, আবার ভিতরে আসতে লাগল। কিন্তু হায়! সাইরাস হার্ডিংকে দেখা গেল না।

তবু হতাশা আসতে দিলেন না স্পিলেট। বললেন, 'টপ নিশ্চয়ই আমাদের কিছু-একটা বলতে চাচ্ছে।'

তখনও অস্থিরভাবে ল্যাজ নাড়ছে টপ্‌। হার্বার্ট বললে, 'টপ্‌ বোধহয় আমাদের কোথাও নিয়ে যেতে চায়, তাই অমন ছটফট করছে। চলুন, ও আমাদের কোথায় নিয়ে যায় দেখা যাক। আমার মনে হচ্ছে টপকে যখন পাওয়া গেছে, ক্যাপ্টেন হার্ডিংকেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে!'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে 'তাহ'লে এক্ষুনি আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত। একটুও দেরি করা ঠিক হবে না। টপই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

তক্ষুনি তিনজনে হাত-ধরাধরি ক'রে সেই ঝড়ের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন। ঝড় তখনও একটুও কমেনি. আগের মতোই তার উথালপাথাল দামাল নৃত্য চলেছে। বাইরে জমাট-বাঁধা অন্ধকার, সেই অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না। টপ ডাকতে-ডাকতে অগ্রসর হচ্ছে। অন্ধকারে টপের স্বর শুনে-শুনে সবাই তাকে অনুসরণ ক'রে চললেন।

তাঁরা চললেন বটে, কিন্তু সেই ঝড়ের মধ্যে চলাটা সহজে হ'ল না। সামান্য পথ যেতেই বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। কতক্ষণ ধ'রে চলেছেন, উত্তেজনার কারুই সে-খেয়াল ছিল না। খেয়াল হ'ল তখন, যখন অন্ধকার ফিকে হ'য়ে আসছে, একটু আলো

ফুটছে আকাশে। টপ তখন একটা পাহাড়ের উপর উঠছিল। সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে ঝড় তখন অনেকটা ক'মে গিয়েছিল, বৃষ্টিও আর পড়ছিল না। আকাশের অবস্থা আর হাওয়ার গতি দেখে বোঝা গেল, শিগগিরই আকাশ একেবারে পরিষ্কার হ'য়ে যাবে—ঝড়ও আর থাকবে না। দ্রুতপায়ে সবাই পাহাড়ে উঠতে লাগলেন।

খানিকটা ওঠবার পরেই সামনে একটা গুহা দেখা গেল। টপ ডাকতে-ডাকতে দৌড়ে সেই গুহার ভিতর ঢুকল। তাঁরা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না-পেরে টপের অনুসরণ করলেন।

কিন্তু ভিতরে ঢুকেই যা দেখলেন তাতে সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। চোখে পুঞ্জিত বিস্ময় নিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন, ক্যাপ্টেন হার্ডিং স্পন্দনরহিত দেহে শুয়ে আছেন। বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন—দেখে তা বোঝবার জো নেই। তাঁর মাথা কোলে নিয়ে উদাস, করুণ চোখে ব'সে আছে একটি লোক। বলা বাহুল্য, সেই লোকটি আর-কেউ নয়, হার্ডিং-এর অনুগত ভৃত্য নেব্।

তিনজনে খানিকক্ষণ বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলেন। কারু মুখেই কোনো কথা ফুটল না। এমন-একটা দৃশ্য যে কখনও তাঁদের নজরে পড়বে, এ-কথা তাঁরা ভুলেও কল্পনা করেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন টপ তাদের জীবিত ক্যাপ্টেনের কাছে হাজির করবে! ঘটল তার বিপরীত। সাইরাস হার্ডিং-এর সমাধির ব্যবস্থা করবার জন্যেই তাঁদের হাজির হ'তে হ'ল।

সেই করুণ নীরবতা ভাঙলো হার্বার্টের গলার স্বরে। সে জিগেশ করলে 'নেব্, ক্যাপ্টেন কি বেঁচে আছেন ?'

নেব্ ঘাড় নাড়লো। জানালে যে তা সে ঠিক জানে না। যে-রকম নিরাশ্বাস গলায় সে কথা বললে, তাতে মনে হ'ল না-বেঁচে থাকারই সম্ভাবনা বেশি। তারপর তাঁরা তিনজনে সামনের দেকে এগিয়ে এলেন। স্পিলেট নাড়ি দেখতে জানতেন। ক্যাপ্টেনের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন তিনি। কিন্তু নাড়ি দেখে কিছুই বোঝা গেল না। তখন স্পিলেট নাকের কাছে হাত দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ বাদে মনে হ'ল, যেন খুব ধীরে-ধীরে নিশ্বাস পড়ছে। স্পিলেটের মুখ আশায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল : এখনও ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর দেহে প্রাণ আছে! চেষ্টা করলে এ-যাত্রা তিনি বেঁচে উঠতেও পারেন!'

শুনে নেবের শরীরে যেন বিদ্যুৎশিহরন খেলে গেল। পলকের মেধ্যে উঠে দাঁড়ালো সে। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'এখনও বেঁচে আছেন! বলুন —কী করলে ওঁর জ্ঞান ফিরবে!'

পুবদিক তখন বেশ ফরসা হ'য়ে উঠেছে। হাওয়ার এলোমেলো ঝাপটাও আর নেই বললেই চলে।

একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে স্পিলেট বললেন, 'অত ব্যস্ত হোয়ো না, নেব্। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা যখন এসে পড়েছি, তখন ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে বাঁচিয়ে তুলবোই। প্রথমে ক্যাপ্টেনের ঠাণ্ডা হাত-পাগুলোকে সেঁক দিয়ে গরম করতে হবে।'

কিন্তু সেঁক দেয়া হবে কী ক'রে ? উদগ্রীব স্বরে পেনক্র্যাফ্ট জিজ্ঞাসা করলে, 'এই গুহায় তো আগুনও নেই, অন্য-কিছুও নেই!'

নেব্ তক্ষুনি বললে, 'আমি সেই গুহায় গিয়ে এক্ষুনি আগুন নিয়ে আসছি । একটু অপেক্ষা করুন আপনারা ।'

হার্বার্ট নেব্‌কে বাধা দিলে । বললে, 'তোমার কাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি, নেব্ । তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না । যা-কিছু আনবার আমিই আনছি ।'

নেব্ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্পিলেট তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হার্বার্ট ঠিকই বলেছে, নেব্ । তোমার এখন কিছু করবার দরকার নেই ।' তারপর হার্বার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি সেই গুহা থেকে একটু আগুন আর কিছু খাবার নিয়ে এসো ।'

হার্বার্ট দ্রুতপদে বের হ'য়ে গেল ।

নেব্ বললে, 'আমি তবে কিছু কাঠকুটো জোগাড় ক'রে আনি । আগুন জ্বালাতে হবে তো ।'

তার উৎসাহে আর বাধা দিতে চাইলেন না স্পিলেট । নেব্‌ও তখনি বের হ'য়ে পড়ল। পেনক্র্যাফ্‌ট আর স্পিলেট তখন হার্ডিং-এর প্রাথমিক পরিচর্চায় লেগে গেলেন ।

আগুন আর খাবার নিয়ে ফিরতে হার্বার্টের ঘণ্টা-দেড়েকের বেশি সময় লাগল না । অন্ধকার দুর্যোগের রাতে পথ চলতে যত সময় লেগেছিল, এবার তার থেকে ঢের কম সময় লাগল । নেব্ ইতিমধ্যে বাইরে থেকে কিছু ডালপালা জোগাড় ক'রে এনেছিল । কিন্তু সেগুলো ভিজে থাকায় আগুন জ্বালাতে বেশ কষ্ট হ'ল । পেনক্র্যাফ্‌টের পকেটে বেশ বড়ো একটা রুমাল ছিল, সেঁক দেবার জন্যে আগুনের আঁচে সেটাকে গরম করতে-করতে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর দেখা তুমি কেমন ক'রে পেলে, নেব্ ?'

নেবের অস্থিরতা তখন বেশ কমেছে । পেনক্র্যাফ্‌টের প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, 'আমি তো সেই রাত্তিরেই আপনার কাছ থেকে পালিয়ে আসি । সারাক্ষণ ঝড়বৃষ্টি মাথায় ক'রে আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজেছি চারদিক । শেষে এইখানে এসে দেখি টপ ঘুরে বেড়াচ্ছে । টপকে দেখেই আমার ভারি আনন্দ হ'ল । ভাবলুম, তাহলে ক্যাপ্টেনও নিশ্চয়ই এখানে আছেন। তাঁর সন্ধানে আমি তখন এদিক-সেদিকে তাকাতে লাগলুম ।'

'তারপর ?'

'টপ আমাকে দেখেই ঘেউ-ঘেউ ক'রে চীৎকার ক'রে আমার কাছে দৌড়ে এলো ।' নেব্ ব'লে চলল, 'আমি প্রশ্ন করলুম, ক্যাপ্টেন কোথায়, টপ্ ? টপ্ আমার কথা শুনে চঞ্চল হ'য়ে জোরে-জোরে ডাকতে লাগল । শেষটায় আমার পোশাক কামড়ে ধ'রে এই পাহাড়টায় উঠতে লাগল সে । এই গুহাটার মধ্যে যখন সে আমাকে টেনে নিয়ে এল, তখন দেখি ক্যাপ্টেন এই অবস্থায় প'ড়ে রয়েছেন । আমার মনের যে তখন কী অবস্থা তা আপনাদের আমি ব'লে বোঝাতে পারবো না । আমার মনে হ'ল, উনি বোধহয় আর বেঁচে নেই । সেই থেকে আমি ঠায় এখানে ব'সে আছি । একবার টপকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, যদি আপনাদের খুঁজে আনতে পারে। টপ্ আমাদের শেখানো কুকুর, ও ঠিক আপনাদের এনে হাজির করেছে।'

তখনও সমানভাবে সেঁক দেয়া চলছিল । ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে সবাই চুপচাপ ব'সে রইলেন । এমনিভাবে আরো-খানিকক্ষণ কেটে গেল । তারপর মনে হ'ল, ক্যাপ্টেনের জীবনীশক্তি যেন একটু-একটু ক'রে ফিরে আসছে । আস্তে-আস্তে তাঁর দেহে স্পন্দন এল।

ক্যাপ্টেনের একটি হাত ধীরে-ধীরে একবার একটুখানি উঠেই আবার প'ড়ে গেল ।

এই দেখে নেব্ আনন্দে ব'লে উঠল, 'এবার তাহ'লে ক্যাপ্টেন ভালো হ'য়ে উঠবেন !'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে ।' স্পিলেট বললেন, 'একটা মস্ত সোয়াস্তির ব্যাপার হ'ল, ক্যাপ্টেনের শরীরে জ্বর নেই । এর উপর যদি জ্বর থাকতো তাহ'লে আর রক্ষা ছিল না। বোধহয় আকস্মিক কোনো-একটা আঘাতে ক্যাপ্টেন অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন, তারপর শুশ্রূষার অভাবে আর অনাহারে আর জ্ঞান ফেরেনি ।'

পেনক্র্যাফ্‌ট ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে : 'আমারও তা-ই মনে হয় । কিন্তু গুহার ভিতরে তিনি এলেন কী ক'রে ? এখানে এসে নিশ্চয়ই তিনি আঘাত পাননি, যা-কিছু চোট তা গুহায় আসার আগেই পেয়েছেন ।'

স্পিলেট তার কথার কোনো উত্তর দিতে পারলেন না । শুধু বললেন, 'সে-সব কথা ক্যাপ্টেনের জ্ঞান ফিরলেই জানতে পারবো ।'

নিঃশব্দে আরো ঘণ্টাখানেক কেটে গেল । ক্যাপ্টেনের শরীর মাঝে-মাঝে ন'ড়ে উঠতে লাগল। অসংলগ্নভাবে দু-একটা কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল । একবার আচ্ছন্নভাবেই তিনি অনতিস্পষ্ট স্বরে ব'লে উঠলেন, 'নেব কি এখানে আছো ?

'আমায় ডেকেছেন, ক্যাপ্টেন আমায় ডেকেছেন !' বলতে-বলতে আনন্দে ছুটে এলো নেব । হার্ডিং-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ আমি আপনার কাছেই আছি, ক্যাপ্টেন ।'

ক্যাপ্টেন নেবের কথা বুঝতে পারলেন কি না বোঝা গেল না । আবার ক্ষীণ স্বরে বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলেন, 'অন্ধকার রাত্রি—বেলুন যে নিচে প'ড়ে যাচ্ছে—নিচে যে সীমাহীন সাগর !'

আবার একটু পরেই শোনা গেল : 'কিন্তু বাঁচবার কি কোনো উপায় নেই ?'

স্পিলেট ইশারায় হার্বার্টকে বললেন, 'পাখির ডিমগুলো আগুনে পুড়িয়ে নাও, হার্বার্ট। ক্যাপ্টেনকে খেতে দিতে হবে ।'

তাঁর কথামতো ডিমগুলো একে-একে আগুনের আঁচে ঝলসে নেয়া হ'ল । পেনক্র্যাফ্‌ট বললে, 'নেব, এইবার তুমি কিছু খেয়ে নাও, অনেকক্ষণ তোমার কিছু খাওয়া হয়নি ।'

'আগে ক্যাপ্টেনের জ্ঞান ফিরে আসুক—' নেবের প্রতিবাদ শোনা গেল, 'তিনি আহার করুন, তারপর আমি খাবো ।'

'তার কোনো দরকার নেই, নেব্ ।' স্পিলেট বললেন, 'ক্যাপ্টেনের জ্ঞান ক্রমেই ফিরে আসছে । আর-কোনো ভয়ের কারণ নেই। তুমি এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটু খেয়ে নাও।'

নেব আর দ্বিরুক্তি না-ক'রে আহার করতে লাগল ।

হার্ডিং পাশ ফিরে শুলেন । স্পিলেট তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে ধীর স্বরে ডাকলেন, 'ক্যাপ্টেন !'

ক্ষীণ কণ্ঠে হার্ডিং উত্তর করলেন, 'কী ?'

'আপনি এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন কি ?'

'সামান্য সুস্থ হয়েছি বটে, তবে বড্ড দুর্বল বোধ করছি ।'

দুটো ডিম তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে স্পিলেট আবার বললেন, 'ডিমদুটো খেয়ে নিন, তাহ'লে অনেকটা শক্তি ফিরে পাবেন । আপনি হাঁ করুন, আমি খাইয়ে দিচ্ছি ।'

ক্যাপ্টেন হাঁ করলেন । স্পিলেট একটু-একটু ক'রে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন ।

ক্যাপ্টেনের খাওয়া শেষ হ'লে পর বাকি ডিমগুলো অন্য-সবাই খেয়ে নিলেন । গুহার বাইরে, পাহাড়ের উপর পাথরের কোলে-কোলে গতরাত্রির বৃষ্টির পরিষ্কার জল জ'মে ছিল। সবাই সেই জলই খেলেন ।

দুপুরবেলার দিকে ক্যাপ্টেন হার্ডিং উঠে বসতে পারলেন । হার্বার্ট শুধোলে, 'বেলুন থেকে পড়বার পর কী-কী ঘটেছে, তা আপনি বলতে পারবেন কি ?'

'হ্যাঁ । এবার আমি কথা বলতে পারবো ।' হার্ডিং একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর বলতে লাগলেন :

'বেলুনটা যখন সমুদ্রে পড়ল, তখন আমি ঢেউয়ের আঘাতে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়লুম। পরমুহূর্তেই আর-একটা কী যেন আমার কাছে এসে পড়ল ! আমার তখন বুঝতে দেরি হ'ল না যে, আমার মতন আর-একজন কেউ নিশ্চয়ই এসে পড়েছে । কিন্তু কে যে পড়ল, অন্ধকারে তা বুঝতে পারলুম না । অনেক চেষ্টা ক'রে সাঁতার দিয়ে শরীরটাকে জলের উপর ভাসিয়ে শুধোলুম, "কে জলে পড়েছো ?" কিন্তু কোনো জবাব পেলুম না । তার একটু পরে সামনেই সাঁতার কাটার আওয়াজ শুনতে পেলুম । আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "কে ?" তখন ঘেউ-ঘেউ ক'রে একটা শব্দ হ'ল । স্পষ্টই বুঝতে পারলুম, টপ লাফিয়ে প'ড়ে আমাকে অনুসরণ করছে । আবার আমি যথাসাধ্য বেগে সাঁতার কাটতে লাগলুম ।'

একটু থামলেন হার্ডিং । দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'কিন্তু সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে প'ড়ে ক্রমশই আমার হাত-পা অবশ হ'য়ে আসতে লাগল । যদিও আমার জ্ঞান তখনও বিলুপ্ত হয়নি, তবু কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব আমায় দখল ক'রে নিয়েছিল। আর সাঁতার কাটতে পারছি না, ক্রমেই তলায় ডুবে যাচ্ছি, এমন সময় টপ আমার পোশাক কামড়ে ধরল । তারপর খুব নিপুণভাবে সাঁতার কাটতে-কাটতে আমাকে টেনে নিয়ে চলল ।'

নেব্ বললে, 'তাহ'লে এই টপই আপনাকে রক্ষা করেছে !'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন, 'হ্যাঁ । কিন্তু জানো, তখন আমার ভারি হাসি পেয়েছিল । ভেবেছিলুম, টপের শক্তি আর কতটুকু ! কতক্ষণ আর সে আমায় এই সীমাহারা সমুদ্রে টেনে নিয়ে যাবে ! কিন্তু পরমুহূর্তেই পায়ের তলায় ঠেকল মাটি । মাটি ! হতাশার হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল । আমার আর আনন্দের সীমা রইল না । ঈশ্বরের অনুগ্রহে আর টপের সাহায্যে আমার পায়ের তলায় মাটি ঠেকেছে । এখন বুঝতে পারছি, রাত্রিবেলা কুকুরদের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হয় ব'লে কাছের এই ডাঙার সন্ধান আগেই পেয়েছিল টপ । কোনোরকমে অতি কষ্টে টপকে কোলে নিয়ে আমি উপরে উঠে এলুম । তখন আর আমার দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। ডাঙায় উঠেই আমি চেতনা হারিয়ে পড়েছিলুম । তোমাদের চেষ্টায় এই একটু আগে জ্ঞান ফিরেছে ।'

'আশ্চর্য !' অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করল পেনক্র্যাফ্ট, 'আপনি তবে এই গুহায় এলেন কী

ক'রে ? টপ কি আপনাকে কামড়ে টেনে এনেছে নাকি ?

'কেন ?' হার্ডিংকেও অবাক দেখালো : 'তোমরা কি এখানে নিয়ে আসোনি আমায় !'

'না । এই গুহাতে এসেই তো আমরা আপনার দেখা পাই । এর আগে নেব্‌ও তো আপনাকে এই গুহাতেই দেখছে ।'

'কী আশ্চর্য !' সবিস্ময়ে কাপ্টেন বললেন, 'তবে আমায় এখানে আনলে কে ? টপ নিশ্চয়ই আনেনি । তবে কি আমি নিজেই উঠে এসেছি ? কিন্তু তা-ই বা এলুম কখন ? ভারি আশ্চর্য তো ! কোনো লোকজন এখানে বাস করে কি ?'

স্পিলেট ঘাড় নাড়লেন । 'না, অন্তত আমরা তো কাউকেই দেখতে পাইনি । আর যতদূর দেখছি তাতে মনে হয়, এটা একটা জনমানবশূন্য দ্বীপ ।'

উত্তেজনায় ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ালেন । তাঁর শরীরে তখন যেন যৌবন ফিরে এসেছে। তাড়াতাড়ি তিনি গুহার বাইরে বেরিয়ে এলেন । অন্যরাও তাঁর অনুসরণ করলে । বাইরে এসে হার্ডিং পাহাড় থেকে নিচে নামলেন । তারপর নিচু হ'য়ে মাটির উপর কীসের দাগ লক্ষ করতে লাগলেন ।

খানিক লক্ষ ক'রে হার্ডিং সকলের পায়ের দিকে তাকালেন । 'আরে ! সকলের পায়েই তো জুতো আছে ! তাহ'লে এই খালি পায়ের ছাপ এখানে এলো কী ক'রে ?' ব'লে তিনি মাটির দিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন ।

সবাই অবাক হ'য়ে দেখতে পেলে ভিজে মাটিতে খালি-পায়ের একাধিক দাগ ।

হার্ডিং-এর মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠল : 'এই দ্বীপ মোটেই জনশূন্য নয় । এই দ্বীপে নিশ্চয়ই মানুষ আছে। অন্তত এমন-একজন মানুষ আছে, যে আমাকে সমুদ্রের ধার থেকে তুলে এনে এই গুহায় রেখে দিয়ে গেছে । কিন্তু কে সে ? সে কি এই দ্বীপের কোনো বুনো অধিবাসীদের একজন ? না, প্রশান্ত মহাসাগরের নির্জন দ্বীপে যে-সব বোম্বেটের আস্তানা আছে সেই বোম্বেটেদের দলের লোক ? কিন্তু তাদের যে মানুষের প্রতি বিশেষ দয়া আছে তা তো মনে হয় না। তবে কে সেই লোক, যে আমাকে এই গুহায় নিয়ে এলো ? কে ?'

'কে ?' সমস্বরে সবাই এই প্রশ্নই করলেন ।

কিন্তু সঠিক কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

নিঃশব্দে, একটিও কথা না-ব'লে, সবাই তাড়াতাড়ি আবার গুহাটায় ফিরে এলেন ।

৫

আরেকটা আশ্চর্য ব্যাপার

যদিও সাইরাস হার্ডিং উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, তবু তাঁর সুস্থ হ'তে পুরো একটা দিন লাগল ।

সেইজন্যে সে-রাত্রে আর আগের গুহায়, অর্থাৎ চিমনিতে না-গিয়ে তাঁরা সেই গুহাতেই কাটিয়ে দিলেন । নেব্ আর পেনক্র্যাফ্‌ট একবার মাত্র বনে গিয়ে আহারের জন্যে কয়েকটা

পাখি মেরে আনলে। এ-কদিন শুধু ডিম আর ঝিনুক খেয়ে থাকবার পর মাংস খেতে পেয়ে সবাই খুশি হ'য়ে উঠলেন।

পরদিন ভোরবেলায় ক্যাপ্টেনকে সঙ্গে নিয়ে সবাই চিমনিতে ফিরে এলেন। কিন্তু ফিরে এসে একটা ব্যাপার দেখে তাঁদের চোখ মাথায় উঠল। গুহার জ্বালানো আগুন নিভে গেছে। এককণা জ্বলন্ত অঙ্গার পাওয়ার জন্যে তাঁরা ছাই তুলতে লাগলেন। কিন্তু বৃথাই শুধু হয়রানই হ'তে হ'ল — আগুন একেবারেই নিভে গেছে।

যে-গুহা তাঁরা এইমাত্র ছেড়ে এসেছেন, সেই গুহাতেও তাঁরা আগুন রেখে আসেননি।

সবচেয়ে চঞ্চল হ'য়ে উঠল পেনক্র্যাফ্‌ট। বললে 'সর্বনাশ! এখন আমাদের উপায় কী হবে? এইবার কাঁচা মাংস বা ডিম ছাড়া আর আমাদের বরাতে ঝলসানো মাংস বা ডিম জুটবে না! রাত্তিরে একটু আলোর দরকার হ'লেই বা পাবো কোথায়?'

স্পিলেট জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কাছে কি দেশলাই আছে, ক্যাপ্টেন হার্ডিং?'

'না।' হার্ডিং জবাব দিলেন, 'আমি সিগারেট খাইনে ব'লে ও-সব জিনিশ কাছে রাখার দরকার হয় না। আর যদিই-বা আমার কাছে থাকতো, তাহ'লেও জলে প'ড়ে গিয়ে ভিজে নষ্ট হ'য়ে যেতো।'

পেনক্র্যাফ্‌ট চিন্তিত হ'য়ে পড়ল। শুধু কেবল আগুনের অভাবে এই জনমানবহীন দ্বীপে বেঁচে থাকা যে অসম্ভব, তা সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে। তার আর দুশ্চিন্তার সীমা রইল না।

নেব্ তার কানে-কানে বললে, 'আপনি খামকা এত ভাববেন না! ক্যাপ্টেন যখন আমাদের কাছে আছেন, তখন এর একটা উপায় তিনি করবেনই।'

হার্ডিং বললেন, 'এসো আমরা এখন ওই পাহাড়টার উপর উঠে দেখি, এটা কোনো দ্বীপ না মহাদেশের কোনো অংশ। যদি এটা দ্বীপই হয়, তাহ'লেও এই দ্বীপটা কত বড়ো, তা আমাদের জানা দরকার। কেননা, বাধ্য হ'য়ে যখন এখানে আমাদের অন্তত কিছুদিনের জন্যেও থাকতে হচ্ছে, তখন এর আয়তনটাও আমাদের জেনে রাখা ভালো।'

সবাই আস্তে-আস্তে পাহাড়টার উপর উঠতে লাগলেন। স্পিলেটের হাতে রিস্টওয়াচ ছিল। পাহাড়ে ওঠা শেষ হ'লে পর তিনি ঘড়ি দেখে জানালেন, বেলা বারোটা বেজেছে।

উপরে উঠে ভালো ক'রে চারধার অনেকক্ষণ ধ'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে ক্যাপ্টেন বললেন, 'এটা দ্বীপ, না কোনো মহাদেশের একাংশ, সেটা ভালো ক'রে বোঝা যাচ্ছে না। পাহাড়টা বড্ড ছোটো। একটা বড়ো পাহাড়ে উঠে আমাদের ভালো ক'রে অনুসন্ধান করতে হবে। তবে এটা যদি দ্বীপই হয়, তবে নেহাৎ ছোটো দ্বীপ নয়, লম্বায় বোধহয় বিশ মাইলের মতন হবে।'

পেনক্র্যাফ্‌ট আগুনের ভাবনায় আর খিদেয় ক্রমেই অধৈর্য হ'য়ে উঠছিল। তার নীল কামিজে হাত ঘসতে-ঘসতে সে বললে, 'এটা দ্বীপই হোক, আর মহাদেশই হোক—বড়ো হোক কিংবা ছোটোই হোক— আজ থেকে না-খেয়ে মরতে হবে আমাদের। আপনি সে-বিষয়ে কিছু ভাবছেন কি, ক্যাপ্টেন হার্ডিং?'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং শুধু একটু হাসলেন। বললেন, 'পাখির মাংস জোগাড় ক'রে আনতেই যা দেরি, নইলে আগুনের আর ভাবনা কী?'

বিস্ময়ে পেনক্র্যাফটের চোখদুটি গোল হ'য়ে উঠল : 'কী বলছেন আপনি ! পাখির মাংস জোগাড় ক'রে আনতেই যা দেরি—আর আগুনের জন্যে ভাবনা নেই ? কিন্তু আগুন আপনি পাচ্ছেন কোথায় ?'

তার হাবভাব আর কথা বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলেন । হার্ডিংও তার দুর্ভাবনা দেখে না-হেসে পারলেন না । বললেন, 'পেনক্র্যাফ্‌ট, তুমি পাখির মাংস জোগাড় ক'রে আনো, আগুন জ্বালাবার ভার আমার উপর রইল ।

এবার পেনক্র্যাফটের বিস্ময় অনেকটা ক'মে এল । বললে 'দুটো কাঠকে ঘ'সে আগুন জ্বালাবার কথা বোধহয় আপনি বলছেন, ক্যাপ্টেন ? তাতে কিন্তু কোনো কাজই হয় না । আমি একটা অ্যাডভেনচারের বইতে ওই কথা পড়েছিলুম বটে, কিন্তু সে-কাঠ নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো এক ধরনের কাঠ । কেননা, দুঃখের সঙ্গে আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, এতদিন এক ঘণ্টা ধরে আমি দুটো কাঠ ঘ'সে একটুও আগুনের ফুলকি পর্যন্ত বার করতে পারিনি, আগুন তো দূরের কথা !'

এই কথা ব'লে পেনক্র্যাফট ভেবেছিল এবার বোধহয় ক্যাপ্টেন দ'মে যাবেন, কিন্তু তিনি মোটেই দমলেন না । তার রকম-সকম দেখে আবার একটু হেসে হার্ডিং বললেন, 'কিন্তু আমি আগেই তোমাকে বলেছি পেনক্র্যাফ্‌ট, সে-ভার আমার, তোমার নয় । মাংস জোগাড় করতেই তোমার যা দেরি হচ্ছে । তুমি বরং একটু তাড়াতাড়ি যাও ।'

আর-একটি কথা না-ব'লে পেনক্র্যাফ্‌ট বেরিয়ে পড়লো । হার্বার্ট আর নেব্‌ও শিকারের লোভে তার অনুসরণ করলে । খানিকটা দূরে এগিয়ে তারা পিছন ফিরে দেখে, টপও লাফাতে-লাফাতে তাদের সঙ্গে আসছে ।

পাহাড় থেকে একটু দূরেই যে-অরণ্য ছিল, তারা তিনজনে সেই অরণ্যে শিকার করতে চলল । অবস্থা অবিশ্যি অনেকটা ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতন । হাতে কোনো অস্ত্র নেই, হাতিয়ার নেই, অথচ শিকারীরা শিকার করতে চলেছে । পেনক্র্যাফ্‌ট একটা গাছের কয়েকটা সরু ডাল ভেঙে নিলে । কোনো পাখি বা জানোয়ার সামনে পড়লে এই ডাল দিয়ে আঘাত ক'রেই মারতে হবে । হার্বার্ট আর নেবের হাতেও সে এক-একটা ডাল তুলে দিলে ।

অরণ্য এত নিবিড়, এত অন্ধকার যে তার ভিতরে প্রবেশ করাই রীতিমতো অ্যাডভেনচার । নেব্‌ গাছের ডাল হাতে নিয়ে লতাপাতা প্রভৃতির উপর ঘা মেরে দু-হাতে পাতা সরিয়ে পথ ক'রে চলতে লাগল, আর অন্য দুজন তার পিছনে-পিছনে চলল । এইভাবে বেশ খানিকটা এগুবার পর অরণ্য একটু পাৎলা হ'য়ে এলো । অরণ্যের অন্ধকারও ঈষৎ ফিকে হ'য়ে এলো । শিকারের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকালো সবাই । কিন্তু একটা জানোয়ারও দেখা গেল না ।

হার্বার্ট বললে, 'বনের ভিতর এসেও শিকার জুটল না আমাদের বরাতে । কিন্তু আর বেশিদূর এগিয়ে যাওয়াও বিপজ্জনক । এই দ্বীপে যদি অসভ্য বুনো অধিবাসীরা থাকে, তাহ'লে হয়তো আমাদের ধ'রে নিয়ে যাবে । আজও না-হয় আমরা ডিম আর ঝিনুক খেয়েই থাকবো ।'

ঘাড় নেড়ে উঠল পেনক্র্যাফ্‌ট । 'না হার্বার্ট, আজ শুধু-হাতে ফিরলে লজ্জায় আমার

মাথা কাটা যাবে। ক্যাপ্টেন হার্ডিং আগুন নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন, আর আমরা শুধু হাতে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াবো ? অসভ্য বুনোদের ভয় যদি থাকে, তোমরা ফিরে যাও। আমি আজকে কিছু একটা শিকার না-ক'রে ফিরছি না।'

হার্বার্টের বড়ো অভিমান হ'ল। সেও কি তাই বলতে চাইছে না ? বুনোদের ভয়ে সে তার আশ্রয়দাতাকে ছেড়ে চ'লে যাবে—সে কি এতই কাপুরুষ ! কোনো কথা না-ব'লে সে চুপ ক'রে রইল।

এমন সময় কয়েকটা গাছপালার আড়ালে একটা হুটোপাটির আওয়াজ শোনা গেল। ব্যাপার কী দেখবার জন্যে গাছের ডাল সরিয়ে তিনজনেই একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু ব্যাপার দেখে তারা না-হেসে থাকতে পারল না। টপ একটা খরগোশের পা সাংঘাতিকভাবে কামড়ে ধরেছে, আর খরগোশটা টপের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নেব্ তখন তার হাতের ডালটার আঘাতে খরগোশটাকে মারলে।

পেনক্র্যাফ্ট ভারি খুশি হ'য়ে উঠল। 'যাক, এবার আমাদের কাজ শেষ হয়েছে, এখন চলো ফিরে যাই সবাই। আমি কিন্তু তোমায় ব'লে রাখছি, হার্বার্ট, ক্যাপ্টেন হার্ডিং কোনোমতেই আগুন জোগাড় করতে পারবেন না। তাঁকে আজ হার মানতেই হবে।

নেব্ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ ক'রে উঠল : 'আমিও ব'লে রাখছি আপনাকে, ক্যাপ্টেন কখনোই হারবেন না।'

'আচ্ছা, দেখা যাক।' ব'লে তিনজনে ফেরার পথ ধরলে। নেব্ খরগোশটাকে পিঠে ঝুলিয়ে নিলে। তিনজনে দ্রুতপদে গুহার দিকে পা চালাতে লাগল।

খানিক এগিয়েই বড়ো একটা হ্রদ চোখে পড়ল সকলের। এই হ্রদটা লম্বায় প্রায় এক মাইল, চওড়ায় সিকি মাইলের মতো হবে। স্পিলেট প্রথম দিন এই হ্রদ থেকেই জল নিয়ে গিয়েছিলেন।

গুহার কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল, গুহার মুখ থেকে ধোঁয়া উঠছে। আগুন ছাড়া ধোঁয়া ওঠে কোত্থেকে ? পেনক্র্যাফ্ট হতভম্ব হ'য়ে গেল। বিস্মিত হ'য়ে বললে, 'তাই তো হে, হার্বার্ট, ধোঁয়া ওঠে কোত্থেকে বলো দিকিনি !'

ধোঁয়া যে কোত্থকে উঠছে, তা বুঝতে আর কারু বাকি রইল না। সাইরাস হার্ডিং যে আগুন জ্বালাতে পেরেছেন, তা সকলেই বুঝতে পারলে। গুহায় আসতেই দেখা গেল বড়ো একটা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত হয়েছে।

ওদের দেখে হার্ডিং হাসতে-হাসতে বললেন. 'এই- যে, তোমরা এসে গেছ ? আমি সেই কখন থেকে আগুন জ্বালিয়ে তোমাদের জন্যে ব'সে আছি।'

পেনক্র্যাফ্ট কথা বলবে কি, বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল। আগুন জ্বালানোর কোনো উপকরণ না-থাকলেও যে আগুন জ্বালানো সম্ভব হয়েছে, একে ভুতুড়ে ব্যাপার ছাড়া আর কী বলা যায় ? একটু বাদে নিজেকে খানিকটা সামলে সে বললে, 'আপনি কি জাদু জানেন, ক্যাপ্টেন ?'

হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন হার্ডিং : 'জাদু ? ম্যাজিক ? না পেনক্র্যাফ্ট, ম্যাজিক আমি কোনোকালেই শিখিনি। তবে ম্যাজিকের চেয়েও আশ্চর্য-কিছু করা যায়, এমন ধরনের কতগুলো বিজ্ঞানের বই এককালে পড়েছিলুম।'

'কী ক'রে আগুন জ্বালালেন আপনি ?' বিস্মিত পেনক্র্যাফ্‌ট প্রশ্ন করলে ।

হার্ডিং উত্তর করলেন, 'কেন ? আগুন জ্বালানো আর একটা বেশি কী ? মিস্টার স্পিলেটের আর আমার রিস্টওয়াচের কাচদুটো খুলে নিয়ে, ওই কাচদুটোকে দু-পাশের ঢাকনির মতো ক'রে পাঁক দিয়ে তার ধারগুলো বন্ধ ক'রে দিলুম । তখন দেখতে হ'লে ঠিক একটা কৌটোর মতো । তখন একপাশ দিয়ে তার ভিতর জল পুরে দিয়ে সেই মুখটাও বন্ধ ক'রে দিলুম । তারপর সেই কাচের উপর সূর্যরশ্মি ফেলে কতগুলো শুকনো পাতার উপর সেই রশ্মি প্রতিফলিত করতেই একটু পরে সেই পাতাগুলো জ্ব'লে উঠল ।'

পেনক্র্যাফ্‌ট এতক্ষণ চোখ গোল ক'রে তাঁর কথা শুনছিল । এবার তার মনে হ'ল, ক্যাপ্টেনের প্রতিভা সত্যিই সাধারণ নয়, তাঁর কাছে যা-কিছু চাওয়া যাবে তা-ই পাওয়া যাবে । তাই সাহসে ভর ক'রে সে বললে, 'ক্যাপ্টেন হার্ডিং, আপনার কাছে আমার আরো-একটা প্রার্থনা আছে । আপনি আপনার অসাধারণ প্রতিভার জোরে যেখান থেকে হোক একটা ছুরি আমাকে দিন, খরগোশের মাংস কাটতে সুবিধে হবে ।'

বিব্রতভাবে চারদিকে তাকালেন হার্ডিং । বললেন, 'ছুরি ! ছুরি আবার এখানে আমি পাবো কোথায় ? আমাদের কারু কাছেই তো একটাও ছুরি নেই !'

কিন্তু পেনক্র্যাফ্‌টের সাহস বেড়ে গিয়েছিল । তার মনে হ'ল, হার্ডিং-এর কাছে অসম্ভব ব'লে কিছু নেই । যিনি বিনা আগুনে আগুন জ্বালান তাঁর কাছে মাংস কাটবার জন্যে একটা ছুরি পাওয়া এমন-কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয় । সে বললে, 'কিন্তু আপনি একটু মাথা খাটালেই একটা ছুরি হয়তো পাওয়া যায় ।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন হার্ডিং । তারপর বললেন, 'আচ্ছা, দেখছি । কাজ-চালানো-গোছের একটা ছুরি পেলেই তো তোমার চলবে ?'

পেনক্র্যাফ্‌ট ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে ।

সাইরাস হার্ডিং টপকে কাছে ডাকলেন । তার গলায় লোহার যে-পাৎলা পাতটা পরানো ছিল, তা খুলে নিয়ে ভেঙে দু-টুকরো করলেন । তারপর পেনক্র্যাফ্‌টের দিকে পাতদুটো বাড়িয়ে ধ'রে বললেন, 'এই নাও তোমার ছুরি—একটা নয়, দুটো । পাথরে ঘ'ষে একটু ধার দিয়ে নিলেই তোমার কাজ-চলার মতন চমৎকার ছুরি তৈরি হ'য়ে যাবে ।'

পেনক্র্যাফ্‌ট তো আনন্দে লাফ দিয়ে উঠল প্রায় । উত্তেজিত স্বরে বললে, 'ক্যাপ্টেন, আপনার মাথায় কী বুদ্ধিই খেলে ! এইসব সহজ-সহজ জিনিশগুলো পর্যন্ত আমার মাথায় আসে না। আমি একটা রীতিমতো গর্দভ !'

'যাক—' সাংবাদিক হাসতে-হাসতে বললেন, 'তাহ'লে এবার তোমার আত্মজ্ঞান হবার পর থেকে ক্যাপ্টেনের সব কথাই তোমার বিশ্বাস হবে তো, পেনক্র্যাফ্‌ট ?'

'নিশ্চয়ই—' ব'লে পেনক্র্যাফ্‌ট লোহার পাতদুটোয় ধার দিতে লাগল ।

নেব্‌ এসে কানে-কানে বললে, 'ক্যাপ্টেনের ক্ষমতা অদ্ভুত কি না, এখন প্রমাণ হ'ল তো ?'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে, 'ক্যাপ্টেন যে এত-বড়ো প্রতিভাবান, না-দেখলে তা কী ক'রে জানবো, বলো ?'

খরগোশের মাংস দিয়ে সেদিন তো তাঁদের রীতিমতো একটা ভোজ হ'য়ে গেল ।

বলবার মতো কোনোকিছু সে-দিন আর ঘটল না। কিন্তু পরদিন একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই হার্ডিং পেনক্র্যাফ্‌টকে বললেন, 'আজ আর তোমার শিকারে গিয়ে কাজ নেই, পেনক্র্যাফ্‌ট। পাখির ডিম আর ঝিনুক খেয়েই আজ আমাদের বেশ চ'লে যাবে। শিকার করতে গেলে মাঝখান থেকে খানিকটা দেরি হ'য়ে যাবে, কিন্তু আজ আমাদের কোথাও অযথা সময় নষ্ট করলে চলবে না। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে একবার চারধারে ঘুরে দেখতে হবে।'

হার্বার্ট বললে, 'কিন্তু কিছু মাংস খেতে পেলে ভালো হ'ত। ডিম আর ঝিনুক অনেকগুলো খেলেও আমার পেট ভরে না।'

হার্ডিং একটু হাসলেন। বললেন, 'কী আর করা যাবে বলো। কোনো উপায় তো নেই। যদ্দিন আমরা এখানে থাকবো তার কোনোদিন জুটবে খরগোশের মাংস, আর কোনোদিন পাবো শুধু পাখির ডিম আর সামুদ্রিক ঝিনুক।'

'কিন্তু কতদিন আমাদের এখানে থাকতে হবে ?'

নির্বিকারভাবে হার্ডিং উত্তর করলেন, 'যতদিন-না আমরা কোনো উপায় ঠিক করতে পারি। দুর্ভাগ্য আমাদের যেখানে টেনে এনেছে, যতদূর মনে হচ্ছে সেটা একটা দ্বীপ। এই দ্বীপের চারপাশে সীমাহারা নীল নির্জন প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ। কে জানে, একশো মাইলের ভিতরে, আর-কোনো দ্বীপ বা মহাদেশ আছে কি না!'

হার্বার্ট হতাশ হ'য়ে বললে, 'ঈশ্বর জানেন, এই দ্বীপ থেকে কখনও মুক্তি পাবো কি না। আর কখনও মুক্তি পাবো ব'লে তো আমার মনে হয় না।'

'মুক্তি আবার আমরা পেতে পারি—' হার্ডিং উৎসাহ দেবার চেষ্টা করলেন, 'যেমনভাবে আমরা এই দ্বীপে এসে পড়েছি, তেমনি অপ্রত্যাশিত কিছু যদি ঘটে।'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে, 'সে-রকম অসম্ভব- কিছু ঘটবার সম্ভবনাই বা কোথায় ? কোনো যাত্রী বা মালবাহী জাহাজ বোধহয় এই দ্বীপের কয়েকশো মাইলের মধ্য দিয়েও যাওয়া-আসা করে না।'

হার্ডিং বললেন, 'কিন্তু যখন অসম্ভব কিছু ঘটে, তখন তার আভাস আগে থেকে পাওয়া যায় না, সেটা আকস্মিকই হয়।'

নেব্‌ এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। এইবার বললে, 'এই দ্বীপটায় আর যত অসুবিধেই থাক, এখানে হিংস্র জানোয়ার কিংবা জংলিদের হাতে প্রাণ দেবার কোনো ভয় নেই।'

হার্ডিং-এর মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠল। বললেন, 'কোনো ভয় নেই, এ-কথা তোমায় কে বললে, নেব্‌ ? প্রশান্ত মহাসাগরের এইসব অজানা ছোটো-ছোটো দ্বীপ কত ভয়ংকর হয়, তা জানো ? মালয় বোম্বেটের দল জাহাজ লুঠতরাজ ক'রে এ-সব দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়। তারা বুনো জানোয়ার বা নরখাদক জংলিদের চেয়ে কম ভয়ংকর নয়।'

এ-কথা শুনে সকলের মুখই গম্ভীর হ'য়ে উঠল। হার্ডিং আবার বললেন, 'কে বলতে পারে যে আমাদের এই দ্বীপটাই বোম্বেটেদের একটা ঘাঁটি নয় ?'

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন সবাই। তারপর ধীর স্বরে পেনক্র্যাফ্‌ট বললে, 'তাহ'লে এই দ্বীপে নেমে অব্দি এখনও যে কোনো বোম্বেটে দলের সামনাসামনি পড়িনি, এটাকে

সৌভাগ্যই বলতে হবে ।'

'নিশ্চয়ই !' হার্ডিং বললেন, 'আর এ-সব দ্বীপে আস্তানা তৈরি করাই তাদের তরফে সবচেয়ে সুবিধের । প্রশান্ত মহাসাগরের এ-সব ছোটো-ছোটো দ্বীপ বাইরের দুনিয়ার অজ্ঞাত। কবে যে অকস্মাৎ এই দ্বীপগুলোর সৃষ্টি হচ্ছে আর কবে যে এগুলো আবার আকস্মিকভাবে জলের তলায় মিলিয়ে যাচ্ছে, তা কেউ জানে না ।'

একরাশ আতঙ্ক ঝ'রে পড়ল নেবের গলা থেকে : 'দ্বীপ আবার জলের তলায় মিলিয়ে যায় নাকি, ক্যাপ্টেন ? তাহ'লে আমাদেরও একদিন এই দ্বীপের সঙ্গে জলের তলায় যেতে হবে !'

তার আতঙ্ক দেখে হার্ডিং না-হেসে পারলেন না । নেব্‌কে আশ্বস্ত ক'রে বললেন, 'না নেব্, সম্প্রতি তোমার জলে ডোববার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না । তবে, আমার কথায় অবাক হওয়ার কিছু নেই । কারণ বড়ো-বড়ো পণ্ডিতদের ধারণা, শুধু ছোটো-খাটো দ্বীপ কেন, বড়ো-বড়ো মহাদেশগুলোরও জন্ম রয়েছে এমনিভাবে জলের থেকে ভূত্বকের আলোড়নের দরুন । আবার হয়তো একদিন সেগুলোও এই জলের তলায় মিলিয়ে যাবে ।'

হতবুদ্ধি হ'য়ে নেব্ শুধু ব'লে উঠল, 'কী ভয়ংকর কথা !'

হার্ডিং ব'লে চললেন, 'ভূমিকম্পের দরুন প্রায়ই তো কত জায়গা মাটির তলায় ব'সে যায় কিংবা জলের তলায় মিলিয়ে যায় । আবার ভূমিকম্পে হয়তো হঠাৎ-একদিন জলের উপর নতুন দ্বীপের সৃষ্টি হয় । এই-যে আফ্রিকার প্রকাণ্ড শাহারা মরুভূমি—অনেকেরই ধারণা একদিন ওটা ছিল একটা সাগর । তারপর সংঘাতিক একটা ভূমিকম্পে একদিন সেই সাগর স্থানচ্যুত হ'য়ে গেছে, আর জলের তলা থেকে বালি উঠে এসেছে । আগে সাগর ছিল ব'লেই তো শাহারা মরুভূমিতে অত বালি !'

কথায়-কথায় বেলা বেড়ে উঠেছে দেখে সবাই তখন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন । কয়েকটা পাখির ডিম আর সামুদ্রিক ঝিনুক জোগাড় করতে খুব বেশি দেরি হ'ল না । সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে আহার করতে-করতে বেলা দুপুর হ'য়ে গেল । ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে সবাই বেড়াতে বেরুলেন । টপও সঙ্গে চলল ।

কখনও-বা ছোটো-বড়ো পাহাড়ের উপর দিয়ে কখনও-বা পাহাড়ের পাশ দিয়ে তাঁরা চলতে লাগলেন । পাহাড়গুলো গ্র্যানাইট পাথরের, তার চারদিকে ইতস্তত কত গ্র্যানাইট ছড়িয়ে আছে । যেখানে পাহাড় নেই, সেখানে গাছ-গাছালির ভিড় । পাহাড়ের উপর নানান জাতের পাখি দেখা গেল ।

অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে এক অজানা পথ দিয়ে তখন সকলে প্রায় বনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন, এমন সময় নেবের চীৎকারে সবাই থমকে দাঁড়ালেন । হার্ডিং আর স্পিলেট গল্প করতে-করতে একটু পেছনে আসছিলেন, নেব্ হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফ্‌ট এগিয়ে চলছিল । নেব্ হঠাৎ দৌড়ে এসে বললে, 'সর্বনাশ হয়েছে, ক্যাপ্টেন ! ওই দেখুন পাহাড়ের গা থেকে ধোঁয়া উঠছে, বোধহয় ওই দ্বীপের জংলিরা আগুন জ্বেলেছে ! যদি ওরা আমাদের দেখতে পেয়ে থাকে, তাহ'লে আর আমাদের কোনোরকমেই রেহাই পাওয়ার জো নেই !'

উত্তেজিত হ'য়ে হার্ডিং শুধোলেন, 'হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফ্‌ট কোথায় ? তাদের তো

দেখতে পাচ্ছি না !'

নেব্ হাঁপাতে-হাঁপাতে জবাব দিলে, 'তাঁরা দুজনে ওই ঝোপে অপেক্ষা করছেন। আপনি এখন কী করতে বলেন ?'

হার্ডিং স্পিলেটের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'আড়ালে লুকিয়ে থেকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখলে মন্দ কী ?'

সাংবাদিক সায় দিলেন, 'আমারও তা-ই ভালো ব'লে মনে হচ্ছে।'

তারপর তাঁরা দ্রুতপদে এগিয়ে যেখানে হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফ্ট অপেক্ষা করছিল সেখানে এসে হাজির হলেন। তারপর খুব সাবধানে আস্তে-আস্তে পাহাড়ে উঠতে লাগলেন সকলে।

জংলিরা পাছে দেখতে পায়, এই ভয়ে পাথরের আড়ালে একটু-একটু ক'রে এগিয়ে হার্ডিং সকলকে থামতে ইশারা করলেন। তারপর কী ব্যাপার দেখবার জন্যে মুখ বাড়িয়েই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, যেন একটা হাসির তুবড়ি ফুটল। একটু পরে হাসি চেপে তিনি বললেন, 'দেখুন মিস্টার স্পিলেট, একটা নালা দিয়ে জ্বলন্ত সালফিউরিক অ্যাসিডের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, আর তা থেকেই ধোঁয়া উঠছে। আগুনের রঙ লাল নয়, নীল।'

ক্যাপ্টেনের পেছনে ছিলেন ব'লে ব্যাপারটা কেউই বুঝতে পারেননি। হঠাৎ তাঁর এই হাসির বহরে হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিলেন সবাই। এবার ব্যাপার কী দেখবার জন্যে সবাই মাথা বাড়ালেন। ক্যাপ্টেন ততক্ষণে নামতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। সবাই তাঁর পেছনে-পেছনে সেই নীল আগুনের বহমান ধারার দিকে এগিয়ে চললেন। কী সুন্দর দেখাচ্ছে সেই জ্বলন্ত নীল সালফিউরিক অ্যাসিডের স্রোত! অ্যাসিড জমা হ'য়ে আগুন জ্বলছে।

হার্ডিং বললেন, 'ওই ব্যাপার থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই দ্বীপের বেশিরভাগ পাহাড়ই আগ্নেয়গিরি। এখনও মাঝে-মাঝে হয়তো একটু-একটু অগ্ন্যুৎপাত হ'য়ে থাকে। পাহাড়ের কোনো-একটা জ্বালামুখ দিয়ে বোধহয় এইসব জ্বলন্ত ধাতু ও অ্যাসিড ইত্যাদি বেরিয়ে এসে এ-সব নালায় জমা হয়েছে, আর বাইরে এসেও তাই এগুলো এখনও জ্বলছে, ঠাণ্ডা হয়নি।'

একটুক্ষণ সবাই সেই নীল রঙের আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার চলতে লাগলেন।

বেলা তখন অনেকটা প'ড়ে এসেছিল। আরো খানিকটা এগুবার পরই সামনে হ্রদটা গেল।

হ্রদটিকে ডানপাশে রেখে সবাই চলতে লাগলেন। হ্রদের আশপাশে আগাছা জন্মেছে। একটু পর-পর ঘন ঝোপও দেখা গেল। নানান জাতের পাখি জলের উপর ব'সে খেলা করছিল। বিকেলের রক্তিম আলোয় হ্রদের জল ঝলমল করতে লাগল। সবাই হ্রদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় টপ হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বসল। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সে খুব চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। সাইরাস হার্ডিং টপকে কাছে ডাকলেন: 'টপ, এদিকে আয়।'

কিন্তু টপ তাঁর কাছে এলো না। বরং তাঁদের নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে সে যেন আরো খেপে উঠল। হঠাৎ সে চীৎকার করতে-করতে লাফ দিয়ে হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পলকের মধ্যে টপ যখন জলের তলায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল, তখন সবাই চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। তার

অদ্ভুত রকম-সকমের কোনো মানে খুঁজে পেলেন না কেউ। সবাই অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখলেন, একটু পরেই টপ জলের উপর ভেসে উঠল, তারপর একটুও দেরি না-ক'রে ডাঙায় উঠে এল।

টপের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কিন্তু শিগগিরই জানা গেল। টপের ডাঙায় উঠে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা বিশালদেহী জলজন্তুর দেহের এক অংশ জলের উপর ভেসে উঠল। জন্তুটা কোন্ শ্রেণীর তা দেখবার জন্যেই সবাই ঝুঁকে দাঁড়ালেন। কিন্তু টপ কাউকে ভালো দেখতে দিলে না। জন্তুটাকে ভালো ক'রে দেখবার আগেই টপ চীৎকার ক'রে আবার তার উপর লাফিয়ে পড়ল। তাকে বাধা দেয়ার এক সেকেণ্ডও সময় পাওয়া গেল না।

তারপরেই ডাঙার জানোয়ারের সঙ্গে জলের জানোয়ারের তুমুল লড়াই বেধে উঠল। প্রবল ঝাপটা-ঝাপটি হ'য়ে গেল হ্রদের জলে। কিন্তু সেই বিপুলকায় জন্তুর কাছে ছোট্ট টপের শক্তি আর কতটুকু। একটু পরেই টপের এক পা কামড়ে ধ'রে সেই জন্তুটা জলের নিচে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আর ওঁরা সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'য়ে তীরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটু পরে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে নেব্ করুণ গলায় ব'লে উঠল, 'হায়, হায়! আমাদের টপকে আর আমরা ফিরে পাবো না, ক্যাপ্টেন! ওই শয়তান জানোয়ারটাই তাকে মেরে ফেলল!'

হার্ডিংও তখন সেই কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু করবার কিছুই ছিল না। তাছাড়া গোটা ব্যাপারটাই এমনই আচমকা এত তাড়াতাড়ি ঘ'টে গেল যে, তখনও সবাই ভালো ক'রে বুঝে উঠতে পারেননি। যখন সংবিৎ ফিরল, তখন তীরে দাঁড়িয়ে হাত কামড়ানো ছাড়া করবার কিছুই ছিল না।

কিন্তু শিগগিরই জলের ভিতরে সাংঘাতিক একটা আলোড়ন শুরু হ'ল। জলের ভিতরকার সেই দারুণ আলোড়নে টপ ছিটকে জলের উপর উঠে এলো। জলের উপরে প্রায় দশ-বারো হাত লাফিয়ে উঠে টপ আবার জলে প'ড়ে গেল। কিন্তু এবার তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে ডাঙায় এসে উঠল।

টপের আঘাতটা কী-রকম দেখবার জন্য সবাই টপের কাছে ছুটে এলেম। কিন্তু পরীক্ষার পর দেখা গেল, তার আঘাত তেমন গুরুতর-কিছু নয়। পেছনের একটা পা সামান্য একটু জখম হয়েছে মাত্র, শরীরের অন্য-কোনো জায়গায় আঘাতের কোনো চিহ্নই নেই।

সকলে তখন জলের দিকে তাকালেন আবার। টপের সঙ্গে সেই জন্তুটার লড়াই তখন শেষ হয়েছিল বটে, কিন্তু দেখা গেল জলের তলায় তখনও আগের মতো প্রবল আলোড়ন চলেছে।

এর কোনো মানে খুঁজে পেলে না কেউ। লড়াইই যদি শেষ হ'য়ে গেল, তবে আলোড়ন এখনও থামেনি কেন?

সাইরাস হার্ডিং বললেন, 'আমার মনে হয় জন্তুটা অন্য-কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করছে।'

স্পিলেট ঘাড় নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিলেন বটে, কিন্তু জন্তুটার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী কে হ'তে পারে, তা তিনি আন্দাজ করতে পারলেন না।

হ্রদের নীল জল তখন লাল হ'য়ে উঠেছে। শেষ-বিকেলের রক্তিম আলোয় নয়, টকটকে

লাল রক্তের রঙে । প্রতিদ্বন্দ্বী দু-জনের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে। আরো মিনিট পনেরো পরে আগেকার সেই বিশালদেহী জলজন্তুটার বিরাট শরীর জলের উপর ভেসে উঠল । এবার সবাই স্পষ্টভাবে জন্তুটাকে দেখতে পেলেন ।

হার্বার্ট বলে উঠল, 'এ-যে দেখছি প্রকাণ্ড একটা সীল !'

তাঁরা আর একটুও দেরি না-ক'রে কয়েকটা শক্ত দেখে একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে এলেন, তারপর একটু জলে নেমে সেই ডাল দিয়ে সীলটাকে তীরের দিকে টেনে আনতে লাগলেন । তীরের কাছে এলে পাঁচজনে সেটাকে টেনে ডাঙায় তুললেন । টপ লেজ নাড়তে-নাড়তে তার মৃত শত্রুর দেহ শুঁকতে লাগল ।

কোন্ জায়গায় আঘাত পেয়ে সীলটা মারা গেল, তা দেখবার জন্যে পাঁচজন ঝুঁকে পড়লেন । এত-বড়ো একটা প্রাণী যার সঙ্গে লড়াইয়ে নিহত হয়, সে নিশ্চয় আরো-অনেক-বেশি শক্তিশালী । কিন্তু, কী আশ্চর্য ! এত-বড়ো একটা লড়াই হ'য়ে গেল, অথচ অন্য জন্তুটাকে এতটুকু সময়ের জন্যেও জলের উপরে দেখা গেল না !

পেনক্র্যাফ্‌ট সীলটার গলার কাছে তর্জনী নির্দেশ করল, 'এই দেখুন ক্যাপ্টেন প্রাণীটার গলায় কত-বড়ো একটা দাঁতের দাগ !'

হার্ডিং খুব ভালো ক'রে দাগটা পরীক্ষা করলেন । আস্তে-আস্তে তাঁর মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠল । একটা দুর্ভাবনায় কালো হ'য়ে উঠল তাঁর মুখ । শান্ত, স্পষ্ট স্বরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এই আঘাতেই ওর মৃত্যু হয়েছে । কিন্তু আরো-একটা কথা আছে । এ-আঘাত দাঁতের কিংবা কোনো জন্তুর খড়্গের নয় । কোনো লোহার হাতিয়ার ছাড়া এ-রকম আঘাত কিছুতেই সম্ভব হয় না ।'

পেনক্র্যাফ্‌টের চোখদুটি গোল হ'য়ে উঠল । বিস্মিত কণ্ঠে সে বললে, 'জলের তলায় লোহার হাতিয়ার ! এ আপনি কী বলছেন, ক্যাপ্টেন ! নিশ্চয় অন্য-কোনো প্রাণীর তীক্ষ্ণধার খড়্গের আঘাতে ওই দাগ হয়েছে !'

হার্ডিং সন্দেহ-গম্ভীর গলায় বললেন, 'কী জানি, পেনক্র্যাফ্‌ট, আমার তো তাই মনে হয় । যেদিন থেকে আমি জানতে পেরেছি যে আমার অজ্ঞাতে আমাকে কেউ গুহার ভিতরে শুইয়ে দিয়ে গেছে, সেদিন থেকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বেশি না-হোক, আমরা পাঁচজন ছাড়াও এই দ্বীপে অন্তত আর-একজন ব্যক্তি আছে । আর এই সাংঘাতিক আঘাতটা হয়তো সেই ব্যক্তিরই কাজ ।'

'কিন্তু সে কী ক'রে হবে, ক্যাপ্টেন ? যদি ষষ্ঠ কোনো ব্যক্তি দ্বীপে থেকেই থাকে, তার বাস কি জলের তলায় ?'

'ঠিক বলতে পারছি না । হয়তো জলের তলাতেই থাকে ।'

'এ তো ভারি অদ্ভুত কথা ! আমার কিন্তু তা মনে হয় না ।'

'ষষ্ঠ কোনো ব্যক্তি যদি না-থাকে তবে ভালোই, দুর্ভাবনার হাত-থেকে রেহাই পাওয়া যায় ।' এই ব'লে হার্ডিং একটু হাসলেন ।

এরপর আর এই সম্পর্কে কোনো আলোচনা না-ক'রে সকলে চিমনির পথ ধরলেন। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে । এই অজানা রহস্যময় দ্বীপে সন্ধের পর আস্তানার বাইরে থাকাটা ভালো হবে না, শিগগির গুহায় ফিরতে হবে । বিশেষত ক্যাপ্টেন যখন মনে করছেন দ্বীপে

কোনো অজ্ঞাত রহস্যময় ষষ্ঠ ব্যক্তি আছে !

পথ চলতে-চলতে স্পিলেটকে লক্ষ্য ক'রে হার্ডিং বললেন, 'বোধহয় আপনিও দেখে থাকবেন মিস্টার স্পিলেট, কোনো তীক্ষ্ণধার ভারি তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলে সে-আঘাতটা যে-রকম দেখায়, এই ক্ষতটাও তেমনি ।'

স্পিলেট তাঁর কথায় সায় দিলেন, 'হ্যাঁ, দেখলে তা-ই মনে হয় বটে ।'

তখন হার্ডিং ফিশফিশ ক'রে স্পিলেটকে বললেন, 'এই দ্বীপে নিশ্চয়ই কোনো-একটা গভীর রহস্য আছে । সমুদ্র-তরঙ্গের হাত থেকে কীভাবে আমি রক্ষা পেয়েছিলুম ? এইমাত্র টপকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে কে ? হয়তো একসময় সব রহস্যেরই সমাধান হবে, কিন্তু তবু এমন দুর্ভাবনায় সময় কাটাতে আমার ভালো লাগছে না !'

স্পিলেট আস্তে-আস্তে বললেন, 'আপনার কথাগুলো ঠিক, ক্যাপ্টেন হার্ডিং । যে-ক'রেই হোক, এই রহস্যটা আমাদের ভেদ করতেই হবে । কিন্তু তবু কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে, আমরা ছাড়া এখানে ষষ্ঠ কোনো ব্যক্তি নেই ।'

'না-যদি থাকে, তাহ'লেই ভালো ।' হার্ডিং বললেন. 'কিন্তু আপনি যেন আমার সন্দেহের কথা পেনক্র্যাফ্‌টদের কাছে বলবেন না । ভেবে-ভেবে আমারই মাথা গরম হ'য়ে উঠছে, আর ওদের তো নেহাৎ অল্প বয়স । শেষে ঘাবড়ে-টাবড়ে গিয়ে একটা কাণ্ড না ক'রে বসে ।'

সেই সীলটাকে দুটো ডালে ঝুলিয়ে নিয়ে নেব্‌, পেনক্র্যাফ্‌ট আর হার্বার্ট হৈ-হৈ ক'রে পথ চলছিল । স্পিলেট আর হার্ডিং-ও এবার দ্রুতপায়ে এগুতে লাগলেন । সকলে যখন চিমনিতে পৌঁছুলেন, তখন চারধারে রাত্রির অন্ধকার ঘন হ'য়ে এসেছে ।

সীলটাকে হার্ডিং-এর কথামতো আগামী দিনের জন্যে রেখে দেয়া হ'ল । আসছে কাল ওটাকে দিয়ে নানান কাজ করা চলবে ।

দুপুরবেলার মতো রাত্রিতেও পাখির ডিম আর ঝিনুকই আহার করলেন সকলে । পরদিন ভোরবেলা সবাই ঘুম থেকে উঠলে সাইরাস হার্ডিং বললেন, 'আজ থেকে আমাদের অনেক কাজ । প্রথমে নদীর ধার থেকে কিছু এঁটেল মাটি এনে আমাদের কয়েকটা মাটির পাত্র তৈরি করতে হবে । তার পরের কাজ হ'ল গতকালকার মৃত সীলটার চর্বি থেকে তেল প্রস্তুত করা । আজকের আহারের জন্যে শিকারে যাওয়া দরকার । সুতরাং সময় যাতে বাজে-খরচ না-হয় সেদিকে লক্ষ রেখো ।'

সঙ্গে-সঙ্গেই নেব্‌ আর পেনক্র্যাফ্‌ট বেরিয়ে গেল শিকারের সন্ধানে । হার্বার্ট গেল ছোটো নদীটির ধার থেকে কিছু এঁটেল মাটি জোগাড় ক'রে আনার জন্যে আর স্পিলেট আর হার্ডিং মৃত সীলটার চর্বি থেকে তেল তৈরির কাজে লেগে গেলেন ।

এমনি ধরনের প্রাথমিক দরকারি কাজে পর-পর কয়েকটা দিন যে কোথা দিয়ে উড়ে গেল, কেউই খেয়াল করলেন না । পেনক্র্যাফ্‌ট শিকারের সুবিধার জন্যে কয়েকটা গাছের ডালের বল্লম তৈরি করেছিল । সেই বল্লমের সাহায্যেই সে একদিন যখন একটা 'ক্যাপিবারা' শিকার করলে, সেদিন তার ফূর্তি দ্যাখে কে ! এছাড়া খরগোশ আর পাখি শিকার করতে টপ কম সাহায্য করেনি ! কাজেই এই ক-দিন তাঁদের খাওয়াদাওয়ার কোনো কষ্ট তো হয়ইনি, বরং বেশ তোফা রকমের ভোজই হয়েছে প্রত্যেকদিন ।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সাইরাস হার্ডিং সবাইকে ডেকে বললেন, 'এবার সারা দ্বীপটা খুঁজে দেখবার সময় এসেছে । আসলে এটা দ্বীপ, না কোনো মহাদেশের অংশ, তাও এখনও আমরা ঠিক ক'রে জানি না । সেই সম্পর্কেও আমাদের নিশ্চিত হ'তে হবে । আগামী কাল আমরা চিমনির কাছে যে-পাহাড়গুলো আছে তারই একটার চূড়ায় উঠবো । তাহ'লে আশপাশে পঞ্চাশ মাইলের মতো ভালো ক'রে দেখা যাবে । এই জায়গা সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা ক'রে নেয়া দরকার । কারণ এটা দ্বীপই হোক, আর কোনো মহাদেশের কোনো অংশই হোক, এখানে আমাদের কতদিন থাকতে হবে, তার ঠিক কী ?'

নেব্ বললে, 'এই দ্বীপে যদি অন্য-কোনো অধিবাসী থাকে, তাহ'লে তাকেও হয়তো আমরা বের করতে পারবো ।'

'হয়তো পারবো ।' হার্ডিং বললেন, 'অবিশ্যি আদৌ যদি এই দ্বীপে আমরা ছাড়া অন্য-কোনো মানুষ থাকে ।'

তারপর হার্ডিং মনে-মনে বললেন, 'কে জানে, সত্যিই এই দ্বীপে কেউ আছে কি না। বুনো জংলি হোক, আর এখানকার সজ্জন আদিম জাতিই হোক, কোনো-কেউ যদি না-থাকে, তবে দ্বীপের ষষ্ঠ ব্যক্তিটি কে ? তার দেখা কালকের অনুসন্ধানে পাওয়া যাবে কি না, কে জানে ? অভিযানের ফলাফলের উপরই নির্ভর করছে সকলের ভবিষ্যৎ ।'

কত-কী আকাশ-পাতাল কথা ভাবতে-ভাবতে ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং একসময়ে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেলেন ।

৬

অনুসন্ধানের ফলাফল

চিমনি থেকে কিছু দূরেই উঁচু একটা পাহাড়—সেটার উপরে উঠে দ্বীপের চারদিক খুব ভালো ক'রে দেখতে হবে ।

পেনক্র্যাফ্টের পরামর্শে বনের মধ্য দিয়ে যাওয়াই ঠিক হ'ল । পাহাড়ের কাছে যাওয়ার জন্যে এই পথটাই সবচেয়ে সোজা এবং সহজ । ফেরবার সময়ে অন্য পথে ফিরতে হবে ।

বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় টপ ছোটোখাটো জানোয়ারগুলোকে তাড়া করতে লাগল । কিন্তু খামকা সময় নষ্ট হবে ব'লে হার্ডিং টপকে বাধা দিলেন । আগে পাহাড়ে চ'ড়ে দ্বীপটা দেখা যাক, পরে অন্য কাজ ।

ধীরে-ধীরে বন পেরিয়ে সকলে খোলা জায়গায় এলে দেখা গেল, সামনে একটু দূরেই সেই পাহাড় । পাহাড়ের দুটো চুড়ো, দেখতে মোচার ডগার মতো । একটা চুড়োর আগাটা প্রায় আড়াই হাজার ফুট উপরে কে যেন ছেঁটে দিয়েছে । চুড়োটার একদিকে ঠিক যেন পোস্তা বাঁধা । এই পোস্তা দু-দিকে পাখির পায়ের মতো হ'য়ে চ'লে এসেছে । তার মধ্যিখানে

সমান জমি, তাতে বড়ো-বড়ো গাছ—গাছগুলি প্রায় নিচু চুড়োটার সমান উঁচু। পাহাড়ের উত্তর-পুব দিকে গাছের সংখ্যা কম, এবং পাহাড়ের গায়ে ছোটো-ছোটো ঝরনার মতো দেখা গেল। ঠিক ছিল, ওঁরা প্রথমে ছোটো চুড়োটাতেই উঠবেন। হার্ডিং দেখলেন, জমি পাহাড়-পর্বত সবকিছুর উপর দিয়েই যেন এককালে অগ্ন্যুৎপাত হ'য়ে গিয়েছে। তার চিহ্ন এখনও পরিষ্কার বর্তমান। ভূমিকম্পের দরুন চারদিকের সমস্ত জমিই খুব উঁচু-নিচু, এবড়োখেবড়ো!

হার্বার্ট পাহাড়ে ওঠবার সময়ে মাটিতে বুনো জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখতে পেলে।

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে, 'এ-সব জানোয়ার যদি ওঠবার সময় আমাদের বাধা দেয়, তখন কী হবে?'

স্পিলেট ভারতবর্ষে বাঘ শিকার করেছেন, আফ্রিকায় সিংহ মেরেছেন। তিনি বললেন, 'পথে জানোয়ারেরা এসে বাধা দিলে তার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু যখন বড়ো জন্তুর পায়ের দাগ দেখা গেছে, তখন আমাদের সাবধান হ'য়ে চলা উচিত।'

দুপুর বারোটার সময় ওঁরা সবাই একটা ঝরনার ধারে গাছের নিচে ব'সে বিশ্রাম করলেন, এবং কিছু আহার সেরে নিলেন। ততক্ষণে ওঁরা চুড়োর প্রায় অর্ধেক পথ উঠছেন। এখান থেকে অনেকদূর পর্যন্ত দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র দেখা যায়। দক্ষিণ দিকটা পর্বতের একটা উঁচু টেকের জন্যে দেখা যায় না। বাঁদিকে উত্তরে অনেকদুর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে।

বিশ্রাম ও আহারের পর বেলা একটার সময় সকলে আবার পর্বতের চুড়োয় উঠতে ঘন ঝোপের মধ্যে এসে হাজির হলেন। মাঝে-মাঝে মোরগের মতো বড়ো ফেজান্ট জাতের ট্রেগোপান পাখি দেখা যেতে লাগল। গিডিয়ন স্পিলেট আশ্চর্য কৌশলে একটুকরো পাথর ছুঁড়ে একটা ট্রেগোপান মেরে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। পেনক্র্যাফ্‌ট শিকার পেয়ে ভারি খুশি হ'ল।

ক্রমে ঝোপ পেরিয়ে, যাত্রীরা একে অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে প্রায় একশো ফুট খাড়া পথ ওঠবার পর সমান জমি পাওয়া গেল। এখানকার জমিতে অগ্ন্যুদগারের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট।

এখানে স্যাময় আর ছাগল জাতের জন্তুর পায়ের দাগ অনেক দেখা গেল। তারপর হঠাৎ দেখা গেল, প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে দুটো বড়োরকমের জন্তু দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় বড়ো-বড়ো শিং—পেছনের দিকে বাঁকানো। গায়ে ভেড়ার মতো লোম।

জানোয়ারগুলোকে দেখেই হার্বার্ট বলে উঠল, 'আরে, এগুলো যে মুশমন!'

কতকটা ভেড়ার মতো দেখতে জানোয়ারগুলো বড়ো-বড়ো কালো পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে অবাক হ'য়ে ওঁদের দেখতে লাগল। মনে হ'ল, যেন আগে তারা কখনও মানুষ দেখেনি। তারপর হঠাৎ কেন যেন ভয় পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু ক'রে দিল।

বিকেল চারটের সময় গাছের সীমানা শেষ হ'ল। আর পাঁচশো ফুট উঠতে পারলেই প্রথম চুড়োর নিচের সমতল জমিতে পৌঁছুনো যাবে। ক্যাপ্টেন হার্ডিং সেখানই রাত কাটাবেন ব'লে ঠিক করলেন। উঁচু-নিচু আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরে অনেক কষ্টের পর সকলে সমান জমিতে উপস্থিত হলেন।

হার্বার্ট, নেব্‌ ও পেনক্র্যাফ্‌ট লেগে গেল আগুন জ্বালানোর কাজে। রাত্রে ঠাণ্ডা পড়বে সাংঘাতিক, আর সেইজন্যেই আগুনের দরকার—রান্নার জন্যে ততটা নয়।

আগুন জ্বলল। শুয়োরের মাংস যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা দিয়েই আহার শেষ হ'ল।

সন্ধে সাড়ে-ছটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সব শেষ ।

আহারের পর স্পিলেট তাঁর নোটবুক নিয়ে বসলেন দিনের ঘটনা লেখবার জন্যে । নেব্ ও পেনক্র্যাফ্ট ঘুমুবার তোড়জোড় করতে লাগল । হার্ডিং হার্বার্টকে সঙ্গে নিয়ে চললেন পাহাড়ের উঁচু চুড়োটার অবস্থা দেখতে ।

সুন্দর পরিষ্কার রাত্রি । অন্ধকারও বেশি নয় । প্রায় কুড়ি মিনিট চ'লে হার্ডিং একটা জায়গায় দাঁড়ালেন । এখানে চুড়োটার ঢালু গা মিলে গিয়ে এক হ'য়েছে । চুড়োর গা ঘুরে আর এগুবার জো নেই । যাই হোক, সৌভাগ্যবশত চুড়োয় ওঠবার একটা উপায় হ'ল । ঠিক তাঁদের সামনেই দেখলেন একটা গভীর গর্ত রয়েছে । এটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। ভারি অসমান, উঁচুনিচু । আগে যে-অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল, তার দরুন লাভা গন্ধক ইত্যাদি মাটিতে প'ড়ে বেশ সিঁড়ির মতো হয়েছে । উঁচু চুড়োটার উপরে ওঠা খুব মুশকিলের ব্যাপার হবে না ।

এইসব দেখে হার্ডিং আর দেরি করলেন না । হার্বার্টের সঙ্গে অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করলেন । তখনও প্রায় হাজার ফুট উঠতে হবে । হার্ডিং ঠিক করলেন, বাধা না-পাওয়া পর্যন্ত গহ্বরের ভিতরকার চড়াই দিয়ে উঠতে থাকবেন । সৌভাগ্যবশত চড়াইয়ের পথ ক্রেটারের ভিতরেও ঘুরে-ঘুরে উপরের দিকে উঠছিল । তাতে ওঠবার পক্ষে সুবিধেই হ'ল।

আগ্নেয়গিরি এখন একেবারে নিভে গেছে । পাহাড়ের জ্বালামুখ দিয়ে এখন আর ধোঁয়া বেরোয় না, গহ্বরের ভিতর তাকালে আর আগুনও দেখা যায় না । সাড়া নেই, শব্দ নেই, গর্জন নেই, কম্পন নেই—আগ্নেয়গিরি এখন যে শুধু ঘুমন্ত তা-ই নয়, একেবারে ম'রে গেছে ।

হার্ডিং হার্বার্টকে নিয়ে ক্রেটারের ভিতর দেয়াল বেয়ে কেবলই উপরের দিকে উঠতে লাগলেন । ক্রমে ক্রেটারের মুখের কাছে আসবার পর উপরের দিকে তাকালে একটুকরো গোল আকাশ দেখা গেল । হার্ডিং আর হার্বার্ট যখন উঁচু চুড়োর ডগায় পা দিলেন, তখন রাত প্রায় সাড়ে-আটটা বেজে গেছে । অন্ধকারও বেশ গভীর হয়েছে ইতিমধ্যে । মাইল-দুয়েকের বেশি দেখা যায় না । তবে কি সমুদ্র জায়গাটিকে ঘিরে রেখেছে ? না এটা কোনো মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ? এখনও সে-কথার মীমাংসা হ'ল না । চারদিকে তাকিয়ে দেখে মনে হ'ল, সবদিকেই সমুদ্র যেন আকাশের সঙ্গে একাকার হ'য়ে গেছে । হঠাৎ মনে হ'ল আকাশে যেন একটা আলো দেখা গেল । এই আলোর ছায়া যেন জলের উপর প'ড়ে কাঁপছে । এই আলো চাঁদের—সরু ধনুকের মতো চাঁদ—একটু পরেই ডুবে যাবে ।

হার্বার্ট চারদিকে তাকিয়ে বললে, 'যেদিকে তাকাই, সেইদিকেই সমুদ্র ! খালি জল, আর জল !'

হার্ডিং হার্বার্টের হাত ধ'রে একটু চাপ দিলেন । গম্ভীর গলায় বললেন, 'হার্বার্ট, বুঝতে পেরেছি—আমাদের এটা দ্বীপ ।' এ-কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে চাঁদ ঢেউয়ের নীচে অদৃশ্য হ'য়ে গেল ।

প্রায় আধঘন্টা বাদে হার্ডিং হার্বার্টের সঙ্গে অন্য-সকলের কাছে ফিরে এলেন । অভিযানের ফলাফল বর্ণনা ক'রে বললেন, 'এবার তো সবকিছু জানা গেল । এ-জীবনে হয়তো-বা আর এই দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যাওয়া যাবে না । এই দ্বীপে বাস করাই যখন আমাদের ভাগ্যলিপি, তখন বসবাসের জন্যে সুব্যবস্থা করতে হবে ।'

গিডিয়ন স্পিলেট শুধু বললেন, 'হ্যাঁ, জীবনে হয়তো-বা এই দ্বীপ থেকে কখনোই আর অন্য-কোথাও যাওয়া যাবে না !'

পরদিন তিরিশে মার্চ। সকাল সাতটার সময় কিছু জলযোগ ক'রে সবাই আবার রওনা হলেন। সেই ম'রে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির চুড়োয় উঠে দিনের আলোয় খুব ভালো ক'রে চারদিক দেখতে হবে। হার্ডিং আগের দিন সন্ধেবেলায় যে-পথে গিয়েছিলেন সেই পথ ধ'রেই চললেন। চুড়োয়, পৌঁছেই চারদিকে তাকিয়ে সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সমুদ্র, সমুদ্র ! চারদিকেই সমুদ্র।

হার্ডিং হয়তো ভেবেছিলেন চুড়োয় উঠে দিনের আলোয় দূরে তীর দেখতে পাবেন। আগের দিন অন্ধকার ছিল ব'লে হয়তো তা দেখা যায়নি। কিন্তু চারদিকে প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কিছুই দেখা গেল না—সমুদ্র যেন সবদিকেই আকাশের প্রান্তের সঙ্গে মিশে গেছে। তীর কিংবা কোনো জাহাজের পাল—কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। অসীম জলরাশির ঠিক মাঝখানে তাঁদের এই দ্বীপ—প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে যেন ভীষণ-কোনো সামুদ্রিক জন্তু, যেন একটা তিমি ঘুমুচ্ছে।

আসলে দ্বীপটা দেখতে সত্যিই অনেকটাই তিমির মতো। গিডিয়ন স্পিলেট তক্ষুনি দ্বীপটার একটা নক্‌শা এঁকে ফেললেন। দ্বীপটার পরিধির একশো মাইলের বেশি হবে ব'লেই মনে হ'ল।

দ্বীপের পুবদিকের অংশটা, যেখানে তাঁরা বেলুন থেকে পড়েছিলেন, দেখতে একটা উপসাগরের মতো। তার একপাশ তীক্ষ্ণ অন্তরীপের মতো হ'য়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। উত্তর-পুব দিকে আরো দুটি অন্তরীপ, আর সেখানেই উপসাগরটির শেষ। উত্তর-পুব তীর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম তীরটা গোল। এই তীরের প্রায় মধ্যিখানে সেই ম'রে-যাওয়া আগুনের পাহাড়। দ্বীপের সবচাইতে সরু জায়গাটা অর্থাৎ চিমনি আর পশ্চিম তীরের নদী পর্যন্ত জায়গাটা দশ মাইল চওড়া। দ্বীপের লম্বালম্বি দূরত্ব ত্রিশ মাইলের কম তো নয়ই, বরং বেশিই হ'তে পারে। দ্বীপের মধ্যকার জায়গাটা—পাহাড় থেকে শুরু ক'রে দক্ষিণ দিক জুড়ে সমুদ্র পর্যন্ত—বিশাল অরণ্য। উত্তর ভাগটা শুকনো, বালুময়। হার্ডিংরা দেখে অবাক হলেন যে, আগ্নেয়গিরি আর পুব তীরের মাঝখানে একটা হ্রদ রয়েছে। তার কিনারায় অগুনতি সবুজ গাছপালা। হ্রদটি দেখে মনে হ'ল এটি যেন সমুদ্র থেকে খানিকটা উঁচুতে অবস্থিত।

পেনক্র্যাফ্‌ট জিজ্ঞাসা করল, 'হ্রদের জল কি খাওয়ার উপযোগী হবে ?'

হার্ডিং বললেন, 'নিশ্চয়ই ! দেখছো না, হ্রদের জল পাহাড়ের ঝরনা থেকে নেমে আসছে ?'

হার্বার্ট বললে, 'ওই দেখুন, একটা ছোটো নদী যেন হ্রদে এসে পড়েছে।'

হার্ডিং বললেন, 'এই নদীর জল দিয়েই যখন হ্রদের সৃষ্টি, তখন খুব-সম্ভব অন্যদিকে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়বার একটা পথও আছে। ফেরার পথে এইটে দেখে যেতে হবে।'

এই বাঁকাচোরা ঝরনা আর নদীর জল দিয়েই দ্বীপটা উর্বর। হয়তো-বা গভীর বনের মধ্যে অন্য-কোনো ঝিল বা হ্রদ আছে। বনটি তো আর কম বড়ো নয় ! দ্বীপের দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে হবে। উত্তর দিকে তাকিয়ে সেখানে নদী কিংবা ঝরনার অস্তিত্ব আছে ব'লে বোঝা

গেল না। তবে মধ্যে-মধ্যে জলাভূমি আছে বটে।

প্রায় একঘণ্টা পাহাড়ের চুড়োয় থেকে সবাই চারদিক তন্নতন্ন ক'রে দেখলেন। এখন একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তরের উপর এই আগন্তুকদের ভবিষ্যৎ ভালোমন্দ নির্ভর করে :

'এই দ্বীপে কি মানুষের বাস আছে ?'

প্রশ্নটি করলেন গিডিয়ন স্পিলেট। চারদিক দেখেশুনে যা মনে হ'ল, তাতে এই প্রশ্নের জবাব হয় : না—এখানে কোনো জনমানবের বসতি নেই। ঘর-বাড়ি, গ্রাম, ধোঁয়া কিছুই দেখা গেল না। অবশ্য ওঁরা যেখান থেকে দেখেছেন, সেখান থেকে দ্বীপের শেষ সীমা ত্রিশ মাইলের উপর। এত-দূরে লোকের বসতি থাকলে ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও দেখতে পাবে না।

পরে আরো খোঁজখবর নেয়া যাবে। এখন না-হয় মেনে নেয়া গেল, দ্বীপটি জনমানবশূন্য। তাহ'লেও কাছাকাছি অন্য-কোনো দ্বীপের লোক এখানে আসতে পারে তো? এ-প্রশ্নেরও উত্তর দেয়া সহজসাধ্য নয়। চারদিকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে তো কোনো দ্বীপ দেখতেই পাওয়া গেল না। যা-ই হোক, পঞ্চাশ মাইলের পরেও দ্বীপ থাকতে পারে। সেখানকার লোকের পক্ষে নৌকো কিংবা ক্যানুতে ক'রে এই দ্বীপে আসা মুশকিল হবে না। এমন অবস্থায় ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় সবসময় তৈরি হ'য়ে থাকতে হবে।

আপাতত অনুসন্ধান শেষ হ'ল। ফেরার আগে হার্ডিং ধীর গভীর গলায় বললেন, 'হয়তো এই দ্বীপে আমাদের অনেকদিন থাকতে হবে। অবশ্য হঠাৎ কোনো জাহাজ এসে হাজির হওয়াও বিচিত্র নয়। হঠাৎ বলছি এইজন্যে যে এটা অতি নগণ্য দ্বীপ—জাহাজ চলাচলের পথ মোটেই নয়।'

স্পিলেট বললেন, 'ক্যাপ্টেন, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। যা-ই হোক, আমরা সকলেই উদ্যোগী মানুষ। তাছাড়া আপনার উপরে আমাদের ভরসা খুব আছে। আমরা এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন ক'রে বাস করবো।'

স্পিলেটের কথায় সকলেই খুব উৎসাহের সঙ্গে সায় দিল।

ফেরবার সময় হার্ডিং বললেন, 'চলো এক কাজ করি। দ্বীপের পাহাড়-পর্বত, নদী নালা, উপসাগর, অন্তরীপ—সবগুলোরই এক-একটা নাম দেওয়া যাক।'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে, 'আমাদের প্রথম আড্ডাটির নাম দিয়েছি "চিমনি"—কারু কোনো আপত্তি না-থাকলে সেটার নাম চিমনিই থাক।'

হার্বার্ট বললে, 'ক্যাপ্টেন হার্ডিং, মিস্টার স্পিলেট, পেনক্র্যাফট, নেব্—সকলের নামেই এক-একটার নাম দেয়া যাক।'

'আমার নামে নাম হবে!' এই ব'লে নেব্ চকচকে শাদা দাঁতগুলো বের ক'রে হাসতে লাগল।

যা-ই হোক, সবাই উত্তর আমেরিকার লোক, তাই শেষটায় হার্ডিং-এর প্রস্তাবমতো আমেরিকার প্রসিদ্ধ নামসমূহ দিয়েই দ্বীপের ভিন্ন-ভিন্ন জায়গার নামকরণ করা হ'ল। বড়োদুটি উপসাগরের একটার নাম হল 'ইউনিয়ন বে', অন্যটার নাম হ'ল 'ওয়াশিংটন বে'। পাহাড়টার নাম রাখা হ'ল 'মাউণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিন'। দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপদ্বীপটার নাম হ'ল 'সার্পেণ্টাইন পেনিনসুলা', কারণ উপদ্বীপটা দেখতে অনেকটা সাপের ল্যাজের মতো। অন্য

প্রান্তের উপসাগরটার নাম 'শার্ক গাল্‌ফ'—দেখত যেন হাঙরের মুখ হাঁ ক'রে আছে। এই শার্ক গাল্‌ফের দুটি অন্তরীপ হ'ল 'নর্থ ম্যাণ্ডিবল' আর 'সাউথ ম্যাণ্ডিবল' অন্তরীপ। বড়ো হ্রদটার নাম 'লেক গ্র্যান্ট'। চিমনির উপরে গ্র্যানাইট পাথরের খাড়া পাহাড়গুলোর চুড়োয় যে-সমতল জমিটুকু ছিল, তার নাম হ'ল 'প্রসপেক্ট হাইট'। এখান থেকে সমস্ত উপসাগর বেশ ভালোরকম দেখা যায়। তারপর যে-নদীর জল তাঁরা পান করবার জন্যে ব্যবহার করেন, যার কাছে তাঁরা বেলুন থেকে পড়েছিলেন, তার নাম হ'ল 'মার্সি নদী'। দ্বীপের যে-সংকীর্ণ অংশটায় তাঁরা বেলুন থেকে পড়েছিলেন, তার নাম হ'ল 'সেফ্‌টি আইল্যাণ্ড'। সবশেষে গোটা দ্বীপটার নাম দেয়া হ'ল 'লিঙ্কন আইল্যাণ্ড'।

এ হ'ল আঠারোশো পঁয়ষট্টি খ্রিষ্টাব্দের তিরিশে মার্চের কথা। তাঁরা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি যে এর ঠিক ষোলো দিন পরে ওয়াশিংটনে এমন-একটা বীভৎস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হবে, যার ফলে সারা দুনিয়া শিউরে উঠবে। অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন যে কোনো নিষ্ঠুর আততায়ীর হাতে নিহত হ'তে পারেন, এ-কথা অবিশ্যি কেই বা ভাবতে পারত।

৭

উপক্রমণিকা

পরদিন সকলের ঘুম ভাঙতেই সাইরাস হার্ডিং বললেন, 'আজ আমরা নতুন পথে চিমনিতে ফিরবো। তাহ'লে এই ফাঁকে গোটা দ্বীপ সম্পর্কে একটু মোটামুটি আন্দাজ ক'রে নেয়া যাবে। এখানে আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে কী-কী জিনিশ পাচ্ছি, আগে সেগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা ক'রে নিতে হবে—তারপর খুব ভেবে আমাদের কাজ করতে হবে। কে জানে কতদিন এই দ্বীপে থাকতে হবে, কিন্তু তার ব্যবস্থা তো করা দরকার।'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে, 'কিন্তু ক্যাপ্টেন হার্ডিং, আমার একনম্বর প্রার্থনা হ'ল, আপনি দয়া ক'রে আমাকে কোনোদিন হাতিয়ার তৈরি ক'রে দিন—বন্দুক বা রিভলভার। এভাবে গাছের ডাল দিয়ে শিকার করা একটা বড়ো বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। পারবেন আপনি বন্দুকের ব্যবস্থা করতে?'

'হয়তো পারতেও পারি।' হার্ডিং উত্তর করলেন, 'কিন্তু এখন আগে আমাদের কয়েকটা তীর ধনুক তৈরি ক'রে নিতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার শিকারীদের মতো তীর-ধনুক ব্যবহারে দু-দিনেই তোমরা ওস্তাদ হ'য়ে উঠতে পারবে, যদি একটু একাগ্রতা থাকে।'

'তীর-ধনুক!' মুখটা কালো ক'রে বললে পেনক্র্যাফ্‌ট, 'ও-তো ছেলেখেলা!'

'এত গর্ব কোরো না, পেনক্র্যাফ্‌ট,' বললেন স্পিলেট, 'রক্তপাতের জন্যে তীর-ধনুকই আরো কয়েক শতাব্দীর জন্যে যথেষ্ট। গোলা-বারুদ আর কবেকার? এই-তো সেদিন সবে গোলা-বারুদ ব্যবহার করা হ'ল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত খুন-জখম লড়াই সেই আদিম যুগ থেকেই চ'লে আসছে।'

'সে-কথা ঠিক, মিস্টার স্পিলেট।' পেনক্র্যাফ্‌ট উত্তর করলে, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সবসময়েই একটুও না ভেবে, হ-য-ব-র-ল যা মাথায় আসে দুমদাম ব'লে ফেলি।'

হার্ডিং বললেন, 'কিন্তু এখন আর একটুও দেরি করা চলবে না। সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। তারপরই আমরা বেরিয়ে পড়বো।'

একটু পরে সবাই খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এবার হ্রদের পশ্চিম দিয়ে চিমনির দিকে চললেন সবাই। সারাদিন দ্বীপের নতুন-নতুন বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে-করতে হাসি-গল্পগুজব করতে-করতে সবাই চললেন। দুপুরবেলার দিকে নেব্‌ আবার টপের সাহায্যে দুটো খরগোশ ধ'রে নিয়ে এলো। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী হ'ল পেনক্র্যাফ্‌ট। সে-তো খরগোশ দুটো দেখে মহা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'যাক, আজ রাত্রিরে খরগোশের রোস্ট দিয়ে ভোজটা জমবে ভালো।'

সারাদিন ওঁরা লেক গ্র্যান্টের আশপাশে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর মার্সি নদীর বাঁ-ধার দিয়ে সবাই যখন চিমনিতে এসে পৌঁছুলেন, তখন সন্ধে হ'য়ে গেছে।

আলো জ্বালিয়ে নেওয়া হ'ল ভালো করে। রান্নাবান্নার কাজে খুব ওস্তাদি দেখালে নেব্‌ আর পেনক্র্যাফ্‌ট। রাত বেশি বাড়বার আগেই খাওয়া-দাওয়া করে নিলেন সবাই। সারাদিন হাঁটাহাঁটির পর খরগোশের রোস্ট খেতে যে খুব ভালো লাগল, সেটা না-বললেও চলে।

খাওয়া-দাওয়ার পর অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে সবাই গোল হ'য়ে বসল। তখন সাইরাস হার্ডিং পকেট থেকে নানা ধরনের খনিজ দ্রব্যের নমুনা বার করলেন, সারাদিন তিনি এ-সবই সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর একটু কেশে সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'এই হ'ল লোহা, এটা পাইরাইট, এটা চুন, এই হ'ল কয়লা আর এটা এখানকার কাদামাটি। প্রকৃতি আমাদের এইসব জিনিশ দিয়েছে। ঠিকভাবে এদের কাজে লাগানো হ'ল আমাদের কর্তব্য। কাল থেকে আমাদের কাজ শুরু হবে।'

স্পিলেট শুধু বললেন, 'হ্যাঁ। শুভস্য শীঘ্রম্‌।'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন, আমরা শুরু করবো কোত্থেকে?' পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই পেনক্র্যাফ্‌ট হার্ডিংকে প্রশ্ন করলে।

'একেবারে শুরু থেকে'—বললেন সাইরাস হার্ডিং।

আর, সত্যিই একেবারে শুরু থেকে করতেই বাধ্য ছিলেন এঁরা। যন্ত্রপাতি বানাবার মতো যন্ত্রপাতি পর্যন্ত এঁদের ছিল না। বাঁচবার পক্ষে যে জিনিশগুলো না-হ'লেই নয়, সেইসব জিনিশ পর্যন্ত ছিল না এঁদের। প্রত্যেকটি জিনিশ তাঁদের নিজের হাতে তৈরি ক'রে নিতে হবে। তাঁদের লোহা আর ইস্পাত অপরিশুদ্ধ খনিজ পদার্থের আওতায় পড়ে, তাঁদের মাটির জিনিশপত্র, পোশাক-আশাক এখনো তৈরি হয়নি। আবিশ্যি এ-কথা বলতেই হবে যে, তাঁরা সবাই 'মানুষ' শব্দটির পূর্ণ বিকাশ। এঞ্জিনিয়ার হার্ডিং-এর সঙ্গীরা সকলে বুদ্ধিমান। হার্ডিং তাঁদের ক্ষমতায় আস্থা রাখেন। যে-পাঁচজন আকস্মিকভাবে এক হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আপন-আপন ক্ষেত্রে সেরা, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা রাখেন, সেই লড়াইয়ে জেতবার শক্তিও তাঁদের আছে।

সাইরাস হার্ডিং বললেন, 'একেবারে শুরু থেকে। এই যে শুরুর কথা বলছি, তা হ'ল

এমন-একটি যন্ত্র তৈরি করবার কথা, যে-যন্ত্রের সাহায্যে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহকে কাজে লাগানো যায়। এ-কাজে উত্তাপের কতটুকু ক্ষমতা, তা সকলেরই জানা আছে। এখন কাঠই হোক আর কয়লাই হোক, তা ব্যবহার করবার জন্যে সব-আগে দরকার একটা চুল্লি।'

'কেন ? চুল্লি দিয়ে কী হবে ?' প্রশ্ন করলে পেনক্র্যাফ্‌ট।

'ইট বানাবার জন্যে—' হার্ডিং উত্তর করলেন, 'এবং তা বানাতে হবে ইট দিয়েই।'

'কিন্তু সে-ইট কী ক'রে বানাবো ?'

'কাদামাটি দিয়ে। এখুনি শুরু করতে হবে আমাদের। হ্যাঙামা কমাবার জন্যে আমাদের চুল্লিটা তৈরি করতে হবে উৎপাদনের স্থানেই! নেব্ খাবার-দাবার নিয়ে যাবে—রাঁধবার জন্যে আগুনের অভাব সেখানে হবে না। হ্রদের পশ্চিম তীরে যেতে হবে আমাদের। সেখানে কাদামাটির কোনো অভাব হবে না। কাল ওখান দিয়ে আসবার সময় আমি জায়গাটা ভালো করে দেখে এসেছি।'

...

মার্সি নদীর তীর দিয়ে সবাই চলতে লাগলেন। প্রসপেক্ট হাইট পেরিয়ে মাইল পাঁচেক চলবার পর তাঁরা অরণ্যের কাছে ঘাসে-ছাওয়া একটি জমিতে এসে পৌঁছুলেন। লেক গ্র্যান্ট সেখান থেকে প্রায় দুশো ফুট দূরে। পথে হার্বার্ট তালগাছের মতো একটা গাছ আবিষ্কার করলে, যার ডাল দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানরা তীর-ধনুক তৈরি করে। পাশেই এমন-এক জাতের গাছ দেখা গেল, যার ছাল দিয়ে অনায়াসে ধনুকে তূণ পরানো চলে। পেনক্র্যাফ্‌ট অনায়াসেই তার ধনুক পেয়ে গেল। এখন শুধু তীরের ওয়াস্তা।

আগের দিন যে-জায়গাটা হার্ডিং দেখে গিয়েছিলেন, সবাই সেখানে এসে পৌঁছুলেন। যে-মাটি দিয়ে ইট তৈরি হয় ঠিক সেই জাতের মাটি ব'লে তাঁদের অনেক ঝামেলা ক'মে গেল। বালি মিশিয়ে সেই কাদামাটি দিয়ে সুন্দর ছাঁচের ইঁট তৈরি করে কাঠের আগুনে পুড়িয়ে নিলেই তাঁদের সব পরিশ্রম সার্থক হ'য়ে উঠবে। ছাঁচ না-থাকায় অবিশ্যি হাত দিয়েই ইট তৈরি করতে হবে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না—সুন্দর না-হয়-না-ই হ'ল, প্রয়োজনটুকু তো মিটবে। ওস্তাদ মজুর অবিশ্যি যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই সকাল-সন্ধে খেটে দিনে দশ হাজার ইঁট তৈরি করতে পারে, কিছু অপটু হাতেও এঁরা পাঁচ জনে দু-দিনের মধ্যে হাজার তিনেক ইঁট তৈরি ক'রে ফেললেন। তিন-চার দিন চুল্লি বানাবার মতো ইঁট তৈরি হ'ল। চুল্লি তৈরি করবার আগে দু-দিন ধ'রে সবাই মিলে জ্বালানি কাঠ জোগাড় করলেন।

এই ফাঁকে পেনক্র্যাফ্‌ট গাছের ডাল দিয়ে বহু তীর তৈরি ক'রে নিলে। প্রত্যেকের জন্যে একটা ক'রে ধনুকও তৈরি করা হ'ল। তারই সাহায্যে শিকার জোগাড় করতে তাঁদের খুব বেশি অসুবিধে হ'ল না। সাইরাস হার্ডিং সবাইকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন, কারণ অরণ্যে হিংস্র জানোয়ার থাকতে পারে। তাঁর আন্দাজে ভুল হয়নি। গিডিয়ন স্পিলেট আর হার্বার্ট একদিন এমন-একটা জানোয়ার দেখেছিলেন বনে, যাকে তাঁদের জাগুয়ার ব'লে মনে হয়েছিল। সৌভাগ্য বলতে হবে, জানোয়ারটা তাঁদের আক্রমণ করেনি। যদি করতো তাহ'লে বিপদ হ'তে পারতো। স্পিলেট তো তখনি প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেললেন যে, কোনোমতে যদি একটা বন্দুক পাওয়া যায় তাহ'লে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা একটুও দ্বিধা করবেন না। দ্বীপ থেকে যে-ক'রেই হোক এই সাংঘাতিক জানোয়ারদের বিনাশ

করতেই হবে ।

এই ক-দিনে তাঁরা কিন্তু চিমনির প্রতি বিশেষ নজর দেননি । সাইরাস হার্ডিং ঠিক করেছিলেন যে শিগগিরই নতুন-একটা বাসস্থান ঠিক ক'রে নেবেন । কেননা চিমনিটি বাসের পক্ষে বেশ বিপজ্জনক । চিমনির জায়গায় ফাঁক ছিল—দেখে মনে হয়, সমুদ্রের জল যখন বেড়ে ওঠে তখন চিমনির মধ্যেও জল ঢোকে ।

স্পিলেট সাংবাদিক । কাজেই লিঙ্কন দ্বীপে আসবার পর থেকে প্রত্যেকটা দিনের হিশেব রাখছিলেন তাঁর রোজনামচায় । পাঁচুই এপ্রিল স্পিলেট জানালেন যে, এই দ্বীপে আসবার পর বারো দিন কেটে গেছে । ছয়ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই সবাই চুল্লির কাছে এসে হাজির হলেন । শুকনো ইঁটের পাঁজার মধ্যে পুঞ্জীভূত করা হ'ল কাঠকুটো, ডালপালা । সারা দিন ধ'রে চুল্লিটাকে কার্যকরী করার চেষ্টা চলল । সন্ধের সময় ইঁটের পাঁজায় আগুন দেয়া হ'ল । সে-রাত্রে আর কেউ ঘুমুলেন না । সতর্কভাবে আগুন জ্বালিয়ে রাখলেন ।

তিনদিন ধ'রে পোড়ানো হ'ল ইঁট । এবারে ঠাণ্ডা হবার সময় দিতে হবে । অসংস্কৃত চুনা-পাথরকেও সাধারণ পাথরের সঙ্গে আর বালির সঙ্গে মিশিয়ে চমৎকারভাবে কাজে লাগানো হ'ল । নয়ই এপ্রিল সাইরাস হার্ডিং কাজ শুরু করবার উপযোগী কয়েক হাজার ইঁট আর পরিশুদ্ধ চুনাপাথর পেলেন ।

আরো-কয়েক দিন বাদে দেখা গেল, দ্বীপের আগন্তুকেরা একরাশ মাটির বাসন-কোশন তৈরি করেছেন, ব্যবহারের জন্যে । মাটির সঙ্গে সামান্য চুনাপাথর আর অন্য-এক ধরনের খনিজ পদার্থ মিশিয়ে তৈরি-করা বাসন টেকসই হ'ল খুব । দেখতে অবিশ্যি খুবই বিশ্রী হ'ল, কিন্তু কাজ চলল খুব ভালোই । পেনক্র্যাফ্‌ট তো ওই চুন-মাটি ইত্যাদি দিয়ে একটা পাইপ তৈরি ক'রে ফেললে । কিন্তু তামাক না-পাওয়ায় সেই পাইপ বেচারির কোনো কাজেই লাগল না । পনেরোই এপ্রিল পর্যন্ত কুমোরের কাজই চলল । পরদিন হ'ল ঈস্টার সানডে, সেদিন তারা জিরিয়ে নিলে । সেদিন বিকেলের দিকে সাইরাস হার্ডিং একটা স্মরণীয় জিনিশ আবিষ্কার করলেন । নাগলতা বা ওঅর্ম উড্ বলে এক ধরনের গাছ আবিষ্কার করলেন তিনি দ্বীপে, যা ভালো ক'রে শুকিয়ে নিয়ে পটাসিয়াম নাইট্রেটের সাহায্যে চলনসই-গোছ দেশলাই তৈরি করা যায় । আর দ্বীপে পটাসিয়াম নাইট্রেটের অভাব ছিল না । কাজেই এই মূল্যবান আবিষ্কার তাঁদের জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'য়ে উঠল ।

ইতিমধ্যে হার্ডিং লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের অবস্থানও বের করে নিয়েছিলেন । মোটামুটি-ভাবে জানা গেল যে, দ্বীপটি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি অক্ষরেখা এবং একশো বাহান্ন ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত । তার মানে দ্বীপটি তাহিতি থেকে বারোশো মাইল, নিউজিল্যাণ্ড থেকে আঠারোশো মাইল এবং আমেরিকার উপকূল থেকে প্রায় সাড়ে-চার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত । প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলে এমনি কোনো দ্বীপের কথা কখনো শুনেছিলেন কি না, সে-কথা ভাবতে চেষ্টা করলেন সাইরাস হার্ডিং । কিন্তু লিঙ্কন দ্বীপের মতো কোনো দ্বীপের কথা তাঁর স্মরণে এলো না ।

রবিবার দিন পেনক্র্যাফ্‌ট তার তীর-ধনুক দিয়ে কোনোকিছুই শিকার করতে পারেনি । সন্ধের পর সবাই চিমনিতে ফিরলে সে আপশোশ ক'রে বললে : 'এভাবে আর ক-দিন চলবে ক্যাপ্টেন বলুন তো ? বন্দুক ছাড়া সাংঘাতিক অসুবিধে হচ্ছে যে !'

'সে-কথা ঠিক ।' স্পিলেট বললেন, 'কিন্তু সে-তো তোমার উপরেই নির্ভর করছে । লোহা জোগাড় করো ব্যারেলের জন্যে, ট্রিগারের জন্যে ইস্পাত, সল্ট পিটার, কয়লা আর গন্ধক বারুদ তৈরির জন্যে, পারদ নাইট্রিক অ্যাসিড আর সিসে গুলির জন্যে—দেখবে, ক্যাপ্টেন আমাদের চমৎকার বন্দুক তৈরি ক'রে দিয়েছেন ।'

সাইরাস হার্ডিং বললেন : 'সবগুলো জিনিশই আমরা দ্বীপে পাবো—কিন্তু বন্দুক হ'ল এমন-একটা জিনিশ, যা বানাতে বিশেষ কয়েক ধরনের ভালো যন্ত্র চাই । কিন্তু সে যা-ই হোক, পরে দেখা যাবে-খন ।'

'বেলুন থেকে সব জিনিশপত্র ফেলে দিয়ে কী ভুলই না করেছি !' বললে পেনক্র্যাফ্ট।

'যদি সব জিনিশপত্র আমরা ফেলে না-দিতুম, তাহলে নির্ঘাৎ জলে ডুবে মরতুম, পেনক্র্যাফ্ট ।' বললে হার্বার্ট ।

স্পিলেট সে-কথায় সায় দিলেন : 'হার্বার্ট ঠিক কথাই বলেছে ।'

'পরদিন ভোরে বেলুনটা না-দেখতে পেয়ে ফরেস্টার আর তার সঙ্গীদের মুখের যে দশা হয়েছিল, তা কল্পনা ক'রেও আমার হাসি পাচ্ছে,' বললে পেনক্র্যাফ্ট ।

'ওদের মুখের কী দশা হয়েছিল,' স্পিলেট বললেন, 'তা জানবার জন্যে আমার বিন্দুমাত্র মাথা-ব্যথা নেই ।'

একটু গর্বের স্বরে পেনক্র্যাফ্ট বললে : 'গোটা বুদ্ধিটা কিন্তু আমার মগজেই এসেছিল প্রথম ।'

'চমৎকার বুদ্ধিটা'—হাসতে-হাসতে বললেন স্পিলেট, 'কারণ তার দরুনই তো আজ আমাদের এই দুরবস্থা !'

'রিচমণ্ডের বদমায়েশগুলোর হাতে বন্দী হ'য়ে থাকার চাইতে এই দ্বীপে সারা জীবন কাটানোও আমি ভালো ব'লে মনে করি !' পেনক্র্যাফ্ট চেঁচিয়ে বললে ।

৮

নতুন আস্তানার সন্ধানে

আজ সতেরোই এপ্রিল ।

আগের দিন প্রাতরাশের পর তাঁরা চিমনি থেকে সাত মাইল দূরে ম্যাণ্ডিবল অন্তরীপ পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছিলেন । এর ফলে কাঁচা লোহার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল । সেই লোহাকে পরিশুদ্ধ ক'রে না-নিলে কোনো কাজেই লাগানো অসম্ভব । সুতরাং সাইরাস হার্ডিং ভোরবেলা পেনক্র্যাফ্টকে ডেকে বললেন: 'পেনক্র্যাফ্ট, এবার কিন্তু তোমাকেই সবচেয়ে বেশি কেরামতি দেখাতে হবে । আমার এখন কয়েকটা সীল চাই । পাথুরে লোহা থেকে লোহার ভাগকে আলাদা ক'রে নিতে হবে ।'

'পাথুরে লোহা থেকে লোহার ভাগকে আলাদা করতে সীল চাই কেন ?' বিস্মিত, হ'য়ে শুধোলে পেনক্র্যাফ্ট ।

'সীলের চামড়া দিয়ে হাপর বানাতে হবে ।' সাইরাস হার্ডিং জানালেন : 'হাপর ছাড়া লোহা আগুনে তাতানো যাবে না ।'

গোটা দিনটা কাটল সীল শিকারে । পেনক্র্যাফ্‌টের নেতৃত্বে সবাই মিলে বেশ কয়েকটা সীল মারলেন । সীলের চর্বি থেকে তেল পাওয়া যাবে—চামড়া দিয়ে হাপরও বানানো চলবে। সুতরাং সীল-শিকার তাঁদের কাছে সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল । আর গুরুত্ব দিয়েছিল ব'লে প্রচুর পরিশ্রম ক'রে পেনক্র্যাফ্‌ট সীল শিকার করলে ।

বিশে এপ্রিলের মধ্যেই একটা বেশ-বড়ো হাপর তৈরি হ'য়ে গেল । মাউন্ট ফ্রাঙ্কলিনের নিচে, চিমনি থেকে ছ-মাইল দূরে, বিপুল পরিমাণ কয়লা আর পাথুরে লোহা পাওয়া গেল। হার্ডিং ঠিক করলেন, ওইখানেই তাঁদের 'লোহার কারখানা' বসবে । প্রত্যেকদিন এখান থেকে চিমনিতে ফেরা সম্ভব নয় ব'লে গাছের ডাল দিয়ে ছোট্ট একটা কুটির তৈরি করা হ'ল ওখানে। তাতে একটা সুবিধে হ'ল এই যে, দিন-রাত্রি কাজ করা চলবে ।

পাথুরে লোহা থেকে লোহার ভাগ আলাদা করা রীতিমতো কঠিন ব্যাপার । পঁচিশে এপ্রিলের আগে তো কোনোরকমেই পরিশুদ্ধ লোহা পাওয়া গেল না । শেষ পর্যন্ত যখন পঁচিশে এপ্রিল বিকেলের দিকে কয়েক তাল বিশুদ্ধ লোহা পাওয়া গেল, সবাই আনন্দে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন । তারপর অনেকবার চেষ্টা ক'রে অনেক পরিশ্রম করে কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র তৈরি করলেন ওঁরা । কুঠার প্রভৃতি যে-সব সাধারণ জিনিশ ওঁরা বানালেন, তা-ই ওঁদের অমূল্য রত্নের সমান হ'য়ে উঠল । মোটামুটিভাবে কাজ-চালানো-গোছ কয়েকটা জিনিশ বানানো গেলেও, ইস্পাত কিন্তু প্রথমটা তৈরি করা সম্ভব হয়নি । ইস্পাত তৈরি করতে হয় লোহার সঙ্গে কয়লা মিশিয়ে ; ওই মিশ্রণে যদি কোনো-একটার পরিমাণ বেশি হ'য়ে পড়ে, তবে কিন্তু ইস্পাত তৈরি করা যাবে না । সুতরাং ইস্পাত তৈরি করাটা সাংঘাতিক কষ্টসাধ্য ব্যাপার । কিন্তু মে মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে তাঁরা যখন ইস্পাতের তৈরি বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিশ তৈরি করতে পারলেন, তখন পেনক্র্যাফ্‌টের আনন্দ দ্যাখে কে !

জিনিশপত্রগুলো দেখতে অবিশ্যি খুবই বিশ্রী হ'ল, কিন্তু তবু এই কর্মকারের দল একটুও নিরুৎসাহ অনুভব করলেন না । কাজ চললেই তো হ'ল –সুন্দর অসুন্দর ধুয়ে জল খেলেই তো চলবে না !

ছয়ই মে দ্বীপে বিষম ঠাণ্ডা পড়ল : সাইরাস হার্ডিং বুঝতে পারলেন, শীত আসছে। ঠাণ্ডাতে হয়তো না-ঘাবড়ালেও চলে, কিন্তু আকাশে বর্ষার পূর্বাভাস দেখে হার্ডিং খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন । মধ্য-সাগরের এই নির্জন দ্বীপে বর্ষার যে কী ভয়ংকর রূপ হবে, তা কল্পনা ক'রে হার্ডিং ঠিক ক'রে ফেললেন, শিগগিরই নতুন-একটি আস্তানা চাই এবার । বর্ষাকালে যে-চিমনিতে সাগরের জল ঢুকবে না তা-ই বা কে বলতে পারে ! আগে যে সাগরের জল ঢুকেছিল, তার প্রমাণ প্রথম দিনেই পাওয়া গিয়েছিল, পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে । প্রথম দিনে চিমনিতেই সামুদ্রিক ঝিনুক আবিষ্কার করেছিল পেনক্র্যাফ্‌ট । সুতরাং শিগগিরই যে নতুন একটা আস্তানা চাই এ-বিষয়ে কারু একটুও মতদ্বৈধ রইল না । এ ছাড়া সাইরাস হার্ডিং আরো বললেন যে, বাসস্থান সম্পর্কে তাঁদের খুব সাবধান হওয়া উচিত । কেননা, যদিও এই দ্বীপে এখনও পর্যন্ত জংলি অধিবাসীদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়নি, হিংস্র

জানোয়ার তো আছে । এই ক-দিনে দু-একবার তাদের সাক্ষাৎও পাওয়া গেছে । প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলে যে মালয় বোম্বেটেরা ঘাঁটি ক'রে থাকে, সে-কথাও হার্ডিং আবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ।

নতুন আস্তানার অবস্থান যাতে মার্সি নদী আর লেক গ্র্যান্টের কাছাকাছি হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে । । কেননা, দ্বীপের মধ্যে এই এলাকাই সব-চাইতে ভালো । গ্র্যানাইট পাথরের পাহাড়ের মধ্যে যদি কোনোরকমে একটা আস্তানা করা যায়, তাহ'লেই সবচেয়ে ভালো । কেননা, গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল ঝড়-ঝঞ্ঝার হাত থেকে যেমনি রক্ষা করবে, তেমনি রক্ষা করবে হিংস্র জানোয়ার কিংবা বোম্বেটেদের হাত থেকে ।

সেদিনই সবাই নতুন আস্তানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন । লেক গ্র্যান্টের জলের উৎস হ'ল পাহাড়ের বেশ-খানিকটা উপরের একটি ঝরনার জল । কিন্তু হ্রদের অতিরিক্ত জল যে কোনদিক দিয়ে বেরিয়ে সাগরে পড়ে, সেটা কোনোমতেই জানা যায়নি । লেক গ্র্যান্টের তীর দিয়েই সবাই দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন । কিন্তু আস্তানার জন্যে যে-রকম জায়গা আর সুবিধে তাঁরা চাইছিলেন, সে-রকম কোনো জায়গা কিন্তু আবিষ্কার করা গেল না ।

সাইরাস হার্ডিং কিন্তু ভেবেছিলেন যে হ্রদের সঙ্গে সমুদ্রের সংযোগ আছে । কিন্তু এই সংযোগস্থল আবিষ্কার করা গেল না । অনেক ঘোরাঘুরি ক'রেও যখন সেই সংযোগস্থল পাওয়া গেল না, অথচ সন্ধে হ'য়ে এল, তখন হার্ডিং ঠিক করলেন পরদিন তিনি আবার এসে ভালো ক'রে খুঁজে দেখবেন সংযোগস্থলটি, কারণ তিনি নিশ্চিত যে অতিরিক্ত জল সমুদ্রে গিয়ে পড়বার একটা পথ কোথাও আছেই ।

পরদিন সকালবেলাতেই স্পিলেট আর হার্ডিং আবার হ্রদের কাছে এলেন, সমুদ্রের সঙ্গে হ্রদের সংযোগ-পথটি খুঁজে বার করবার জন্যে । ওঁরা দুজনে কথা বলতে-বলতে পথ চলতে লাগলেন । হঠাৎ এক জায়গায় এসে হার্ডিং-এর নজরে পড়ল, হ্রদের জলে তীব্র স্রোত । সেই স্রোতের মধ্যে কয়েকটা কাঠের টুকরো তিনি ফেলে দিলেন । হ্রদের দক্ষিণ দিক অভিমুখে সেই কাঠের টুকরোগুলো ভেসে চলল । সেই স্রোত অনুসরণ ক'রে তাঁরা হ্রদের দক্ষিণ সীমান্তে এসে পৌঁছুলেন । সেখানে হ্রদের জলে তীব্র একটা ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হয়েছে ; হঠাৎ সেখানে এসে জল যেন অনেকটা নিচে পাতালে চ'লে যাচ্ছে । হার্ডিং উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে লাগলেন । হ্রদের সমতল মাটিতে কান লাগিয়ে একটা জলপ্রপাতের শব্দ শুনতে তাঁর বিলম্ব হ'ল না ।

উঠে দাঁড়িয়ে হার্ডিং বললেন : 'এইখান দিয়েই অতিরিক্ত জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে । নিঃসন্দেহে গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালের মধ্য দিয়ে কোনো পথ আছে । যে-ক'রেই হোক সেই পথটি বার করতেই হবে ।'

লম্বা একটা গাছের ডাল কেটে নিলেন হার্ডিং । তারপর সেটাকে জলে ডুবিয়ে দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে জলের সমতলের এক ফুট নিচে, তীরের গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালে একটা গর্ত আছে ব'লে বোঝা গেল । সেখানে জলে এত তীব্র স্রোত যে, ক্যাপ্টেনের হাত থেকে তীরের মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল ডালটি এবং পলকের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল ।

আবার বললেন হার্ডিং : 'এবার আর-কোনো সন্দেহই নেই—এখানেই অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাবার পথ । এই পথটিকে দৃষ্টিপথে আনতেই হবে ।'

‘কী ক’রে আনবেন ?’ শুধোলেন স্পিলেট ।

‘জলের সমতলটা তিন ফুট নিচে নামিয়ে দিয়ে ।’

‘কিন্তু কী ক’রে নামাবেন ?’

‘এর চেয়ে বড়ো আর-একটা জল বেরুবার পথ ক’রে দিয়ে ।’

‘কোন্ জায়গায় আপনি সেই পথটা করবেন ?’

‘উপকূলের সবচেয়ে কাছে যে-তীর, সেখানে ।’

‘কিন্তু সেখানে তো গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল !’

‘তা জানি ।’ উত্তর দিলেন হার্ডিং । ‘ওই গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল আমি উড়িয়ে দেবো। ওইদিকে পথ পেয়ে জলের সমতল অনেক নেমে যাবে, তাহ’লেই এই পথটা—’

‘এবং তীরে একটা জলপ্রপাত তৈরি ক’রে—’ স্পিলেট বললেন ।

‘—সেই জলপ্রপাত আমরা কাজে লাগাবো ।’ সাইরাস হার্ডিং বললেন : ‘চলুন, এবার ফেরা যাক ।’

দ্রুতপদে তাঁরা চিমনিতে ফিরে এলেন । পেনক্র্যাফ্‌ট আর হার্বার্ট তখন সদ্য-সদ্য বন থেকে কাঠ কেটে বোঝা নিয়ে ফিরেছে । তাঁদের দেখেই পেনক্র্যাফ্‌ট হেসে বললে : ‘কাঠুরেরা এইমাত্র তাদের কাজ শেষ ক’রে ফিরল, ক্যাপ্টেন । এবার আপনি যদি রাজমিস্ত্রি চান, তবে তা-ও আমরা হ’তে পারি ।’

‘রাজমিস্ত্রি ?’ হার্ডিং বললেন : ‘না-না, এবার চাই রাসায়নিক ।’

‘জানো পেনক্র্যাফ্‌ট, আমরা এবার দ্বীপটা উড়িয়ে দিতে চলেছি ।’ জানালেন স্পিলেট।

‘দ্বীপটা উড়িয়ে দিতে চলেছি !’ চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফ্‌ট । ।

‘গোটা দ্বীপটা নয়,’—স্পিলেট হাসলেন : ‘একটা অংশ মাত্র ।’

তখন হার্ডিং তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সবার কাছে খুলে বললেন । সব শুনে হার্বার্ট বললে : ‘ডাইনামাইট ছাড়া ওই গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল আপনি উড়িয়ে দেবেন কী ক’রে ?’

‘ডাইনামাইটের চেয়েও শক্তিশালী বিস্ফোরক তৈরি ক’রে ।’

পরদিন, মে মাসের আট তারিখে, ক্যাপ্টেন হার্ডিং বেশ-কিছু পরিমাণ ‘সালফারেট অভ আয়রন’ সংগ্রহ করলেন । আগ্নেয়গিরির কল্যাণে দ্বীপে এইসব খনিজ পদার্থের কোনো অভাব ছিল না । সালফারেট অভ আয়রন থেকে সালফেট বার ক’রে নিতে খুব-বেশি দেরি হ’ল না । সালফেট পাওয়া গেলে সালফিউরিক অ্যাসিডের আর ভাবনা কী !

চিমনির পিছনে নিখুঁত সমতল একটি জায়গা বার ক’রে নিলেন হার্ডিং । সেইখানেই তৈরি করলেন তাঁর ল্যাবরেটরি । আর ল্যাবরেটরিতেই প্রস্তুত হ’ল সালফিউরিক অ্যাসিড ।

সীলের চর্বি থেকে গ্লিসারিন বার করতেও কোনো অসুবিধে হ’ল না । কেননা দ্বীপে চুনের কোনো অভাব নেই । রসায়ন নিয়ে যারাই সামান্য নাড়াচাড়া করেছে তারাই জানে, চর্বি থেকে গ্লিসারিন বার করতে হ’লে চুন কিংবা সোডার প্রয়োজন । সোডাও দ্বীপে পাওয়া গেল, কেননা ক্ষারযুক্ত গাছের অভাব নেই দ্বীপে ; আর সেই গাছ থেকে সোডা বার ক’রে নেয়া খুব বেশি কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয় ।

সালফিউরিক অ্যাসিড আর গ্লিসারিন যখন জোগাড় করা গেল, তখন প্রয়োজন পড়ল ‘অ্যাজোট অভ পটাশ’-এর । এই অ্যাজোট অভ পটাশ সল্টপিটার নামেই অভিহিত হয় ।

আজোটিক অ্যাসিডের সাহায্যে সহজেই উদ্ভিদসমূহের মধ্য থেকে কার্বনেট অভ পটাশ পাওয়া যায় । কিন্তু অ্যাজোটিক অ্যাসিড পাওয়াটা মুশকিলের ব্যাপার হ'য়ে উঠল । তবে, সৌভাগ্যবশত ফ্র্যাঙ্কলিন পর্বতের পাদদেশে অতি সামান্য সল্টপিটার পাওয়া গেল । হার্ডিং তাকে পরিশুদ্ধ ক'রে নিলেন । এইসব কাজেই কেটে গেল এক সপ্তাহ । এই ক-দিনে চুন-বালি-কাদা দিয়ে একটা ফারনেস তৈরি ক'রে নিয়েছিলেন হার্ডিং । সেই ফারনেসের সাহায্যে সালফারেট অভ আয়রন থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড আর সল্টপিটার একত্র ক'রে অ্যাজোটিক অ্যাসিড পাওয়া গেল । সেই অ্যাজোটিক অ্যাসিড আর গ্লিসারিন মিশিয়ে হার্ডিং তাঁর বহু-আরাধ্য বিস্ফোরক পেলেন—সামান্য একটু তেলতেলে হলদে তরল পদার্থ । একটা বোতলের মধ্যে সেই বহু-আরাধ্য পদার্থটি নিয়ে হার্ডিং সবাইকে বোতলটি দেখালেন, বললেন : 'এই হ'ল তোমাদের নাইট্রোগ্লিসারিন ।'

সেদিন হ'ল মে মাসের বিশ তারিখ ।

চোখ মাথায় তুলে পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'এই কয়েক ফোঁটা নাইট্রোগ্লিসারিন দিয়ে আপনি গ্র্যানাইট পাথর উড়িয়ে দেবেন ?'

'হ্যাঁ ।' হার্ডিং বললেন : 'কালকেই নিজের চোখে সব দেখতে পাবে ।'

পরদিন একুশে মে ভোরবেলা সবাই লেক গ্র্যান্টের পুব তীরে গিয়ে হাজির হলেন ।

জায়গাটা সমুদ্র-উপকূল থেকে মাত্র পাঁচশো ফুট দূরে । এই জায়গাতেই মাটি ঢালু হ'য়ে নেমে গেছে । গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল না-থাকলে হ্রদের জল ঝরনার মতো হ'য়ে গিয়ে বেলাভূমির কাছে নেমে যেতো । যদি গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালটি উড়িয়ে দেয়া যায়, তবে জলের সমতল অনেক নিচে চ'লে যাবে—এবং সঙ্গে-সঙ্গে যে-বহির্পথ দিয়ে হ্রদের অতিরিক্ত জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তা দৃশ্যমান হবে ।

হার্ডিং-এর নির্দেশমতো পেনক্র্যাফ্‌ট একটি শাবল সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল । হ্রদের তীরে গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালে একটু জায়গা নির্দেশ করলেন হার্ডিং । পেনক্র্যাফ্‌ট সেখানে একটা গর্ত করতে লাগল । গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালে গর্ত করা মোটেই সোজা ব্যাপার নয় । অথচ গর্তটা একটু গভীর করা প্রয়োজন । সুতরাং, একটু পরে যখন পেনক্র্যাফ্‌টের শরীর দিয়ে ঝরঝর ক'রে ঘাম ঝরতে লাগল, তখন নেব্‌ পেনক্র্যাফ্‌টের হাত থেকে শাবলটা নিলে ।

বেলা চারটের সময় গর্ত করা হ'য়ে গেল । সেই গর্তের মধ্যে হার্ডিং অতি সন্তর্পণে নাইট্রো-গ্লিসারিনের বোতলটা রাখলেন ।

এবার সেই বিস্ফোরকে অগ্নিসংযোগের প্রশ্ন উঠল । কয়েকটি গাছের ছাল দিয়ে একটা লম্বা দড়ির মতো তৈরি করা হ'ল । তারপর সেই দড়িটা সালফিউরিক অ্যাসিডে ভিজিয়ে নিয়ে তার একটা মুখ ওই গর্তটায় ঢুকিয়ে দেয়া হ'ল । ঠিক হ'ল এর অন্য প্রান্তে অগ্নিসংযোগ করা হবে । গোটা দড়িটা পুড়তে পঁচিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে ।

দড়িটার এক প্রান্তে অগ্নিসংযোগ ক'রে সবাই দৌড়ে চিমনিতে ফিরে এলেন । ঠিক পঁচিশ মিনিট বাদে অতি ভয়ংকর একটি বিস্ফোরণের শব্দে লিঙ্কন আইল্যাণ্ড এত জোরে কেঁপে উঠল যে, মনে হ'ল যেন সাংঘাতিক একটি ভূমিকম্প শুরু হয়েছে । বড়ো-বড়ো পাথরের চাঁই ছিটকে পড়ল ফ্রাঙ্কলিন পর্বতের গা থেকে, যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গার শুরু

হয়েছে।

বিস্ফোরণের স্থান থেকে চিমনি প্রায় দু-মাইল দূরে অবস্থিত হলেও, সবাই চিমনির ভিতরে এ-ওর ঘাড়ে গিয়ে ছিটকে পড়লেন। সংবিৎ ফিরে পেয়ে সবাই ছুটলেন লেক গ্র্যান্টের দিকে। একটু পরেই সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন আনন্দে।

গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালে বেশ বড়ো আকারের একটি পথ দেখা গেল। হ্রদের ফেনিল জল সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে এসে তিনশো ফুট নিচে সমুদ্র-সৈকতে আছড়ে পড়ছে।

৯

গ্র্যানাইট হাউস

নতুন বহির্পথটির পরিধি এত বড়ো হ'ল যে, দেখা গেল অল্প সময় পরেই হ্রদের জলের সমতল তিন ফুটের মতো নেমে গেছে। সবাই তখন চিমনিতে ফিরে এলেন। কুঠার, শাবল ইত্যাদি কিছু হাতিয়ার নিয়ে সবাই এবার রওনা হলেন হ্রদের পুরোনো বহির্পথের সন্ধানে। টপ এবার তাঁদের সঙ্গে চলল।

রাস্তায় পেনক্র্যাফ্‌ট হার্ডিংকে একটা কথা জিজ্ঞেস না-ক'রে পারলে না। শুধোলে: 'আচ্ছা ক্যাপ্টেন, আপনার ওই নাইট্রো-গ্লিসারিন দিয়ে কি কেউ এই গোটা দ্বীপটাকে উড়িয়ে দিতে পারে না?'

'কোনো সন্দেহ নেই তাতে। শুধু এই দ্বীপ কেন'—হার্ডিং জবাব দিলেন, 'দেশ, মহাদেশ এমনকী দুনিয়া পর্যন্ত উড়িয়ে দেয়া যায়। প্রশ্ন শুধু পরিমাণের।'

'বন্দুকে কি এই নাইট্রো-গ্লিসারিন আপনি ব্যবহার করতে পারেন না?' শুধোলে পেনক্র্যাফ্‌ট।

'না পেনক্র্যাফ্‌ট এটি একটি সাংঘাতিক বিস্ফোরক। বন্দুকের জন্যে সাধারণ বারুদ তৈরি করা মোটেই কঠিন নয়। অ্যাজোটিক অ্যাসিড সল্টপিটার, গন্ধক, কয়লা—কিছুরই অভাব নেই এই দ্বীপে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একটিও বন্দুক নেই আমাদের।'

পেনক্র্যাফ্‌ট উত্তর করলে: 'ক্যাপ্টেনের সামান্য ইচ্ছে থাকলেই—'

লিঙ্কন দ্বীপের অভিধান থেকে 'অসম্ভব' কথাটা মুছে ফেলেছিল পেনক্র্যাফ্‌ট।

খানিকক্ষণ বাদেই হ্রদের পুরোনো বহির্পথটির সামনে এসে দাঁড়ালেন সবাই। গ্র্যানাইট পাথরের মধ্য দিয়ে টানেলের মতো পথ চ'লে গেছে। বাইরে থেকে দেখা গেল ক্রমশ ঢালু হ'য়ে গেছে সেই পথটি। টপ তো সোজা সেই টানেলের ভিতর প্রবেশ করল। টানেলটা দেখে মনে হ'ল, কেউ যেন কোনো উদ্দেশ্যে পাহাড় কেটে তা প্রস্তুত করেছে। হার্ডিং খুব ভালো ক'রে বুঝতে পারলেন যে, টানেলটার বয়স দ্বীপের বয়সের কম হবে না। সম্ভবত এই ঢালু টানেলটা গিয়ে পড়েছে একেবারে সমুদ্রের সমতলে।

হার্বার্ট বললে: 'চলুন, এবার ভিতরে ঢোকা যাক।'

'চলো'—ব'লে হার্ডিং সবে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন, চীৎকার করতে করতে টপ ভিতর থেকে ছুটে আসছে।

'নেব্ বিরক্ত হ'য়ে বললে : 'তোর আবার কী হ'ল রে টপ, অত ডাকছিস কেন?'

সবাই টানেলের ভিতর প্রবেশ করলেন। টপ গর্জন করতে-করতে ছুটতে-ছুটতে সেই টানেলের অভ্যন্তরে এগিয়ে চলল। আস্তে-আস্তে সেই ঢালু সুড়ঙ্গপথ দিয়ে নামতে লাগলেন সকলে। এই না-জানা পাতালের দিকে প্রথম চলেছেন তাঁরা—এই কথা ভেবে তাঁদের মনে ঈষৎ ভীতি এবং একটু বিস্ময়ের ভাব জেগে উঠল। কেউ একটিও কথা বলছিলেন না। এমনও তো হ'তে পারে, এই সুড়ঙ্গ-পথের মধ্যে কোনো সামুদ্রিক জীবজন্তু বাস করে! তাদের সঙ্গে দেখা না-হ'লেই ভালো একহিশেবে।

পিচ্ছিল, ঢালু সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে প্রায় একশো ফুট নামবার পরে সবাই একটা চওড়া গহ্বরের মতো জায়গায় এসে থামলেন। ছাদ থেকে তখনো ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছিল। একটু স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকলেও হাওয়া সেখানে বিশুদ্ধ।

'ক্যাপ্টেন,' গিডিয়ন স্পিলেট বললেন : 'এই হ'ল নিরাপদ আস্তানা—একেবারে পাহাড়ের অভ্যন্তরে। কিন্তু তবু বাসযোগ্য নয়।'

'বাসযোগ্য নয় কেন?' নাবিক পেনক্র্যাফটের গলা শোনা গেল।

'কারণ এ-জায়গাটা খুব ছোটো, আর অন্ধকার।'

'কেন, এটাকে কি বড়ো করা যায় না? আলো-হাওয়ার জন্যে দু-একটা জানলা ক'রে নিলেই চলে।

পেনক্র্যাফ্‌ট তার অভিধান থেকে অসম্ভব কথাটা একেবারেই মুছে ফেলে দিয়েছিল।

'চলো এগিয়ে চলো।' সাইরাস বললেন : 'সবে তো তিনভাগের একভাগ পথ মাত্র এসেছি। আরো নিচে হয়তো দেখতে পাবো প্রকৃতি আমাদের সমস্ত পরিশ্রম লাঘব ক'রে রেখেছে।'

'টপ কোথায়?' হঠাৎ নেব্ একটু উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠল।

চারদিকে তাকালেন সবাই। মশালের আলোয় তন্ন-তন্ন ক'রে দেখলেন জায়গাটা। কিন্তু টপকে দেখা গেল না।

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'টপ হয়তো এগিয়ে গিয়েছে।'

'চলো—আমরাও এগোই।' হার্ডিং বললেন।

আবার সবাই নিচে নামতে লাগলেন। আরো পঞ্চাশ ফুট এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ সবাই থমকে দাঁড়ালেন। অনেক তলা থেকে কীসের একটা শব্দ যেন ভেসে আসছে।

একটু কান পেতে শুনেই হার্বার্ট বললে : 'আরে! এ-যে টপ ডাকছে!'

'হ্যাঁ,' পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'ভীষণভাবে ডাকছে টপ!'

'শাবল আর কুঠারগুলো বাগিয়ে ধ'রে সাবধানে এগিয়ে চলো।' হার্ডিং-এর নির্দেশ পাওয়া গেল।

দ্রুতপদে টপকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে চললেন সকলে। টপের ডাক ক্রমশই বাড়ছিল—সাংঘাতিকভাবে ডাকতে লাগল সে।

'কোনো সামুদ্রিক জন্তুর দেখা পেয়েছে কি টপ ?' সাইরাস হার্ডিং একটু নিচু গলায় বললেন : 'বিনা কারণে তো টপ কখনো এত উত্তেজিত হয় না ! নিশ্চয়ই কোথাও কিছু-একটা ঘটেছে, আমরা বুঝতে পারছি না ।'

আরো ষোলো ফুটের মতো নামবার পর টপের দেখা পাওয়া গেল । সেখানটা বিশাল এবং চমৎকার একটা চত্বরের মতো । টপ খুব উত্তেজিত হ'য়ে ছুটোছুটি ক'রে ডাকতে লাগল । মশালের আলো জ্বেলে খুব সতর্কভাবে চারদিক দেখলেন সবাই । কিন্তু বিপুল গুহাটি শূন্য, একেবারে ফাঁকা । প্রত্যেকটি কোণে গিয়ে পরীক্ষা করলেন তখন । কোনো জন্তু বা মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না । কিন্তু তবু টপ ডেকেই চলল একটানা । ভয় দেখিয়ে বা চুপ করতে নির্দেশ দিয়েও টপকে থামানো গেল না ।

হার্ডিং বললেন : এই গুহার মধ্যে এমন-একটা পথ নিশ্চয়ই আছে, যেখান দিয়ে হ্রদের জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে ।'

'নিশ্চয়ই', পেনক্র্যাফ্ট বললে : 'সাবধানে চলাফেরা করতে হবে আমাদের । ও-রকম কোনো গর্তের মধ্যে প'ড়ে গেলেই সর্বনাশ !'

হার্ডিং ডাকলেন : 'টপ, টপ, চল ।'

হার্ডিং-এর কথায় উত্তেজিত হ'য়ে টপ ছুটে গেল গুহাটির একেবারে প্রত্যন্ত প্রান্তে —সেখানে গিয়ে দ্বিগুণ জোরে চীৎকার করতে লাগল । টপকে অনুসরণ ক'রে সে-জায়গায় পৌঁছে দেখা গেল, গ্র্যানাইট পাথরের কোলে রীতিমত একটা কুয়ো সেখানে । এই কুয়ো দিয়েই হ্রদের জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে । কুয়োটা সোজা নেমে গেছে । সুতরাং এর ভেতর ঢুকে পরীক্ষা করে দেখাটা সম্ভব নয় । কুয়োর মুখের কাছে মশাল ধরা হ'ল, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না । হার্ডিং একটা জ্বলন্ত মশাল কুয়োর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন । ছলাৎ ক'রে একটা শব্দ শোনা গেল, বোঝা গেল মশালটা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে । সমুদ্রের জলে পড়তে মশালটার যত সময় লাগল তা হিশেব ক'রে হার্ডিং কুয়োর গভীরতা নির্ণয় করলেন । প্রায় নব্বুই ফুট গভীর হবে কুয়োটা । গহ্বরের মেঝে তাহলে সমুদ্রতলের নব্বুই ফুট উপরে অবস্থিত !

হার্ডিং বললেন : 'এই হ'ল আমাদের নতুন আস্তানা ।'

'কিন্তু এই জায়গায় নিশ্চয়ই কোনো প্রাণী থাকে ?' স্পিলেটের কৌতূহল তখনো নিবৃত্ত হয়নি ।

'সে-প্রাণী এতক্ষণে ওই কুয়ো দিয়ে সমুদ্রে চ'লে গেছে, ' হার্ডিং উত্তর দিলেন । 'জায়গাটা আমাদের দিয়ে গেছে ।'

সত্যিই প্রশস্ত গহ্বরটা বাসের পক্ষে খুব ভালো । এত চওড়া, যে অনায়াসেই ইটের গাঁথুনি দিয়ে দেয়াল তুলে কয়েকটা কামরায় ভাগ ক'রে নেয়া সম্ভব । তবে, দুটো অসুবিধে আছে । প্রথমত, এই পাথরের তৈরি গুহায় আলো পাওয়া যাবে কী ক'রে, আর দ্বিতীয়ত, সংস্কার ক'রে আরো স্বাচ্ছন্দ্য আনতে হবে । গ্র্যানাইটের পুরু ছাদ ভেদ ক'রে আলোর পথ ক'রে দেয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তবে, সমুদ্রের দিকের দেয়ালে কয়েকটা জানলা তৈরি করা সম্ভব হ'তে পারে । ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মতো পেনক্র্যাফ্ট সমুদ্রের দিকের দেয়ালে শাবল দিয়ে ঘা মারতে লাগল । একটু পরে স্পিলেট গিয়ে তার স্থান গ্রহণ করলেন, তারপর

নেব্ কাজে লাগল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পরও যখন সবাই দেয়ালে জানলা করবার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন এমন সময় নেবের শেষ একটা আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে শাবলটা ছিটকে পাথরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে পড়ল। হার্ডিং মেপে দেখলেন, দেয়ালটা তিন ফুট পুরু। সেই ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালেন ক্যাপ্টেন। দেখতে পেলেন, প্রায় আশি ফুট নিচে সমুদ্র-সৈকত, তারপর সেফটি আইল্যাণ্ড, তারও পর উত্তাল সমুদ্রের নীল জল। সেই ফাঁক দিয়ে বন্যার মতো ছুটে এলো আলো। তখন ভালো ক'রে গহ্বরটি দেখতে পাওয়া গেল। বিরাট গহ্বরটি—বাঁ দিকে ত্রিশ ফুট উপরে ছাদ, ডান দিকে ছাদ আশি ফুট উপরে। মাঝে-মাঝে শূন্যে মাথা তুলেছে গ্র্যানাইট পাথরের থাম। অনায়াসেই একাধিক কক্ষে গহ্বরটি ভাগ করা সম্ভব হবে। যেখানে মাথা গোঁজবার জন্যে সামান্য একটা আশ্রয় চাচ্ছিলেন, সেখানে এই বিরাট আস্তানা পেয়ে সবাই আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

সাইরাস হার্ডিং বললেন : 'প্রথমেই কয়েকটা জানলা বানাতে হবে। গোটা গুহাটা আলোকিত হ'য়ে গেলে পর বাঁ দিকে আমরা থাকবার ঘর আর ভাঁড়ার বানাবো, আর ডান দিকের অংশটুকু হবে আমাদের "স্টাডি" আর জাদুঘর।'

হার্বার্ট জিগেস করল : 'আমাদের নতুন আস্তানার নাম কী হবে ?'

'গ্র্যানাইট হাউস।' হার্ডিং উত্তর করলেন।

ঠিক হ'ল, পরদিন থেকেই গ্রানাইট হাউসের কাজ শুরু হ'য়ে যাবে। তখন তাঁরা ফিরতি পথ ধরলেন। ফেরার আগে আবার কুয়োর কাছে এসে ভিতরে দৃষ্টিপাত করলেন হার্ডিং। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখা গেল না।

সবাই যখন সেই গুহার বাইরে এসে দাঁড়ালেন, তখন প্রায় চারটে বাজে।

পরদিন বাইশে মে থেকে নতুন আস্তানা গ'ড়ে তোলবার কাজ শুরু হ'য়ে গেল। প্রথমেই ভারি একটা ঢাকনি গ'ড়ে তোলবার কাজ। কুয়োটার মুখ এমনভাবে বন্ধ ক'রে দেয়া হ'ল, যাতে উপর থেকে সেই ঢাকনি খোলা গেলেও কুয়োর ভিতর থেকে সেই ঢাকনি মনুষ্যেতর কোনো প্রাণী খুলতে না-পারে। পাঁচটি জানলা এবং একটি দরজা বানানো হ'ল, যাতে বাইরে থেকে আলো-হাওয়া আসে। সমুদ্রমুখী পাঁচটি কক্ষে গুহাটিকে বিভক্ত করা হ'ল। ডানদিকে একটি পথ—সেখান থেকে নিচে ঝোলানো সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হ'ল। কেননা দ্বীপে কোনো লোক না-থাকলেও মালয় বোম্বেটেরা হয়তো দ্বীপে আসতে পারে—তারা যাতে গ্র্যানাইট হাউসে প্রবেশ করতে না-পারে, এইজন্যেই ঝোলানো সিঁড়ির ব্যবস্থা। ঠিক হ'ল সবাই যখন বাইরে যাবেন তখন সিঁড়িটি ফেলে দেয়া হবে—ফিরে আসবার পর আবার তুলে ফেলা হবে। প্রবেশ-পথের পরেই ত্রিশ ফুট লম্বা একটি রান্নাঘর। তারপর প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা খাওয়ার ঘর। এর পরে ঠিক তত বড়ো একটি শোবার ঘর, আর সবশেষে বিরাট একটি হলঘর—তাঁদের বৈঠকখানা। এ-ছাড়াও গহ্বরের মধ্যে যে-জায়গা ছিল, তাতে একটি ভাঁড়ার ঘর বানানো হ'ল, আর বাকিটুকু করিডর হিশেবে ব্যবহারের জন্যে রাখা হ'ল। যে-টানেলটি দিয়ে হ্রদের জল গহ্বরে প্রবেশ করতো, ইঁটের দেয়াল দিয়ে সেটা বন্ধ ক'রে দেয়া হ'ল। ঝোলানো সিঁড়িটা খুব সতর্কভাবে অত্যন্ত মজবুত ক'রে বানানো হ'ল। সেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করাটা অসুবিধে হ'লেও নিরাপত্তার পক্ষে প্রচুর সহায়ক। আঠাশে মে ঝোলানো সিঁড়িটা নির্দিষ্ট স্থানে বসানো হ'ল। প্রায় আশি ফুট লম্বা সিঁড়ি—একশোটার মতো সোপান

তাতে। সৌভাগ্যবশত সিঁড়িটা দু-ভাগে ভাগ করা গেল। মাটি থেকে চল্লিশ ফুট উপরে একটি পাথরের চাঁই—প্রকৃতি যেন তাদের জন্যে আগে থেকেই একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি ক'রে রেখেছে। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে দ্বিতীয় সিঁড়ি শুরু হ'ল। সুতরাং তাঁদের ওঠানামা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হ'ল। পেনক্র্যাফ্‌ট টপকে শিখিয়ে দিতে শুরু করলে কী ক'রে ওই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয়। টপ কিছুদিনের মধ্যেই সার্কাসের কুকুরের মতো ওই সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত ওঠানামা করতে সক্ষম হ'ল।

গোটা জুন মাসটা কাটল গ্র্যানাইট হাউসকে গ'ড়ে তুলতে। ইতিমধ্যে দিন ছোটো হ'য়ে আসছিল—আস্তে-আস্তে শীত পড়ছিল। শীতের সময় হয়তো সবদিন বাইরে বেরুনো সম্ভব না-ও হ'তে পারে, তাই শীতের জন্যে খাদ্য সঞ্চয় করা প্রয়োজন হ'য়ে পড়ছিল। হার্বার্ট আর স্পিলেটের উপর ভার পড়ল শিকারের। মার্সি নদীর পাশের অরণ্যে শিকারের অভাব নেই। সুতরাং প্রত্যেকদিনই বেশ-কিছু পরিমাণ খাদ্য সংগৃহীত হ'তে লাগল। ইতিমধ্যে একদিন সীল শিকারেও বেরিয়েছিলেন সবাই। সীলের চর্বি দিয়ে মোমবাতি প্রস্তুত করা যায়। সেই মোমবাতি বানানোর জন্যেই সীল-শিকারে গেলেন সবাই। সৌভাগ্যবশত তিনটে সীল শিকার করা সম্ভব হ'ল। সুতরাং কিছুকালের জন্যে যে আলোর ভাবনা ভাবতে হবে না, সেই আশ্বাস পেয়ে সবাই খুব খুশি হ'য়ে উঠলেন। সীলের চামড়া দিয়ে সবাই একজোড়া ক'রে জুতো তৈরি ক'রে নিলেন। বলা বাহুল্য দেখতে জুতোগুলো ভালো হ'ল না, কিন্তু কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

জুন মাসের গোড়া থেকেই মাঝে-মাঝে কয়েক পশলা ক'রে বৃষ্টি হ'তে লাগল। একদিন বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। সবাই সেদিন গ্র্যানাইট হাউসের বৈঠকখানায় ব'সে মোমবাতি তৈরি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ হার্বার্ট চেঁচিয়ে উঠল : 'এই দেখুন ক্যাপ্টেন, একটা গমের দানা!' এই ব'লে সে সবাইকে একদানা গম—মাত্র একটি দানা—দেখালো। দানাটা তার ওয়েস্ট-কোটের লাইনিং-এ আটকে ছিল। রিচমণ্ডে থাকতে হার্বার্ট কয়েকটা পায়রা পুষেছিল—নিজের হাতে তাদের সে খাওয়াতো। খুব-সম্ভব সেই সময়কারই গম এটি।

'একটা গমের দানা?' তক্ষুনি উৎসুক কণ্ঠে ক্যাপ্টেন শুধোলেন।

'হ্যাঁ ক্যাপ্টেন। কিন্তু একটা—মাত্র একটা দানা!'

পেনক্র্যাফ্‌ট হো হো ক'রে হেসে উঠল : 'একটা গমের দানা দিয়ে আমরা করবো -কী?

এমন কী চেঁচিয়ে বলার মতো ব্যাপার এটা?'

'রুটি—আমরা রুটি পাবো এ থেকে!' হার্ডিং বললেন।

'রুটি, কেক—আরো কত-কী!' হেসে উঠল পেনক্র্যাফ্‌ট : 'চমৎকার! একটা মাত্র গমের দানা, অথচ তা নিয়ে কত স্বপ্ন!'

হার্বার্ট দানাটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় হার্ডিং দানাটা নিজের হাতে নিয়ে খুব ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। একটু পরে পেনক্র্যাফটের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন : 'পেনক্র্যাফট, তুমি জানো একটা গমের দানা থেকে কটা অঙ্কুর হয়?'

বিস্মিত হ'য়ে পেনক্র্যাফ্‌ট বললে 'কেন? একটা বোধহয়।'

'না, দশটা। আর, একটা অঙ্কুরে কটা ক'রে গমের দানা থাকে, জানো ?'

'না।'

'প্রায় আশিটা।' সাইরাস হার্ডিং বললেন : 'তাহলে, আমরা যদি এই গমের দানাটা রোপণ করি, তবে প্রথম বারে আটশোটা দানা পাব—দ্বিতীয় বারে তা থেকে পাবো ছ-শো চল্লিশ হাজার, তৃতীয় বারে পাঁচশো বারো লক্ষ, আর চতুর্থ বারে চারশো হাজার লক্ষেরও বেশি।'

এই কথা শুনে সবাই অবাক হ'য়ে গেল। সাইরাস হার্ডিং ব'লে চললেন : 'এই দ্বীপের আবহাওয়ায় বছরে দু-বার চাষ করা সম্ভব—সুতরাং দু-বছরের মধ্যেই আমরা বিরাট এক গম-খেতের মালিক হতে পারবো। সুতরাং হার্বার্ট, তোমার এই আবিষ্কার আমাদের কাছে প্রায় অমূল্য। যে-কোনো কিছু—এখন যে-অবস্থায় আছি, তাতে প্রত্যেকটি তুচ্ছ জিনিশও আমাদের কাজে লাগবে, এ-কথা তোমরা কেউ ভুলে যেয়ো না, এই অনুরোধই তোমাদের করছি।'

'না ক্যাপ্টেন, না, আমরা কখনো ভুলবো না এ-কথা,' উত্তর দিলে পেনক্র্যাফ্‌ট : 'আচ্ছা এখন আমরা কী করবো ?'

'এই গমের দানাটা রুইবো আমরা।' উত্তর করলে হার্বার্ট।

'হ্যাঁ।' যোগ করলেন গিডিয়ন স্পিলেট : 'খুব সতর্কভাবে এটি রুইতে হবে। কেননা, এইটের ওপরই আমাদের ভবিষ্যৎ ফসল নির্ভর করছে।'

'যদি এটা থেকে অঙ্কুর না-বেরোয় ?' চেঁচিয়ে বললে পেনক্র্যাফ্‌ট।

'বেরুবেই।' সাইরাসের দৃঢ় কণ্ঠ শোনা গেল।

সেদিন হ'ল বিশে জুন। এই একটিমাত্র মহামূল্য গম রুইবার উপযুক্ত সময় তখন। প্রথমে ঠিক করা হ'ল একটা টবের মধ্যে এটি রোয়া হবে, কিন্তু পরে ঠিক হ'ল, প্রকৃতির হাতেই সব ভার ছেড়ে দেয়া হবে, মাটিতে রোয়া হবে এটি। সেইদিনই রোয়া হ'ল এটি, আর কষ্ট ক'রে না-বললেও চলে যে, যাতে এই পরীক্ষা সার্থক হয় সেজন্যে খুব সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'ল।

আবহাওয়া পরিষ্কার হ'য়ে যাওয়ায় সবাই বেরিয়ে পড়লেন। গ্র্যানাইট হাউস ছাড়িয়ে আরো উপরের দিকে উঠে একটা সমতল জমির উপর খুব ভালো ক'রে জায়গা করা হ'ল গমটি রুইবার জন্যে। তারপর এর চারিদিকে একটা বাঁশের বেড়াও দেয়া হ'ল, যাতে কোনো জীবজন্তু এটাকে নষ্ট করতে না-পারে। যদি এই গমটি কোনো কারণে নষ্ট হ'য়ে যায়, এই জনমানবহীন দ্বীপে আর-কোথাও আর-একটি গমের দানাও জোগাড় করা যাবে না।

১০

রহস্যের কালো মেঘ

সেইদিন থেকে পেনক্র্যাফ্‌ট একদিনের জন্যেও তার 'গম-খেত' দেখতে যেতে ভোলেনি।

যে-সব কীট সাহস ক'রে ওই খেতের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, বলা বাহুল্য, তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র ক্ষমা প্রদর্শন করা হ'ত না।

জুন মাসের শেষের দিকে আবহাওয়া ভয়ানক খারাপ হ'য়ে গেল। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ল দ্বীপে। উনত্রিশে জুন তো এমন ঠাণ্ডা পড়ল যে, যদি থার্মোমিটার থাকতো তবে তাতে নিশ্চয়ই কুড়ি ডিগ্রির বেশি তাপ ধরা পড়তো না। পরদিন এমন ঠাণ্ডা পড়ল যে তাকে তিরিশে জুন না-ব'লে অনায়াসে একত্রিশে ডিসেম্বর বলা চলে। মার্সি নদীর মুখে বরফ জমতে শুরু করল। লেক গ্র্যান্টের দশাও শিগগিরই মার্সি নদীর মতো হ'য়ে গেল।

প্রায়ই সেই অসহ্য ঠাণ্ডার মধ্যে কাঠ আর কয়লা আনতে বেরুতে হ'ত সবাইকে। এবার তাই মার্সি নদীকে কাজে লাগানো হ'ল। কাঠ জড়ো ক'রে বাণ্ডিল বেঁধে স্রোতে ভাসিয়ে দেয়া হ'ল, স্রোতে ভেসে-ভেসে তা গ্র্যানাইট হাউসের প্রায় নিচে এসে উপস্থিত হওয়ায় অনেক পরিশ্রমের হাত থেকে রেহাই পেলেন তাঁরা।

এর মধ্যেই একদিন আবহাওয়া শুকনো থাকায় সবাই মিলে ঠিক করলেন, মার্সি নদী আর ক্লু অন্তরীপের মাঝখানের জায়গাটা দেখতে যাবেন। পাঁচই জুলাই সকাল ছ'টায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে সবাই বেরিয়ে পড়লেন—তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্র—মানে কুঠার, তীর-ধনুক, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে। মার্সি নদীর জল সব বরফ হ'য়ে যাওয়ায় তাঁদের পক্ষে বেশ সুবিধেই হ'ল। বরফের উপর দিয়েই মার্সি নদী হেঁটে পেরুনো গেল। পেরুবার সময় হার্ডিং বললেন: 'কিন্তু এই বরফ তো আর চিরকাল মার্সি নদীর উপর সেতুর ভূমিকায় কাজ করবে না, সুতরাং আমাদের আরো-একটা কাজ বাড়ল। এখানে একটা সেতু তৈরি করতে হবে।'

ক্লু অন্তরীপের মধ্যকার অঞ্চল গ্র্যানাইট হাউসের পাশের অঞ্চলের থেকে একেবারে বিপরীত। এই দিককার জমি এত উর্বর যে দেখে রীতিমতো লোভ হয়। হার্ডিং এইসব দেখে বললেন: 'লিঙ্কন দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল দেখছি বিভিন্ন রকম। একটা ছোট্ট দ্বীপের জমিতে এত বৈচিত্র্য যে কী ক'রে সম্ভব, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এই দ্বীপের প্রকৃতি আর গঠন ভারি অদ্ভুত। একটা মহাদেশের সংক্ষিপ্তসার যেন এই দ্বীপটি! আগে কোনো মহাদেশের অংশ ছিল ব'লে যদি জানা যায়, তাহ'লেও বিস্মিত হবো না।'

'কী! প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে একটি মহাদেশ!' বিস্মিত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফ্‌ট।

'অসম্ভব কী?' উত্তর দিলেন হার্ডিং: 'অস্ট্রেলিয়া, নিউ-আয়ারল্যাণ্ড, অস্ট্রেলেশিয়া ইত্যাদি যে এক ছিল না, তা কে বলতে পারে? আমার তো মনে হয়, বিশাল সমুদ্রের মধ্যে যে-সব ছোটোখাটো দ্বীপ দেখা যায় তা সেই ষষ্ঠ মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চুড়ো মাত্র—

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে-মহাদেশটির অস্তিত্ব ছিল ; এইসব চুড়ো ব্যতীত আজ তার আর কোনো চিহ্নই নেই ।

হার্বার্ট বললে, 'আগে যেমন অ্যাটল্যান্টিস ছিল, ঠিক তেমনি ?'

'হ্যাঁ, অবিশ্যি যদি অ্যাটল্যান্টিস কোনোকালে থেকে থাকে ।'

'এই লিঙ্কন আইল্যাণ্ড সেই ষষ্ঠ মহাদেশের একাংশ তাহ'লে ?' প্রশ্ন করলে পেনক্র্যাফ্‌ট ।

'সম্ভবত ।' হার্ডিং বললেন : 'দ্বীপের জমিতে এত বৈচিত্র্যর কারণ বোধহয় তা-ই ।'

প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ছাত্র হার্বার্ট । সে বললে : 'এই দ্বীপে যে বিভিন্ন ধরনের বহু জীবজন্তু দেখা যায়, তা-ও বোধ হয় এই কারণেই ।'

'হ্যাঁ' । হার্ডিং উত্তর করলেন : 'আমার মত তাতে আরো টেকসই হ'ল, পেনক্র্যাফ্‌ট। আমরা এ ক-মাসে দেখেছি এই দ্বীপে অসংখ্য জীবজন্তুর বাস এবং আশ্চর্য, এত বিভিন্ন জাতের জীবজন্তু, এত বৈচিত্র্য তাদের মধ্যে যে তাই যদি বলা যায় লিঙ্কন আইল্যাণ্ড আগে এমন-কোনো মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল বা ক্রমে-ক্রমে প্রশান্ত মহাসাগরের অতল গর্ভে স্থান নিয়েছে, তবে সে-কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়া চলে না ।'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'তাহ'লে, দেখছি একদিন সেই প্রাচীন মহাদেশের অবশিষ্ট অংশও জলের তলায় অদৃশ্য হ'য়ে যাবে—আর এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল জল ছাড়া আর-কিছু থাকবে না !'

'সম্ভবত !' হার্ডিং বললেন : 'তাই ব'লে আমরা কাজে ঢিলে দেবো না বা হাল ছেড়ে দেবো না । সেই ভয়ংকর দিনটি আসতে এখনো ঢের বাকি আছে ।'

গোটা দিনটা ঘুরে-ঘুরে কাটল । খুব ভালো ক'রে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করলেন হার্ডিং । সেদিন শিকারও পাওয়া গেল অনেক । সন্ধে পাঁচটার সময় তাঁরা সবাই ফিরে চললেন এবং সন্ধে আটটার সময় গ্র্যানাইট হাউসে এসে প্রবেশ করলেন ।

পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত ভয়ংকর ঠাণ্ডায় যেন জ'মে রইল লিঙ্কন দ্বীপ । ইতিমধ্যে তাঁরা প্রসপেক্ট হাইটের আশপাশে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটা ফাঁদ পাতলেন । অতি সাধারণ সেই সব ফাঁদ । বড়ো-বড়ো গর্ত খুঁড়ে তার উপর ডাল-পালা পাতা বিছিয়ে রাখা হ'ল । তাঁরা কিন্তু দ্বীপের সব জায়গাতেই এইভাবে গর্ত খুঁড়লেন না । যে-সব জায়গায় জীবজন্তুর প্রচুর পায়ের ছাপ দেখা গেল শুধুমাত্র সেইসব জায়গাতেই এইরকম গর্ত খুঁড়ে-খুঁড়ে ফাঁদ পাতা হ'ল । প্রথম দিকে অবিশ্যি ফাঁদে কোনো জানোয়ার পড়ল না । কিন্তু আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মাঝে-মাঝে একাধিক জানোয়ার ফাঁদে পড়ল, তাদের মধ্যে একটি জাত উল্লেখযোগ্য । ঠিক বরাহ এদের বলা চলে না, বরং 'পিকারি' ব'লেই এদের অভিহিত করা উচিত । এগুলো সেই বিরল জাতের পিকারি, যাদের দেখা সব জায়গায় পাওয়া যায় না। পেনক্র্যাফ্‌ট তো তার শিকার পেয়ে মহা খুশি হ'য়ে উঠল ।

পনেরোই আগস্ট থেকে দ্বীপের আবহাওয়া একটু-একটু ক'রে ভালো হ'য়ে উঠতে লাগল। তাপ কয়েক ডিগ্রি বাড়ল । এর মধ্যেই কয়েকদিন প্রচুর বরফ পড়েছিল, এত প্রচুর পড়েছিল যে প্রায় দু-ফুট পুরু হয়েছিল সেই বরফের চাদর । এই তুষার-ঝড়ের জন্যে বিশে আগস্ট থেকে পঁচিশে আগস্ট গ্র্যানাইট হাউসের বাইরে তাঁরা বেরুতে পারলেন না । তাই ব'লে শুধু-শুধু ব'সে রইলেন না । অনেক কাঠ ছিল গ্র্যানাইট হাউসে, তাই দিয়ে তাঁরা

এ ক-দিনে টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি তৈরি করলেন। এই দ্বীপে এসে তাঁরা যে কী-না করেছেন সে-কথা বলা দুষ্কর। প্রথমে তাঁরা হলেন কুমোর, তারপর কাঠুরে, তারপর রাসায়নিক, এরপরে রাজমিস্ত্রি, এবারে ছুতোর আর ঝুড়িওয়ালা। সীলের চামড়া দিয়ে জুতোও বানিয়েছিলেন তাঁরা।

আগস্টের শেষ দিকে আবহাওয়া আবার প্রসন্ন হ'য়ে উঠল। তুষার-ঝড় অন্তর্হিত হ'ল। এবার তাঁরা বাইরে বেরুতে সক্ষম হলেন। যদিও দু-ফুট পুরু বরফের চাদরে পথঘাট ঢেকে ছিল, তবু সেই কঠিন বরফের উপর দিয়ে চলতে তাঁদের খুব বেশি অসুবিধে হ'ল না।

সারা দ্বীপ যেন শাদা হ'য়ে গেছে। মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের চুড়ো থেকে শুরু ক'রে সমুদ্র-সৈকত, অরণ্য, সমভূমি, হ্রদ, নদী সবকিছু শাদায়-শাদাময় হ'য়ে গেছে। হার্বার্ট, স্পিলেট আর পেনক্র্যাফ্‌ট গিয়ে তাদের ফাঁদগুলো পরীক্ষা ক'রে এল। ফাঁদের আশপাশে জানোয়ারদের পায়ের অনেক ছাপ দেখা গেল, কিন্তু ফাঁদে একটিও জানোয়ার দেখা গেল না। বরং ফাঁদগুলোয় এমন-কতগুলো থাবার দাগ দেখা গেল, বা গভীরভাবে মাটিতে ব'সে গেছে।

হার্বার্ট তীক্ষ্ণ চোখে থাবার দাগগুলো পরীক্ষা করে দেখলে, তারপর বললে: 'জাগুয়ারের থাবার দাগ।'

'জাগুয়ার!' পেনক্র্যাফ্‌ট চেঁচিয়ে উঠল 'এই দ্বীপে তাহ'লে অমন হিংস্র জন্তুও আছে! সেইজন্যে ফাঁদে কোনো শিকার দেখা যাচ্ছে না! ওই ব্যাটা জাগুয়ারই সবগুলোকে সাবাড় করেছে!'

স্পিলেট বললেন: 'এবার থেকে আমাদের সকলের খুব সর্তক হ'য়ে চলা-ফেরা করা উচিত।'

'হ্যাঁ।' পেনক্র্যাফ্‌ট বললে: 'আজকেই গিয়ে ক্যাপ্টেনকে আবার বন্দুকের কথা বলতে হবে।'

'হ্যাঁ, দ্বীপে যখন বন্য জানোয়ার আছে তখন তাদের সবংশে বিনাশ করতেই হবে সব-আগে।' স্পিলেট বললেন।

সেদিন ফিরেই সব বলা হ'ল হার্ডিংকে। হার্ডিং কিন্তু তখন বন্দুকের কথা ভাবছিলেন না—কাপড়-চোপড়ের সমস্যাটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। মাংসাশী জাতীয় জীবের চামড়া কিংবা ভেড়া-জাতীয় প্রাণীর, যথা মুসমনের লোম দিয়ে কিছু জামা-কাপড় বানাতেই হবে। তিনি আরো ভাবছিলেন, মুসমন ইত্যাদি জন্তুকে এবং বন্য মুরগি, বালি হাঁস ইত্যাদিকে পোষবার জন্যে একটা আস্তানা বানালে পর প্রত্যেকদিন শিকারে যাওয়ার হ্যাঙামা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, অনেক কাজ হালকা হবে। তার মানে: শিকারেই যদি এত সময় নষ্ট হয়, তবে আর অন্যান্য কাজ করবার সময় পাওয়া যাবে কোথায়? কিন্তু তারও আগে এই দ্বীপের প্রত্যেকটি অংশ তন্ন-তন্ন ক'রে পরীক্ষা করতে হবে। এখনো অধিকাংশ অঞ্চলই দেখে আসা হয়নি।

আবহাওয়া তখন বিশেষ অনুকূল ছিল না ব'লেই দ্বীপ-ভ্রমণের সংকল্প অল্পদিনের জন্যে স্থগিত রাখতে হ'ল। একটু-একটু ক'রে তাপ বাড়ছে তখন। বরফ গলতে শুরু করেছে। এ-ছাড়া দিনকয়েক প্রবল বর্ষণও চলল। এ ক-দিন গ্র্যানাইট হাউসে ব'সে-ব'সে সবাই

ঘরোয়া কাজগুলো সমাধা করলেন। কিন্তু এরমধ্যেই এমন-একটা ঘটনা ঘটল, যাতে সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন, একটা আতঙ্ক এসে অধিকার করল তাঁদের মন ; আর গোটা দ্বীপটা তন্ন-তন্ন ক'রে পরীক্ষা করবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হ'য়ে একটা দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হ'ল।

যে-দিনটির কথা বলছি, সেটি অক্টোবর মাসের চব্বিশ তারিখ। সেদিন পেনক্র্যাফ্‌ট একাই তার ফাঁদগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখতে গিয়েছিল। দেখা গেল যে তিন-তিনটে প্রাণী ধরা পড়েছিল। তাই দেখে পেনক্র্যাফ্‌ট তো আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠল। সেই তিনটে প্রাণী হ'ল একটি স্ত্রী-পিকারি, আর দুটো খুব বাচ্চা।

পেনক্র্যাফ্‌ট হৈ-হৈ করতে-করতে তার শিকার নিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরল, ও বারকয়েক 'হুরে-হুরে ব'লে চ্যাচালে। তার শিকার দেখে অন্যরাও, বলা বাহুল্য, খুশি হ'য়ে উঠতে একটুও দেরি করলেন না।

পেনক্র্যাফ্‌ট চেঁচিয়ে বললে : 'আজ আমাদের রীতিমতো একটা ভোজ হবে, ক্যাপ্টেন! আর মিস্টার স্পিলেট, আশা করি আপনিও আমাদের সঙ্গে আহারে বসে যৎসামান্য মুখে দেবেন।'

'আপনার নেমন্তন্ন পেয়ে আমি খুব সুখী হলুম, পেনক্র্যাফ্‌ট সাহেব!' স্পিলেট বললেন : 'কিন্তু আজকের "মেনু"র প্রধান আকর্ষণটা কী বলুন তো?'

'বাচ্চা পিকারির মাংস!'

'বাচ্চা পিকারির মাংস! আমি তো তোমার চ্যাচামেচি শুনে মনে করছিলুম না-জানি কী শিকার ক'রে এনেছো!'

'আরো চাই!' পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'আপনি দেখছি বাচ্চা পিকারির মাংস খেতে হবে শুনে নাক সিঁটকোচ্ছেন!'

'না, সে-কথা নয়। আমার বক্তব্য হ'ল কারুই বেশি খাওয়া উচিত নয়।' স্পিলেট বললেন : 'দ্বীপে তো আর ডাক্তার নেই! বেশি খেয়ে অসুখ বাধিয়ে বসাটা খুব-একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

'সে-কথা ঠিক। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, সাত মাস আগে আমরা যখন এ-দ্বীপে এসে পৌঁছুই, তখন এ-রকম শিকার দেখলে পর আপনি স্বয়ং হৈ-চৈ বাধিয়ে বসতেন।'

সাংবাদিক-সুলভ গাম্ভীর্য এনে আপ্তবাক্য আওড়ালেন স্পিলেট : 'মানুষ কখনো কোনো অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হয় না, পেনক্র্যাফ্‌ট।'

'আপনার বক্তৃতা বাদ দিন!' পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'আমি জানি নেবের রান্নার কল্যাণে আজকের ভোজটা জমবে ভালো। এই ছোট্ট দুটো পিকারির বয়স তিন মাসের বেশি কোনোমতেই হবে না। সুতরাং খেতে চমৎকার লাগবে। এসো নেব্‌, এসো আজ আমি নিজেই রান্নার তদারক করবো।'

নেব্‌ আর পেনক্র্যাফ্‌ট তক্ষুনি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

রাত্তির বেলা গ্র্যানাইট হাউসের ডাইনিং রুমে রীতিমত ভোজসভা ব'সে গেল। মাংসটা চমৎকার রান্না করেছে নেব্‌। পেনক্র্যাফ্‌ট অবিশ্যি বললে যে সে না-থাকলে কক্‌খনো নেব্‌

এত ভালো রান্না করতে পারতো না।

প্রত্যেকের প্লেটেই বিপুল পরিমাণ মাংস দেয়া হ'ল। সত্যি, বাচ্চা পিকারিগুলো চমৎকার লাগল খেতে। পেনক্র্যাফ্‌ট বড়ো একটুকরো মাংস তুলে মুখে পুরল আর পরক্ষণেই প্রচণ্ড চেঁচিয়ে উঠল। আর্ত স্বরে একটা শপথ ক'রে উঠল সে।

'কী হ'ল আবার?' জিগেস করলেন সাইরাস হার্ডিং।

'কী হ'ল?' পেনক্র্যাফ্‌ট বললে: 'হবে আবার কী? আমার একটা দাঁত ভেঙে গেছে!'

'তোমার মাংসে পাথরের কুচি ছিল?' গিডিয়ন স্পিলেট প্রশ্ন করলেন।

'তা-ই তো মনে হচ্ছে!' এই ব'লে পেনক্র্যাফ্‌ট মুখের ভিতর থেকে তার দাঁত-ভাঙার কারণটি বার করলে। কিন্তু—

কিন্তু জিনিশটা পাথরের কুচি নয়—একটা বন্দুকের গুলি!!

————

দ্য মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড ২

পরিত্যক্ত

১

আরেকটা রহস্যময় ঘটনা

ঠিক সাত মাস আগে বেলুন-যাত্রীর দল মার্কিন মুলুক থেকে গৃহযুদ্ধের একেবারে মাঝখানে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে এসে পড়েছিলেন। সেই সময়টুকুর মধ্যে তাঁরা যতদূর অনুসন্ধান করেছেন, তার মধ্যে কোনো মানুষ চোখে পড়েনি। দ্বীপে যে কোনো মানুষ থাকে, তার কোনো প্রমাণ এর মধ্যে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া, দ্বীপে যে কোনোকালে কোনো মানুষ পদার্পণ করেনি, দ্বীপের চারদিক ঘুরে সেই ধারণাই তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁদের সেই বদ্ধমূল ধারণা ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। পেনক্র্যাফটের দাঁত যা ভেঙেছে তা একটি বুলেট, আর বুলেটটি নিঃসন্দেহে কোনো বন্দুক থেকে বেরিয়ে এসেছে। আর, মনুষ্যেতর কোনো প্রাণী নিশ্চয়ই বন্দুক ব্যবহার করে না।

পেনক্র্যাফ্‌ট যখন বুলেটটি টেবিলের উপর রাখলে, সবাই বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই ঘটনা থেকে যে-সব ব্যাপার ঘটবার সম্ভাবনা আছে, নিমেষের মধ্যে তাও একের পর এক তাঁদের মনে জেগে উঠল। অতিপ্রাকৃত কোনো-কিছু ঘটলেও বোধহয় তাঁরা এত বিমূঢ় হ'য়ে পড়তেন না। সাইরাস হার্ডিং বুলেটটা হাতে তুলে নিলেন, বারকয়েক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন সীসের বলটি, হাতের তালুতে বারকয়েক গড়িয়ে নিলেন, তারপর পেনক্র্যাফটের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'তুমি ঠিক জানো, যে-পিকারিটি এই বুলেটে আহত হয়েছে সেটির বয়েস তিন মাসের বেশি হবে না?'

'অসম্ভব।' পেনক্র্যাফ্‌ট উত্তর করলে: 'পিকারিটির বয়স কোনোমতেই তিন মাসের বেশি হ'তে পারে না। ফাঁদে যখন এটিকে আমি দেখতে পাই, তখনও এ মায়ের দুধ খাচ্ছিল।'

'হুঁ!' আরো গম্ভীর হ'ল হার্ডিং-এর মুখ। 'তাই থেকে প্রমাণ হয় যে তিন মাসের মধ্যে অন্তত একবার এই দ্বীপে গুলি ছোঁড়া হয়েছে!'

'এবং সেই গুলিতে একটি প্রাণী আহত হয়েছে।' স্পিলেট যোগ করলেন।

'তার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।' বললেন সাইরাস হার্ডিং: 'এই ঘটনা থেকে এইসব ধারণা করা যায় যে, আমাদের আসবার আগেও দ্বীপে কোনো মানুষ ছিল, কিংবা তিন মাসের মধ্যে কোনো ব্যক্তি এই দ্বীপে এসে পৌঁছেছে। এই লোকগুলো কিংবা লোকটি কি প্রায়ই এখানে আসে, না হঠাৎ কোনো জাহাজডুবির ফলে এসে পৌঁছেছে, সে-প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সেই লোকেরা ইওরোপীয় কিংবা মালয় বোম্বেটে, শত্রু কিংবা মিত্র—যা-ই হোক-না কেন, আগে থেকে কিছু আন্দাজ করবার কোনো উপায় নেই। এখনও তারা এই দ্বীপে আছে, না দ্বীপ ছেড়ে চ'লে গেছে, তাও আমরা জানি না।

কিন্তু এই প্রশ্নগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ যে, যে ক'রেই হোক শিগগিরই এর উত্তর আমাদের পেতেই হবে ।'

'অসম্ভব ।' পেনক্র্যাফ্‌ট তড়াক ক'রে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল : 'আমরা ছাড়া লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে আর-কোনো লোক থাকে না, থাকতে পারে না ! দ্বীপটা তো আর খুব বড়ো নয় ! যদি অন্য লোকেরা এই দ্বীপে থাকত, তবে এতদিনে নিশ্চয়ই অন্তত তাদের একজনেরও দেখা আমরা পেতুম ।'

'না-থাকলেই ভালো । কিন্তু বিপরীতটা অত্যন্ত বিস্ময়কর হ'লেও বাস্তব হ'তে পারে ।' হার্বার্ট বললে ।

'যদি মনে করতে হয় যে পিকারিটি তার দেহে একটি বুলেট নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল, তবে তা-ই হবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ।' স্পিলেট বললেন ।

হার্ডিং বললেন : 'এ-কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্যি যে, তিন মাসের মধ্যে অন্তত একটি বন্দুক এই দ্বীপে গ'র্জে উঠেছে । নিশ্চয়ই অল্পদিনের মধ্যে এই দ্বীপে জনসমাগম হয়েছে, কেননা মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের চূড়ো থেকে যখন আমরা সারা দ্বীপ পর্যবেক্ষণ করেছিলুম, তখন যদি কেউ এই দ্বীপে থাকতো তবে নিশ্চয়ই তা দেখতে পেতুম । এমনও হ'তে পারে, কয়েক হপ্তার মধ্যে জাহাজডুবি হয়ে কোনো-কেউ এই দ্বীপে এসে উঠেছে । তবে এখনও কিছু ঠিক ক'রে বলা চলে না ।'

'আমাদের খুব সাবধান হ'তে হবে ।' সাংবাদিকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ।

'আমিও তাই বলি,' বললেন হার্ডিং, 'কেননা, মালয় দস্যুরাও এ-দ্বীপে আসতে পারে ।'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'সারা দ্বীপ আমাদের খুঁজে দেখতে হবে । কিন্তু তার আগে একটা ক্যানু তৈরি করলে ভালো হয় না কি, ক্যাপ্টেন ? এর সাহায্যে আমরা নদীপথেও অনুসন্ধান চালাতে পারবো—দ্বীপের উপকূলভাগও ঘুরে দেখতে সুবিধে হবে ।'

'তোমার পরিকল্পনা খুব ভালো, কিন্তু আমরা সেজন্যে অপেক্ষা করতে পারি না । একটা চলনসই নৌকো বানাতে কম ক'রেও একমাস সময় লাগবে ।'

'হ্যাঁ, যদি একটা সত্যিকার ভালো নৌকো তৈরি করি । কিন্তু আমরা তো আর সমুদ্রযাত্রা করছি না । মার্সি নদীতে চলাচলের উপযোগী একটা ক্যানু তৈরি করতে পাঁচদিনের বেশি সময় লাগবে না ।'

'পাঁচ দিন লাগবে একটা নৌকো বানাতে ?' নেব্‌ চেঁচিয়ে উঠল ।

'হ্যাঁ, নেব্‌ । রেড-ইণ্ডিয়ানদের ধরনের একটা নৌকো বানাতে এর বেশি সময় লাগবে না ।'

'কাঠের নৌকো ?' তখনো নেবের কৌতূহল অপগত হয়নি ।

'হ্যাঁ, কাঠের নৌকো । আমি আবারও বলছি ক্যাপ্টেন, পাঁচ দিনের মধ্যেই কাজ শেষ হ'য়ে যাবে ।'

'যদি পাঁচদিনের মধ্যে তৈরি করা যায়, তাহ'লে ভালো ।' হার্ডিং বললেন : 'কিন্তু এ-কদিন আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে । গ্র্যানাইট হাউসের আশপাশের অরণ্যের মধ্যেই এ-কদিন তোমাদের শিকার সীমাবদ্ধ রাখতে হবে ।'

পেনক্র্যাফ্‌টের আশা আর পূর্ণ হ'ল না। তার ভোজ-পর্ব অবশ্য তারপরে নিরাপদভাবেই শেষ হ'ল। তাহ'লে এই দ্বীপে এঁরা ছাড়াও অন্য লোক আছে। বুলেট যখন পাওয়া গেছে, তখন আর এই সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এবং এই আবিষ্কারে এঁদের আশঙ্কা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেল।

সাইরাস হার্ডিং আর গিডিয়ন স্পিলেট ঘুমোতে যাওয়ার আগে ব্যাপারটা সম্পর্কে খানিকক্ষণ আলোচনা করলেন। এই ঘটনার সঙ্গে কি দ্বীপে-ঘ'টে-যাওয়া রহস্যময় ঘটনাগুলোর কোনো সম্পর্ক আছে ? খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ব্যাপারটা সম্পর্কে আলোচনা ক'রে হার্ডিং বললেন : 'ভালো কথা, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনি কি আমার অভিমত জানতে চান ? আমার অভিমত হ'ল, যত আঁতি-পাঁতি ক'রেই দ্বীপটা আমরা খুঁজে দেখি না কেন, আমরা কিন্তু কিছুই দেখতে পাবো না।'

পরদিনই পেনক্র্যাফ্‌ট তার কাজে লেগে গেল। মার্সি নদীতে চলাচলের উপযোগী ছোটোখাটো একটা সাধারণ ক্যানু বানাবে বলেই ঠিক করেছিল সে। ঝড়ে অরণ্যের অনেকগুলো বড়ো-বড়ো গাছ উপড়ে পড়েছিল, সুতরাং কাঠের জন্যে ওঁদের আর ভাবতে হ'ল না।

সেইদিনই হার্বার্ট একটি খুব উঁচু গাছের আগায় উঠে সারা দ্বীপটা তন্ন-তন্ন ক'রে দেখেছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য, সন্দেহজনক কিছুই তার চোখে পড়েনি। অনেকক্ষণ ধ'রে সে চারদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেছিল। কিন্তু না, কোথাও কিছুই নেই।

সাইরাস হার্ডিং চুপচাপ হার্বার্টের অনুসন্ধানের ফলাফল শুনলেন, তারপর বারকয়েক মাথা ঝাঁকালেন ; কিন্তু কিছুই বললেন না। বোঝা গেল, গোটা দ্বীপটা তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে না-দেখলে এই সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত করা চলবে না।

এর দু-দিন পরেই, আটাশে অক্টোবর এমন-একটি ঘটনা ঘটল যে তার জন্যে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুবই জরুরি হ'য়ে পড়ল। গ্র্যানাইট হাউস থেকে দু-মাইল দূরে সমুদ্র-সৈকতে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে অকস্মাৎ হার্বার্ট আর নেব্‌ একটি বিরাটাকার কচ্ছপ দেখতে পেলো। দেখেই হার্বার্ট চেঁচিয়ে উঠল : 'নেব্‌ শিগগির এসে আমায় সাহায্য করো !'

নেব্‌ দৌড়ে হার্বার্টের কাছে এসে দাঁড়াল। 'কী বিরাট জানোয়ারটা ! কিন্তু কী ক'রে এটাকে ধরা যায় ?'

'এর চেয়ে সোজা আর-কিছু নেই, নেব্‌।' উত্তর করলে হার্বার্ট : 'যদি আমরা কোনোমতে এটাকে উলটে ফেলতে পারি, তবে এটা আর পালাতে পারবে না। তাড়াতাড়ি তোমার কুড়ুলটা নিয়ে এসো তো !'

বিপদ বুঝতে পেরেই কচ্ছপটা তার পাগুলো আর মুখটা ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। হার্বার্ট আর নেব্‌ তাদের কুড়ুল কচ্ছপটার দেহের নিচে ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে ওটাকে উলটে ফেললে। কচ্ছপটা প্রায় তিন ফুট লম্বা, আর তার ওজন হবে প্রায় চারশো পাউণ্ড।

'চমৎকার !' নেব্‌ চেঁচিয়ে উঠল : 'পেনক্র্যাফ্‌ট এটার কথা জানতে পারলেই আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠবে। কিন্তু এখন এটাকে নিয়ে কী করা যায় ? যে-রকম ওজন, তাতে এটাকে গ্র্যানাইট হাউসে তো নিয়ে যেতে পারবো না !'

'এখানেই প'ড়ে থাক।' উত্তর করলে হার্বার্ট: 'একবার যখন এটাকে উলটে ফেলতে পেরেছি, তখন এটা আর-কখনও পালাতে পারবে না। কাঠের গাড়িটা এনে এটাকে গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে যাওয়া যাবে।' কাজের সুবিধের জন্যে হার্ডিং-এর নির্দেশে তারা একটা কাঠের গাড়ি আগেই প্রস্তুত ক'রে নিয়েছিল।

ফিরে-যাওয়ার আগে হার্বার্ট আর নেব্ কচ্ছপটার চারপাশে বড়ো-বড়ো কয়েকটা পাথর দিয়ে একটা দেয়ালের মতো তৈরি করলে। তারপর সমুদ্রে-সৈকত ধ'রে-ধ'রে ওরা দুজনে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এল। পেনক্র্যাফ্টকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেয়ার জন্যে হার্বার্ট কচ্ছপটার খবর আর কারু কাছে ভেঙে বললে না। দু-ঘণ্টা পরে ওরা দুজনে কাঠের গাড়ি নিয়ে সমুদ্র-সৈকতে ফিরে এলো। কিন্তু, কী আশ্চর্য! কচ্ছপটাকে আর সেখানে দেখা গেল না। অবাক হ'য়ে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকালে। পাথরগুলো তখনও সে-জায়গায় প'ড়ে আছে, কিন্তু কচ্ছপটারই শুধু দেখা নেই।

নেব্ বললে: 'তাহ'লে এই জন্তুগুলো আপনা-আপনিই উলটে যেতে পারে?'

'তা-ই তো দেখা যাচ্ছে!' হতবুদ্ধি হ'য়ে বললে হার্বার্ট: 'এটা এমনিভাবে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে শুনে নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন হার্ডিংও হতভম্ব হ'য়ে যাবেন।'

নেব্ ঠিক ক'রে ফেললে তাদের এই দুর্ভাগ্যের কথা কাউকে বলবে না। সে বললে: 'এই ব্যাপারটা কাউকে বলা চলবে না।'

'না নেব্, বরং ঠিক তার উলটো। এই ব্যাপারটা বলতেই হবে আমাদের।' বললে হার্বার্ট।

তারপর দুজনে খালি গাড়িটাই ঠেলতে-ঠেলতে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলো। হার্ডিং, স্পিলেট আর পেনক্র্যাফ্ট তখন নৌকোর কাজে ব্যস্ত। কী-কী ঘটেছে, সংক্ষেপে হার্বার্ট সবাইকে খুলে বললে। পেনক্র্যাফ্ট তো শুনেই চেঁচিয়ে উঠল: 'মহামূর্খ!'

'কিন্তু—' নেব্ বললে: 'আমাদের কোনো দোষ নেই! আমরা ওটাকে উলটে রেখে এসেছিলুম।'

'তাহ'লে তোমরা ভালো ক'রে উলটে রাখোনি।' বললে পেনক্র্যাফ্ট।

তখন হার্বার্ট খুলে বললে কচ্ছপটা যাতে পালাতে না-পারে তার জন্যে কী সতর্ক ব্যবস্থা তারা অবলম্বন করেছিল।

শুনে পেনক্র্যাফ্ট বললে: 'ব্যাপারটা তাহ'লে সম্পূর্ণ অলৌকিক!'

'ক্যাপ্টেন, আমি ভেবেছিলুম,' হার্বার্ট বললে, 'একবার কচ্ছপদের উলটে দিতে পারলে তারা আর-কখনো পালাতে পারে না।'

'সে-কথা সত্যি।' হার্ডিং বললেন: 'আচ্ছা, বলো তো সমুদ্র থেকে কত দূরে তোমরা ওটাকে উলটে রেখে এসেছিলে?'

'খুব বেশি হ'লে পনেরো ফুট দূরে হবে।'

'তখন ভাঁটার সময়, না?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন।'

হার্ডিং বললেন: 'বালির মধ্যে কচ্ছপরা যা করতে পারে না জলের মধ্যে তা পারে। জোয়ার এলে পর জলের মধ্যে এটা হয়তো নিজেই উলটে গিয়েছিল, তারপর আস্তে-আস্তে

গভীর সমুদ্রে চ'লে গেছে ।'

'কী গর্দভ আমরা !' নেব্ বললে : 'এই সোজা ব্যাপারটাও আমরা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি ।'

পেনক্র্যাফ্ট বললে, 'ঠিক এই কথাটাই আমি তোমাদের বলতে যাচ্ছিলুম ।'

সাইরাস হার্ডিং যে-ব্যাখ্যাটা দিলেন, নিঃসন্দেহে তা গ্রহণযোগ্য । কিন্তু তিনি নিজেই কি সেই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ? এমন কথা কোনোমতেই বলা চলে না ।

...

নয়ই অক্টোবর ক্যানুটা তৈরি হ'য়ে গেল । পেনক্র্যাফ্ট তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে, পাঁচ দিনের মধ্যেই ক্যানু সম্পূর্ণ করেছে । লম্বায় বারো ফুট হবে ক্যানুটা, আর ওজনে কোনোমতেই দুশো পাউণ্ডের বেশি নয় । ক্যানুটাকে জলে ভাসাতে কোনো অসুবিধেই হ'ল না । ক্যানুটাকে ব'য়ে নিয়ে-যাওয়া হ'ল তীরের বেলাভূমিতে—ভরা জোয়ারের সময় আপনা থেকেই জলে ভাসল ক্যানুটা । পেনক্র্যাফ্ট উৎফুল্ল কণ্ঠে জানালে যে ভালোভাবেই কাজ সাঙ্গ হয়েছে । প্রথমে একে পরীক্ষা ক'রে দেখা হবে ঠিক হ'ল ।

সবাই গিয়ে বসলেন ক্যানুতে । পেনক্র্যাফ্ট ক্যানু ছেড়ে দিলে । আবহাওয়া তখন চমৎকার । জলও শান্ত । নিরাপদেই ক্যানুটা মার্সি নদীর ধীর স্রোতে এগিয়ে চলল । হার্বার্ট আর নেব্ বৈঠা চালাতে লাগল, আর পেনক্র্যাফ্ট হাল ধ'রে ব'সে রইল । দক্ষিণ থেকে একটু হালকা হাওয়া বইছিল । দুই বৈঠার জোরে অনায়াসেই এগিয়ে চলতে লাগল ক্যানু । গিডিয়ন স্পিলেট একহাতে পেনসিল অন্য হাতে নোটবুক নিয়ে আলতোভাবে তীরের একটা স্কেচ ক'রে চলছিলেন ।

নেব্, হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফ্ট দ্বীপের এই নতুন অংশে ভ্রমণ করতে-করতে কথা বলছিল । সাইরাস হার্ডিং নিঃশব্দে তীরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন । তাঁর দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোনো আশ্চর্য দেশে এসে পড়েছেন ।

প্রায় পৌনে-এক ঘণ্টা চলবার পর ক্যানু ম্যাণ্ডিবল অন্তরীপের একেবারে সম্মুখবিন্দু পর্যন্ত এসে পৌঁছুল । পেনক্র্যাফ্ট তখন ফেরবার উদ্যোগ করতে লাগল । এমন সময় হার্বার্ট উঠে দাঁড়িয়ে একটা কালো জিনিশের দিকে তর্জনী নির্দেশ ক'রে বললে 'তীরের ওই জিনিশটা কী, বলুন তো ?'

তক্ষুনি নির্দিষ্ট দিকে তাকালেন সকলে । সাংবাদিক বললেন : 'কিছু-একটা আছে ওখানে । মনে হচ্ছে কোনো জাহাজের ভাঙা টুকরো ।'

'আমি দেখতে পেয়েছি জিনিশটা !' চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফ্ট : 'সিন্দুক, সিন্দুক ! মনে হয় জিনিশপত্রে ভরা !'

সাইরাস হার্ডিং বললেন, 'তীরে নৌকো ভেড়াও ।'

বারকয়েক বৈঠা চালানোর পর নৌকো এসে ঠেকল । সবাই তীরে নামলেন । না, পেনক্র্যাফ্ট কোনো ভুল করেনি । দুটো সিন্দুক সেই তীরের বালুরাশির মধ্যে অর্ধপ্রোথিত হ'য়ে প'ড়ে আছে ।

হার্বার্ট বললে : 'তাহ'লে এই দ্বীপের কোনো অংশে জাহাজডুবি হয়েছে !'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে,' উত্তর করলেন স্পিলেট ।

সদা-অস্থির পেনক্র্যাফ্‌টের কৌতূহল আর-কোনো বাধা মানল না। 'কিন্তু কী আছে এই সিন্দুকে ? কী আছে ? বন্ধ দেখছি সিন্দুকটা—খুলবো কী ক'রে ? একটা বড়ো-শড়ো পাথরের টুকরো দিয়ে অবিশ্যি—'এই ব'লে সে বড়ো একটা পাথর তুলে নিলে হাতে।

তক্ষুনি হার্ডিং তাকে বাধা দিলেন : 'পেনক্র্যাফ্‌ট,' বললেন তিনি : 'একঘণ্টার জন্যেও কি তুমি একটু সুস্থির হ'তে পারবে না ?'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন, ভাবুন তো—হয়তো এখানে আমাদের অভাব মেটানোর উপযোগী সবকিছুই আছে !'

'সে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবো, পেনক্র্যাফ্‌ট,' উত্তর করলেন হার্ডিং : 'কিন্তু এখন সিন্দুকটা ভাঙবার কোনো দরকার নেই। আর-কিছু কাজে লাগুক না-লাগুক, ভেঙে এটাকে নষ্ট করবে কেন ? আগে গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে যাই, সেখানে সহজেই সিন্দুক না-ভেঙে খোলবার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'ঠিক', বললে পেনক্র্যাফ্‌ট, 'আপনার কথাই ঠিক, ক্যাপ্টেন।'

তখন সিন্দুক দুটিকে জলে ভাসিয়ে দেয়া হ'ল, তারপর বেঁধে দেয়া হ'লো ক্যানু সঙ্গে। এইভাবে সহজেই ভাসিয়ে-ভাসিয়ে সিন্দুকদুটিকে গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে যাওয়া যাবে—অনেক পরিশ্রমও বাঁচবে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হ'ল, এই সিন্দুক দুটি এলো কোত্থেকে ? চারদিক আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজে দেখলেন সকলে। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই কোনো জাহাজডুবি হয়েছে। বুলেটের সঙ্গে কি এই জাহাজডুবির কোনো সম্পর্ক আছে ? দ্বীপের অন্য-কোনো অংশে কি নতুন-কোনো আগন্তুক দলের আবির্ভাব ঘটেছে ? এখনও আছে কি তারা এখানে ? তবে এ-কথা ঠিক যে, এই আগন্তুকরা মালয় বোম্বেটে নয়, কেননা সিন্দুকের গড়ন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, এর নির্মাতা কোনো মার্কিন কিংবা ইওরোপীয়।

গ্র্যানাইট হাউসে এনে সিন্দুক দুটিকে অতি সন্তর্পণে খোলা হ'ল। সিন্দুক দুটি তখনও খুব ভালো অবস্থায় ছিল, তাতে বোঝা গেল যে খুব বেশিক্ষণ জলে ভাসেনি। সিন্দুক খুলতে গিয়ে বোঝা গেল যে, যাতে স্যাঁৎসেতে না-হ'য়ে যায় সেইজন্যে খুব ভালো ক'রে প্যাক করা হয়েছিল।

সিন্দুকের ডালা খুলতেই সবাই একসঙ্গে ঝুঁকে পড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন। এমন-কোনো জিনিশ নেই যা এই সিন্দুকে নেই। যেন দ্বীপবাসীদের সুবিধের দিকে নজর রেখেই কেউ জিনিশপত্রগুলো সিন্দুকে থরে-থরে সাজিয়ে রেখেছে। যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার তৈরির সূক্ষ্ম কলকব্জা, কাপড়-চোপড় বই-পত্র-কী-যে ওই সিন্দুক দুটোয় নেই তা ভেবে বলা অসম্ভব। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্পিলেট তাঁর নোটবইয়ে জিনিশ-পত্রগুলোর একটা তালিকা তৈরি ক'রে ফেললেন। সেই ফিরিস্তিতে কী-কী ছিল পাঠকদের সুবিধের জন্যে তা হুবহু নিচে তুলে দেয়া হ'ল :

যন্ত্রপাতি : একাধিক-ফলাওলা তিনটি ছুরি, দুটি কুঠার, দুটি করাত, তিনটি হাতুড়ি, স্কেল, দুটি অ্যাজ (adzes), একটি শাবল, ছ-টি চিজেল, দুটি ফাইল, তিনটি র‍্যাঁদা, দুটি খুন্তি, দশটি ব্যাগ-ভর্তি পেরেক আর স্ক্রু, বিভিন্ন আকারের তিনটি দা, দু-বাক্স সূঁচ।

হাতিয়ার : দুটি ফ্লিন্ট-লক বন্দুক, দুটি কার্তুজ বন্দুক, দুটি হালকা ওজনের রাইফেল,

পাঁচটি বড়ো কুঠার, চারটি কৃপাণ, পঁচিশ পাউণ্ড ওজনের দুটি বাক্স-ভর্তি বারুদ, বারোটি কার্তুজের বাক্স ।

সূক্ষ্ম কলকব্জা : একটি সেক্সটান্ট, একটি অপেরা-গ্লাস, একটি টেলিস্কোপ, একবাক্স জ্যামিতিক যন্ত্রপাতি, একটি নাবিকদের কম্পাস, একটি ফারেনহাইট থার্মোমিটার, একটি ব্যারোমিটার, একটি বাক্সের মধ্যে ফোটো তোলবার সব সরঞ্জাম ।

কাপড়-চোপড় : দু-ডজন শার্ট—দেখে মনে হয় পশমের তৈরি—আসলে কোনো অজ্ঞাত উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত, ঐ জিনিশেরই তিন ডজন মোজা, আর কয়েক-জোড়া দস্তানা ।

রান্নাবান্নার জিনিশ : একটি লোহার কড়াই, দুটি সস্‌প্যান, তিনটি ডিশ, দশটি ধাতুনির্মিত থালা, দুটি কেটলি, একটি স্টোভ, দু-প্রস্থ ছুরি-কাঁটা ।

বইপত্র : একটি বাইবেল, একটি পৃথিবীর মানচিত্র, বিভিন্ন পলিনেশীয় ইডিয়মের একটি অভিধান, একটি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অভিধান (ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ), তিন রীম শাদা কাগজ, দুটি মোটা বাঁধানো খাতা—তবে প্রত্যেকটির পাতাই শাদা ।

'এ-কথা মানতেই হবে,' বললেন স্পিলেট : 'এই সিন্দুকের মালিক যিনি ছিলেন, তিনি একজন ব্যবহারিক মানুষ । যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, অস্ত্রশস্ত্র, জামা-কাপড়, রান্নাবান্নার জিনিশ, পুঁথিপত্র—সবকিছুই তিনি সিন্দুকে ভরেছিলেন । তিনি বোধহয় আগে থেকেই আঁচ করেছিলেন যে জাহাজডুবি অনিবার্য, আর সে-জন্যেই আগে থাকতে প্রস্তুত হ'য়ে ছিলেন ।'

গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করলেন হার্ডিং : 'আর-কিছুই চাইবার নেই ! হুঁ !'

'আর-একটা জিনিশও মানতেই হবে,' বললে হার্বার্ট : 'সিন্দুকের মালিক কোনোক্রমেই কোনো মালয় বোম্বেটে নয় । এমনও হ'তে পারে, কোনো মার্কিন বা ইওরোপীয় জাহাজ এ-অঞ্চলে ঝঞ্ঝা-তাড়িত হ'য়ে এসেছিল, তখন দরকারি জিনিশপত্র রক্ষা করবার জন্যে যাত্রীরা এইগুলি সিন্দুকে ভরেছিল । আপনি কী বলেন, ক্যাপ্টেন ?'

'খুব সম্ভব তোমার কথাই ঠিক ।' বললেন সাইরাস হার্ডিং : 'জাহাজডুবির সম্ভাবনা দেখা দেয়াতেই হয়তো ওই জিনিশপত্রগুলো সিন্দুকে ভরা হয়েছিল ।'

'ফোটো তোলবার সরঞ্জামগুলো পর্যন্ত ?' পেনক্র্যাফ্‌ট বিস্মিত কণ্ঠে বললে ।

'সত্যি-বলতে কি, ফোটো তোলবার সরঞ্জামগুলো বাক্সে ঢোকানোর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে, তা আমি আন্দাজ করতে পারছি না । তার চেয়ে আরো গুলিবারুদ কিংবা কাপড়-চোপড় বেশি দরকারি ।'

'আচ্ছা,' সাংবাদিকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল : 'এই জিনিশপত্রগুলোর মালিক বা নির্মাতার নাম-ধাম দেখলে হয় না ?'

তখন প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র তন্নতন্ন ক'রে পরীক্ষা করা হ'ল, কিন্তু কোথাও নির্মাতার কোনো নাম-ঠিকানা পাওয়া গেল না । ব্যাপারটা রহস্যময় । বিশেষ ক'রে অস্ত্রশস্ত্রে নির্মাতার নাম-ধাম পাওয়া যাওয়ার কথা, কিন্তু সেখানেও কিছু লেখা নেই । আরেকটা আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল, প্রত্যেকটি জিনিশই আনকোরা নতুন—একেবারে চকচক করছে । আর এমনভাবে জিনিশগুলো সিন্দুকে সাজানো ছিল যে, বোঝা গেল ধীরে-সুস্থে একটি-একটি ক'রে প্রত্যেকটি জিনিশ সিন্দুকে ভরা হয়েছে । সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল যে

বইপত্রগুলোতে কোথাও প্রকাশক বা মুদ্রাকরের নাম দেখা গেল না। এ-রকমটা সচরাচর দেখা যায় না। সবমিলিয়ে গোটা ব্যাপারটাই সাইরাস হার্ডিং-এর কাছে কেমন-কেমন ঠেকল। কিন্তু যেখান থেকেই সিন্দুক দুটো আসুক না কেন, লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের অধিবাসীদের কাছে এদের মূল্য অসীম। অবশ্য এ-পর্যন্ত দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রভূত বুদ্ধি ও পরিশ্রমের দ্বারা তাঁরা উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় এটাই যে তাঁরা যেন জীবনযাত্রা অনায়াসে নির্বাহ করেন। নইলে অকস্মাৎ এই সিন্দুক দুটো পাওয়া যাবে কেন?

এত-সব জিনিশ পেয়েও পেনক্র্যাফ্‌ট অবিশ্যি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হ'ল না। তার মনে হ'ল, পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিশটাই সিন্দুকে নেই। তা হ'ল তামাক। সে বললে, 'অন্তত আধ পাউণ্ড তামাক যদি থাকতো তবে আমি একেবারে দুনিয়ার বাদশা হ'য়ে যেতে পারতুম?'

তার কথা শুনে না-হেসে পারলেন না কেউ।

এই সিন্দুক-দুটো হাতে আসবার দরুন একটা ব্যাপারে সবাই একমত হলেন: তন্নতন্ন ক'রে গোটা দ্বীপে অভিযান চালাতে হবে। ঠিক হ'ল, পরদিন ভোরবেলাতেই যাত্রা শুরু হবে। মার্সি নদীর একেবারে পশ্চিম প্রত্যন্তে পৌঁছুতে হবে। যদি জাহাজডুবির ফলে কোনো ভাগ্যহত এই দ্বীপে উঠে থাকে, তবে সম্ভবত সে রসদবিহীন। সুতরাং অবিলম্বে তাকে সাহায্য করা কর্তব্য।

ওই নতুন জিনিশপত্রগুলো গোছগাছ ক'রে গ্র্যানাইট হাউসে রাখতে-রাখতেই বাকি দিনটুকু কেটে গেল।

এই দিনটা—এই উনত্রিশে অক্টোবর—ছিল রবিবার। রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে হার্বার্ট হার্ডিংকে অনুরোধ করলে বাইবেল থেকে একটা অংশ প'ড়ে শোনাতে। হার্ডিং বাইবেলটা হাতে নিয়ে যেই খুলতে যাবেন অমনি পেনক্র্যাফ্‌ট বললে: 'দাঁড়ান, ক্যাপ্টেন, একটু থামুন। আমার একটা কুসংস্কার আছে। বইটার যে-কোনো পাতা খুলে, প্রথম যেখানে আপনার চোখ পড়ে সে-জায়গাটা প'ড়ে শোনান। আমাদের এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় কি না মিলিয়ে দেখা যাক।'

পেনক্র্যাফ্‌টের কথা শুনে হার্ডিং একটু হাসলেন। তারপর চোখ বুজে বইটা খুললেন। আগে থেকেই যেন কেউ ওই পাতাটা চিহ্নিত ক'রে রেখেছিল, তা চোখ খুলেই বুঝতে পারলেন হার্ডিং। প্রথমেই তাঁর চোখ পড়ল, পেনসিলের দাগ-দেয়া একটি শ্লোকের উপর। সেণ্ট ম্যাথুর সুসমাচারের সপ্তম অধ্যায়ে আছে সেই শ্লোকটি। উদাত্ত কণ্ঠে হার্ডিং শ্লোকটি পাঠ করলেন: 'যে প্রার্থনা করে, পূর্ণ হয় তার সর্ব কামনা; যে পরিশ্রম করে, সে প্রাপ্ত হয় তার সর্ব-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।'

২

আরো আশ্চর্য ঘটনা

পরদিন তিরিশে অক্টোবর সবাই অভিযানের জন্যে তৈরি হলেন। দ্বীপবাসীরা এখানে এসে বর্তমানে এমন অবস্থায় পৌঁছেছেন যে, এখন আর অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন তাঁদের নেই, বরং তাঁরাই অন্যদের সাহায্য করতে পারেন। মার্সি নদী বেয়ে যত-দূর-সম্ভব ততদূর পর্যন্তই তাঁরা যাবেন ব'লে ঠিক হ'লো। অস্ত্রশস্ত্র, রসদপত্র সব ক্যানুতে ওঠানো হ'লো। দুটো কুঠার নেয়া হ'লো যাতে ঘন অরণ্যের মধ্যে পথ ক'রে চলা যায়। আর নেয়া হ'ল টেলিস্কোপ আর পকেট-কম্পাস। যাত্রার আগে সাইরাস হার্ডিং সবাইকে সতর্ক ক'রে দিলেন এই ব'লে যে, বন্দুক সঙ্গে নেয়ায় তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু একটি গুলিও যেন বাজে খরচ করা না-হয়।

ছ-টার সময় সবাই ক্যানুতে উঠলেন। টপও সঙ্গে চলল। তারপর মার্সি নদীর মুখ থেকে দ্বীপের নতুন অংশের দিকে এগিয়ে চলল ক্যানু। ঘণ্টা-দেড়েক আগেই জোয়ার শুরু হয়েছিল। সুতরাং ক্যানু দ্রুতবেগেই গন্তব্যস্থানের দিকে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ বাদে নদী আস্তে-আস্তে একটু-একটু ক'রে প্রসারিত হচ্ছে ব'লে মনে হ'ল। দু-দিকে চিরহরিৎ উদ্ভিদের ঘন ঝোপ শূন্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে, মাঝখান দিয়ে ব'য়ে চলেছে নদী। তীরের সেই বন আর উঁচু ঝোপঝাড়ের জন্যে ক্যানু ছায়ার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিল।

কিছুদূর এগিয়ে ক্যানু থামল। তীরে নেমে চারদিকে খুঁজলেন তাঁরা। কিন্তু জনমানবের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। আবার তখন নৌকোয় উঠে সবাই এগিয়ে চললেন। এইভাবে চারদিক তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজতে-খুঁজতে এগুলেন সকলে। মাইল-চারেক যাওয়ার পর সবাই আবার তীরে নামলেন। ঘন অরণ্যের মধ্যে কুঠার দিয়ে পথ ক'রে নিয়ে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি হ'ল। এই নিয়ে চলতে-চলতে সপ্তম বার তীরে নামলেন তাঁরা। কিন্তু মানুষের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। পেনক্র্যাফ্‌ট এবার দুটো জ্যাকামার পাখি মারলে। এই পাখির নাম থেকে অরণ্যের নাম দেয়া হ'ল জ্যাকামার অরণ্য।

অভিযান এগিয়ে চলল। লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের পশ্চিম প্রত্যন্ত তখনো মাইল পাঁচেক দূরে। সাইরাস হার্ডিং একেবারে মার্সি নদীর শেষ সীমা পর্যন্ত অভিযান চালাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। হয়তো একেবারে দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে জাহাজডুবির ফলে ভাগ্যহত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

মার্সি নদীর তীরে এক ধরনের উঁচু গাছের সারি দেখতে পাওয়া গেল। এই গাছপালাগুলো প্রধানত অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, মধ্য ইওরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় দেখতে পাওয়া যায়। এইসব গাছকে ইংরেজিতে বলে ফিবার-ট্রি, বাংলায় তর্জমা করলে যার মানে দাঁড়ায়, জ্বর-গাছ। এই গাছগুলো জ্বরকে প্রতিরোধ করে ব'লেই এগুলোর এই নাম। মার্সি নদীর তীর ঘেঁসে জ্বর-গাছের সারি দূর পশ্চিমে এগিয়ে গেছে। তারই মধ্য দিয়ে আরো মাইল-দুয়েক এগিয়ে গেল ক্যানু।

ইতিমধ্যে বেলা গড়িয়ে আসছে। সাইরাস হার্ডিং বুঝতে পারলেন যে, একদিনের মধ্যে

কোনোরকমেই দ্বীপের পশ্চিম প্রত্যন্তে পৌঁছোনো যাবে না । সুতরাং তিনি ঠিক করলেন যে একটা সুবিধেমতো জায়গা বেছে রাত কাটানোর জন্যে তাঁবু ফেলবেন । ইতিমধ্যে মার্সি নদীর জল ক্রমশ অগভীর হ'য়ে পড়ছিল ভাঁটার দরুন ; অথচ তখনও আরো পাঁচ মাইলের মতো এগুনো বাকি । সুতরাং সেখানেই, সেই অজানা অরণ্য অঞ্চলেই, রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করবেন ব'লে ঠিক করলেন হার্ডিং ।

পেনক্র্যাফ্‌ট ক্যানু তীরের দিকে নিয়ে গেল । তীরের গাছপালার মধ্যে একঝাঁক বানর ব'সে কিচির-মিচির করছিল । বানরগুলো তাঁদের দেখতে পেয়েছিল । কিন্তু বানরদের হাবভাবে ভীতির কোনো চিহ্নই দেখা গেল না । স্পষ্টই বোঝা গেল যে, এই প্রথম তারা দ্বীপে মানুষের দেখা পেল ।

তখন বেলা চারটে বাজে । ক্যানু নিয়ে আর এগুনো প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ল । এদিকে তীরও ক্রমশ খাড়া হ'য়ে উঠেছে । হার্ডিং বুঝতে পারলেন যে তাঁরা ক্রমশই মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের পাদদেশের নিকটবর্তী হচ্ছেন । সুতরাং শিগগিরই তীরে নৌকো ভেড়ানো কর্তব্য ।

হার্বার্ট শুধোলে : 'এখন আমরা গ্র্যানাইট হাউস থেকে কত দূরে স'রে এসেছি ?'

'প্রায় মাইল-সাতেক,' উত্তর করলেন হার্ডিং : 'আন্দাজ ক'রে বলছি অবশ্য । স্রোতের টানে আমরা উত্তর-পশ্চিম দিকে এসেছি । আজ আমরা এখানে নৌকো ভিড়িয়ে রাতটা কাটাবো, আর কাল ভোরবেলাতেই নৌকো তীরে বেঁধে রেখে পায়ে হেঁটে চারদিকে ঘুরে-ফিরে দেখবো । পেনক্র্যাফ্‌ট, তুমি চেষ্টা ক'রে দ্যাখো, আরো-একটু এগুনো যায় কি না ।'

একটু পরেই হার্ডিং নৌকো থেকে জলপ্রপাতের গম্ভীর ধ্বনি শুনতে পেলেন । নদী এখানে প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া হবে ; আরো সামনে ক্রমশ সরু হ'য়ে গেছে । হার্ডিং-এর বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে তাঁরা একেবারে মার্সি নদীর উৎসমুখের কাছে এসে পৌঁছেছেন ।

তখন বিকেল পাঁচটা । শেষ বিকেলের সোনালি রশ্মি মার্সির উৎসমুখের জলে প'ড়ে ঝিকমিক করছে । একটু দূরেই মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের গা থেকে অঝোর ধারায় বিশাল জলরাশি নেমে আসছে । সূর্যের রক্তিম আলো সেই ঝরনার জলে প'ড়ে একটা রামধনুর বর্ণালি সৃষ্টি করেছে । হার্ডিং ঠিক করলেন, এবার তীরে নৌকো ভেড়াতে হবে ।

তক্ষুনি তীরে নৌকো ভেড়ানো হ'ল । জায়গাটা দেখতে ভারি সুন্দর । ঘন একসার গাছের নিচে বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার ক'রে নেয়া হ'ল । ঠিক হ'ল সেখানেই রাত্রিবাস করা হবে । শিগগিরই কিছু কাঠ-কুটো জড়ো ক'রে আগুন জ্বালিয়ে-দেয়া হ'ল, যাতে বন্যজন্তুরা আগুন দেখে ওঁদের আক্রমণ করতে সাহস না-পায় । সারাদিন পরিশ্রম করার দরুন খুব খিদে পেয়েছিল । শিগগিরই আহার সেরে নেয়া হ'ল । তারপর ঠিক হ'ল , রাত্রে নেব্ আর পেনক্র্যাফ্‌ট পালা ক'রে পাহারা দেবে । অবশ্য রাত্রে কোনো-কিছুই ঘটল না । পরদিন, একত্রিশে অক্টোবর, ভোর পাঁচটার সময় সবাই যাত্রার জন্যে তৈরি হ'য়ে নিলেন । তারপর প্রাতরাশ সেরে নিয়ে বেলা দুটোর সময়ে দ্বীপের পশ্চিমে উপকূলের সন্ধানে রওনা হ'য়ে পড়লেন। বলা বাহুল্য, আজকের যাত্রাটা পদব্রজেই শুরু হ'লো ।

পশ্চিম উপকূলে পৌঁছতে কত সময় লাগবে, হার্ডিং তা মোটামুটি একটা আন্দাজ ক'রে

নিয়েছিলেন। পথে যদি কোনো বাধা-বিপদ উপস্থিত না-হয়, তাহ'লে দু-ঘণ্টা লাগবে, একটু কম-বেশি হ'তে পারে। গত রাত্রে বুনো জানোয়ারদের হাঁক-ডাক শোনা গিয়েছিল ব'লে অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত ক'রেই সবাই রওনা হলেন। সাইরাস হার্ডিং চললেন সকলের আগে-আগে।

দ্বীপের এই অংশের জমি অসমতল। কোথাও চড়াই, কোথাও উৎরাই। প্রথম-প্রথম বনের মধ্যে অসংখ্য বানরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তারা যে কখনো এর আগে মানুষ দ্যাখেনি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল এঁদের দেখে তাদের বিস্ময়চকিত ভঙ্গি থেকে। বিভিন্ন জাতের বরাহ, হরিণ, ক্যাঙারু ইত্যাদির সাক্ষাতও পাওয়া গেল পথে। শিকারের জন্যে অবশ্য পেনক্র্যাফ্‌টের হাত নিশপিশ করছিল, তবে এভাবে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না ব'লেই সে অনেক কষ্টে তার লোভ সামলালে। তবে, ফেরার পথে সে-যে জানোয়ারগুলোকে একহাত দেখে নেবে, স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ কণ্ঠে বার-বার সে-কথা জাহির করতে সে মোটেই ভুলল না।

প্রায় সাড়ে-নটার সময় অকস্মাৎ তাদের পথ-রোধ ক'রে দাঁড়াল খরস্রোতা একটি ঝরনাধারা।

নৌকো চালানোর সুবিধেও নেই, অথচ পায়ে হেঁটেও পার হওয়া একরকম অসম্ভব।

হার্ডিং বললেন, 'খুব-সম্ভব এই ঝরনার জল সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই জলধারা অনুসরণ ক'রে গেলেই আমরা বোধহয় দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছতে পারবো। একটু এগিয়ে দেখা যাক।'

স্পিলেট বললেন, 'এক মিনিট দাঁড়ান। আগে এটার একটা নাম দিয়ে নেয়া যাক। দ্বীপের ভূগোল অসম্পূর্ণ রাখা উচিত হবে না। হার্বার্ট, তুমিই একটা নাম দাও না এই ঝরনার।'

'আগে দেখা যাক ঝরনাটা কোথায় গিয়ে পড়েছে,' বললে হার্বার্ট।

'বেশ—' বললেন হার্ডিং, 'তবে খামকা এখানে না-দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলো।'

অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ চলতে যত-সময় লাগছিল, এবার ঝরনাধারার গা ঘেঁষে চলতে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগল। মাঝে-মাঝে পথের মধ্যে বড়ো-বড়ো জানোয়ারের পায়ের ছাপ দেখা গেল। বোঝা গেল, তৃষ্ণার্ত জানোয়ারেরা এই ঝরনার জল পান করতে প্রায়ই এসে থাকে। ইতিমধ্যে ঝরনার স্রোতের তীব্রতা দেখে হার্ডিং বুঝতে পারলেন যে, দ্বীপের পশ্চিম উপকূল তাঁরা যত দূরে ব'লে আন্দাজ করেছিলেন—আসলে সেটা তারও দূরে।

ক্রমশ ঝরনার জলধারা প্রসারিত হ'য়ে পড়তে লাগল। স্রোতের তীব্রতাও আস্তে-আস্তে কমতে লাগল। দু-তীরের গাছপালা এমনভাবে জড়াজড়ি ক'রে ছিল যে, তার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি চলে না। কিন্তু এ-অঞ্চলে যে কোনো মানুষের বাস নেই, তা অবশ্য স্পষ্টই বোঝা গেল। কেননা টপ একবারও ডাকছিল না। অথচ আশপাশে যদি কোনো আগন্তুকের পদসঞ্চার ঘটে থাকে, কিংবা কারু উপস্থিতি থেকে থাকে তবে নিশ্চয়ই টপের মতন চালাক কুকুর না-ডেকে ছাড়তো না। এবার হার্বার্ট সবার আগে-আগে চলতে লাগল।

প্রায় সাড়ে-দশটার সময় হঠাৎ হার্বার্ট যখন 'সমুদ্র!' সমুদ্র!' ব'লে চেঁচিয়ে উঠল তখন হার্ডিং বিস্মিত হলেন। আরো কয়েক মিনিটের মধ্যে সবাই সমুদ্রসৈকতে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁদের চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ল দ্বীপের জনশূন্য পশ্চিম উপকূল।

কিন্তু দ্বীপের উপকূলভাগের সঙ্গে কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য পূর্ব উপকূলের! গ্র্যানাইট পাথরের কোনো খাড়াই পাহাড়ের গা, কিংবা বিশালাকার কোনো পাথরের চাঁই, অথবা হলুদ রঙের বালুময় বেলাভূমি—কিছুই ওদিকে নেই। শুধু তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার-ভরা ঘন অরণ্য।

এবার সেই খরস্রোতা স্রোতস্বিনীটির নামকরণ করা হ'ল। এর নাম দেয়া হ'ল 'ফল্‌স্ রিভার'। ফল্‌স্ রিভার থেকে রেপ্টাইল এণ্ড পর্যন্ত গহীন অরণ্যের অপর্যাপ্ত শ্যামলিমা।

সেই সমুদ্রসৈকতের একদিকে ঈষৎ উঁচু একটি ঢিবির মতন দেখা গেল। সেখানে গিয়ে বসলেন সবাই। বেশ খিদে পেয়েছিল। এবার সবাই আহার সেরে নিলেন।

উঁচু ঢিবির মতো থাকায় উপরদিকে সমুদ্রের দিগন্ত পর্যন্ত দৃষ্টিক্ষেপ করা গেল। সেই সীমাহারা নীলকান্তমণির মতো সমুদ্রে একটিও পালের চিহ্ন নেই। তীরের কোথাও কোনো কিছু দেখা গেল না। একটু জিরিয়ে, সাড়ে এগারোটার সময়, হার্ডিং প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করলেন।

রেপ্টাইল এণ্ড থেকে ফল্‌স্ রিভার প্রায় বারো মাইল দূরে হবে। এমনিতে এইটুকু পথ অতিক্রম করতে ঘণ্টা-চারেক সময় লাগে। কিন্তু ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে চলতে হবে ব'লে প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগবার কথা।

সমুদ্রের এইদিকে কখনও যে কোনো জাহাজডুবি হয়েছিলে, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। অবশ্য স্পিলেট বললেন যে সমুদ্রের ঢেউয়ের দরুন হয়তো জাহাজডুবির কোনো চিহ্নই এখানে দেখা যাচ্ছে না, তাই ব'লে এ-কথা মনে করা অসংগত যে এখানে কোনো জাহাজডুবি হয়নি। সাংবাদিকের এই যুক্তি ন্যায়-সংগত। এ ছাড়া, বুলেটের ঘটনাটি থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিন মাসের মধ্যে কেউ এই দ্বীপে নিশ্চয়ই বন্দুক ছুঁড়েছে। সুতরাং বুলেট-রহস্যের কোনো সমাধানই এখন পর্যন্ত হ'ল না।

তখন পাঁচটা বাজে—কিন্তু রেপ্টাইল এণ্ড তখনও মাইল দু-এক দূরে। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, মার্সি নদীর তীরে কাল যেখানে তাঁরা রাত কাটিয়েছিলেন সেখানে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে অন্ধকার হ'য়ে যাবে। সাতটার সময় সবাই রেপ্টাইল এণ্ডে এসে পৌঁছুলেন। এখানেই সমুদ্রতীরের অরণ্য শেষ হয়েছে। নুড়ি-পাথর আর বালি-ভরা বেলাভূমি শুরুই হয়েছে এখান থেকেই। রাত্রি নেমে আসায় এখানে এসেই সেদিনকার মতো যাত্রা স্থগিত রাখা হ'ল। দূর পশ্চিমে অরণ্য যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে হার্বার্ট বাঁশঝাড় আবিষ্কার করলে। এই বাঁশঝাড় দ্বীপবাসীদের কাছে এক মূল্যবান সামগ্রী রূপে দেখা দিল। কেননা বাঁশ নানান কাজেই ব্যবহার করা যায়। বিশেষ ক'রে এমন ধরনের বাঁশ দেখা গেল, যার মূল সেদ্ধ ক'রে খেতে বেশ সুস্বাদু।

এমন সময় হঠাৎ একটা বুনো জানোয়ারের গর্জন শোনা গেল। সচমকে হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফ্‌ট তাকিয়ে দেখলে, হাত-কয়েক দূরেই একটা জাগুয়ার, লাফ মারবার উদ্যোগ করছে। সঙ্গে-সঙ্গেই গর্জন ক'রে উঠল পেনক্র্যাফ্‌টের বন্দুক। কিন্তু দুর্ভাগবশত গুলি ব্যর্থ হ'ল। অন্ধকারে ভীষণভাবে জ্ব'লে উঠল জাগুয়ারের ভাঁটার মতো চোখদুটো। গিডিয়ন স্পিলেট শিকারী হিশেবে নাম কিনেছিলেন। এবার উপর্যুপরি কয়েকবার গর্জন ক'রে উঠল

তাঁর রাইফেল। সঙ্গে-সঙ্গে গুলির আঘাতে ছিটকে পড়ল জাগুয়ারটা—দু-একবার এঁকে-বেঁকে উঠল তার দেহটা, তারপরই নিঃসাড় হ'য়ে গেল।

তখন সবাই জাগুয়ারটার কাছে দৌড়ে গেলেন। দেখা গেল অব্যর্থলক্ষ্য স্পিলেটের একটি গুলি জাগুয়ারটার চোখে লেগেছে। জাগুয়ারটার চামড়াটাকে গ্র্যানাইট হাউসের একটি মূল্যবান সামগ্রী হিশেবে ব্যবহার করা যাবে ব'লে সবাই খুশি হ'য়ে উঠলেন।

হার্বার্ট তো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে স্পিলেটকে অভিনন্দন জানালেন। স্পিলেট বললেন, 'কেউ যদি কোনোরকমে জাগুয়ারের চোখে গুলি চালাতে পারে, তবে তার সাফল্য অনিবার্য।'

ইতিমধ্যে হার্ডিং কাছেই একটা গুহা আবিষ্কার করেছিলেন। সবাই সেই জাগুয়ারটাকে ব'য়ে নিয়ে এলেন গুহায়। ঠিক হ'ল এই গুহাতেই রাত্রিবাস করবেন সবাই। নেব্ গুহার ব'সে জাগুয়ারটার চামড়া ছাড়াতে লাগল। অন্যরা বন থেকে শুকনো কাঠ-কুটো নিয়ে এলেন। তারপর গুহার মুখে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হ'ল যাতে কোনো জানোয়ার গুহায় ঢুকতে না পারে। হার্ডিং-এর নির্দেশমতো বেশ-কিছু বাঁশও ঝাড় থেকে কেটে আনা হয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বন্দুকে গুলি ভ'রে নিয়ে শুলেন সবাই। শোবার আগে হার্ডিং গুহা-মুখের অগ্নিকুণ্ডে একরাশ বাঁশ গুঁজে দিয়ে এলেন। একটু বাদেই বাঁশের গাঁটগুলো ভীষণ শব্দ ক'রে ফাটতে লাগল। এই শব্দে যে বুনো জানোয়াররা ভয় পাবে, এ-বিষয়ে হার্ডিং-এর কোনো সন্দেহ ছিল না। বুদ্ধিটা অবিশ্যি হার্ডিং-এর আবিষ্কার নয়। মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্তে আছে, তাতাররা নাকি বহু শতাব্দী আগে থেকেই এভাবে বুনো জানোয়ারদের তাদের তাঁবুর কাছ থেকে দূরে সরানোর ব্যবস্থা করতো।

রাত্রিটা নিরাপদেই কাটল। পরদিন সকালে ওঁদের সামনে এই প্রশ্ন জাগল : এখন কি ফিরে যাবেন, না দ্বীপের বাকি অংশটুকু অর্থাৎ দক্ষিণ উপকূলও পর্যবেক্ষণ ক'রে আসবেন? গিডিয়ন স্পিলেট প্রস্তাব করলেন যে অভিযানে যখন একবার বেরিয়ে পড়েছেন, তখন তা সম্পূর্ণ ক'রে যাওয়াই উচিত। শুধোলেন : 'এখান থেকে ক্লু অন্তরীপ কতটা দূরে হবে?'

'প্রায় তিরিশ মাইল—' বললেন হার্ডিং, 'কেননা, সমুদ্রতীর তো এঁকেবেঁকে গেছে।'

'তিরিশ মাইল!' উত্তর করলেন স্পিলেট, 'গোটা দিনই লেগে যাবে তবে। তবুও আমার মনে হয়, দক্ষিণ উপকূল ধ'রেই গ্র্যানাইট হাউসে পৌঁছুনো ভালো।'

'কিন্তু—' হার্বার্ট বললে, 'ক্লু অন্তরীপ থেকে গ্র্যানাইট হাউস অন্তত দশ মাইল দূরে।'

'মোট তাহ'লে চল্লিশ মাইল হ'ল—' বললেন হার্ডিং। 'কিন্তু তবু মিস্টার স্পিলেটের প্রস্তাব মতো কাজ করা ভালো। আজকেই যদি ঐ-দিকটা দেখে আসা যায়, তবে পরে অভিযানে না-বেরুলেও চলবে।'

'সে-কথা তো বুঝলুম—' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট, 'কিন্তু ক্যানু? ক্যানুটা যে মার্সি নদীর উৎসমুখে বাঁধা রইল।'

'তা থাক না।' উত্তর করলেন স্পিলেট, 'একদিন যখন রয়েছে, তখন আরো দু-

দিন না-হয় রইলোই । তাতে কিছু-একটা এসে-যাবে না ।'

এবার নেব্ বললে, 'সমুদ্রতীর ধ'রে যদি আমরা ক্ল অন্তরীপে পৌঁছুতে চাই তবে তো আমাদের মার্সি নদী পেরুতে হবে ।

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে, 'তার আর ভাবনা কী ? ডালপালা দিয়ে না-হয় একটা ভেলা তৈরি ক'রে নেয়া যাবে । ঐ ভেলা বানানোর ভার আমিই নিচ্ছি, তোমাদের সেজন্যে আর মাথা ঘামাতে হবে না । এখনও আমাদের কাছে আরেক দিনের উপযোগী খাবার আছে । এছাড়া এ-দ্বীপে শিকারেরই বা অভাব কোথায় ? চলো নেব,—খামকা সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই ।'

ভোর ছটার সময়েই অভিযাত্রীদল রওনা হ'য়ে পড়ল । গুলিভরা বন্দুক নিয়ে এগিয়ে চলল সবাই । এবারকার যাত্রায় টপ চলল সবার আগে-আগে । বেলা একটার সময় সকলে ওয়াশিংটন বে-র অন্য প্রান্তে এসে পৌঁছুলেন । ইতিমধ্যে তাঁরা প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করেছেন । এত হাঁটাহাঁটির দরুন সবাই পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন । একটু জিরিয়ে সবাই আহার সেরে নিলেন ।

এখান থেকেই উপকূলরেখা অমসৃণ হ'তে শুরু করেছে । বড়ো-বড়ো পাথরের চাঁই ইতস্তত ছড়িয়ে আছে উপকূলে । সেই পাথরের উপরে এসে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ । পথে অগুনতি পাথরের টুকরো ছড়িয়ে প'ড়ে ছিল ব'লে তাঁদের হাঁটতে কষ্ট হ'তে লাগল রীতিমতো । তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে তাকাতে-তাকাতে চললেন সকলে । কিন্তু সেই উপকূলে এমন-কোনো চিহ্ন দেখা গেল না, যাতে সম্প্রতি এখানে কোনো জাহাজডুবি হয়েছে ব'লে মনে করা যেতে পারে । কোথাও কোনো জাহাজের ভগ্নাংশের ক্ষুদ্রতম চিহ্নও নেই ।

বেলা তিনটে বাজল । অভিযাত্রীদল নীরবে এগিয়ে চললেন । এমন-কোনো চিহ্ন কোথাও দেখা গেল না যাতে বোঝা যেতে পারে যে কখনও এই দ্বীপে কোনো মানুষ বাস করতো কিংবা এখনও করে । নীরবতা ভাঙলেন গিডিয়ন স্পিলেট । বললেন, 'তাহ'লে এ-কথা ভেবেই আমাদের সান্ত্বনা পেতে হবে যে, লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের আধিপত্য নিয়ে কেউ আমাদের সঙ্গে কোনো কলহ করতে আসছে না ।'

'কিন্তু সেই বুলেটটা ?' বললে হার্বার্ট, 'সেটা তো আর কল্পনা নয় ।'

'সে-প্রশ্ন উঠতেই পারে না !' ভাঙা দাঁতের কথা স্মরণ ক'রে ব'লে উঠল পেনক্র্যাফট ।

'তাহ'লে গোটা ব্যাপারটা থেকে কী সমাধান বার করবো আমরা ?' সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন ।

'এই সমাধান,' উত্তর করলেন ক্যাপ্টেন : 'তিন মাস কিংবা তারও আগে একটি জাহাজ, ইচ্ছে ক'রেই হোক আর অনিচ্ছাসত্ত্বেই হোক, এই দ্বীপে এসে ভিড়েছিল । অবিশ্যি প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই দ্বীপে যদি একদা জাহাজ ভিড়েছিল, তার কোনো চিহ্নই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন ? কিন্তু এ-কথা মানতেই হবে যে এই দ্বীপে বর্তমানে আমরা ছাড়া অন্য -কোনো মানুষ থাকে না । অন্তত আমরা তো তার প্রমাণ পাইনি ।'

নেব্ বললে, 'তাহ'লে সেই জাহাজটি লিঙ্কন আইল্যাণ্ড ছেড়ে আবার চ'লে গেছে ? ঈশ ! আগে যদি জানা যেতো তবে হয়তো দেশে ফেরা যেতো !'

'হয়তো যেতো,' বললে পেনক্র্যাফট, 'কিন্তু সে সুযোগ আমরা যখন হারিয়েছি তখন

সে সম্পর্কে আর-কোনো প্রশ্ন উঠছে না । বরং গ্র্যানাইট হাউসকে আরো ভালো ক'রে গড়তে হবে এখন ।'

এমন সময় টপ সাংঘাতিকভাবে ঘেউ-ঘেউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল । একটু পরেই দেখা গেল, সামনের ঘন গাছপালার মধ্য থেকে টপ কাদা-চটচটে একটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো মুখে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসছে । সঙ্গে-সঙ্গে নেব্ ঐ ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো হাতে তুলে নিলে । টপ আবারও ডাকতে শুরু করলে । উত্তেজিত হ'য়ে সে যেভাবে একবার বনে প্রবেশ করছিল আবার বেরিয়ে আসছিল, তা দেখে বোঝা গেল যে সে সবাইকে তার সঙ্গে আসবার জন্যে প্রার্থনা করছে ।

'এবার বুলেট-রহস্যের নিষ্পত্তি হবে—' বললে পেনক্র্যাফ্ট : 'আহত কিংবা মৃত কোনো জাহাজডুবি-হওয়া লোকের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে আমাদের ।'

সকলে টপের পেছনে-পেছনে বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন । হার্ডিং-এর নির্দেশমতো সবাই বন্দুকও প্রস্তুত ক'রে নিলেন । কিন্তু বনের বেশ-খানিকটা দূর যাওয়ার পরও কোনো জনমানবের সাক্ষাৎ না-পেয়ে তাঁরা হতাশ হ'য়ে পড়লেন । সেই বনের মধ্যে কোনো দূর-কালে কোনো মানুষ একবারের জন্যেও পদার্পণ করেছিল কি না বোঝা গেল না । খানিকটা সামনে ঘন গাছপালার মধ্যে হঠাৎ গাছের সংখ্যা একটু বিরল হ'য়ে যাওয়ায় চৌকো-মতন একফালি জমি দেখা গেল । টপ সেখানে পৌঁছেই থমকে দাঁড়ালো । তারপর আবার ডাকতে লাগলো ।

সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে তাকালেন সবাই । কিন্তু না, কোথাও কিছু নেই । গাছে কিংবা ঝোপে-ঝাড়ে কেউ ব'সে নেই—কোনো মানুষের চিহ্নমাত্র নেই ।

সাইরাস হার্ডিং বললেন, 'টপ, ব্যাপার কী তোমার ?'

টপ আরো জোরে-জোরে ডেকে উঠল । ঠিক সেই সময় পেনক্র্যাফ্ট চেঁচিয়ে উঠল : 'বাঃ ! চমৎকার ! আশ্চর্য !'

'কী ?' জানতে চাইলেন স্পিলেট ।

'আমরা সমুদ্র পার হ'লেই যা-কিছুর দেখা পাবো ব'লে ভেবেছিলুম ।' বললে পেনক্র্যাফ্ট, 'কিন্তু শূন্যের কথা আমাদের মনেই হয়নি ।—ওই দেখুন—উপরে, গাছের ডগায় !'

পেনক্র্যাফ্টের নির্দেশ-মতো উপরে তাকালেন সবাই । পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠলেন স্পিলেট : 'আরে ! বেশ মজা তো ! এ যে আমাদের হাওয়াই নৌকো—আমাদের বেলুনটা ! বাতাসে ভাসতে-ভাসতে এই গাছের মাথায় এসে আটকে গেছে !'

তক্ষুনি উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফ্ট : 'এখনও বেশ ভালো আছে বেলুনের কাপড় ! তাই থেকেই কয়েক বছরের জামা কাপড় পাবো আমরা । কী মজা ! রুমাল আর শার্ট বানানোর হ্যাঙামাও অনেকখানি ক'মে গেল । মিস্টার স্পিলেট, যে-দ্বীপের গাছে শার্ট ঝোলে, সে-দ্বীপকে আপনি কী বলবেন ?'

'লিঙ্কন আইল্যাণ্ড ।' হেসে বললেন গিডিয়ন স্পিলেট ।

এই আবিষ্কারও যে সৌভাগ্যসূচক, তাতে আর সন্দেহ কী ! বেশ কয়েকশো গজ কাপড় বেলুনটি করতে লেগেছিল । সুতরাং এইভাবে বেলুনটির দেখা পেয়ে সবাই খুশি হ'য়ে

উঠলেন। এখন প্রধান কর্তব্য, গাছের মগডালে উঠে বেলুনটাকে নিচে নামিয়ে আনা। এবং সে-কাজটা খুব সহজ নয়। নেব, হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফ্‌ট তক্ষুনি তরতর ক'রে গাছে উঠে গেল। তারপর বেলুনটাকে নামিয়ে আনবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল।

ঘণ্টাদুয়েক চেষ্টার পর বেলুনটাকে নিচে নামানো গেল। বেলুনটার নিচের দিকটাই শুধু সাংঘাতিকভাবে ফেঁসে গেছে, নইলে এখনও বাকি অংশটা ভালোই। এছাড়া একরাশ দড়ি-দড়াও পাওয়া গেল বেলুনের কল্যাণে। ভাগ্য যখন প্রসন্ন থাকে তখন আকাশ থেকে সম্পদ আসে এই প্রবাদও যে মিথ্যে নয়, এটা বুঝতে আর কারু বাকি রইল না।

বেলুনটার ওজন নেহাত কম নয়। এত ভারি জিনিশ এখান থেকে গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে যাওয়া মুশকিলের ব্যাপার। সুতরাং একটা নিরাপদ জায়গায় এটা রেখে যাওয়া কর্তব্য। আধঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর একটা অপরিসর গুহায় মতো দেখা গেল। সেটাই আপাতত গুদাম ঘরের কাজ করল। এখানেই বেলুনটাকে এখনকার মতো রেখে-দেয়া হ'ল। গুহার কল্যাণে ঝড়-বৃষ্টি এবার বেলুনটির ক্ষতি করতে পারবে না।

জায়গাটার নাম দেয়া হ'ল পোর্ট বেলুন। তারপর ছটার সময় সবাই আবার তাঁদের অভিযাত্রায় রওনা হ'য়ে পড়লেন।

এবার খানিকটা এগুলেই সামনে পড়বে মার্সি নদী। নদী পার হওয়ার জন্যে একটা সেতু তৈরি করা প্রয়োজন। তা যদি এখন সম্ভব না-হয়, তবে আপাতত কাজ চালাবার জন্যে একটা ভেলা বানাতে হবে। পরে সময়-মতো সেতু তৈরি ক'রে কাঠের গাড়ি এনে বেলুনটাকে গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে যাওয়া যাবে। ক্যানুটা হাতের কাছে থাকলে অবিশ্যি এক্ষুনি বেলুনটিকে নিয়ে যাওয়া যেতো, কিন্তু ক্যানুটা তো মার্সি নদীর উৎস-মুখে বেঁধে রেখে আসা হয়েছে। মনে-মনে এইসব কথা আলোচনা করতে-করতে সবাই এগিয়ে চললেন।

ইতিমধ্যে সন্ধে নেমে এল। আলো ঝাপসা হ'য়ে-হ'য়ে একসময় অন্ধকার হ'য়ে গেল।

এমন সময় সবাই ফ্লোটসাম পয়েন্টে এসে পৌঁছলেন। এই জায়গাতেই সেই মূল্যবান সিন্দুকদুটো পাওয়া গিয়েছিল। ফ্লোটসাম পয়েন্ট থেকে গ্র্যানাইট হাউসের দূরত্ব চার মাইল। মার্সি নদী অভিমুখে এবার এগুলেন সবাই। ওঁরা যখন মার্সি নদীর তীরে এসে পৌঁছলেন, তখন মধ্যরাত্রি।

মার্সি নদী সেখানে প্রস্থে প্রায় আশি ফুটের মতো। এবার এই আশি ফুট কী ক'রে অতিক্রম করা যায়, সেই হ'ল সমস্যা। পেনক্র্যাফ্‌ট আগে বলেছিল যে ভেলা বানিয়ে সে নদী পেরুবার ব্যবস্থা করবে, সুতরাং এবার সেই কাজে রত হ'তে হ'ল তাকে।

সারাদিনের পরিশ্রমে সকলের দেহে-মনে তখন একটা অবসাদ নেমে আসছে। খিদেয়, তেষ্টায় তখন সবাই অতিরিক্ত ক্লান্ত, গ্র্যানাইট হাউসে পৌঁছে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমনোর জন্যে ব্যস্ত। নদী পেরুতে পারলেই হ'ল—তারপর তো গ্র্যানাইট হাউস মিনিট পনেরোর রাস্তা।

ঘন অন্ধকার-ঢালা রাত্রি। পেনক্র্যাফ্‌ট তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল কাজে। সে আর নেব্‌ দুটো গাছ কাটতে শুরু ক'রে দিলে। সাইরাস হার্ডিং আর স্পিলেট নদীর তীরে ব'সে-ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলেন, গাছ কাটা কখন সাঙ্গ হয়। হার্বার্ট কাছেই নদীর তীরে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ মার্সি নদীর দিকে তর্জনী

নির্দেশ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল : 'আরে ! কী ভাসছে এখানে ?'

পেনক্র্যাফ্ট তক্ষুনি কুঠার হাতে নদীতীরে ছুটে এল। জলের মধ্যে কী-একটা অস্পষ্ট জিনিশ ভাসছিল। সেদিকে তাকিয়েই সে ব'লে উঠল : 'ক্যানু ! একটা ক্যানু !'

সবাই এগিয়ে গেলেন। অবাক চোখে দেখতে পেলেন যে একটা ক্যানু স্রোতের টানে ভেসে আসছে তীরের দিকে।

পেনক্র্যাফ্ট চেঁচিয়ে ডাকলে : 'নৌকোয় কে আছো !'

কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। নৌকোটা তীরের দিকে ভেসে আসতে লাগল।

তীর থেকে তখন নৌকোটা মাত্র ফুট বারো দূরে, এমন সময় অবাক কণ্ঠে পেনক্র্যাফ্ট ব'লে উঠল : 'আরে ! এ-যে আমাদেরই নৌকোটা ! কোনোমতে বাঁধন ছিঁড়ে স্রোতের টানে ভাসতে-ভাসতে চ'লে এসেছে ! ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছে নৌকোটা !'

'আমাদের নৌকো !' গম্ভীর অথচ ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন সাইরাস হার্ডিং।

পেনক্র্যাফ্টের কথাই ঠিক। এঁদেরই নৌকো এটি। কোনো কারণে দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় স্রোতে ভাসতে-ভাসতে এদিকপানে এসেছে।

লম্বা একটা বাঁশের সাহায্যে তক্ষুনি নৌকোটা তীরে টেনে আনল পেনক্র্যাফ্ট আর নেব্। নৌকো তীরে ভিড়তেই হার্ডিং উঠে প্রথমে দড়িটা পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল, পাথরে ঘষা খেয়ে-খেয়ে দড়িটা ছিঁড়ে গেছে। স্পিলেট ফিশফিশ ক'রে হার্ডিংকে বললেন : 'তবু ব্যাপারটা আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে।'

'আশ্চর্য ?' কী যেন ভাবতে ভাবতে বললেন হার্ডিং : 'হ্যাঁ, আশ্চর্য তো নিশ্চয়ই !'

আশ্চর্য হোক বা না-হোক, ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছে ক্যানুটা। তাঁরা যদি মধ্যযুগে বাস করতেন, তবে হয়তো মনে করতেন এ কোনো অপার্থিব ব্যাপার। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে অলৌকিককাণ্ডে বিশ্বাস করেন কী ক'রে ! হার্ডিং মনে-মনে বললেন : 'তবু আমি জানি কেউ-একজন অলক্ষে থেকে আমাদের সাহায্য ক'রে চলেছে। কিন্তু কে সেই ব্যক্তি ? এত খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও তাকে দেখতে পেলুম না কেন ?'

কোনো উত্তর না-পেয়ে হার্ডিং-এর মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠল।

একটু বাদেই তাঁরা নদীর অপর তীরে পৌঁছুলেন। ক্যানুটা ধরাধরি ক'রে চিমনির কাছেই সমুদ্র সৈকতে তুলে আনা হ'ল। তারপর সবাই গ্র্যানাইট হাউসের দড়ির সিঁড়ির দিকে এগুলেন।

এমন সময় কেন যেন টপ রুদ্ধ কণ্ঠে গজরাতে লাগল। নেব্ ছিল সকলের আগে। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ালে।

'কী সর্বনাশ ! সিঁড়ি কোথায় গেল ?'

৩

ঘটনার আবর্ত

নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সাইরাস হার্ডিং । একটা কথাও বেরুলো না তাঁর মুখ দিয়ে ।

অন্যরা অন্ধকারেই হাৎড়ে-হাৎড়ে দেখল গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল । তবে কি হাওয়ায় একটু ন'ড়ে গিয়েছে সিঁড়িটা ?... কিন্তু না সিঁড়িটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে ।

মিনিট কয়েক পরে পেনক্র্যাফটের হতভম্ব স্বর শোনা গেল : 'লিঙ্কন আইল্যাণ্ড দেখছি শেষ পর্যন্ত অলৌকিকের রাজত্ব হ'য়ে উঠল ।'

'অলৌকিক নয়, পেনক্র্যাফ্‌ট,' বললেন স্পিলেট : 'খুব সহজ ব্যাপার । আমাদের সবার অনুপস্থিতির সুযোগে কেউ-একজন এসে গ্র্যানাইট হাউস দখল করেছে এবং সিঁড়ি উপরে তুলে ফেলেছে ।'

'কেউ-একজন !' চেঁচিয়ে উঠল নাবিক : 'কিন্তু কে সে ?'

'যে বুলেট ছুঁড়েছিল, সে ছাড়া আর কে !' সাংবাদিক জবাব দিলেন ।

অধৈর্য হ'য়ে উঠল পেনক্র্যাফ্‌ট, পরক্ষণেই ভীষণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল : 'কে আছো গ্র্যানাইট হাউসে ? কে ?'

উত্তরে মৃদু-একটা হাসির শব্দই শোনা গেল । সে-হাসি মানুষের, না অন্য-কোনো জীবের, তা ভালো বোঝা গেল না । দ্বীপে তাঁরা আছেন সাত মাস হ'ল । এতদিনের মধ্যে একের পর এক রহস্যময় ঘটনা ঘ'টেই চলেছে, এর মীমাংসা তাঁরা এখনও করতে পারেননি । কিন্তু এবার ঘটনার আবর্তে তাঁরা যে আশ্চর্য বিস্ময়ের সম্মুখীন হয়েছেন, তার সঙ্গে আগেকার অন্য-কোনোকিছুর তুলনাই হয় না । এই ব্যাপারটির গুরুত্বের কথা মনে পড়তেই একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব আচ্ছন্ন করল সবাইকে । বিস্ময়ে দু-চোখ যেন বিস্ফারিত হ'য়ে ফেটে পড়তে চাইছে ।

অবশেষে বহুক্ষণ বাদে সাইরাস হার্ডিং-এর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল : 'বন্ধুগণ ! এখন আমাদের সামনে একটিমাত্র পথ খোলা আছে—সে হ'ল দিনের জন্যে অপেক্ষা করা । দিনের আলোয় পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে আমাদের । কিন্তু এখন সবাই চিমনিতে ফিরে চলো । হয়তো আহারের ব্যবস্থা করা চলবে না, কিন্তু চিমনিতে নিরাপদে ঘুমুনো যাবে ।'

পেনক্র্যাফ্‌ট হতভম্ব কণ্ঠে আবার জিগেস করলে : 'কিন্তু কে আমাদের এ-রকম ক'রে বিপদে ফেলল ?'

সে কে—তা জানা গেল না । হার্ডিং-এর প্রস্তাব কাজে পরিণত করা ছাড়া এখন তাঁদের করবার অন্য-কিছু ছিল না । সবাই চিমনির দিকে রওনা হলেন । চিমনিতে প্রবেশ ক'রে সবাই শুয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু কারু চোখেই ঘুম এলো না । গ্র্যানাইট হাউসে তাঁদের সবকিছু রয়েছে—অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, রসদ—সবকিছু । কে সেই ব্যক্তি, যার জন্যে গ্র্যানাইট হাউস তাঁদের হাতছাড়া হয়ে গেল ?

পুবের আকাশ দিনের আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে-না-উঠতেই গুলিভরা বন্দুক হাতে

ক'রে সবাই গ্র্যানাইট হাউসের নিচের জমিতে এসে দাঁড়ালেন। তখনও একটু-একটু কুয়াশা ছিল। তবু গ্র্যানাইট হাউসের বন্ধ জানলাগুলো স্পষ্টই দেখা গেল। তাঁরা যে-রকম দেখে গিয়েছিলেন সেইরকমই প'ড়ে আছে গ্র্যানাইট হাউস। তফাতের মধ্যে, সদর দরজাটা একেবারে হাট ক'রে খোলা। কেউ-একজন যে গ্র্যানাইট হাউসে প্রবেশ করেছে, সে-বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহই নেই। সিঁড়ির উপরের অংশটা আগের মতোই ঝুলছে, শুধু নিচের দিকটাই টেনে তোলা হয়েছে মধ্যবর্তী প্ল্যাটফর্মে।

অবাঞ্ছিত আগন্তুকরা যে আর-কাউকে গ্র্যানাইট হাউসে ঢুকতে দিতে চায় না, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। আবারও চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফ্‌ট, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে সূর্য উজ্জ্বল হলুদ রঙ ছড়াতে-ছড়াতে আকাশে উঠে এসেছে। রোদের আলোয় স্নান করতে লাগল গ্র্যানাইট হাউস। কিন্তু গ্র্যানাইট হাউসের ভিতর-বাহির তবু মৃত্যুর মতো নীরব হ'য়ে প'ড়ে রইল। যদিও সিঁড়ির অবস্থা দেখে সকলের মনে প্রশ্ন জাগল, সত্যিই কি কেউ গ্র্যানাইট হাউসে ঢুকেছে? যদি কেউ তাঁদের অনুপস্থিতিতে গ্র্যানাইট হাউসে প্রবেশ ক'রে থাকে, তবে নিশ্চয়ই এখনও সে ওখানেই আছে। কিন্তু কী ক'রে এই খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে ওঠা যায়!

হঠাৎ হার্বার্টের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সিঁড়ির যে-শেষাংশ পাহাড়ের গায়ে ঝুলছে কোনোরকমে যদি তা একবার নিচে নামানো যায়, তাহ'লেই সব মুশকিল আসান হ'য়ে যায়। হার্বার্ট ভাবলে, ওদের কাছে তীরধনুক আছে, তীরের পেছনে দড়ি বেঁধে যদি সেই সিঁড়ির শেষ পা-দানির ফাঁকের মধ্য দিয়ে তীর ছোঁড়া যায়, তবে হয়তো সিঁড়িটা আবার ভূমি স্পর্শ করবে। সৌভাগ্যবশত বেলুনের দড়িদড়াগুলো সঙ্গেই নিয়ে এসেছিলেন ওঁরা। সুতরাং হার্বার্ট তক্ষুনি তার বুদ্ধিকে কাজে পরিণত করতে লেগে গেল। বারকয়েক চেষ্টার পর দড়িবাঁধা তীর সিঁড়ির শেষ পা-দানির মধ্যকার ফাঁক দিয়ে গ'লে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই কে যেন সজোরে হ্যাঁচকা টান মেরে সিঁড়িটা আরো উপরে তুলে নিয়ে গেল।

'রাস্কেল!' চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফ্‌ট: 'যদি বন্দুক ছোড়বার সুযোগ পাই তবে তোমাদের মজা দেখিয়ে দেবো!'

'কিন্তু কে সিঁড়িটা টেনে তুলল?' জিগেস করলে নেব্‌।

'কে? কেন, তুমি দ্যাখোনি?' পেনক্র্যাফ্‌ট বললে: 'একটা বানর—ওরাংওটাংও হ'তে পারে! ব্যাবুন গোরিলা হওয়াও বিচিত্র নয়। গ্র্যানাইট হাউস দখল করেছে বানরের দল—আমাদের অনুপস্থিতিতে ওই বানরগুলোই উপরে উঠে সিঁড়ি টেনে তুলে নিয়েছে।'

পেনক্র্যাফ্‌টের কথা যে মিথ্যে নয়, পরমুহূর্তেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। গ্র্যানাইট হাউসের জানলায় একপাল বানরের মাথা দেখা গেল। পেনক্র্যাফ্‌ট তখুনি বন্দুক তুলে ট্রিগারে চাপ দিল। বন্দুকের গর্জন থামতে-না-থামতেই একটি বানর গ্র্যানাইট হাউসের জানলা থেকে ছিটকে পড়ল শূন্যে, তারপর সেই বানরের মৃতদেহটা সশব্দে নিচে প'ড়ে গেল। অন্য বানরগুলো কিন্তু সেই মুহূর্তে জানলা থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

যে-বানরের মৃতদেহটা নিচে পড়ল দেহ তার বিশাল—শিম্পাঞ্জি, গোরিলা কিংবা ওরাংওটাং হবে। প্রাণী-বিজ্ঞানের ছাত্র ভালো ক'রে লক্ষ ক'রে জানালে যে মৃতদেহটা ওরাংওটাং-এর।

মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে নেব্ বললে : 'জানোয়ারটা সত্যিই জানোয়ার !'

'কিন্তু তবু সমস্যার নিষ্পত্তি হ'ল কই ?' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট : 'কী ক'রে আমরা উপরে উঠবো ?'

ঠিক এমন সময় ঘটনার ধারা একেবারে পালটে গেল । সবাই যখন নিচু হ'য়ে ওরাংওটাংটাকে দেখছে, এমন সময় টপ হঠাৎ সাংঘাতিকভাবে চেঁচিয়ে উঠল । দেখা গেল, কোনো অজ্ঞাত কারণে ভীত-ত্রস্ত হ'য়ে ওরাংওটাং-এর দল পালাতে শুরু করেছে ! তারা সাংঘাতিকভাবে চ্যাঁচাতে শুরু করলে, তারপর একটার ঘাড়ে আরো-একটা প'ড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা গ্র্যানাইট হাউস পরিত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেল । কেউ-বা উপর থেকে সোজা লাফ দিলে নিচে, তারপর একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেল ।

ঠিক এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল, আস্তে-আস্তে গড়িয়ে সিঁড়ি নেমে আসছে !

'কী ব্যাপার !' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট : 'ভারি আশ্চর্য তো !'

সিঁড়িতে পা দিতে-দিতে নাতিস্ফুট কণ্ঠে সাইরাস বললেন : 'ভারি আশ্চর্য !'

'একটু সাবধান হ'য়ে, ক্যাপ্টেন,' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট : 'এখনও হয়তো গোটাকয়েক রাস্কেল উপরে আছে !'

'দেখা যাক,' বলতে-বলতে ক্যাপ্টেন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন । অন্যরা তাঁকে পায়ে-পায়ে অনুসরণ করলে ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই গ্র্যানাইট হাউসে উঠে এলেন । তন্ন-তন্ন ক'রে চারদিক খুঁজলেন সবাই । না, কেউ কোথাও নেই । কিন্তু তাহ'লে সিঁড়িটা নিচে ফেললে কে ? ঠিক এমন সময় একটা চ্যাঁচামেচি শোনা গেল, চীৎকার করতে করতে একটা বিশালদেহী ওরাংওটাং প্রবেশপথ থেকে বেরিয়ে এসে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল । পেনক্র্যাফ্‌ট তার কুঠার তুলে ওরাংওটাংটার মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে যেতেই হার্ডিং বললেন : 'একে মেরো না, পেনক্র্যাফ্‌ট । মনে রেখো, এ-ই আমাদের জন্যে সিঁড়ি নিচে ফেলে দিয়েছিল ।'

এমন স্বরে হার্ডিং কথাগুলো বললেন যে, তিনি যে ঠাট্টা করছেন না তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হ'ল না ।

তারপর বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টা ক'রে সবাই মিলে ওরাংওটাংটিকে গ্রেপ্তার করলেন । ওরাংওটাংটি প্রতিরোধের বিশেষ চেষ্টা করলে না, বোঝা গেল কোনো অজ্ঞাত কারণে সে ভয় পেয়েছে ।

ওরাংওটাংরা খুব চালাক । শুধু আকারেই মানুষের সঙ্গে ঈষৎ তফাৎ, নইলে মানুষই বলা চলতো ওদের । আর পেনক্র্যাফ্‌টের কথা-মতো ওরাংওটাংরা যে কথা বলতে পারে না সেইটে ভারি আপশোশের ব্যাপার । তবে ডারউইনের কথা-মতো বলা যায় যে, ওরাংওটাংরা মানুষেরই পূর্বপুরুষ । সেই কারণেই ক্যাপ্টেন এ-কথা বললেন যে, একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে ওরাংওটাংটা ওঁদের ভৃত্যের কাজ করতে পারবে । অবিশ্যি এর মধ্যে একটি যদি আছে । যদি পোষ মানে, তবেই তো ।

পেনক্র্যাফ্‌ট তো তক্ষুনি ওরাংওটাংটার কাছে গিয়ে বলল : 'কী হে ওরাং সাহেব, ভালো তো ।'

ওরাংওটাংটা জবাবে এমন একটা শব্দ ক'রে উঠল, যার মধ্যে রাগের কোনো

আভাস নেই ।

আবারও পেনক্র্যাফ্‌ট শুধোলে : 'তুমি আমাদের দলে যোগ দেবে তো ? না কি, সাইরাস হার্ডিং-এর দলে যোগ দেয়া তোমার অপছন্দ ?'

আবারও ওরাংওটাংটা অমনি একটা শব্দ করলে ।

'কিন্তু বাছা, আগেই তোমাকে ব'লে রাখছি, খাবার-দাবার ছাড়া মাইনে কিন্তু আমরা দিতে পারবো না ।'

আবারও ওরাংওটাংটি যা শব্দ করলে তাকে ইতিবাচক বলা যেতে পারে ।

গিডিয়ন স্পিলেট মন্তব্য করলেন : 'তোমাদের কথাবার্তা বন্ধ করো তো, পেনক্র্যাফ্‌ট । অসহ্য লাগছে আমার ।'

পেনক্র্যাফ্‌ট উত্তর দিলে : 'আর যা-ই হোক, বাছা আমার বিশেষ অবাধ্য নয় । কম কথা বলে—এটা একটা সুলক্ষণ । — হ্যাঁ বাছা, মনে থাকবে তো, কোনো মাইনে পাবে না প্রথমটা । তবে যদি তোমার কাজ দেখে আমরা খুশি হই, তাহ'লে একসঙ্গে দ্বিগুণ মাইনে পাবে ।'

এইভাবেই ওদের দল ভারি করলে ওরাংওটাংটি । পেনক্র্যাফ্‌ট তার নাম দিল জুপিটার—সংক্ষেপে জাপ । কেউ সে নামে আপত্তি করল না । সুতরাং মাস্টার জাপ গ্র্যানাইট হাউসেই থেকে গেলেন ।

এরপর তাঁদের প্রথম কর্তব্য হ'ল, নিচে-পড়ে-থাকা মৃত ওরাংওটাংগুলো সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা । সবাই মিলে ওরাংওটাংগুলোকে বনের ধারে নিয়ে কবর দিয়ে দিলেন । সে-কাজ সাঙ্গ হবার পর হার্ডিং জানালেন, এবার তাঁদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হ'ল, মার্সি নদী পারাপারের জন্যে একটি সেতু নির্মাণ করা । তারপর মুসমন ইত্যাদি জন্তুর জন্যে একটি বাসস্থান তৈরি । এই দুই কাজ সাঙ্গ হ'লে অসুবিধে অনেক ক'মে যাবে । মুসমনদের বাসস্থান কোথায় হবে, সে-জায়গাটার কথাও ক্যাপ্টেন সবাইকে জানালেন । তিনি বললেন, রেড ক্রীকের আশপাশে কোনোখানে সেটা তৈরি করলে সুবিধে হয় ।

পরদিন তেসরা নভেম্বর থেকে সবাই উঠে-পড়ে লাগলেন মার্সি নদীর উপর সেতু নির্মাণে । সমস্ত যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে সবাই মার্সি নদীর তীরে এসে পৌঁছুলেন । সেতুটা এমন জায়গায় নির্মাণ করা হবে ঠিক হ'ল, যে-জায়গা থেকে দ্বীপের সর্বত্র চলাচলের একটা সুরাহা হয় । মার্সি নদীর এই সেতু তৈরি করতে তিন সপ্তাহ সময় লাগল । এই সময়টুকু সাংঘাতিক খাটতে হ'ল সবাইকে । তারপর বিশে নভেম্বর সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হ'ল । বাঁশ আর কাঠ দিয়েই সেতুটা তৈরি করা হ'ল বটে, কিন্তু তবু খুব মজবুত হ'ল।

এ ক-দিনের মধ্যে মাস্টার জাপ আস্তে-আস্তে ওঁদের পোষ মেনেছে । জাপকে যা করতে দেখিয়ে দেয়া হয়, নীরবে সে তা পালন করে । এ ছাড়া টপ আর জাপের মধ্যে বন্ধুত্বও হয়েছে । অবসর সময়ে দুজনে একসঙ্গে বসে খেলা করে ।

ইতিমধ্যে সেই একদানা গম থেকে বেশ-খানিকটা গম পাওয়া গেল । দশটি অঙ্কুর বেরিয়েছে সেই গমের দানা থেকে, আর এক-একটা অঙ্কুরে আশিটা ক'রে গমের দানা পাওয়া গেল । সুতরাং আটশো গমের দানা পেলেন তাঁরা । অবিশ্যি পেনক্র্যাফ্‌টের সতর্কতা ব্যতীত তাঁদের এই প্রথম চাষ সফল হ'ত কি না বলা দুষ্কর ।

এবার দ্বিতীয় চাষের জন্যে একটা জমি তৈরি করা হ'ল, আর সেই জমির চারদিকে উঁচু ক'রে বাঁশের বেড়া দেয়া হ'ল। আর পাখিদের তাড়াবার জন্যে কাক-তাড়ুয়াও তৈরি করা হ'ল। তারপর সেই আটশোটি গমের দানা রোপণ করলেন তাঁরা।

একুশে নভেম্বর হার্ডিং দ্বীপের মধ্যে জল সরবরাহের জন্যে একটা খাল কাটবার মৎলব করলেন। ঠিক হ'ল, পশ্চিম সমভূমি ঘুরে লেক গ্র্যান্টের দক্ষিণ কোণ বেষ্টন ক'রে সেই খাল এসে পড়বে মার্সি নদীর প্রথম বাঁকে। বারো ফুট চওড়া আর ছ-ফুট গভীর হবে সেই খাল।

ডিসেম্বরের প্রথম পক্ষের মধ্যেই সেই খাল কাটা হয়ে গেল। অবিশ্যি এজন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করলেন সবাই।

ডিসেম্বর মাসে গরম পড়ল অত্যন্ত ভয়ানক। তবু সেই ভয়ানক গরমের মধ্যেই সবাই মিলে কাজ চালিয়ে গেলেন। এবার তাঁদের প্রথম কাজ হ'ল, পোষমানা পশুপাখির জন্যে খোঁয়াড় তৈরি করা। লেক গ্র্যান্টের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দুশো বর্গগজ জমি জুড়ে সেই খোঁয়াড় তৈরি করা হবে ঠিক হ'ল। খুব শক্ত ক'রে বাঁশ আর কাঠ দিয়ে চারদিকে বেড়া দেয়া হ'ল। তারপর পাখিদের জন্যে কাঠ দিয়ে কয়েকটা খুপরিও তৈরি করা হ'ল। তারপর সবাই খোঁয়াড়ের অধিবাসী সংগ্রহের জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।

প্রথমে ধরা হ'ল দুটি টিনামুস, তারপর লেক গ্র্যান্টের কাছ থেকে এক-ডজন হাঁস। পেলিক্যান, জল-মুরগি ইত্যাদি ধরবার জন্যে আর কষ্ট করতে হ'ল না, আপনা থেকেই তারা খোঁয়াড়ের অধিবাসীদের দল ভারি করলে। তারপর আস্তে-আস্তে পাঁচটি ওনাগা (জিব্রা এবং কনাগার মধ্যবর্তী একজাতীয় চতুষ্পদ ; খুব ভালো দৌড়ুতে পারে), গোটা-সাতেক মুসমন এবং আরো দু-এক জাতের জীব এসে খোঁয়াড়ে ভিড় করলে। তারা অবিশ্যি আপনা থেকে আসেনি, অনেক হ্যাঙ্গামার পর ধরতে হয়েছে তাদের। তারপর একটা বেশ বড়ো-শড়ো গাড়ি প্রস্তুত করলেন সবাই। ঘোড়া না-পাওয়া গেলেও ওনাগা পাওয়া গেছে। ওনাগার সাহায্যেই গাড়ি চালানো যাবে।

পেনক্র্যাফ্‌ট নিয়েছিল খোঁয়াড়ের ভার। কয়েক দিনের মধ্যেই সে ওনাগাদের পোষ মানিয়ে ফেললে। তারও কয়েক দিন পর প্রথম যেদিন ওনাগার গাড়ি ছুটল দ্বীপে, সেদিন তো পেনক্র্যাফ্‌ট রীতিমত হৈ-চৈ বাধিয়ে বসল।

ইতিমধ্যে বেলুন থেকে পাওয়া লিনেনের সাহায্যে পরনের কাপড়ের একটা সুরাহা হ'য়ে গেল। সিন্দুকের মধ্যে সূঁচ ছিল, তারই সাহায্যে লিনেনের জামা-কাপড় বানানো হ'ল। বিছানার চাদর ইত্যাদিও তৈরি করা হ'ল। অর্থাৎ, এক কথায়, বেশ-একটু স্বাচ্ছন্দ্য এলো তাঁদের জীবন-যাত্রায়।

বলা বাহুল্য যে, এ ক-দিন জাপ দ্বীপবাসীদের ঘর-গেরস্থালির কাজে বেশ খানিকটা সাহায্য করতে শুরু করেছে। এভাবেই জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কেটে গেল।

আঠারোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই ভয়ানক গরম পড়ল। তাই বলে ওঁদের শিকার কিন্তু বন্ধ রইল না। আগুতি, পিকারি, ক্যাশিবরা, ক্যাঙারু ইত্যাদি শিকারও করা হ'ল, ধরাও হ'ল খোঁয়াড়ের অধিবাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে।

ইতিমধ্যে জাপ রীতিমতো ওস্তাদ খানশামা হ'য়ে উঠেছে। একদিন দেখা গেল ন্যাপকিন

হাতে সে ওঁদের ডিনার টেবিল তদারক করবার জন্যে তৈরি। মনোযোগী জাপ থালা পালটে, ডিশ এনে, গেলাশে জল দিয়ে, এমন গম্ভীরভাবে আপন কাজ ক'রে চলল যে, হার্ডিং পর্যন্ত না-হেসে পারলেন না। সবচেয়ে বেশি হৈ-চৈ করতে লাগল পেনক্র্যাফ্‌ট। একটু পরে-পরেই সে বলতে লাগল : 'জাপ, একটু সুপ! জাপ, লক্ষ্মী জাপ, একটু জল!'—ইত্যাদি-ইত্যাদি।

প্রত্যেকবারই নীরবে জাপ সকলের চাহিদা সরবরাহ করতে লাগল। তা. কাজে একটুও গোলমাল হ'ল না। তাই দেখে পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'সত্যি জাপ, এবার তুমি দ্বিগুণ মাইনে চাইতে পারো!'

বলা বাহুল্য যে, জাপ গ্র্যানাইট হাউসের ঘরকন্নার ভার এবার থেকে, বলতে-গেলে, পুরোপুরিই নিয়ে নিলে নিজ হাতে। এখন তো সে গ্র্যানাইট হাউসের একজন পুরোদস্তুর মেম্বার। তার গাল-গল্প, হাসি-খেলা সব চলে টপের সঙ্গে। টপ বোধহয় এবার জাপের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, আর টপের জন্যে প্রাণ দিতে জাপও সর্বদা তৈরি।

জানুয়ারির শেষ দিকে দ্বীপের একেবারে মাঝখানে তাঁদের কাজ শুরু হ'ল। ঠিক হ'ল যে, রেড ক্রীকের উৎসের কাছে ফ্র্যাঙ্কলিন পর্বতের পাদদেশে একটি কোর্‌য়াল তৈরি করা হবে। গ্র্যানাইট হাউস থেকে পাঁচ মাইল দূরে কোর‍্যালের নির্মাণস্থান ঠিক করা হ'ল। হার্ডিং তাঁর এঞ্জিনিয়ারসুলভ নৈপুণ্যের সঙ্গে শিগগিরই কোর‍্যালের একটা প্ল্যান তৈরি ক'রে ফেললেন। জানোয়ারদের আশ্রয় নেয়ার জন্যে শেডও থাকবে কোর‍্যালে। তারপরেই সবাই কোর‍্যাল তৈরির কাজে উঠে-প'ড়ে লাগলেন। খুব মজবুত ক'রে বানানো হ'ল কোর‍্যাল। চারপাশে দেয়া হ'ল শক্ত বেড়া। কোর‍্যালের কাজ শেষ হ'তে-হ'তে তিন সপ্তাহ লেগে গেল। তারপর শুরু হ'ল কোর‍্যালের জন্যে জানোয়ার সংগ্রহের পালা। যদিও অনেক পরিশ্রম করতে হ'ল, তবুও কোনো নালিশ রইল না তাদের। কেননা, শিগগিরই কোর‍্যাল প্রায় ভর্তি হ'য়ে গেল।

সারা ফেব্রুয়ারি মাসে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটল না। যন্ত্রচালিতের মতো এগুতে লাগল সকলের কাজ। কোর‍্যালে যাওয়ার জন্যে রাস্তাটা সুগম করা হ'ল, পোর্ট বেলুনের সঙ্গেও যাতে সহজে সংযোগ করা যায়, সেইজন্যে সেখানে যাওয়ার জন্যেও ভালো ক'রে রাস্তা তৈরি করা হ'ল।

শীত আসবার আগেই যাতে রসদের একটা ব্যবস্থা করা যায়, সেইজন্যে নানান রকম শাকসব্জিরও একটি বাগান করা হ'ল। উদ্ভিদতত্ত্ব হার্বার্টের ভালো পড়া ছিল ব'লে সে-ই এই কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলে। দ্বীপের সমতল ভূমির জমি বেশ উর্বর ছিল ব'লে বাগানের কাজেও তাদের ব্যর্থতা বরণ করতে হ'ল না। ক্রমশ গরমের দিন প্রায় শেষ হ'য়ে গেল। এই গ্রীষ্মকালে দিনের তীব্র উত্তাপের পর সন্ধেবেলা সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রসপেক্ট হাইটের উপর ব'সে-ব'সে তাঁরা গল্পগুজব করতেন।

সেখানে শুধু গল্পগুজবই হ'ত না, নির্ধারিত হ'ত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। মাঝে-মাঝে স্বদেশের কথাও উঠতো। যুদ্ধ কি শেষ হয়েছে এতদিনে? কে জিতল লড়াইয়ে? নিঃসন্দেহে জেনারেল গ্র্যান্ট রিচমণ্ড দখল করেছেন। আহা! যদি একটা খবরের কাগজ পাওয়া যেত কোনোরকমে! এদিকে চব্বিশে মার্চ আসছে শিগগিরই। প্রায় এক বৎসর পূর্ণ হ'তে চলল

লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে আসবার পর থেকে। যখন তাঁরা দ্বীপে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ছিলেন ভাগ্যহত কয়েকজন ব্যক্তিমাত্র। আর এখন? জ্ঞানবৃদ্ধ ক্যাপ্টেনের আশ্চর্য প্রখর বুদ্ধি আর সকলের সম্মিলিত পরিশ্রমের দরুন এই নির্জন দ্বীপকে তাঁরা বাসযোগ্য ক'রে তুলতে পেরেছেন। এইসব কথা আলোচনা করতে-করতে অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে নতুন-নতুন পরিকল্পনা করতেন তাঁরা।

অবিশ্যি সাইরাস হার্ডিং এই ধরনের আলাপ-আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরব হ'য়ে থাকতেন। নিঃশব্দে তিনি শুনতেন তাঁর সঙ্গীদের কথাবার্তা, কখনো-কখনো তরুণ হার্বার্টের কল্পনাবিলাসে তাঁর ঠোঁটে হাসির ঝিলিক খেলে যেতো, কখনো-বা পেনক্র্যাফ্‌টের আজব বা আজগুবি প্ল্যান শুনে সশব্দে হেসে উঠতেন তিনি। কিন্তু সবসময়েই তাঁর মাথায় ঘুরে বেড়াতো একটি জিনিশ। সে হ'ল সেই রহস্যময় ঘটনাবলি, সেই আশ্চর্য-আশ্চর্য ব্যাপার, যার কোনো মীমাংসা করা এখনও সম্ভব হয়নি। দ্বীপে যে কোনো-একজন লোক আছে, সে-বিষয়ে হার্ডিং প্রায় নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে কে? থাকেই বা কোথায়? তাঁদের সাহায্য করছে অথচ দেখা দিচ্ছে না কেন?—না, এর কোনো উত্তরই খুঁজে পাননি হার্ডিং।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ আবহাওয়া বদলে গেল। পয়লা তারিখ ছিল পূর্ণিমা, গরমও পড়েছিল অসহ্যরকম। কিন্তু দুই তারিখে আকাশে গজরাতে লাগল বজ্র, পূর্বদিক থেকে বইল হাওয়া, ঝড়ের সম্ভাবনা জাগল বায়ুকোণে। সেই সম্ভাবনা সত্যি-সত্যিই উন্মত্ত ঝঞ্ঝায় পরিণত হ'ল। এই বিশ্রী আবহাওয়ার স্থিতিকাল হয়েছিল এক সপ্তাহ। বাইরের কোনো কাজ আপাতত হাতে না-থাকায় এই ঝড়ের সময় সবাই গ্র্যানাইট হাউসের গেরস্থালির কাজে মন দিলেন। বন্দুক রাখবার জন্যে র‍্যাক বানালেন, রান্নাবান্নার কিছু-কিছু সরঞ্জাম তৈরি করা হ'ল, টেবিল আর তাকও বানানো হ'ল গোটাকয়েক।

মাস্টার জাপের কথা কেউ ভুলে যায়নি। এবার ভাঁড়ার ঘরের পেছনে একটা পার্টিশন দিয়ে সম্পূর্ণ একটা ঘর ছেড়ে দেয়া হ'ল তার দখলে। ইতিমধ্যে জাপ তার কাজে-কর্মে আরো দুরন্ত হ'য়ে উঠেছে। তার কাজের ধারা দেখে সবসময়েই হৈ-চৈ করতো পেনক্র্যাফ্‌ট। দিন-দিন তার কাজের উন্নতি হচ্ছে দেখে পেনক্র্যাফ্‌টের উৎসাহও বেড়ে চলল।

দ্বীপবাসীদের স্বাস্থ্যে কোনো দোষত্রুটি ছিল না। এই এক বছরে হার্বার্ট তো দু-ইঞ্চি লম্বাই হ'য়ে গেছে। অন্য-সবার স্বাস্থ্যও নিখুঁত ছিল।

মার্চের নয় তারিখে এই তুমুল ঝড় থামল, কিন্তু সারা মার্চ মাস জুড়েই আকাশ মেঘ মুড়ি দিয়ে রইল। প্রায়ই বৃষ্টিপাত হ'ত, মাঝে-মাঝে বেজায় কুয়াশাও পড়তো। এরই মধ্যে একটি স্ত্রী-ওনাগার বাচ্চা হ'ল। কোর‍্যালে মুসমনের সংখ্যাও বেশ বৃদ্ধি পেলে।

একদিন কথায়-কথায় পেনক্র্যাফ্‌ট ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে বললে: 'ক্যাপ্টেন, আপনি একবার বলেছিলেন যে, সিঁড়ির পরিবর্তে গ্র্যানাইট হাউসে ওঠবার জন্যে একটা যন্ত্র বানানো সম্ভব। এবার সেই কাজে লাগলে হয় না?'

'খুবই সহজ ওটি বানানো। কিন্তু সত্যিই কি এর কোনো প্রয়োজন আছে?'

'নিশ্চয়ই, ক্যাপ্টেন। নিছক প্রয়োজনের তাগিদেই তো এতদিন কাজ ক'রে এসেছি, এবার একটু স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিলে কোনো ক্ষতি নেই। আমাদের কাছে হয়তো এ-স্বাচ্ছন্দ্যের জিনিশ ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু মালপত্র তোলবার ব্যাপারে এ আমাদের

প্রয়োজনের কোঠায় পড়ে। মালপত্র নিয়ে এই লম্বা সিঁড়ি বেয়ে ওঠা ভারি অসুবিধে, তাছাড়া বিপজ্জনকও।'

'বেশ, পেনক্র্যাফ্‌ট, তোমার কথা রাখতে পারি কি না চেষ্টা ক'রে দেখা যাক।' বললেন সাইরাস হার্ডিং।

'কিন্তু আপনার তো কোনো মেশিন নেই।'

'বানিয়ে নেবো।'

'স্টীম মেশিন?' শুধোল পেনক্র্যাফ্‌ট : 'বাষ্প-চালিত?'

'না, একটি হাইড্রলিক লিফ্‌ট বানাবো। তার জন্যে দরকার তীব্রস্রোত জলের।'

আর, বলা বাহুল্য, এই যন্ত্র তৈরি করবার প্রধান উপাদানের কোনো অভাবই ছিল না। ছোট্ট ঝরনাটির তীব্র স্রোতধারা গ্র্যানাইট হাউসের অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত হ'ত, তাকে কাজে লাগাবার পরিকল্পনা করেছেন হার্ডিং। যে-সংকীর্ণ ফাটল দিয়ে এই জলধারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করতো প্রথমে তাকে আরো চওড়া করা হ'ল—এমনভাবে, যাতে তীব্রবেগে তার জলধারা প্রবাহিত হয়। ভিতরের কূপটি দিয়ে এই জল গিয়ে পড়তো সমুদ্রে। সেই নিম্নগামী জলধারার নিচে ক্যাপ্টেন প্যাডেল-সমেত একটি সিলিণ্ডার লাগালেন। শক্ত, লম্বা একটা তার দিয়ে সেই সিলিণ্ডারের সঙ্গে একটি চাকা যোগ ক'রে দেয়া হ'ল। এইভাবে একটি দড়ির সাহায্যে গ্র্যানাইট হাউসের নিচের ভূমি স্পর্শ করা গেল। আর সেই দড়ির সঙ্গে একটি ঝুড়ি সংযুক্ত ক'রে দেয়া হ'ল। এইভাবেই জলধারাকে কাজে লাগিয়ে ক্যাপ্টেন তাঁর হাইড্রলিক লিফ্‌ট তৈরি করলেন।

সতেরোই মার্চ হাইড্রলিক লিফ্‌ট প্রথম কাজ করল। সাফল্য দেখে সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো, এবার সিঁড়ির ব্যবস্থা বাতিল ক'রে দেয়া হ'ল। মালপত্র তো বটেই, এছাড়াও টপ এবং জাপ সেই লিফ্‌টের সাহায্যেই ওঠানামা করতে লাগলে।

এবার সাইরাস হার্ডিং কাচ বানানোর পরিকল্পনা করলেন। মৃৎপাত্র নির্মাণের জন্যে যে-চুল্লিটা প্রস্তুত করা হয়েছিল, এবারে সেটি কাজে লাগল। কাচ তৈরি অবিশ্যি সহজ নয়। সম্মিলিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উপর্যুপরি বেশ কয়েকবার সেই কাজে ব্যর্থ হ'তে হ'ল ওঁদের।

অবশেষে ক্যাপ্টেন হার্ডিং কাচের কারখানা তৈরি করতে সক্ষম হ'লে তুমুল হৈ-চৈ-এর সঙ্গে সবাই তাঁকে অভিনন্দন জানালে। কাচ বানাতে যে-সব উপকরণ লাগে, যেমন—বালি, খড়ি, সোডা (কার্বনেট অথবা সালফেট—যে-কোনো একটি) কিছুরই অভাব ছিল না দ্বীপে। এইভাবে অল্পদিনের মধ্যেই কারখানা তৈরি হ'য়ে গেল। কাচ তৈরির জন্যে যে-পাইপের প্রয়োজন লোহা দিয়ে একটি টিউব তৈরি ক'রে সে অভাব পূরণ করা হ'ল। জলের টিউবটা হ'ল ছ-ফুট লম্বা—দেখতে অনেকটা বন্দুকের ব্যারেলের মতো। আটাশে মার্চ থেকে কাচ তৈরি শুরু হ'ল। প্রথম-প্রথম বালি খড়ি আর সোডার সংমিশ্রণ উপযুক্ত পরিমাণে না-হওয়ায়, যে-কাচ তৈরি হ'ল তা মোটেই স্বচ্ছ হ'ল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই অবিশ্যি সেই ত্রুটি সংশোধন ক'রে নিলেন হার্ডিং। তার পর থেকে স্ফটিকের মতো চকচকে, উজ্জ্বল স্বচ্ছ কাচ পেতে মোটেই অসুবিধে হ'ল না। সেই কাচ দিয়ে প্রথমে গ্র্যানাইট হাউসের জানলা তৈরি করা হ'ল। তারপর তৈরি করা হ'ল নানান ধরনের পাত্র। প্রায় শ-খানেক বোতল, পাঁচ ডজন গেলাশও তৈরি হ'ল। এইসব কাচের জিনিশের গড়ন মোটেই সুদৃশ্য

হ'ল না, কেমন তেড়াবেঁকা, দেখলেই হাসি পায় । এই কাজের ভার ছিল প্রধানত হার্বার্টের উপর । হার্বার্টকে উৎসাহ দেয়ার জন্যেই হার্ডিং সবাইকে এই নিয়ে হাসিহাসি করতে বারণ ক'রে দিলেন । অবিশ্যি অন্যরা এমনিতেও হাসত না । কেননা, ছাঁচ ছাড়াই যে এভাবে কাজ চালাবার উপযোগী জিনিশপত্র তৈরি করা যাচ্ছে, এ তো আর কম প্রশংসার ব্যাপার নয় ।

ইতিমধ্যে একদিন শিকার করতে বেরিয়ে হার্বার্ট আর হার্ডিং একটি মূল্যবান গাছ আবিষ্কার করলেন । গাছটি হল 'কাইকাস রিভল্যুতা' । প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ছাত্র ব'লে হার্বার্টই গাছটিকে চিনতে পেরেছিল । হার্বার্ট জানালে যে এই গাছের টিশু এক ধরনের ময়দার মতো পদার্থ পাওয়া যায়, খাদ্য হিশেবে যার আস্বাদ নিতান্ত ফ্যালনা নয় ।

তার কথা শুনে হার্ডিং বললেন : 'সোজা কথায়, এটি তাহ'লে রুটি-গাছ ?'

'হ্যাঁ, একে রুটি-গাছই বলা চলে । ব্রেডফ্রুট ট্রি ।'

'এটি একটি মূল্যবান আবিষ্কার,' বললেন হার্ডিং : 'যতদিন না আমরা আমাদের খেতের ফসল পাচ্ছি, ততদিন এই গাছ আমাদের আহার জোগাবে । কিন্তু তোমার গাছটা চিনতে ভুল হয়নি তো, হার্বার্ট ?'

না, হার্বার্টের ভুল হয়নি । হার্বার্ট গাছের একটা ডাল ভেঙে নিলে । এক ধরনের ময়দার মতো গুঁড়ো টিশু দিয়েই সেই ডাল গঠিত । প্রকৃতির আহার জোগানোর ক্ষমতা কত অসীম, এ-কথা চিন্তা ক'রে হার্ডিং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন । আশপাশে আরো-কয়েকটি এই জাতের গাছ দেখা গেল । যে-জায়গায় তাঁরা গাছগুলো পেলেন, সে-জায়গার অবস্থান দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে । গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে হার্ডিং এই মূল্যবান আবিষ্কারের কথা সবাইকে জানালেন । পরদিন সবাই মিলে সেই জায়গার উদ্দেশ্যে বেরুলেন । যখন তাঁরা ফিরে এলেন, দেখা গেল তাঁরা বিপুল পরিমাণে 'কাইকাসে'র ডাল সংগ্রহ ক'রে এনেছেন । যদিও এটি অবিকল শাদা রঙের ময়দার মতো হ'ল না, তবু দেখতে অনেকটা সেই রকমই হ'ল ।

কোর‍্যালের প্রাণীদের একটি বৃহৎ সংখ্যা রচনা করেছিল ওনাগা, ছাগল আর ভেড়া । তাদের দুধ এবার পেতে লাগলেন তাঁরা । ওনাগার গাড়ির সাহায্যে কোর‍্যাল আর গ্র্যানাইট হাউসের মধ্যে সংযোগ রক্ষার বিশেষ অসুবিধে হ'ত না ।

যত দিন গেল, ততই উন্নতি হ'তে লাগল তাঁদের অবস্থার । খুঁত-খুঁত করবার মতো কিছুই ছিল না তাঁদের । ক্রমে-ক্রমে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডই যেন তাঁদের স্বদেশ হ'য়ে উঠতে লাগল ।

দ্বীপে প্রয়োজনীয় কোনো-কিছুরই অভাব না-থাকায়, ক্রমশ এই দ্বীপকে ভালোবাসতে শুরু করলেন তাঁরা । কিন্তু তবু মাতৃভূমির মাটি টানে সকলের মন । মনের মণিকোঠায় উঁকিঝুঁকি মারে ক্ষীণ আশা । আহা ! একবার যদি একটি জাহাজ যায় এই দ্বীপের পাশ দিয়ে ! তখন হয়তো-বা সংকেতের সাহায্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে সেই জাহাজের ।

সেদিন পয়লা এপ্রিল, রবিবার । দিনটা ছিল ঈস্টার ডে। হার্ডিং আর তার সঙ্গীরা সেদিন খানিকক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করলেন । আবহাওয়া ছিল প্রসন্ন । প্রার্থনার পরে সেই আবহাওয়ার মতোই শুচি হ'য়ে উঠল তাঁদের মন ।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে সবাই প্রসপেক্ট হাইটের উপরে একটি বারান্দা'র মতো

জায়গায় গা এলিয়ে বসলেন । খানিকক্ষণ সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন অন্ধকার দিকচক্রবালের দিকে । তারপর দ্বীপের কথাই আলোচনা করতে লাগলেন । প্রশান্ত মহাসাগরের এমন-এক নিরালা অঞ্চলে তাঁদের দ্বীপ অবস্থিত যে, কোনো জাহাজ তৈরি ক'রে সমুদ্র-পাড়ি দেয়া সহজসাধ্য নয় ।

এমন সময় গিডিয়ন স্পিলেট প্রশ্ন করলেন : 'আচ্ছা ক্যাপ্টেন হার্ডিং, সিন্দুকে সেক্সট্যান্ট পাওয়ার পর আপনি কি আর আমাদের দ্বীপের অবস্থান নিরূপণের চেষ্টা করেছেন ?'

'না,' উত্তর করলেন সাইরাস ।

'আপনি তো আগে নক্ষত্র দেখে, আর গাছের ছায়া ইত্যাদি দেখে দ্বীপের অবস্থান আন্দাজ করেছিলেন । সেক্সট্যান্ট ব্যবহার করলে সেই সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো না কি ?'

'কী দরকার খামকা ?' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট : 'দ্বীপটার অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ যা-ই হোক না কেন, দিব্যি আরামে-গরমে আছি তো ।'

'এমনও তো হ'তে পারে,' বললেন স্পিলেট, 'এই দ্বীপের কাছাকাছি কোনো লোকালয় আছে, অথচ আমরা জানি না ।'

'বেশ । কালকেই আমরা দ্বীপের সঠিক অবস্থিতি জেনে নেবো,' বললেন হার্ডিং : 'অন্য-সব কাজে ব্যস্ত না-থাকলে আরো আগেই তা জানতে পারতুম ।'

'আমার কিন্তু মনে হয়,' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট, 'ক্যাপ্টেন আগে যা নিরূপণ করেছিলেন তাই ঠিক । যদি দ্বীপটি এর মধ্যে স্থানচ্যুত না-হ'য়ে থাকে, তবে ক্যাপ্টেনের হিশেবে কোনোই ভুল হয়নি ।'

'সে দেখা যাবে কাল ।'

পরদিন দোসরা এপ্রিল সেক্সট্যান্টের সাহায্যে হার্ডিং সতর্ক হ'য়ে দ্বীপের অবস্থিতি নির্ধারণে রত হলেন । তাঁর পর্যবেক্ষণের ফল থেকে জানা গেল যে, যন্ত্র ব্যতিরেকে তিনি যা নিরূপণ করেছিলেন, প্রায় সেইটেই দ্বীপের অবস্থিতি । তাঁর প্রথম পর্যবেক্ষণের ফল ছিল এইরকম :

পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা : ১৫০° থেকে ১৫৫°-র মধ্যে ।

দক্ষিণ অক্ষাংশ : ৩০° থেকে ৩৫°-র মধ্যে ।

এবারের পর্যবেক্ষণের ফলে সঠিক অবস্থান দাঁড়াল :

১৫০°৩০´ দ্রাঘিমারেখা এবং ৩৪°৫৭´ দক্ষিণ অক্ষাংশ ।

দেখা গেল, আগের বারে যন্ত্রপাতি না-থাকা সত্ত্বেও সাইরাস হার্ডিং হিশেবে খুব-বেশি তফাৎ করেননি ।

স্পিলেট বললেন, 'আমাদের তো একটি মানচিত্র আছে । প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক কোন্‌খানটায় আমাদের দ্বীপ, এবার তা দেখা যাক ।'

হার্বার্ট তক্ষুনি মানচিত্র নিয়ে এল । প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্র বের করা হ'ল ।

কম্পাসের সাহায্যে হার্ডিং লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের অবস্থিতি নিরূপণ ক'রে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন : 'আরে ! প্রশান্ত মহাসাগরের এ-অঞ্চলে আগে থেকেই আরেকটা দ্বীপ আছে !'

'একটা দ্বীপ !' চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফ্‌ট : 'কী নাম ?'

'টেবর আইল্যাণ্ড ।'

'গুরুত্বপূর্ণ কোনো দ্বীপ ?'

'না, জনমানবহীন একটা হারানো দ্বীপ এটি ।'

'আমরা তবে টেবর আইল্যাণ্ডে যাবো,' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট ।

'আমরা !'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন । আমি একটা ডেক-সমেত নৌকো তৈরি করবার ভার নিচ্ছি । তার সাহায্যেই আমরা টেবর আইল্যাণ্ডে যাবো । আমাদের দ্বীপ থেকে কত দূরে ওই দ্বীপ ?'

'উত্তর-পুব দিকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে ।' উত্তর করলেন হার্ডিং ।

'দেড়শো মাইল ? এত কাছে ?' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট : 'আবহাওয়া ভালো থাকলে, অনুকূল হাওয়া পেলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওই দ্বীপে পৌঁছুনো যাবে ।'

এ-কথা শুনে সবাই ঠিক করলেন যে, অক্টোবরের আগেই একটা পালের জাহাজ তৈরি করতে হবে । তারপর বের হওয়া যাবে সীমাহারা নীল সমুদ্রে, নতুন অ্যাডভেনচারের সন্ধানে ।

৪

সন্দেহ তবু গেল না

পেনক্র্যাফ্‌টের মগজে যখন কোনো কাজের কথা ঢোকে, তখন সে-কাজ শেষ না-হওয়া অব্দি তার আর শান্তি নেই ; অক্টোবর মাস এলেই টেবর আইল্যাণ্ডে যেতে হবে, সুতরাং উপযুক্ত নৌকো তৈরি করবার জন্যে তার মন ভারি ব্যস্ত হ'য়ে উঠল । অক্টোবরের অবিশ্যি এখনও ছ-মাস বাকি । এই সময়ের মধ্যে নৌকো তৈরি করতেই হবে । হার্ডিং এক-একজনের ওপর এক-একরকম কাজ ভাগ ক'রে দিলেন । তিনি আর পেনক্র্যাফ্‌ট নিলেন নৌকো তৈরির ভার ; স্পিলেট আর হার্বার্টের উপর পড়ল শিকার ক'রে খাদ্যের ব্যবস্থা করবার ভার ; আর ঠিক হ'ল, নেব্‌ জাপকে নিয়ে রান্নাবান্না করবে ।

উপযুক্ত গাছ বেছে নিয়ে সেই গাছ চিরে তক্তা করা হ'ল । চিমনি আর প্রসপেক্ট হাইটের মাঝখানে ডক-ইয়ার্ড বানিয়ে পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা নৌকোর কাঠামো তৈরি করা হ'ল । তারপর শুরু হ'ল হার্ডিং আর পেনক্র্যাফ্‌টের সকাল-সন্ধে পরিশ্রম ।

এদিকে হার্বার্টকে নিয়ে স্পিলেট শিকারে বেরুতে লাগলেন প্রত্যহ ।

তিরিশে এপ্রিল তাঁরা পশ্চিম দিকে গহন বনে শিকার করতে গেলেন । স্পিলেট চললেন আগে-আগে, হার্বার্ট পেছন-পেছন । একটু খোলামেলা জায়গায় এলে পর স্পিলেট ঝোপের মতো নিবিড় এক ধরনের গাছ দেখতে পেলেন । তার পাতার গন্ধ কী-রকম যেন কটু । আঙুরের মতো থোকা-থোকা ফুল ফুটে আছে । তার মধ্যে আবার ছোটো-ছোটো ফলও রয়েছে । ডালগুলো সোজা । পাতাগুলো একটু লম্বাটে ধরনের । একটা ডাল ভেঙে হার্বার্টকে

দেখালেন স্পিলেট। শুধোলেন : 'হার্বার্ট, এটা কী গাছ ?'

গাছ দেখেই চিনতে পারলে হার্বার্ট। বললে : মিস্টার স্পিলেট, খুব মূল্যবান গাছ আবিষ্কার করেছেন আপনি ! এর জন্যে পেনক্র্যাফ্ট আপনার কাছে চিরজীবন কেনা হ'য়ে থাকবে !'

স্পিলেট জিগেস করলেন, 'এটা কি তামাকের গাছ ?'

'হ্যাঁ,' বললে হার্বার্ট। 'যদিও খুব ভালো তামাক নয়, তবু এটা যে তামাকের গাছ, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

'তাহ'লে তো পেনক্র্যাফ্‌টের জোর বরাত বলতে হবে,' হাসলেন স্পিলেট। 'আনন্দে ও একেবারে দিশেহারা হ'য়ে যাবে !'

হার্বার্টের মাথায় তক্ষুনি একটা মৎলব এলো। 'মিস্টার স্পিলেট,' বললে সে : 'এখন পেনক্র্যাফ্‌টকে এই সম্পর্কে কিছু বলা চলবে না। গোপনে তামাক তৈরি ক'রে একেবারে পাইপে ভ'রে নিয়ে, ওকে উপহার দেয়া হবে।'

স্পিলেট আর হার্বার্ট অনেক তামাক-পাতা সংগ্রহ ক'রে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলেন। পাতাগুলো গোপনে রাখা হ'ল। তারপর চুপি-চুপি সাইরাস হার্ডিং আর নেব্‌কে এর কথা জানিয়ে দেয়া হ'ল। পাতাগুলো শুকিয়ে কেটে ব্যবহারের উপযুক্ত ক'রে তুলতে লাগল প্রায় মাস-দুয়েক। পেনক্র্যাফ্‌ট এই সম্পর্কে একটি কথাও জানতে পারলে না। সে সবসময় নৌকোর কাজ নিয়েই থাকতো। গ্র্যানাইট হাউসে আসতো মাত্র একবার—আহার ও বিশ্রামের জন্যে।

ইতিমধ্যে, প্রকাণ্ড একটা জন্তু লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের চারদিকে প্রায় দু-মাইল দূরে সমুদ্রে সাঁৎরে বেড়াতে লাগল। দ্বীপবাসীরা জন্তুটাকে দেখে বুঝতে পারলেন যে সেটা একটা বিরাট তিমি।

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে, 'আহা ! তিমিটা শিকার করতে পারলে চমৎকার হ'ত !' এই ব'লে আপশোশ করতে-করতে সে তার কাজে চ'লে গেল।

এদিকে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। দেখা গেল, তিমিটা যেন কিছুতেই লিঙ্কন আইল্যাণ্ড ছেড়ে যেতে চাইছে না। পেনক্র্যাফ্‌ট তো একেবারে অস্থির ! তিমিটাকে মারতেই হবে ! কী কাজের সময়, কী বিশ্রামের সময়—সবসময়েই যেন তিমিটা তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল। অবশেষে তেসরা মে দ্বীপবাসীদের পক্ষে যা আশার অতীত ছিল, আপনা থেকেই তা ঘ'টে গেল। নেব্ রান্নাঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আরে ! কী আশ্চর্য ! তিমিটা সমুদ্রতীরে আটকা প'ড়ে গেছে !'

গিডিয়ন স্পিলেট আর হার্বার্ট তখন শিকারে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হাতের বন্দুক ফেলে দিয়ে তাঁরা ছুটলেন সমুদ্রের দিকে। হার্ডিং আর নেব্‌ও তাঁদের অনুসরণ করলেন। বলা বাহুল্য, পেনক্র্যাফ্‌টও ছুট লাগালে সেই দৃশ্য দেখতে।

গ্র্যানাইট হাউস থেকে তিন মাইল দূরে ফ্লোটসাম পয়েন্ট, সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল মাল-সমেত সিন্দুক। দেখা গেল জোয়ারের সময় সেখানে এসেই আটকা পড়েছে তিমিটা। উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সবাই বল্লম, কুড়ুল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটলেন। মার্সি নদীর উপরকার সেতুটি পেরিয়ে সমুদ্রতীরে তিমিটার কাছে পৌঁছুতে প্রায়

বিশ মিনিট সময় লাগল । দূর থেকে দেখতে পাওয়া গেল, বিশালকায় তিমিটার দেহের উপরে অগুনতি পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে । তিমিটা প'ড়ে আছে নিশ্চল হ'য়ে, একটুও নড়াচড়া নেই । আরো কাছে গিয়ে দেখা গেল, সেটা ম'রে প'ড়ে আছে । তার বাঁ-পাশে পাঁজরের মধ্যে একটা হারপুন বিঁধে আছে ।

স্পিলেট বললেন, 'তাহ'লে দেখছি লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের কাছেই তিমি-শিকারী কেউ রয়েছে !'

'তা না-ও হতে পারে—' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট—'অনেক সময় দেখা গেছে পাঁজরে হারপুন নিয়ে তিমি হাজার-হাজার মাইল চ'লে যায় । এই তিমিটা হয়তো অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে আহত হ'য়ে প্রশান্ত মহাসাগরে চ'লে এসেছে । এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই ।' এই বলে পেনক্র্যাফ্‌ট হারপুনটা টেনে বার করল । দেখা গেল সেটার বাঁটের মধ্যে লেখা রয়েছে :

'মারিয়া স্তেলা',
'ভিনিয়ার্ড' ।

ভিনিয়ার্ড হ'ল নিউ-ইয়র্কের একটা বন্দর, সেখানেই পেনক্র্যাফ্‌টের জন্ম হয়েছিল । মারিয়া স্তেলা জাহাজটি সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় তিমি-শিকারের জন্যেই । 'মারিয়া স্তেলা'র কথাও পেনক্র্যাফ্‌ট জানতো । সে হারপুন মাথার উপর ঘোরাতে-ঘোরাতে মনের আবেগে বার-বার বলতে লাগল : 'মারিয়া স্তেলা আমি চিনতুম । পয়লা শ্রেণীর জাহাজ ! হবে না-ই বা কেন ? ভিনিয়ার্ডের জাহাজ তো !'

তিমিটা পচতে শুরু করার আগেই তার শরীর থেকে দরকার-মতো মাংস আর হাড় বের ক'রে নিতে হবে । পেনক্র্যাফ্‌ট আগে একবার একটা তিমি-ধরা জাহাজে কাজ করেছিল । তিমির চর্বিটারই সবচেয়ে বেশি দরকার । সেজন্যে পেনক্র্যাফ্‌ট বেছে-বেছে শুধু চর্বিটুকুই কেটে নিলে । যে-সব হাড় ভবিষ্যতে কাজে লাগবে, সেগুলোও কেটে বার করা হ'ল ।

বহুদিনের খাদ্যের সন্ধান পেয়ে ইতিমধ্যেই অগুনতি পাখি এসে ভিড় করেছিল । সহজে তারা তিমিটাকে ছেড়ে যেতে চায়নি । শেষটায় বন্দুক ছুঁড়ে তাদের তাড়ানো হ'ল । দ্বীপবাসীরা অবিশ্যি কাজের অংশটুকু কেটে নিয়ে তিমির বাকি শরীরটুকু পাখিদের ছেড়ে দিলেন ।

এরপর ফের নবোদ্যমে নৌকোর কাজ শুরু হ'ল । শ্রান্তিহীন পেনক্র্যাফ্‌ট আশ্চর্য পরিশ্রম করতে লাগল দিনরাত । সবাই মিলে ঠিক করলেন, পেনক্র্যাফ্‌টকে এত পরিশ্রমের পুরস্কার দিতে হবে । দিন ঠিক হ'ল একত্রিশে মে । সেদিন পেনক্র্যাফ্‌টকে সেই পুরস্কার দিয়ে দস্তুরমতো তাক লাগিয়ে দেয়া হবে ।

সেদিন রাত্রিবেলা খাওয়ার পর পেনক্র্যাফ্‌ট যখন টেবিল ছেড়ে উঠতে যাবে, তখন গিডিয়ন স্পিলেট তাকে বাধা দিলেন । বললেন : 'আর-একটু জিরিয়ে নাও হে—এত তাড়াতাড়ি চ'লে গেলে হবে না । এখনও একটা জিনিশ বাকি আছে ।'

'না, মিস্টার স্পিলেট—' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট, 'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে । আমি এখন আমার কাজে যাবো ।'

'বেশ, তাহ'লে অন্তত এককাপ কফি খেয়ে যাও !'

'না-না—আর-কিছুরই দরকার নেই।'

'আহা!' বললেন স্পিলেট: 'তাহ'লে একটু তামাকই খেয়ে যাও না-হয়!'

'তামাক!' পেনক্র্যাফ্‌ট একেবারে লাফিয়ে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে স্পিলেট তামাক-ভরা পাইপটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, আর হার্বার্ট একটুকরো জ্বলন্ত কয়লা হাতে নিয়ে তার কাছে এগিয়ে এলো। কী-যেন বলতে চেষ্টা করলে পেনক্র্যাফ্‌ট, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। হাত বাড়িয়ে পাইপটা নিয়ে মুখে দিলে সে। তারপর পাইপে আগুন ধরিয়ে চোখ বুজে কেবল টানের পর টান! তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে পূর্ণ তৃপ্তির স্বরে ব'লে উঠল: 'তামাক! একেবারে সত্যি-সত্যি তামাক! এ-যে আশাতীত!'

একটু বাদে সে আবার প্রশ্ন করলে: 'তা, এ-আবিষ্কারটা কার? হার্বার্টের বুঝি?'

'না, পেনক্র্যাফ্‌ট!'—বললে হার্বার্ট: 'এটি মিস্টার স্পিলেটেরই আবিষ্কার।'

'মিস্টার স্পিলেট!' এই কথা ব'লেই পেনক্র্যাফ্‌ট স্পিলেটকে এমনভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলে যে স্পিলেটের একেবারে দম বন্ধ হয়-হয়।

কোনোমতে পেনক্র্যাফ্‌টের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে তিনি বললেন: 'ধন্যবাদ সকলকেই দাও তুমি। হার্বার্ট গাছটাকে চিনতে পেরেছিল, হার্ডিং তামাক তৈরি করেছিলেন, আর এমন-একটা কথা চেপে রাখতে নেবেরও কম কষ্ট হয়নি!'

জুন মাসের গোড়া থেকেই বেশ শীত পড়ল। এবার সকলের প্রধান কাজ হ'ল শীতের পোশাক তৈরি করা। কোর‍্যালে যতগুলো মুসমন ছিল সবগুলোরই লোম কেটে ফেলা হ'ল—এই লোম দিয়ে গরম কাপড় তৈরি করতে হবে। কাজটা খুব সোজা নয়। সুতো কাটবার কল নেই, কাপড় বোনবার কল নেই—এককথায়, কোনো সরঞ্জামই নেই। উপায় ঠিক করলেন সাইরাস হার্ডিং। প্রথমে লোমগুলোকে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়া হ'ল। তারপর আবার সোডার জলে ধুয়ে নেয়া হ'ল। এখন ওগুলোকে চেপে পাৎলা চাদরের মতো ক'রে নিতে পারলে ফেল্টের মতন একটা জিনিশ প্রস্তুত হবে। দ্বীপবাসীদের কাপড় হিশেবে এই হালকা ফেল্টের চাদরই ঢের। খুব বড়ো-বড়ো কাঠের ডিশ বানিয়ে তাতে সাবান-মাখানো পশম রাখা হ'ল। তারপর কাঠের মুগুর দিয়ে সজোরে একনাগাড়ে চাপ দিতে-দিতে সমস্ত পশমকে জমাট বাঁধিয়ে বেশ পাৎলা ফেল্টের মতো তৈরি ক'রে নেয়া হ'ল। এই ফেল্টের চাদর দিয়ে কোট-প্যান্ট হ'ল। এবার আর ভাবনা কীসের? এখন শীত এলেও কোনো পরোয়া নেই।

পরোয়া নেই বলাতেই বোধহয় বিশে জুন থেকে ভয়ানক শীত পড়ল। বাইরে কাজ করা একেবারে অসম্ভব হ'য়ে উঠল। কাজেই বাধ্য হ'য়ে পেনক্র্যাফ্‌টকে নৌকোর কাজ স্থগিত রাখতে হ'ল। পেনক্র্যাফ্‌টের খুব ইচ্ছে, নৌকো তৈরি হ'লেই টেবর আইল্যাণ্ডের উদ্দেশে সমুদ্রে পাড়ি জমানো।

লিঙ্কন আইল্যাণ্ড থেকে টেবর আইল্যাণ্ড দেড়শো মাইল দূরে। শুধু-শুধু দ্বীপ দেখতে যাওয়ার জন্যে সমুদ্র-পথে একটা নৌকোয় চ'ড়ে যাওয়াটা সাইরাসের পছন্দ হ'ল না। নৌকো যদি মাঝপথে কোনো ঝড়ের পাল্লায় পড়ে, তবে আর বাঁচোয়া নেই। তবু পেনক্র্যাফ্‌টের জেদ, টেবর আইল্যাণ্ডে যাবেই। হার্ডিং ওকে বোঝালেন, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চাইলে

না। বরং বললে : আমি তো আর লিঙ্কন আইল্যাণ্ড ছেড়ে একেবারে চ'লে যেতে চাইছি না, একবার টেবর আইল্যাণ্ড দেখেই চ'লে আসবো।'

হার্ডিং বললেন : 'দেখবার আর কী আছে ? টেবর আইল্যাণ্ড নিঃসন্দেহে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের চেয়ে ভালো নয়।

'সে আমি জানি', একগুঁয়ের মতো ঘাড় নাড়লে পেনক্র্যাফ্‌ট : 'তবু একবার দেখে আসবো। আপনি ভাববেন না। ভালো আবহাওয়া দেখে রওনা হ'লেই তো ঝড়বৃষ্টির ভয় থাকবে না। আমি শুধু হার্বার্টকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, আপনি এতে আর কোনো আপত্তি করবেন না। আমার ভরসা আছে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে কোনো বিপদেই পড়বো না। নৌকোটা শেষ হ'লে একবার যখন সেইটেতে চ'ড়ে দেখবেন কেমন মজবুত, তখন আর আপনার কোনো ভাবনা থাকবে না।'

জুন মাসের শেষে বরফ পড়তে শুরু হ'ল। কোর‍্যালে অনেক জন্তু ছিল, সুতরাং সেখানে খাবার-দাবারের নিয়মিত জোগান দেয়া দরকার। তাই ঠিক হ'ল সপ্তাহে একদিন কোর‍্যালে গিয়ে খবর নিয়ে আসতে হবে। অবিশ্যি কোর‍্যালে জন্তুদের খাদ্যের পরিমাণ যথেষ্ট রাখা হয়েছিল, তবু সবাই সতর্কতার জন্যে এই ব্যবস্থা ঠিক করলেন।

এদিকে গিডিয়ন স্পিলেট ভাবছিলেন তাঁদের লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের খবরটা কোনোরকমে কোনো মহাদেশে পৌঁছে দেয়া যায় কি না। দুটি উপায় অবিশ্যি আছে। এক হ'ল, কাগজে সমস্ত ঘটনা লিখে সেই কাগজটুকু বোতলে বন্ধ ক'রে তাতে এমনভাবে ছিপি এঁটে দেয়া, বোতলের মধ্যে যাতে একফোঁটাও জল না-ঢোকে। সেই বোতল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলে, সেটা হয়তো একদিন কোনো দেশে গিয়ে লাগতে পারে। আর দু-নম্বর হ'ল, চিঠি লিখে পায়রার গলায় বেঁধে পায়রাটাকে ছেড়ে দেয়া। কিন্তু পায়রাই হোক আর বোতলই হোক —বারোশো মাইল বিস্তৃত সমুদ্র পেরিয়ে যাওয়া কোনোটার পক্ষেই সম্ভব নয়। এমনধারা কথা ভাবাও বাতুলতা। কিন্তু এই কল্পনা-বিলাসের সাফল্যের একটা সুযোগ হঠাৎ একদিন এসে হাজির হ'ল।

বিশে জুন হার্বার্ট একটা অ্যালবাট্রস পাখিকে গুলি করেছিল। গুলিটা লেগেছিল পাখিটার পায়ে। সবাই মিলে অনেক চেষ্টার পর পাখিটাকে পাকড়াও করলেন। অ্যালবাট্রস হাঁস-জাতীয় পাখি। রঙ শাদা ধবধবে। পাখা মেললে দশ ফুট লম্বা হয়। এর মতো ওড়বার শক্তি অন্য-কোনো পাখির নেই।

স্পিলেট সব ঘটনা লিখে ফেললেন। সেই কাগজটা ব্যাগের মধ্যে পুরে ব্যাগটা অ্যালবাট্রসের গলায় বেঁধে দেয়া হ'ল। এই লেখার সঙ্গে একটা আবেদনও ছিল। তাতে ছিল : 'এই ব্যাগটা কারু হাতে পড়লে অনুগ্রহ করে *নিউ-ইয়র্ক হেরাল্ড* কাগজের আপিশে পাঠিয়ে দেবেন।' এরপর পাখিটাকে ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার পাখা ঝটপট ক'রে উঠল, তারপর গলায় ব্যাগটি নিয়ে সে দেখতে-দেখতে সমুদ্রের উপর দিয়ে সীমাহারা নীল আকাশে মিলিয়ে গেল।

শীত শুরু হ'তেই সবাই গ্র্যানাইট হাউসের মধ্যে থেকে ঘরোয়া কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। নৌকোর জন্যে একটা পাল তৈরি করতে হবে। বেলুনের আবরণের কল্যাণে কাপড়ের কোনো অভাব নেই। পেনক্র্যাফ্‌ট উঠে-প'ড়ে লাগল পাল তৈরির কাজে।

জুলাই মাসে ভয়ানক শীত পড়ল। খাবার-ঘরেও আরেকটা চুল্লির ব্যবস্থা করা হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার পর এই চুল্লির ধারে ব'সে সবাই যে যার কাজ করেন, পড়াশোনা করেন, কখনো-বা গল্প-গুজব করেন। একদিন সবাই চুল্লির ধারে ব'সে কাজ করছিলেন, এমন সময় টপ হঠাৎ ভীষণভাবে ডেকে উঠল। শুধু ডাকা নয়, সেইসঙ্গে কুয়োটার মুখের চারপাশে ছুটোছুটিও করতে লাগল। এই সময় জাপও গর্-গর্ করতে লাগল। ঠিক রাগের গর্জন নয়—টপ আর জাপ যেন কোনো কারণে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে উঠেছে।

স্পিলেট বললেন : 'কুয়োটার যোগ আছে সমুদ্রের সঙ্গে। বোধহয় কোনো সমুদ্রের জন্তু কুয়োর তলায় জিরোতে আসে।'

পেনক্র্যাফ্‌ট ধমক দিয়ে জাপ আর টপকে চুপ করালে। ধমক খেয়ে জাপ তার ঘরে চ'লে গেল। টপ চুপ করলে বটে, কিন্তু সেই ঘরেই রইল, আর মধ্যে মধ্যে গোঁ-গোঁ ক'রে শব্দও করতে লাগল। এই সম্পর্কে আর-কোনো আলোচনা হ'ল না। কিন্তু এই ঘটনায় কেন যেন সাইরাস হার্ডিং খুব গম্ভীর হ'য়ে গেলেন।

গোটা জুলাই মাস ধ'রেই একটানা তুষার-ঝড় চলল। শীত গত বছরের মতো তেমন না-হ'লেও, তুষার-ঝড়ের তীব্রতা এবার হ'ল বেশিরকম। এই ঝড়ের সময় বাইরে বেরুনো বিপজ্জনক। চারদিকেই গাছ-গাছালি ভেঙে পড়তে থাকে। এই দুর্যোগের মধ্যেও সপ্তাহে একদিন ক'রে কোর‍্যালের খবর নেয়া বাদ পড়ত না। মাউণ্ট ফ্রাঙ্কলিনের আড়ালে থাকার দরুন ঝড়ে কোর‍্যালের কোনো ক্ষতি হয়নি বটে, কিন্তু ওঁরা প্রসপেক্ট হাইটের উপরে যে পাখির বাসা তৈরি করেছিলেন, তার খুব ক্ষতি হয়েছিল।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আকাশ অনেকটা শান্ত হ'ল বটে, কিন্তু হিম পড়ল বেশি। তেসরা আগস্ট স্পিলেট, পেনক্র্যাফ্‌ট, হার্বার্ট আর নেব্ একদিন শিকারে বেরুলেন। ট্যাডর্ন মার্শ-এ বিস্তর বুনো হাঁস, স্নাইপ, টীল প্রভৃতি পাখি চ'রে বেড়ায়। সবাই ট্যাডর্ন মার্শ-এর দিকে রওনা হ'ল। সাইরাস হার্ডিং তাদের সঙ্গে গেলেন না ; বললেন : 'গ্র্যানাইট হাউসে ব'সে আমাকে অনেক কাজ করতে হবে, তোমরা যাও।'

সবাই পোর্ট বেলুনের পথে রওনা হলেন। সেই পথেই জলাভূমিতে যেতে হয়। যাওয়ার আগে তাঁরা জানিয়ে গেলেন যে সন্ধের আগেই তাঁরা গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে আসবেন। টপ আর জাপও তাঁদের সঙ্গে গেল। সবাই মার্সি নদীর সেতুটা পেরিয়ে গেলে হার্ডিং গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলেন। তাঁর মনে একটা উদ্দেশ্য ছিল, সেজন্যেই তিনি শিকারে যাননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, গ্র্যানাইট হাউসের কুয়োটা খুব ভালো ক'রে পরীক্ষা করা। টপ কেন কুয়োর মুখের চারদিকে ডেকে-ডেকে ছুটে বেড়ায়? আর যখনই এ-রকম করে, তখনই কেন অমন অস্থির হ'য়ে ওঠে? সেদিন জাপও কেন টপের মতো অত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল? সমুদ্র ছাড়া অন্য-কিছুর সঙ্গে কি কুয়োটার যোগ আছে? দ্বীপের দিকেও কি এর কোনো পথ গিয়েছে?—এইসব প্রশ্নের উত্তর বের করবার জন্যেই হার্ডিং ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। ঠিক করেছিলেন যে অন্যদের অনুপস্থিতিতে একলা এ-কাজটা করবেন। এবার সেই সুযোগ এসেছে। লিফ্‌ট তৈরি হবার পর থেকে দড়ির সিঁড়িটা ব্যবহার হ'ত না। এই সিঁড়ির সাহায্যে কুয়োর নিচে নামা খুব সহজ। এর একটা মাথা শক্ত ক'রে বেঁধে হার্ডিং গোটা সিঁড়িটা কুয়োর মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর রিভলভার আর ছুরি কোমরবন্ধের মধ্যে গুঁজে লণ্ঠন হাতে

সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন ।

কুয়োর ধারটা অসমান নয়, তবে মধ্যে-মধ্যে ছুঁচলো পাথর যেন মাথা বাড়িয়ে আছে । এইসব পাথরের সাহায্যে কোনো চটপটে জন্তুর পক্ষে কুয়োটার মুখ পর্যন্ত উঠে আসা বিচিত্র নয় । কিন্তু হার্ডিং এমন-কোনো চিহ্ন দেখতে পেলেন না যা থেকে মনে হ'তে পারে যে সম্প্রতি কোনো জন্তু এই পাথরের সাহায্যে উপরে ওঠবার চেষ্টা করেছে ।

আরো নিচে নামলেন হার্ডিং । কিন্তু তবু সন্দেহজনক কিছুই তার নজরে পড়ল না ।

সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত নামবার পর জল দেখা গেল । নিষ্কম্প, স্থির জল । হার্ডিং কুয়োর দেয়াল ঠুকে দেখলেন । একবারে নিরেট গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল । না, এর মধ্যে দিয়ে কোনো পথ নেই ।

অনুসন্ধান শেষ ক'রে সাইরাস হার্ডিং উপরে উঠে এলেন । তারপর সিঁড়িটা তুলে নিয়ে কুয়োর মুখ বন্ধ ক'রে দিলেন । এরপর খাবার-ঘরে ব'সে ভাবতে লাগলেন ।

কিছুই তো দেখতে পাওয়া গেল না । কিন্তু তাহ'লেও কিছু-একটা কুয়োর মধ্যে আছেই । অন্তত মধ্যে-মধ্যে যে এসে থাকে, সে-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না । অনুসন্ধানের ফলে সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পাওয়া না-গেলেও, সন্দেহ গেল না হার্ডিং-এর ।

৫

ভাসমান লিপি

সন্ধের আগেই রাশি-রাশি শিকার নিয়ে ফিরল হার্বার্টরা । সবার কাঁধেই শিকারের বোঝা ; টপের গলায় টীল পাখির মালা, জাপেরও সারা গায়ে স্নাইপ পাখির পালক ঝোলানো ।

সাইরাস হার্ডিং তাঁর অনুসন্ধানের কথা গোপনে স্পিলেটকে বললেন । সব শুনে স্পিলেট বললেন : 'খুঁজে কিছু দেখতে না-পেলেও কোনো জন্তু নিশ্চয়ই কুয়োর মধ্যে থাকে কিংবা মাঝে-মাঝে সেখানে আসে । দেখা যাক, ভবিষ্যতে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় কি না ।'

নেব্ স্পিলেটের সাহায্যে শিকারগুলির ব্যবস্থায় মন দিল । প্রচুর পরিমাণ শিকার । এত ঠাণ্ডায় নষ্ট হ'য়ে যাওয়ারও কোনো ভয় নেই । রাশি-রাশি পাখি ও জন্তুর মাংস ভবিষ্যতের জন্যে নুন মাখিয়ে জারিয়ে রেখে দেয়া হ'ল ।

পেনক্র্যাফ্ট হার্বার্টকে নিয়ে ফের নৌকোর কাজে মন দিলে। বেলুনের কাপড় দিয়ে নৌকোর জন্যে সুন্দর একটা পাল তৈরি হ'ল । নৌকোর সাজ-সরঞ্জাম সবকিছুই নৌকো শেষ হওয়ার আগেই প্রস্তুত হ'ল । নৌকোর মাস্তুলে টাঙিয়ে দেয়ার জন্যে একটা নিশানও প্রস্তুত করলে পেনক্র্যাফ্ট । বলা বাহুল্য নিশানটি হ'ল মার্কিন মুলুকের জাতীয় নিশান । আমেরিকার জাতীয় নিশানে সাঁইত্রিশটা নক্ষত্র থাকে, এই নিশানে আটত্রিশটা নক্ষত্র এঁকে দেয়া হ'ল । এই অতিরিক্ত নক্ষত্রটা হ'ল লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের নামে । নৌকো তখনও শেষ হয়নি, তাই নিশানটিকে গ্র্যানাইট হাউসের জানালায় টাঙানো হ'ল । সবাই তিনবার জয়ধ্বনি

ক'রে নিশানটিকে অভিবাদন জানালেন ।

শীত প্রায় শেষ হ'য়ে এলো । সেপ্টেম্বরের শেষে শীত একেবারে চ'লে গেল ।

পেনক্র্যাফ্‌টও দ্বিগুণ উৎসাহে মন দিলে নৌকোয় কাজে । তার উপরেই নৌকোর সব কাজের ভার । শুধু নৌকো নয়, নৌকোর সাজ-সরঞ্জাম—মাস্তুল, হাল, ডেক, ক্যাবিন —সবই হ'ল পেনক্র্যাফ্‌টের পছন্দমতো । নৌকোর কাজে লোহার জিনিশ যা-কিছু লাগল, সবই চিমনির কারখানায় প্রস্তুত । এইভাবে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নৌকোটি শেষ হ'ল : এবার চ'ড়ে দেখলেই হয় ।

দশই অক্টোবর নৌকোটি জলে ভাসানো হ'ল । পেনক্র্যাফ্‌টের তখন আনন্দ দ্যাখে কে ! সে হৈ-চৈ ক'রে রীতিমতো একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসল । এমন সুন্দর নৌকো হয়েছে দেখে সবাই খুশি হ'য়ে উঠলেন । এবার নৌকোর একটা নাম দেয়া চাই । ঠিক হ'ল নৌকোর নাম দেয়া হবে 'বোনাভেনতুর', অর্থাৎ 'বন্‌-অ্যাডভেনচার' । সকালবেলা প্রাতরাশ সেরেই নৌকো চালিয়ে পরখ করে দেখা হবে ব'লে ঠিক হ'ল । সঙ্গে খাবার-দাবার নেবারও ব্যবস্থা করা হ'ল । ফিরতে দেরিও হ'তে পারে তো ।

সাড়ে-দশটার সময় সবাই নৌকোয় চড়লেন । বলা বাহুল্য, টপ আর জাপও বাদ গেল না । পাল তুলে দেয়া হ'ল । মাস্তুলের আগায় পৎ-পৎ ক'রে উড়তে লাগল নিশানটি । পেনক্র্যাফ্‌টকে কাপ্তেন ক'রে বন্‌-অ্যাডভেনচার নীল সমুদ্রে অ্যাডভেনচারে বেরিয়ে পড়ল ।

দেখতে-দেখতে এই নতুন নৌকো পোর্ট বেলুন পেরিয়ে আরো তিন-চার মাইল চ'লে আসার পর নৌকোর ডেক থেকে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের দৃশ্যটি দেখালো আশ্চর্য সুন্দর ।

চারদিকের দৃশ্য দেখে সবাই রীতিমতো মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন । পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'নৌকো কেমন লাগছে, ক্যাপ্টেন ? খুশি হয়েছেন তো ?'

একটু হাসলেন হার্ডিং : 'বেশ ভালোই চলছে ব'লে তো মনে হচ্ছে ।'

'এখন কি আপনার মনে হয়,' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট, 'যে এতে চ'ড়ে নির্ভয়ে দূরে যাওয়া যায় ?'

'দূরে আবার যাবে কোথায় ?'

'কেন ?' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট, 'টেবর আইল্যাণ্ডে !'

হার্ডিং বললেন : 'দ্যাখো পেনক্র্যাফ্‌ট, খুব দরকারে পড়লে বন্‌-অ্যাডভেনচারে চ'ড়ে টেবর আইল্যাণ্ডের চেয়ে দূরে যেতেও আমার কোনো আপত্তি হবে না । কিন্তু কোনো দরকার নেই, অথচ খামকা-খামকা টেবর আইল্যাণ্ডে যাওয়াটা আমার ভালো মনে হয় না । এ ছাড়া তুমি তো আর একা টেবর আইল্যাণ্ডে যেতে পারো না !'

'একজন মাত্র সঙ্গী পেলেই হয় ।'

'তবেই তো !' বললেন সাইরাস হার্ডিং : 'লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের মোট পাঁচজন লোকের মধ্যে দু-জনের জীবনই খামকা বিপন্ন হবে ।'

'কিন্তু এতে বিপদের তো কোনোই সম্ভাবনা নেই, ক্যাপ্টেন !'

হার্ডিং কোনো জবাব দিলেন না । পেনক্র্যাফ্‌টও মনে-মনে একটু বিরক্ত হ'য়ে চুপ ক'রে গেল । সে ভাবলে, এখন আর ঘাঁটাঘাঁটি না-ক'রে পরে এ-সম্পর্কে আরো আলোচনা করা যাবে । এই ভেবে সে চুপ ক'রে রইল । টেবর আইল্যাণ্ডে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা

যে অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে উপস্থিত হ'তে পারে, তা সে তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

একটু পরেই বন্‌-অ্যাডভেনচার ফিরে তীরের দিকে চলল। লক্ষ্য তার পোর্ট বেলুন। পোর্ট বেলুনের কাছেই চ্যানেলের মধ্যে নৌকোটা রাখতে হবে, সুতরাং এই চ্যানেলগুলো ভালো ক'রে দেখা দরকার। নৌকো তখন তীর থেকে আধ মাইল দূরে, হার্বার্ট দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পথ ব'লে দিচ্ছে, এমন সময় সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : 'পেনক্র্যাফ্‌ট, ওই দ্যাখো, একটা বোতল জলে ভেসে আসছে!' এই ব'লেই উপুড় হ'য়ে জলে হাত ডুবিয়ে দিলে সে। একটু পরেই দেখা গেল, তার হাতে একটা ছিপি-আঁটা বোতল।

সাইরাস হার্ডিং হার্বার্টের হাত থেকে বোতলটা নিলেন। ছিপিটা খুলে ফেললেন। তারপর বোতলের ভিতর থেকে বার করলেন একটুকরো কাগজ। তাতে লেখা : 'একজন নির্বাসিত ভাগ্যহত ব্যক্তি ...টেবর আইল্যাণ্ড...১৫৩° পশ্চিম-দ্রাঘিমা এবং ৩১°১১ দক্ষিণ-অক্ষাংশ'।

৬

অ্যাডভেনচারের ডাকে

সাইরাস হার্ডিং লেখাটুকু পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যস্ত হ'য়ে উঠল পেনক্র্যাফ্‌ট। বললে : 'টেবর আইল্যাণ্ডে নির্বাসিত ব্যক্তি! লিঙ্কন আইল্যাণ্ড থেকে মোটে দুশো মাইলের মধ্যে একজন লোক রয়েছে! ক্যাপ্টেন হার্ডিং, এখন নিশ্চয়ই টেবর আইল্যাণ্ডে যাওয়া সম্পর্কে আপনি আর আপত্তি করবেন না?'

হার্ডিং ঘাড় নাড়লেন : 'না, পেনক্র্যাফ্‌ট। এখন যত শিগগির সম্ভব তোমাকে টেবর আইল্যাণ্ডে যেতে হবে। তুমি কালকেই রওনা হ'য়ে পড়ো।'

তারপর সেই কাগজের টুকরোটুকু আবার প'ড়ে হার্ডিং বললেন : 'এই লেখাটুকু প'ড়ে মনে হচ্ছে টেবর আইল্যাণ্ডের লোকটির নৌ-বিদ্যা সম্পর্কে বেশ জ্ঞান আছে। দ্বীপটা সমুদ্রের কোন্‌খানে, ঠিকভাবে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে। আর, লোকটি হয় ইংরেজ, নয়তো আমেরিকান। নইলে ইংরেজিতে চিঠি লিখত না।'

এদিকে পেনক্র্যাফ্‌ট নৌকো ঘুরিয়ে ক্লু অন্তরীপের দিকে নিয়ে চলল। সবার মনেই এবার টেবর আইল্যাণ্ডের লোকটির কথা তোলপাড় করছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে লোকটি বেঁচে থাকতে-থাকতেই সেখানে পৌঁছতে পারলে হয়। ক্লু অন্তরীপে ঘুরে বেলা বারোটার সময় বন্‌-অ্যাডভেনচার মার্সি নদীর মুখে এসে নোঙর ফেলল।

সেদিন সন্ধের আগেই যাত্রার সমস্ত আয়োজন ঠিক হ'য়ে গেল। পরদিন এগারোই অক্টোবর রওনা হ'লে অনুকূল হাওয়ার সাহায্যে টেবর আইল্যাণ্ডে পৌঁছুতে আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি লাগবে না। দ্বীপে একদিন থাকতে হবে, ফিরে আসতে আরো তিন-চার দিন; তাহ'লে সতেরোই নাগাদ লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে ফিরে আসা যাবে। হার্ডিং আর স্পিলেট নেব্‌কে নিয়ে ততদিন গ্র্যানাইট হাউসে কাটাবেন।

এই ব্যবস্থায় কিন্তু স্পিলেট তুমুল আপত্তি করলেন। বললেন : 'আমি নিউ-ইয়র্ক হেরাল্ডের নিজস্ব প্রতিনিধি। এমন খাশা সুযোগটা কি আমি ছাড়তে পারি ? আমিও পেনক্র্যাফ্‌টের সঙ্গে যাবো। যদি দরকার হয়, তবে সাঁৎরে যেতে হ'লেও যাবো।'

এ-কথার আর কী উত্তর দেয়া যায় ! বাধ্য হ'য়ে হার্ডিং স্পিলেটকেও যেতে দিলেন।

পরদিন ভোরবেলা বন্‌-অ্যাডভেনচার তিনজন যাত্রী নিয়ে টেবর আইল্যাণ্ড অভিমুখে চলল।

প্রায় সিকি মাইল যাওয়ার পর যাত্রীরা ফিরে তাকিয়ে দেখলে, গ্র্যানাইট হাউসের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে হার্ডিং আর নেব্‌ টুপি ও রুমাল উড়িয়ে তখনও শুভযাত্রা জানাচ্ছেন। পেনক্র্যাফ্‌ট, হার্বার্ট আর স্পিলেট রুমাল উড়িয়ে তার উত্তর দিতে লাগলো। তারপর দেখতে-দেখতে ক্লু অন্তরীপের উঁচু পাহাড়ের আড়ালে গ্র্যানাইট হাউস অদৃশ্য হ'য়ে গেল। দিনের গোড়ার দিকে অনেক দূর থেকে লিঙ্কন আইল্যাণ্ড দেখা যাচ্ছিল যেন সবুজ রঙের একটা ঝুড়ি, আর তার মধ্যিখানে মাউণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিন। বিকেলের দিকে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের আর-কোনো চিহ্নই দেখা গেল না।

প্রসন্ন মৃদু হাওয়ায় ঢেউয়ের উপর দিয়ে নাচতে-নাচতে বন্‌-অ্যাডভেনচার চলল।

পেনক্র্যাফ্‌টের মনে তো আনন্দ আর ধরে না ! কখনো-বা হালের ভার হার্বার্টকে দিয়ে সে স্পিলেটের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। এমনি ক'রে সারাদিন কেটে গেল, তারপর নেমে এল অন্ধকার রাত্রি। রাত্রি অন্ধকার হ'লেও আকাশ বেশ পরিষ্কার—অগুনতি তারার আলোয় কম্পাসের সাহায্যে অবিরাম এগিয়ে চলল বন্‌-অ্যাডভেনচার।

নিরাপদেই রাতটা কেটে গেল। পরের দিনটাও ভালোয়-ভালোয় কাটল। হিশেব ক'রে দেখা গেল, ততক্ষণে বন্‌-অ্যাডভেনচার লিঙ্কন আইল্যাণ্ড থেকে প্রায় একশো মাইল পথ এসেছে। হিশেব ঠিক হ'য়ে থাকলে আর বন্‌-অ্যাডভেনচার ঠিক পথে এসে থাকলে, পরদিন ভোরবেলা টেবর আইল্যাণ্ড নজরে পড়ার কথা। সে-রাত্রে আর কারু ঘুম এলো না। দারুণ উদ্বেগে কাটল রাত। ভোরবেলা টেবর আইল্যাণ্ড দেখা যাবে কি ? পরিত্যক্ত লোকটি কি এখনও দ্বীপেই আছে ? এক কারাগার ছেড়ে অন্য কারাগারে যেতে কি সে রাজি হবে ? এইসব ভাবনা তোলপাড় করতে লাগল মনে, তাই রাত্রি কাটল অতন্দ্র।

ভোরবেলা ছ-টার সময় পেনক্র্যাফ্‌ট চেঁচিয়ে উঠল : 'ঐ-যে ডাঙা ! ঐ দূরে তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে !'

পেনক্র্যাফ্‌টের মতন অভিজ্ঞ নাবিকের পক্ষে ভুল হওয়া অসম্ভব। ডাঙার দেখা পেয়ে তাঁদের আর আনন্দের সীমা রইল না। আর ঘণ্টা-কয়েক বাদেই টেবর আইল্যাণ্ডে নামা যাবে। আস্তে-আস্তে সত্যিই টেবর আইল্যাণ্ডের তীররেখা স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগল। আর মাইল-পনেরো দূরেই দ্বীপ। সামনের দিকে এগিয়ে চলল নৌকো।

বেলা এগারোটার সময় বন্‌-অ্যাডভেনচার দ্বীপ থেকে মাত্র দু-মাইল দূরে এসে পৌঁছুল। পেনক্র্যাফ্‌ট এবার খুব সতর্ক হ'য়ে আস্তে-আস্তে অগ্রসর হ'তে লাগল। অজানা পথ। জলের নিচে হঠাৎ কোনো-কিছুতে ঘা খেয়ে নৌকোর বিপদ হ'তে পারে তো। ছোটো দ্বীপটা আস্তে-আস্তে চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। দ্বীপের গাছপালা অনেকটা লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের মতোই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গোটা দ্বীপে কোথাও কোনো ধোঁয়া দেখতে পাওয়া গেল

না, কিংবা মানুষের অস্তিত্বের কোনো চিহ্নও দেখা গেল না। কিন্তু বোতলের কাগজটুকুতে পরিষ্কার লেখা ছিল, 'পরিত্যক্ত ব্যক্তি', 'টেবর আইল্যাণ্ড।' লোকটির উচিত ছিল সমুদ্র-তীরে নজর রাখা, তার উদ্ধারের জন্যে কেউ আসে কি না।

বেলা বারোটার সময় বন্-অ্যাডভেনচার-এর তলা টেবর আইল্যাণ্ডের বালিতে আটকে গেল। নোঙর ফেলে সবাই তীরে নামলেন। তীর থেকে আধ মাইল দূরে প্রায় তিনশো ফুট উঁচু একটা পাহাড়। তার উপর থেকে গোটা দ্বীপটা স্পষ্ট দেখা যাবে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সবাই সেদিকে এগুলেন।

পাহাড়টার নিচে পৌঁছুনোর পর তার চুড়োয় উঠতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না। উঠে দেখা গেল, দ্বীপটা ছোটো ; পরিধি ছ-মাইলের বেশি হবে না। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদি লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের মতো তেমন-কিছুই নেই, সমতল ভূমি ও বনসমেত একটা দ্বীপ, আর ডিমের মতো তার আকৃতি। চারদিক দেখে-শুনে পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'চলুন, নেমে গিয়ে ভালো ক'রে খোঁজা যাক।'

সবাই বন্-অ্যাডভেনচার-এর কাছে ফিরে এসে ঠিক করলেন, গোড়ায় দ্বীপটার চারদিক ঘুরে দেখবেন, তারপর ভিতরে ঢুকে খবর নেয়া যাবে। সমুদ্রের তীর ধ'রে চলাই সুবিধে। মধ্যে-মধ্যে ছোটো-ছোটো পাহাড় পড়ল সামনে, কিন্তু তাতে চলার কোনো ব্যাঘাত হ'ল না।

সবাই দক্ষিণ দিকে চললেন। পথে দলে-দলে সামুদ্রিক পাখি আর সীল তাঁদের দেখেই ছুটে পালাতে লাগল। তাতে মনে হ'ল ইতিপূর্বে এরা মানুষ দেখেছে, সেইজন্যেই তাঁদের দেখে ভয়ে পলায়ন করল। এক ঘণ্টা চ'লে যাত্রীরা দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হলেন। এইভাবে চার ঘণ্টা চলবার পর দ্বীপের চারদিক ঘুরে দেখা গেল। কিন্তু জনমানবের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। মনে হ'ল টেবর আইল্যাণ্ডে যেন কোনোকালে মানুষ আসেনি, কিংবা এসে থাকলেও সে এখন অন্যত্র প্রস্থান করেছে। হয়তো-বা বোতলটা অনেকদিন ধ'রেই জলে ভাসছিল, ইতিমধ্যে সেই ব্যক্তি কোনো উপায়ে দেশে ফিরে গেছে, কিংবা অনেক কষ্টভোগের পর লোকান্তরিত হয়েছে।

এরপর বন্-অ্যাডভেনচারে ফিরে সবাই খাওয়া-দাওয়া করলেন। তারপর বিকেল পাঁচটার সময় চললেন দ্বীপের অভ্যন্তরটায় সন্ধান করবার জন্যে। তাঁদের দেখে বনের জানোয়াররা সশব্দে পালাতে লাগল। তার মধ্যে বেশির ভাগই ছাগল আর শুয়োর। আগে কোনো সময়ে যে টেবর আইল্যাণ্ডে মানুষ এসেছিল, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। বনের মধ্যে মানুষের চলাফেরার পথের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল। মধ্যে-মধ্যে বড়ো-বড়ো গাছ প'ড়ে আছে—পরিষ্কার দেখা গেল কুড়ুল দিয়ে কাটা।

স্পিলেট বললেন : 'এ-সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, মানুষ যে শুধু এখানে এসেছিল তা-ই নয়, কিছুকাল এখানে বাসও করেছে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে—এরা কারা ? এদের কেউ কি এখনও দ্বীপে আছে ?'

হার্বার্ট বললে : 'বোতলের কাগজে লেখা ছিল : "একজন এই দ্বীপে আছে"।'

'সে-লোক যদি এখনও এখানে থেকে থাকে,' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট : 'তবে নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বার করতে পারবো।'

দ্বীপের ঠিক মাঝখান দিয়ে কোনাকুনিভাবে একটা পথ গেছে। সে-পথে একটা নদীর তীর বেয়ে চললেন সবাই। নদীটা গিয়ে পড়েছে সীমাহারা নীলকান্ত সমুদ্রে। মধ্যে-মধ্যে খোলামেলা জায়গা দেখা গেল। কে যেন কোনোদিন শাক-সব্জির চাষ করেছিল।

হার্বার্ট চিনতে পারলে: 'বাঁধাকপি, গাজর, টারনিপ প্রভৃতির চাষ করা হয়েছিল। এদের বীজ লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে হবে।'

স্পিলেট বললেন: 'তা না-হয় নেয়া যাবে। কিন্তু চাষের অবস্থা দেখে তো মনে হয়, সে-লোক বেশিদিন এখানে থাকেনি। তা নইলে এ এমনভাবে নষ্ট হ'য়ে যেতো না। আমার মনে হয় সেই লোক চ'লে গেছে। বোতলটা বোধহয় সেই কাগজটুকু নিয়ে অনেকদিন সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছিল।'

সন্ধে হ'য়ে গেছে দেখে সবাই ফিরবার উদ্যোগ করলেন। এমন সময় হঠাৎ হার্বার্ট ব'লে উঠল: 'ওই দেখুন, গাছের ফাঁক দিয়ে একটা কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে!'

সবাই তখন সেদিকে ছুটলেন। গিয়ে দেখা গেল, ঘরটা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি, চালটা মোটা টার্পলিনের। ঘরটার দরজা অর্ধেক ভেজানো ছিল। পেনক্র্যাফ্‌ট ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ঢুকে দেখল, ঘরটা খালি।

হার্বার্ট, পেনক্র্যাফ্‌ট, আর স্পিলেট সেই অন্ধকার ঘরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

খানিকক্ষণ পরে চেঁচিয়ে ডাকলে পেনক্র্যাফ্‌ট: 'কে আছো?'

কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

পেনক্র্যাফ্‌ট আগুন জ্বাললে। এবার সব স্পষ্ট দেখা গেল। শূন্য ছোট্ট একটা ঘর, তার পেছনের দিকে একটা চুল্লি, কিছু স্যাঁৎসেঁতে কয়লা, আর একবোঝা কাঠ প'ড়ে আছে কাছে। ঘরে একটা বিছানাও আছে। কিন্তু স্যাঁৎসেঁতে, হলদে চাদর দেখে মনে হ'ল, সে-বিছানা অনেকদিন ধ'রে কেউ ব্যবহার করেনি। চুল্লির এককোণে দুটো কেটলি প'ড়ে আছে; জং ধ'রে গেছে তাতে। একটা র‍্যাকের উপর নাবিকের জীর্ণ, ময়লা কামিজ। একটা টেবিলের উপর একটা টিনের প্লেট আর একটি বাইবেল। ঘরের এককোণে কিছু যন্ত্রপাতি, কোদাল, কুড়ুল, আর দুটো বন্দুক। একটা বন্দুক আবার ভাঙা। দেয়ালের গায়ে তক্তার তাক। সেই তাকে একপিপে বারুদ, একপিপে গুলি আর অনেকগুলো ক্যাপের বাক্স। সব ধূলিধূসর।

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে, 'ঘর তো খালি। আর, অনেকদিন ধ'রে কেউ এখানে বাস করেনি ব'লেই মনে হচ্ছে। আমি বলি, নৌকোয় ফিরে না-গিয়ে আজ রাতটা এখানেই কাটানো যাক।'

স্পিলেট বললেন: 'ঠিক বলেছো। ঘরের মালিক যদি ফিরে আসে, তবে হয়তো আমাদের দেখে দুঃখিত হবে না।'

'মালিক আর ফিরে আসবে না,' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট: 'এই দ্বীপ ছেড়েও সে চ'লে যায়নি। দ্বীপ ছেড়ে চ'লে গেলে কি সে তার অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি সব ফেলে যেতো? জাহাজডুবির লোকদের কাছে এ-সব জিনিশ যে কী-রকম মূল্যবান, সেটা তো বুঝতে পারছেন। সে-যে দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যায়নি, সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু এ-ঘরে আর ফিরে আসবে কি না, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। হয়তো মারা গেছে। যদি মারা গিয়ে থাকে, তবে শরীরটা তো আর সে নিজে কবর দেয়নি, তার চিহ্ন কিছু-না-কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে।'

সেই রাত্রে ঘরের ভিতর আগুন জ্বালিয়ে তিনজনে ব'সে রইলেন। বলা যায় না, লোকটি যে-কোনো একসময়ে এসে হাজির হ'তে পারে। রাত ভোর হ'য়ে এলো, কিন্তু ঘরের দরজাও কেউ খুলল না, বাইরেও কারু সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। সবাই ঠিক করলেন, রাত ভোর হ'লেই আবার খুঁজতে বেরুবেন। লোকটির মৃতদেহের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেলে তা কবর দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভোর হ'লে ওঁরা তিনজনে প্রথমে বাড়ির বাগান, মাঠ ইত্যাদি ঘুরে দেখলেন। বাড়ির সামনে মাঠ, তারপর নীলের উচ্ছ্বাস। একটা পাহাড়ের নিচে বড়ো-বড়ো কতগুলো গাছের মধ্যিখানে কুটিরটা। জায়গাটা ভারি সুন্দর। বাড়ির সামনের মাঠের চারদিকে কাঠের বেড়া। এখন অবিশ্যি সব ভেঙে-চুরে গেছে। এই বেড়ার একটু দূরেই সমুদ্র। বেড়ার বাঁ দিকে সেই সমুদ্রের মুখ। ঘরটার কাঠ, তক্তা—সবই কোনো জাহাজ থেকে নেয়া। সম্ভবত দ্বীপের কাছাকাছি কোনো জাহাজ ডুবেছিল, তারই তক্তা দিয়ে এই লোকটি ঘর তৈরি করেছিল। স্পিলেট দেখতে পেলেন একটা তক্তার অস্পষ্টভাবে লেখা : *'Br-tan-ia'*—'অর্থাৎ জাহাজটির নাম ছিল *'Britannia (ব্রিটানিয়া)*, কয়েকটা হরফ একেবারে উঠে গেছে। এরপর তিন জনে বন-অ্যাডভেনচারে ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করলেন। একটু বেশিই খেয়ে নিলেন। সারাদিন ঘোরাঘুরিতে কাটিয়ে আবার কখন খাওয়ার সুবিধে হবে, কে জানে! আহারের পর তন্নতন্ন ক'রে দ্বীপের অর্ধেকের বেশি খুঁজে দেখা হ'ল, কিন্তু কোথাও কারু কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

তবে কি লোকটি ম'রে গেছে, আর বুনো জানোয়ারে তার শরীরটা খেয়ে ফেলেছে? একেবারে হাড়-টাড় সমেত!

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'খুঁজে আর কী লাভ? আমরা তাহ'লে কাল সকালেই ফিরে যাবো।'

বেলা দুটোর সময় একটা গাছের নিচে ব'সে জিরোতে-জিরোতে পরামর্শ করলেন তিনজনে।

'যাওয়ার সময়,' বললে হার্বার্ট : 'পরিত্যক্ত ব্যক্তির বাসনকোশন, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র সবই নিয়ে যাবো। দু-একটা শুয়োর আর ছাগলও ধ'রে নিয়ে যেতে হবে।'

'ঠিক বলেছো,' বললেন স্পিলেট : 'কিন্তু তাহ'লে তা আরো-একদিন টেবর আইল্যাণ্ডে থাকা দরকার।'

'না,' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট : 'আমরা কাল ভোরেই রওনা হবো। মনে হচ্ছে শিগগিরই পশ্চিমের হাওয়া শুরু হবে। আসার সময় নিরাপদে এসেছি, যাবার বেলায়ও তা-ই চাই। হার্বার্ট, তুমি তাহ'লে এখুনি গিয়ে শাক-সব্জির বীজ যা পাও জোগাড় ক'রে নাও। আমি আর মিস্টার স্পিলেট চেষ্টা ক'রে দেখি দু-একটা শুয়োর ধরতে পারি কি না।'

তক্ষুনি খেতের দিকে গেল হার্বার্ট, পেনক্র্যাফ্‌ট আর স্পিলেট গেলেন বনের দিকে। ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর একটা ঝোপের মধ্যে দুটো শুয়োর পাকড়াও করলেন স্পিলেটরা। এমন সময় উত্তর দিকে একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল ভীষণ একটা গর্জন।

কী সর্বনাশ! এ-যে হার্বার্টের চীৎকার!

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন দুজনে । পথটার বাঁক ফিরেই দেখলেন, সামনে একটা খোলা জায়গায় হার্বার্ট মাটিতে চিৎ হ'য়ে পড়ে আছে, আর তার বুকের উপরে ঠিক মানুষের মতো দেখতে ভীষণ-একটা হিংস্র জন্তু ব'সে তাকে আঘাত করবার চেষ্টা করছে । পলকের মধ্যে ছুটে গিয়ে হার্বার্টকে মুক্ত ক'রে সেই হিংস্র জন্তুটাকে ওঁরা বেঁধে ফেললেন । ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখা গেল, আততায়ী পশু নয়, একজন মানুষ ; কিন্তু এমন ভীষণ বুনো আর হিংস্র চেহারার মানুষ কল্পনাও করা যায় না । ঠিক সময়ে মুক্ত করতে না-পারলে হার্বার্ট নির্ঘাৎ মারা পড়তো তার হাতে ।

স্পিলেট বললেন : 'নিঃসন্দেহে এই লোকটিই টেবর আইল্যাণ্ডের পরিত্যক্ত ব্যক্তি । কিন্তু দুঃখের বিষয় এর মধ্যে এখন আর মনুষ্যত্ব ব'লে কিছু নেই । আকারে-প্রকারে লোকটি একেবারে জানোয়ার হ'য়ে গেছে ।'

স্পিলেট মিথ্যে বলেননি । নির্জনে একলা বাস করবার দরুন সত্যিই লোকটির মনুষ্যত্ব একেবারে লোপ পেয়েছে । মুখ দিয়ে কথার বদলে শুধু ভাঙা-ভাঙা আওয়াজ বেরোয় । দাঁতগুলো প্রায় মাংস-খেকো হিংস্র জানোয়ারের মত ছুঁচলো । তার স্মৃতিশক্তি লুপ্ত । নিজের অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবারও ক্ষমতা নেই । কী ক'রে আগুন জ্বালাতে হয়, তা পর্যন্ত ভুলে গেছে । স্পিলেট তাকে উদ্দেশ ক'রে কথা বললেন, কিন্তু সে-যে কিছু বুঝেছে এমনটা মনে হ'ল না । শুনতে পেলো কি না সে-বিষয়েও সন্দেহ । কিন্তু স্পিলেট তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, তার জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয়নি । চুপ ক'রে বাঁধনে প'ড়ে আছে, দাঁড়ানোর কোনো চেষ্টা নেই । তবে কি বহুকাল পরে তারই মতো মানুষ দেখে স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছে ? কে জানে ।

স্পিলেট অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন । বললেন : 'লোকটি যে-ই হোক, আর ভবিষ্যতে এর অবস্থা যা-ই হোক না কেন, একে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে নিয়ে যেতেই হবে ।'

'নিয়ে তো যেতে হবেই,' বললে হার্বার্ট : 'আর আমার বিশ্বাস, ঠিক মতো শুশ্রূষা হলে এর বুদ্ধি-শুদ্ধিও সব ফিরে আসবে ।'

স্পিলেট সে-কথায় সায় দিলেন : 'আমারও তা-ই বিশ্বাস । কিন্তু একে এখন নৌকোয় নিয়ে যেতে হবে । আমার মনে হয়, এর পায়ের বাঁধন খুলে দিলে বোধহয় এখন আমাদের সঙ্গে হেঁটেই যেতে পারবে ।'

কয়েদির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেয়ার পর সে নিজেই উঠে দাঁড়ালে । পালাবার কোনো চেষ্টা করলে না । ওঁদের সঙ্গে-সঙ্গেই চলল । মাঝে-মাঝে তীক্ষ্ণ চোখে ওঁদের পানে তাকালে । কিন্তু সে যে ওঁদের মানুষ ব'লে চিনতে পেরেছে, এমনটা বোঝা গেল না ।

স্পিলেটের কথামতো প্রথমে তাকে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল, নিজের জিনিশপত্র দেখে যদি তার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে । কিন্তু তার স্মৃতি ফিরে এলো না । মনে হ'ল, সে যেন সবকিছুই ভুলে গেছে । স্পিলেট ভাবলেন, হয়তো আগুন দেখলে তার মনে কোনো স্মৃতি জাগতে পারে । আগুন জ্বালানোর পর পলকের জন্যে তার দৃষ্টি সেদিকে গেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে ।

কী আর করা যায় ? এবার তাকে বন্‌-অ্যাডভেনচারে নিয়ে-যাওয়া ছাড়া আর উপায়

নেই । নৌকোয় যাওয়ার পর তাকে পেনক্র্যাফ্টের পাহারায় রেখে স্পিলেট আর হার্বার্ট তাঁদের কাজগুলো শেষ করতে গেলেন ।

কয়েক ঘণ্টা বাদেই তাঁরা বাসনকোশন, অস্ত্রশস্ত্র আর একরাশ শাকসব্জি আর বীজ, আর দু-জোড়া শুয়োর নিয়ে ফিরে এলেন । জিনিশপত্র সবই বন্-অ্যাডভেনচারে তোলা হ'ল ।

ভোরবেলা জোয়ার এলেই নৌকো ছেড়ে দেয়া হবে । কয়েদিকে রাখা হ'ল সামনের ক্যাবিনে । সে কালা-বোবার মতো চুপচাপ রইল সবসময় । পেনক্র্যাফ্ট তাকে খেতে দিলে সে অপছন্দের ভঙ্গিতে রান্না-করা খাবার সব ঠেলে সরিয়ে দিলে । হার্বার্ট কতকগুলো হাঁস শিকার ক'রে এনেছিল । পেনক্র্যাফ্ট একটা হাঁস তার সামনে ধরবার সঙ্গে-সঙ্গেই বুনো বেড়ালের মতো ছোঁ মেরে হাঁসটা নিয়ে কাঁচাই খেয়ে ফেলল ।

পেনক্র্যাফ্ট বললে : 'না, আর-কখনও এর জ্ঞান ফিরে আসবে ব'লে আশা করা যায় না ! তবে, অবিশ্যি নির্জন-বাসের জন্যেই বেচারির এমনধারা দুরবস্থা হয়েছে । তাই আমাদের সঙ্গে থেকে, আমাদের সেবা-যত্নে, খানিকটা বদল হওয়া বিচিত্র নয় ।'

রাত কেটে গেল । রাত্রে লোকটি ঘুমিয়েছিল কি না বলা যায় না । তবে তার বাঁধন খুলে দেয়া সত্ত্বেও সে আর নড়াচড়া করেনি । বুনো জানোয়ারকে প্রথমে ধরলে সে যেমন হতবুদ্ধি হয়ে যায়, লোকটির অবস্থাও বোধহয় তেমনি হয়েছে ।

পনেরোই অক্টোবর ভোর পাঁচটার সময় বন্-অ্যাডভেনচার ছেড়ে দেয়া হ'ল । পাল তুলে দিয়ে পেনক্র্যাফ্ট উত্তর-পুব দিকে নৌকো চালালে । এবার সোজা লিঙ্কন আইল্যাণ্ড ।

প্রথম দিন বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটল না, কিন্তু পরদিন হাওয়ার বেগ খানিকটা বেড়ে যেতে সবাই একটু ভাবনায় পড়লেন । সমুদ্র ক্রমেই উত্তাল হ'য়ে উঠল । লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে পৌঁছুতে দেরি হ'তে পারে । পেনক্র্যাফ্টের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠল বটে, কিন্তু সে এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলে না ।

সতেরোই অক্টোবর ভোরবেলা আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেল । কিন্তু তবুও মনে হ'ল না নৌকো লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের কাছাকাছি এসেছে । আরো চব্বিশ ঘণ্টা লাগল । কিন্তু তবু ডাঙার দেখা পাওয়া গেল না । সমুদ্র ক্রমেই উথাল-পাথাল হ'য়ে উঠতে লাগল । বাড়তে লাগল বাতাসের বেগও । আঠারো তারিখে একটা উত্তাল ঢেউ নৌকোর উপর বেগে এসে আছড়ে পড়ল । যাত্রীরা সবাই আগে থেকে সতর্ক না-হ'লে সেই ঢেউ সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো ।

তারপর ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠল সবার অবস্থা । পেনক্র্যাফ্টের ভয় হ'ল, বিশাল বিরাট সীমাহারা সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে বুঝি-বা লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে আর পৌঁছুনো গেল না ।

তারপর আস্তে-আস্তে নেমে এলো নিদারুণ অন্ধকার রাত্রি । বইতে লাগল উত্তাল হিমেল বাতাস । কিন্তু রাত এগারোটার সময় সৌভাগ্যবশত বাতাসের বেগ ক'মে গেল । আবার শান্ত হ'ল অশান্ত সমুদ্র । সঙ্গে-সঙ্গে দ্রুততর হ'ল নৌকোর গতি ।

পলকের জন্যেও চোখ বুজলেন না কেউ । উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হ'তে লাগল মন । হয়তো কাছেই লিঙ্কন আইল্যাণ্ড—হয়তো ভোরবেলাতেই দেখা যাবে শ্যামলবরণ তীর । কিন্তু তা যদি না-হয়, তবে হয়তো হাওয়ার টানে বন্-অ্যাডভেনচার এত দূরে চ'লে যাবে যে, আবার ঠিক পথে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠবে । সকলের চাইতে আলোড়িত হ'ল

পেনক্র্যাফটের মন । কিন্তু তবু হাল ছাড়লে না সে । হাল ধ'রে গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ব'সে রইল ।

রাত তখন প্রায় দুটো হবে, হঠাৎ পেনক্র্যাফ্‌ট চেঁচিয়ে উঠল : 'আলো ! ওই যে আলো !'

সত্যিই দেখা গেল আলোর উজ্জ্বল রেখা । উত্তর-পুব দিকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে উজ্জ্বল একটি আলোক-স্পন্দন আকাশের তারার মতো জ্বলছে । ওইদিকেই লিঙ্কন আইল্যাণ্ড !

নিশ্চয়ই সাইরাস হার্ডিং আলো জ্বালিয়েছেন, যাতে যাত্রীদল অন্ধকার রাত্রে ওই আলো দেখে পথের সন্ধান করতে সক্ষম হন । পেনক্র্যাফ্‌ট উত্তর দিকে অনেকটা চ'লে গিয়েছিল । এবার আলো লক্ষ্য ক'রে নৌকো চালিয়ে দিলে ।

আর-কোনো ভয় নেই ।

৭

রহস্য-লিপি

পরদিন বিশে অক্টোবর । চারদিনের দিন সকাল সাতটার সময় মার্সি নদীর মুখের কাছে এসে নোঙর ফেলল বন্‌-অ্যাডভেনচার । এদিকে সাইরাস হার্ডিং আর নেব্‌ এই বিষম দুর্যোগ, আর সঙ্গীদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন মনে সকালবেলাই প্রসপেক্ট হাইটে উঠে দেখছিলেন । এমন সময় দূরে বন্‌-অ্যাডভেনচারকে দেখে হার্ডিং বললেন : 'এই-যে ওরা এসে পড়েছে ।'

বন্‌-অ্যাডভেনচার-এর ডেকের উপরের লোক গুনে হার্ডিং প্রথমে মনে করেছিলেন যে, টেবর আইল্যাণ্ডের সেই লোকটিকে পাওয়া যায়নি, কিংবা পাওয়া গেলেও সে টেবর আইল্যাণ্ড ছেড়ে আসতে রাজি হয়নি । নৌকো তীরে ভেড়বার আগেই হার্ডিং নেব্‌কে নিয়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন । ওদের দেখেই শুধোলেন : 'তোমাদের এত দেরি দেখে আমরা ভারি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম । কোনোরকম মুশকিলে পড়তে হয়নি তো ? হ্যাঁ, ভালো কথা । তোমরা যে-কাজে গিয়েছিলে, তা দেখছি নিস্ফল হয়েছে । চতুর্থ ব্যক্তিটিকে তো দেখতে পাচ্ছি না ।'

'না ক্যাপ্টেন,' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট : 'আমরা চারজনই আছি ।'

'পরিত্যক্ত লোকটিকে তাহ'লে খুঁজে পেয়েছ ?'

'হ্যাঁ, একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি ।'

'কোথায় সে ?' প্রশ্ন করলেন হার্ডিং : 'লোকটি কে ?'

'লোকটি যে কে, তা বলা ভারি মুশকিল,' বললেন স্পিলেট : 'একদা আমাদেরই মতো মানুষ ছিল বটে, তবে এখন আর তা নেই ।' এই ব'লে স্পিলেট সবকিছু হার্ডিংকে খুলে বললেন । এখন যে লোকটিকে আর মানুষ বলা যায় না, তাও স্পিলেট বললেন ।

•

তারপর পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'সত্যি ক্যাপ্টেন, আমার তো মনে হচ্ছে যে লোকটিকে এখানে এনে ভালো কাজ হয়নি ।'

'তা কেন বলছো ?' বললেন হার্ডিং : 'তাকে এনে যে ভালো করেছো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । এখন হয়তো ওর বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে, কিন্তু মাস-কয়েক আগেও তো সে ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ ছিল । নির্জন-বাসের মতো অভিশপ্ত জীবন আর-কিছুই নেই ।'

স্পিলেট বললেন : 'মাসকয়েক আগে যে ওর জ্ঞান ছিল, তা কী ক'রে বুঝবো ? বোতলের চিঠিটা হয়তো ওর কোনো সঙ্গী লিখে থাকবে ।'

'অসম্ভব !' ঘাড় নাড়লেন হার্ডিং : 'তাহ'লে চিঠিতে নিশ্চয়ই দুজনের কথা লেখা থাকতো ।'

এরপর লোকটিকে ক্যাবিন থেকে তীরে নিয়ে আসা হ'ল । তার চেহারা দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন হার্ডিং । লোকটির মুখ দেখে মনে হ'ল, যেন তার মনে পালানোর ইচ্ছে জেগেছে । হার্ডিং তার দিকে এগিয়ে তার কাঁধে হাত দিলেন । তাঁর উজ্জ্বল মুখ আর করুণ চোখ দেখে লোকটি তক্ষুনি মাথা নিচু করলে । তার অস্থিরতা অদৃশ্য হ'ল । পলায়নের ইচ্ছে পর্যন্ত দূর হ'য়ে গেল ।

মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ লোকটিকে দেখলেন হার্ডিং । বুঝতে পারলেন, সত্যিই তার মানবিকতা অন্তর্হিত হয়েছে । কিন্তু তবু তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, তার চোখে যে-আলো তখনও জ্বলছে সে-আলো মনুষ্যত্বের । সেবায়-যত্নে এর মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হবে না । তখন ঠিক করা হ'ল, তাকে গ্র্যানাইট হাউসের একটা ঘরে রাখা হবে, যেখান থেকে পালানোর কোনো সম্ভাবনা নেই ।

তাকে গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে যেতে কোনো মুশকিল হ'ল না ।

স্পিলেট, পেনক্র্যাফ্‌ট আর হার্বার্টের খুব খিদে পেয়েছিল । নেব্‌ তাড়াতাড়ি আহারের ব্যবস্থা করল । সবাই আহার করতে বসলেন । আহারের সময় হার্ডিং ওদের অ্যাডভেনচারের সব কথা শুনলেন । সবাই আন্দাজ করলেন, লোকটি হয় মার্কিন, নয় তো ইংরেজ । সেই *ব্রিটানিয়া* জাহাজের নামটিতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায় । তার চেহারা দেখেও তা-ই মনে হয় ।

হঠাৎ হার্ডিং জিগেস করলেন 'তা, তোমার সঙ্গে কী ক'রে লোকটির দেখা হ'ল, হার্বার্ট ?'

'কী ক'রে দেখা হয়েছিল, তা ঠিক বলতে পারছি না ।' বললে হার্বার্ট : 'আমি গাছগাছড়া, শাকসব্জি সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলুম, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলুম, কাছেই খুব উঁচু একটা গাছ থেকে সাঁৎ ক'রে যেন কী একটা নেমে এলো । বোধহয় এই লোকটিই গাছের উপরে লুকিয়ে ছিল । তীরের মতো নেমে এসে হঠাৎ কখন আমার উপর পড়ল, তা বোঝবারও সময় পেলুম না । মিস্টার স্পিলেট আর পেনক্র্যাফ্‌ট যদি সে-সময়—'

হার্বার্টের কথা শেষ না-হ'তেই হার্ডিং বললেন, : 'তুমি তাহ'লে জবর বিপদে পড়েছিলে বলো ! তবে এ-কথা ঠিক যে, তোমার এই বিপদটি না-হ'লে লোকটি হয়তো এখনও লুকিয়েই থাকতো ; টেবর আইল্যাণ্ড থেকে নতুন সঙ্গীটিকে তোমাদের আর আনা হ'ত না ।'

আহারের পর সবাই সমুদ্রতীরে গেলেন। নৌকোর জিনিশপত্র সবই যথাস্থানে রেখে দেয়া হল। শুয়োরগুলি গেল খোঁয়াড়ে। বারুদের পিপে, গুলির বাক্স ইত্যাদি সযত্নে রেখে দেয়া হ'ল। এবার বন্-অ্যাডভেনচারকেও একটা নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে।

হার্ডিং বললেন : 'নৌকোটা মার্সি নদীর মুখে রেখে দিলে হয় না ?'

পেনক্র্যাফ্‌ট আপত্তি জানালে : 'না ক্যাপ্টেন, মার্সি নদীর মুখে বেশি সময় বালির মধ্যে প'ড়ে থাকবে, তাতে নৌকোর কাঠ নষ্ট হ'তে পারে। আমার ইচ্ছে, আপাতত ওটাকে পোর্ট বেলুনে রেখে দিই।'

'তবে সেখানেই রাখো,' বললেন হার্ডিং : 'কিন্তু আমার মনে হয় ওটাকে চোখের সামনে কোনো জায়গায় রাখতে পারলেই ভালো হয়। যাক, পরে সুবিধেমতো বন্-অ্যাডভেনচারের জন্যে একটা বন্দর বানাতে হবে।'

কিছুদিনের মধ্যেই আগন্তুকের ভালোর দিকেই বেশ-একটু পরিবর্তন দেখা গেল। এত শিগগির পরিবর্তন দেখা যাওয়ায় বোঝা গেল যে তার জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে ব'লে সকলে আগে যে-ধারণা করেছিলেন, তা ভুল। টেবর আইল্যাণ্ডে খোলা হাওয়ায় স্বাধীনভাবে সে ঘুরে বেড়াতো। তাই গ্র্যানাইট হাউসে বন্ধ থেকে সে প্রথমটা বিরক্ত মুখে ব'সে থাকতো। সবাই ভয় করতেন, পাছে সে গ্র্যানাইট হাউসের জানলা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ে। ক্রমশ তার সেই বিরক্তি দূর হ'ল। তখন তাকে চলাফেরা সম্পর্কে একটু স্বাধীনতা দেয়া হ'ল। বুনো জানোয়ারের মতো কাঁচা মাংস সে আর খায় না। রান্না করা খাবার দিলে দ্বিরুক্তি না-ক'রে গ্রহণ করে। একদিন যখন ঘুমিয়েছে, তখন হার্ডিং তার চুল-দাড়ি কেটে দিলেন। তার পোশাকও বদলে দেয়া হ'ল। এখন তার মুখের ভাব বেশ স্নিগ্ধ হয়েছে। এবং পোশাক পরাবার পর আর তার হিংস্র চেহারার বিন্দুমাত্র চিহ্ন রইল না।

প্রত্যহ হার্ডিং তার সঙ্গে একটু সময় কাটাতেন। তার কাছে ব'সে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে নানান ধরনের কাজ করা হ'ত। চেঁচিয়ে কথা বলতেন সবাই। উঁচু গলায় আলোচনা করতেন নৌ-বিদ্যা—যে-সব কথা শুনলে নাবিক-মাত্রেরই কৌতূহল জাগে, সে-সব কথা প্রায়ই আলোচনা করা হ'ত। কখনো-কখনো লোকটি তাঁদের কথাবার্তায় মনোযোগ দিতো। স্পষ্টই বোঝা যেতো যে সে কিছু-কিছু বুঝতে পারছে। মধ্যে-মধ্যে তার মুখে ফুটে উঠতো বিষাদের ছাপ। এ ছাড়া সবসময়েই সে থাকতো গম্ভীর হ'য়ে। আস্তে-আস্তে হার্ডিং-এর প্রতি তার আকর্ষণ জেগেছে ব'লে বোঝা গেল। হার্ডিং ভাবলেন তাকে একবার বনের কাছে নিয়ে যাবেন—দৃশ্যপট বদলের সঙ্গে-সঙ্গে যদি তার ভাবের পরিবর্তন হয়।

স্পিলেট কিন্তু এ-কথায় আপত্তি জানালেন। বললেন : 'স্বাধীনতা পেলে যদি পালিয়ে যায় ?'

'তাহ'লেও,' হার্ডিং বললেন, 'পরীক্ষা ক'রে দেখতেই হবে। আমার তো মনে হয় সে পালাবে না।'

এইসব কথাবার্তা যেদিন হ'ল, সেদিন তিরিশে অক্টোবর। অর্থাৎ ন-দিন হ'ল গ্র্যানাইট হাউসে বন্দী হ'য়ে আছে লোকটি। সে যে-ঘরে শুয়ে ছিল, পেনক্র্যাফ্‌টকে নিয়ে সে-ঘরে গেলেন হার্ডিং। তাকে বললেন, 'ওঠো, একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমায়।'

তখুনি উঠে দাঁড়ালে লোকটি। একবার তাকালে হার্ডিং-এর দিকে, তারপর দ্বিরুক্তি

না-ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে চলল । পেনক্র্যাফ্‌ট চলল তার পিছনে-পিছনে । গ্র্যানাইট হাউসের দরজার কাছে এসে হার্ডিং লোকটিকে লিফ্‌টে চড়ালেন । লিফ্‌ট থেকে সমুদ্রতীরে গেলে পর সবাই খানিক দূরে স'রে গিয়ে আগন্তুককে স্বাধীনতা দিলেন ।

ধীরে-ধীরে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল লোকটি । উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল তার চোখ । কিন্তু সে একটুও পালানোর চেষ্টা করলে না । ছোটো-ছোটো ঢেউ ভেঙে পড়ছে তীরে, তারপর শাদা ফেনা হ'য়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে । সে অপলক চোখে তা-ই দেখতে লাগল ।

স্পিলেট বললেন : 'সমুদ্র দেখে পালানোর ইচ্ছে ওর মনে জাগবে কিন্তু ।'

'বেশ,' বললেন হার্ডিং, 'তবে ওকে বনের কাছেই নিয়ে যাওয়া হোক ।'

সবাই আগন্তুককে নিয়ে মার্সি নদীর মুখের দিকে গেলেন । তারপর নদীর বাঁ-তীর ধ'রে গিয়ে প্রসপেক্ট হাইটে উপস্থিত হলেন । এখান থেকেই শুরু অরণ্য । একদৃষ্টে অরণ্যের দিকে তাকিয়ে লোকটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে । সবাই তার পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। পালানোর চেষ্টা করলেই যাতে ধ'রে ফেলতে পারেন তাকে, সেইজন্যে প্রস্তুত হ'য়ে রইলেন । সামনে ছোটো নদী, তার পরই গহন অরণ্য । একবার মনে হ'ল, আগন্তুক হয়তো জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে । মুহূর্তের জন্যে সে পা দুটি বাঁকালে লাফ দেবার জন্যে । পরক্ষণেই আবার পিছনে স'রে এসে প্রায় বসে পড়ল ।

সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল, সে কাঁদছে, তার চোখ দিয়ে হু-হু ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছে ।

সাইরাস হার্ডিং নিচু স্বরে বললেন : 'তোমার চোখে যখন জল দেখা দিয়েছে, তখন তোমার মনুষ্যত্বও যে ফিরে এসেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।'

সবাই আগন্তুককে পুরো স্বাধীনতা দিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে দূরে স'রে এলেন । কিন্তু এতেও তার পালানোর ইচ্ছে দেখা গেল না । তখন তাকে নিয়ে সবাই গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলেন ।

এই ঘটনার দু-দিন পরে মনে হ'ল, আগন্তুক যেন সকলের প্রাত্যহিক কাজে যোগ দিতে চায় । স্পষ্ট বোঝা গেল, সে অন্যের কথা মন দিয়ে শোনে, বুঝতে পারে । কিন্তু নিজে সে একটাও কথা বলে না।

তারপর আগন্তুক যন্ত্রপাতি নিয়ে বাগানে কাজ করতে শুরু করলে । এই কাজের সময় কেউ তার কাছে গেলেই সে কাজ ছেড়ে গম্ভীর মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চ'লে যেতো । হার্ডিং-এর কথামতো সে-সময় কেউ তাকে কোনো কথা ব'লে বিরক্ত করতো না ।

কয়েকদিন পরে তেসরা নভেম্বর আগন্তুক বাগানের কাজ করতে-করতে হঠাৎ হাতের কোদাল ফেলে দাঁড়ালে ।

দূর থেকে হার্ডিং তার উপর নজর রেখেছিলেন । দেখতে পেলেন, আগন্তুক কাঁদছে ।

দুঃখিত হলেন হার্ডিং । তার কাছে এসে তার হাত ধ'রে বললেন : 'আমার দিকে তাকাও তো !'

আগন্তুক তাঁর দিকে তাকালে । কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল সে, তারপর তার চোখদুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল । ভাঙা গলায় সে শুধোলে : 'আপনারা কারা ?'

হার্ডিং বললেন : 'আমরাও তোমার মতোই পরিত্যক্ত মানুষ । তুমি টেবর আইল্যাণ্ডে অসহায় অবস্থায় প'ড়ে ছিলে, তাই তোমাকে তোমার সঙ্গী বন্ধুদের মধ্যে আনা হয়েছে ।'

'আমার বন্ধু ! সঙ্গী ! না, না—পৃথিবীতে আমার বন্ধু কেউ নেই । কেউ নেই !' এই ব'লে সে সমভূমির কিনারায় ছুটে গিয়ে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল ।

প্রায় দু-ঘণ্টা সে সমুদ্রতীরে গভীর চিন্তায় ডুবে রইল । দু-ঘণ্টা পরে সে যেন মন ঠিক ক'রে এসে উপস্থিত হ'ল । কান্নার ফলে চোখ লাল হয়ে উঠেছে, মুখে বিষাদের ছাপ ।

নতমুখে সে হার্ডিংকে শুধোলে : 'আপনারা কি ইংরেজ ?'

'না, আমরা আমেরিকান । তুমি কোন্ দেশের লোক ?'

'ইংল্যাণ্ডের ।'

এই কথা ব'লেই সে আবার সমুদ্রতীরে চ'লে গেল । সেখানে গিয়ে সে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল । একবার হার্বার্টের কাছে এসে জিগেস করলে : 'এটা কোন্ মাস ? কোন্ সাল ?'

'আঠারোশো ছেষট্টি সালের নভেম্বর ।'

অস্ফুট কণ্ঠে সে উচ্চারণ করল : 'বারো বছর !' তারপর ফের হার্বার্টের কাছ থেকে চ'লে গেল ।

হার্বার্ট সবাইকে এ-কথা বলতেই হার্ডিং বললেন : 'লোকটি তবে বারো বছর ধ'রে টেবর আইল্যাণ্ডে রয়েছে । এত বছর নির্জন বাসে যে তার জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে, তাতে আর বিচিত্র কী !'

'আমার মনে হয়,' বললে পেনক্র্যাফ্ট : 'জাহাজডুবির দরুন ও মোটেই টেবর আইল্যাণ্ড আসেনি । কোনো সাংঘাতিক অপরাধের দরুণ টেবর আইল্যাণ্ডে ওকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল ।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' বললেন হার্ডিং : 'তাহ'লে হয়তো যারা ওকে ফেলে গিয়েছিল, তারা আবার ওকে নিয়ে যাবার জন্যে টেবর আইল্যাণ্ডে ফিরে আসতেও পারে । কিন্তু এই সম্পর্কে কোনো কথাই ওকে জিগেস করা চলবে না । পাপ যদি সে ক'রেও থাকে, তবে তার জন্যে সে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করেছে ।'

এরপর কিছুদিন পর্যন্ত আগন্তুক একটা কথাও বললে না । বাগানেই সে থাকে । নীরবে কাজকর্ম করে । এক মুহূর্তও জিরোয় না । শাকসব্জি চিবিয়ে খায় । অনুরোধ করা সত্ত্বেও গ্র্যানাইট হাউসে এসে সবার সঙ্গে আহারে যোগ দেয় না । রাত্রেও গ্র্যানাইট হাউসে ঘুমোতে আসে না । বাগানেই ঝোপের মধ্যে ঘুমোয় । দুর্যোগ উপস্থিত হ'লে আশ্রয় নেয় গুহায় । সে যেন টেবর আইল্যাণ্ডের বুনো জীবনই যাপন করছে আবার । সবাই ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করতে লাগলেন । অবশেষে একদিন সে তার জীবনের ভীষণ কাহিনী না-ব'লে আর থাকতে পারলো না ।

দশই নভেম্বর রাত প্রায় আটটার সময় সবাই বারান্দায় ব'সে আছেন, এমন সময় আগন্তুক হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হ'ল । চোখ তার জ্বলছে, মুখ আগের মতোই হিংস্র আর ভয়াবহ ।

এসেই সে অসংলগ্নভাবে বলতে শুরু করল : 'এখানে আমাকে এনেছেন কেন ? কোন্ অধিকারে এনেছেন আমায় ? জানেন আমি কে ? জানেন আমি কী অপরাধ করেছিলুম ? কেন আমি একলা টেবর আইল্যাণ্ডে থাকতুম, জানেন ? আমি যে চোর, ডাকাত

কিংবা খুনে নই, তা বুঝলেন কী ক'রে ?'

তার এই উত্তেজনা দেখে হার্ডিং তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন । কিন্তু সে সেদিকে দৃকপাত না-ক'রে বলল : 'একটা কথা আমি জানতে চাই । আমি কি স্বাধীন ?'

'হ্যাঁ,' হার্ডিং বললেন : 'নিশ্চয়ই তুমি স্বাধীন ।'

'তবে আমি চললুম'—ব'লেই সে পাগলের মতো অরণ্যের দিকে ছুটে চ'লে গেল ।

সংবিৎ ফিরতেই হার্ডিং বললেন : 'যাক, ওকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই । আমি ঠিক জানি, ও আবার ফিরে আসবে ।'

বেশ-কিছুদিন কেটে গেল, কিন্তু আগন্তুকের কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না । হার্ডিং কিন্তু স্থির নিশ্চিত যে, সে আবার ফিরে আসবে । এভাবে ও-যে একলা থাকছে, তা কেবল অনুতাপের জন্যে । নির্জন-বাসে ভয় পেয়ে আবার তাকে ফিরে আসতেই হবে ।

এবার সবাই আবার নিয়মিত কাজ শুরু ক'রে দিলেন । টেবর আইল্যাণ্ড থেকে আনা বীজগুলো সযত্নে রোপণ করা হ'ল । ফসল এখন যথেষ্ট ফলে । একটা হাওয়াকল বা উইণ্ড-মিল তৈরি করতে পারলে গম থেকে ময়দা তৈরি করা যাবে । হার্ডিং ঠিক করলেন প্রসপেক্ট হাইটের উপরে একটা শাদাসিধে ধরনের উইণ্ড-মিল তৈরি করবেন । প্রসপেক্ট হাইটের উপর সমুদ্রে জোরালো হাওয়া লাগবে—অনবরত ঘুরতে থাকবে প্রপেলার । হার্ডিং ছোটো-একটা নমুনাও বানালেন । পাখির বাসার দক্ষিণে লেকের তীরে মিল বানানোর জায়গা ঠিক হ'য়ে গেল । দিনরাত খেটে দিন-কয়েকের মধ্যেই উইণ্ড-মিলটা প্রস্তুত করা হ'ল ।

তখনও পর্যন্ত কিন্তু আগন্তুকের কোনো খবর নেই । গ্র্যানাইট হাউসের কাছে বনের মধ্যে স্পিলেট হার্বার্টকে নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু তার কোনো চিহ্নই দেখা গেল না । হার্ডিং কিন্তু তবু বলতে লাগলেন যে লোকটি ফিরে আসবেই, এবং এসে তাঁদের দলে যোগও দেবে ।

শেষ পর্যন্ত হার্ডিং-এর কথাই ঠিক হ'ল । তেসরা ডিসেম্বর হার্বার্ট হ্রদের দক্ষিণ তীরে মাছ ধরতে গিয়েছিল । পেনক্র্যাফ্ট আর নেব্ পাখির বাসায় কাজে ব্যস্ত । হার্ডিং আর স্পিলেট তখন চিমনিতে ব'সে সাবান তৈরির জন্যে সোডা প্রস্তুত করছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল : 'বাঁচাও ! বাঁচাও !'

হার্ডিং আর স্পিলেট দূরে ছিলেন ব'লে চিৎকার শুনতে পাননি । পেনক্র্যাফ্ট আর নেব্ উর্ধ্বশ্বাসে হ্রদের দিকে ছুটল । তারা হ্রদের তীরে পৌঁছুবার আগেই আগন্তুক বন থেকে ছুটে এসেছে । দেখা গেল হার্বার্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে একটা ভীষণ-দর্শন জাগুয়ার ।

জাগুয়ারটা হার্বার্টের উপর প্রায় লাফিয়ে পড়বে, এমন সময় আগন্তুক এসেই শুধু একটা ছুরি হাতে নিয়ে জাগুয়ারের উপর লাফিয়ে পড়ল । জাগুয়ারটাও তখন হার্বার্টকে ছেড়ে তাকেই আক্রমণ করলে । অসাধারণ শক্তি আগন্তুকের শরীরে । একহাতে জাগুয়ারের টুঁটি টিপে ধ'রে অন্যহাতে সে সজোরে ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিলে জাগুয়ারের বুকে । সঙ্গে-সঙ্গে জাগুয়ারটা মাটিতে প'ড়ে গেল ।

আগন্তুক তক্ষুনি ফেরবার উপক্রম করলে, এমন সময় অন্যরা সেখানে এসে পৌঁছুলেন । এদিকে হার্বার্টও আগন্তুককে জড়িয়ে ধ'রে চ্যাঁচাতে লাগল : 'না, না, কিছুতেই তোমাকে যেতে দেবো না !'

দ্য মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড ৩

দ্বীপের রহস্য

১

বোম্বেটেদের জাহাজ

সবাই এসে ভিড় করলেন জাহাজের সামনে। পেনক্র্যাফ্‌ট তো দৌড়ে এসেই দুরবিন লাগিয়ে সেই বিন্দুটিকে পরীক্ষা ক'রে বললে : 'সত্যিই এটা জাহাজ !'

স্পিলেট শুধোলেন : 'জাহাজটা কি এদিকে আসছে ?'

'এখন তা বলা মুশকিল। এখন শুধু মাস্তুলের ডগা দেখতে পাচ্ছি—' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট : 'অন্য-কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

হার্বার্ট প্রশ্ন করলে, 'এখন তাহ'লে কী করবো ?'

হার্ডিং বললেন, 'অপেক্ষা করবো।'

এরপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সবাই নীরব হ'য়ে রইলেন। আশায়-উদ্বেগে-আশঙ্কায় সকলের মনই আলোড়িত হ'তে লাগল। লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে আসার পর এ-রকম ঘটনা এই প্রথম। দীর্ঘকাল দ্বীপে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস ক'রে দ্বীপটার উপর সকলেরই একটা মায়া প'ড়ে গিয়েছিল। যাই হোক, এই জাহাজের কাছে সভ্য জগতের খবর জানতে পারা যাবে। আমেরিকার খবরও পাওয়া যেতে পারে। তাই জাহাজটা দেখে আশঙ্কায় আনন্দে তোলপাড় চলতে লাগল সকলের মনে। পেনক্র্যাফ্‌ট মধ্যে-মধ্যে দুরবিন দিয়ে জাহাজটা দেখতে লাগল। তখনও কুড়ি মাইল পুবদিকে রয়েছে জাহাজটা। এখনো সেটাকে সংকেত ক'রে কিছু জানানোর উপায় নেই। তবু দ্বীপের উপরে এত-বড়ো ফ্র্যাঙ্কলিন পর্বত যখন রয়েছে, তখন এটার উপর জাহাজের লোকের নজর পড়বেই।

'কিন্তু এখানে কেন এলো জাহাজটা ? ম্যাপে তো প্রশান্ত মহাসাগরের এই অংশে টেবর আইল্যাণ্ড ছাড়া অন্য-কোনো দ্বীপের অস্তিত্ব নেই !'

হার্বার্ট জিগেস করলে : 'এটা কি ডানকান জাহাজ ?'

স্পিলেট বললেন : 'শিগগির আয়ারটনকে ডেকে পাঠাও। এটা ডানকান কি না, তা সেই বলতে পারবে।'

তক্ষুনি আয়ারটনকে তাড়াতাড়ি চ'লে আসতে টেলিগ্রাম করা হ'ল।

হার্বার্ট বললে : 'এটা যদি ডানকান জাহাজ হয়, তবে এটাকে দেখেই আয়ারটন চিনতে পারবে।'

'হ্যাঁ, আর সৌভাগ্যবশত, আয়ারটন এখন ডানকানে যাওয়ার উপযুক্তও হয়েছে—' বললেন হার্ডিং : 'ঈশ্বর করুন, এটা যেন ডানকান জাহাজই হয় ! অন্য-কোনো বেহুদা জাহাজ হ'লেই ভাবনার কথা ! এ-সব জায়গার ভারি দুর্নাম। মালয় বোম্বেটে এসে হাজির হওয়াও বিচিত্র নয়। এলে অবশ্য আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো ; কিন্তু আত্মরক্ষার দরকার

না-হ'লেই ভালো ।'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'জাহাজটা যদি লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের খানিক দূরে এসে নোঙর ফ্যালে, তখন আমরা কী করবো ?'

একটু ভেবে হার্ডিং উত্তর করলেন : 'তখন আমরা এই জাহাজের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবো । তারপর এই জাহাজে চ'ড়ে দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যাবো । যাওয়ার আগে দ্বীপটাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামে দখল ক'রে নেবো । কিছুদিন পরে আবার আমরা ফিরে আসবো । এখানে উপনিবেশ ক'রে থাকবে ব'লে তখন যদি কেউ আমাদের সঙ্গে আসতে চায়, তবে তাদেরও সঙ্গে ক'রে আনবো । তখন লিঙ্কন আইল্যাণ্ড হবে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে আমেরিকার একটা ঘাঁটি ।'

বিকেল চারটের সময় আয়ারটন গ্র্যানাইট হাউসে এলো । হার্ডিং তাকে জানলার কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন : 'আয়ারটন, একটা জাহাজ দেখতে পাওয়া গেছে, সেইজন্যেই তোমায় ডেকেছি । দুরবিনটা দিয়ে ভালো ক'রে দ্যাখো তো এটা ডানকান জাহাজ কি না ?'

দুরবিন দিয়ে অনেকক্ষণ ভালো ক'রে দেখে আয়ারটন বললে : 'একটা জাহাজ তো বটেই । কিন্তু আমার মনে হয় না যে এটা ডানকান ।'

'কেন ডানকান ব'লে মনে হয় না ?' শুধোলেন স্পিলেট ।

'ডানকান হ'ল একটা স্টীমশিপ,' বললে আয়ারটন : 'কিন্তু আমি তো ধোঁয়ার কোনো চিহ্নই দেখছি না । অবিশ্যি এমনও হ'তে পারে, আগুন নিবিয়ে দিয়ে এখন শুধু পালে চলেছে, তাই ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি না । সেইজন্যে এটা আরো কাছে না-আসা পর্যন্ত কিছু বলার জো নেই । ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ।' এই বলে আয়ারটন ঘরের এককোণে চুপ ক'রে ব'সে রইল ।

সবাই আবার জাহাজ সম্পর্কে অলোচনা করতে লাগলেন, কিন্তু আয়ারটন তাতে যোগ দিলে না । সাইরাস হার্ডিং গম্ভীরভাবে ব'সে চিন্তা করতে লাগলেন । জাহাজের এই আকস্মিক আগমন তাঁর পছন্দ হয়নি । বরং বেশ-একটু ভাবনাই হ'ল তাঁর ।

ক্রমে জাহাজটা আরো-কাছে এলে পেনক্র্যাফ্‌ট দুরবিন দিয়ে দেখলে, সেটা দ্বীপের দিকে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে । এমনভাবে যদি চলতে থাকে, তবে শিগগিরই ক্ল অন্তরীপের পিছনে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে । কিন্তু, তবু জাহাজটার উপরে নজর রাখতে হবে । এদিকে সন্ধে হ'য়ে এলো, আস্তে-আস্তে আলো ক'মে আসছে ।

স্পিলেট শুধোলেন : 'রাত হ'লে অন্ধকারে কী করা যাবে ! একটা আগুন জ্বাললে হয় না ? তা দেখে জাহাজের লোকে বুঝতে পারবে যে, এখানে একটা দ্বীপ আছে !'

প্রশ্নটা একটু গুরুতর । হার্ডিং-এর আশঙ্কা তখনও দূর হয়নি । তবু, আগুন জ্বেলে রাখাটাই উচিত ব'লে ঠিক হ'ল । রাত্রে হয়তো জাহাজটা চ'লে যেতে পারে । এটা চ'লে গেলে আবার কি কোনো জাহাজ লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের কাছে আসবে ? এই সুযোগ হারালে হয়তো অনুতাপ করতে হবে পরে । তাই ঠিক হ'ল, নেব্‌ আর পেনক্র্যাফ্‌ট পোর্ট বেলুনে গিয়ে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালাবে । তারা দু-জনে যখন পোর্ট বেলুনে যাওয়ার দিকে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন দেখা গেল, জাহাজটা হঠাৎ তার গতি ফিরিয়ে মুখ করেছে ইউনিয়ন বে-র

দিকে। আয়ারটন দুরবিন নিয়ে খুব ভালো ক'রে দেখতে লাগল জাহাজটাকে। প্রসন্ন আকাশে তখনও বেশ আলো আছে। আয়ারটন স্পষ্ট দেখতে পেলে, জাহাজে চিমনি নেই। সে বললে : 'অসম্ভব! এটা ডানকান জাহাজ হ'তেই পারে না।'

আরো ভালো ক'রে দেখে সে বললে : 'জাহাজটা ভারি সুন্দর, বেশ মজবুত আর লম্বা। খুব দ্রুত চলতে পারে ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু কোন্ জাতের জাহাজ, সেটা বলা শক্ত। একটা নিশানও উড়ছে, কিন্তু সেটার রঙ ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।'

এবার পেনক্র্যাফ্‌ট দুরবিন নিয়ে জাহাজটাকে দেখতে লাগল। বললে, 'এটা আমেরিকার নিশান নয়—মনে হয় নিশানটা একরঙা। এটার রঙ দেখে মনে হচ্ছে—'

নিশানটা ঝুলে পড়েছিল, ঠিক এইসময় হাওয়ার আবেগে আবার পৎ-পৎ ক'রে উড়তে লাগল। আয়ারটন দুরবিনটা চোখে নিয়ে দেখে ব'লে উঠল : 'কী সর্বনাশ! নিশানের রঙ যে কুচকুচে কালো!'

সাইরাস হার্ডিং-এর ধারণাই তবে সত্যি হ'ল? এটা কি তবে বোম্বেটে জাহাজ? বোম্বেটে জাহাজ লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে আসবে কেন? তবে কি লিঙ্কন আইল্যাণ্ডকে বোম্বেটেরা ঘাঁটি করবে?

সাইরাস হার্ডিং বললেন, 'জাহাজটা হয়তো শুধু চারপাশ দেখে-শুনেই চ'লে যাবে, দ্বীপে আসবে না। তাহ'লেও দ্বীপে যে মানুষ আছে, তা যেন বোম্বেটেরা জানতে না-পারে। আয়ারটন আর নেব্ গিয়ে উইণ্ড-মিলের প্রপেলারগুলো নামিয়ে ফেলুক, সেইটেই সবচেয়ে আগে চোখে পড়বে। তারপর গ্র্যানাইট হাউসের দরজা-জানলাগুলো লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দাও, আর সব আগুন নিভিয়ে ফ্যালো।'

হার্বার্ট বললে, 'বন-অ্যাডভেনচারের কী হবে?'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'বন্-অ্যাডভেনচার পোর্ট বেলুনে একেবারে নিরাপদ। বাজি রেখে বলতে পারি, বোম্বেটেরা সেটা খুঁজেই বার করতে পারবে না।'

এভাবে সতর্কতা অবলম্বন করবার পর ঠিক হ'ল, বোম্বেটেরা যদি লিঙ্কন আইল্যাণ্ড দখল করতে চায়, তবে প্রাণপণে বাধা দিতে হবে। এবার জানতে হবে বোম্বেটেদের সংখ্যা কত, তাদের অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থাই বা কেমন। কিন্তু জানবার উপায় কী? এদিকে মেঘলা আকাশে রাত্রি নেমে এসেছে। অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে গেল সবকিছু। জাহাজের আলো নেভানো। সেটা ভালো ক'রে দেখতেই পাওয়া যায় না। এমন সময় হঠাৎ অন্ধকারে একটা আলোর ফিন্‌কি দেখা গেল, সঙ্গে-সঙ্গে কামানের প্রচণ্ড গর্জন। জাহাজে তবে কামানও আছে!

কামানের আওয়াজ পৌঁছুতে প্রায় ছ-সেকেণ্ড লাগল। তার মানে, তীর থেকে প্রায় সোয়া মাইল দূরে আছে জাহাজটা। এমন সময় একটা গুরু-গুরু শব্দ শোনা গেল। জাহাজ থেকে জলে পড়ল শেকল। গ্র্যানাইট হাউসের ঠিক সামনে; অর্থাৎ সেখানেই নোঙর ফেলেছে জাহাজ।

এতক্ষণে বোম্বেটেদের মৎলব বোঝা গেল। রাতটা কাটলেই তারা নৌকোয় চ'ড়ে তীরে নামবে। হার্ডিংরা অবশ্য প্রস্তুত হ'য়েই আছেন সংঘর্ষের জন্যে, কিন্তু বুদ্ধি ক'রে কাজ করতে হবে। অযথা রক্তপাত ঘটানো ঠিক হবে না। সৌভাগ্যবশত গ্র্যানাইট হাউস দুর্ভেদ্য,

দরজা-জানলাগুলো লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। গ্র্যানাইট হাউসে বোম্বেটেরা ঢুকতে পারবে না ; কিন্তু খেত, পাখির বাসা, কোর‍্যাল—সবই তারা নষ্ট ক'রে ফেলতে পারে।

বোম্বেটেদের দলে ক-জন লোক আছে, সেইটেই সবচেয়ে আগে জানা দরকার। দশ-বারো জন লোক হ'লে হয়তো বাধা দেয়া যাবে, কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক হ'লে বিপদের সম্ভাবনা। এছাড়া, বোম্বেটেদের যে কামানও আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এমন সময় আয়ারটন বললে : 'ক্যাপ্টেন হার্ডিং, আমার একটা আরজি আছে।'

'কী ?' শুধোলেন হার্ডিং।

আয়ারটন বললে : 'জাহাজটায় গিয়ে দেখে আসতে চাই, ওদের লোকজনের সংখ্যা কত।'

'কিন্তু,' হার্ডিং বললেন : 'এতে যে প্রাণের ভয় আছে !'

'থাকুক। তবু আমি যাবো।' বললে আয়ারটন : 'চুপি-চুপি সাঁতার কেটে যাবো জাহাজে। কিছু ভাববেন না। আমি খুব ভালো সাঁতার জানি। মাইল-দেড়েক দূরে আছে তো জাহাজটা ? সে আমি সাঁৎরেই যেতে পারবো।'

হার্ডিং আবার বললেন : 'কিন্তু এতে যে তোমার প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা আছে !'

'প্রাণের ভয় আমি করি না।' বললে আয়ারটন : 'আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যেই আমি এ-কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছি। আপনি আমায় অনুমতি দিন।'

এ-কথা শুনে হার্ডিং আর বাধা দিলেন না। কিন্তু পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'আমি আয়ারটনের সঙ্গে যাবো। আমি শুধু উপদ্বীপ পর্যন্ত যাবো আয়ারটনের সঙ্গে। বলা যায় না তো, এর মধ্যে বোম্বেটেদের কেউ তীরে নেমেছে কি না ! তখন দুজন থাকলে ভালো হবে। আমি সেখানে আয়ারটনের জন্যে অপেক্ষা করবো আর ও জাহাজে চ'লে যাবে।'

আয়ারটন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হ'ল। যে-দুঃসাহসের কাজে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে, তাতে মুহূর্তের অসতর্কতায় মৃত্যুর সম্ভাবনা। তবে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সে যদি কাজ হাসিল করতে পারে, তবে দ্বীপবাসীরা আসন্ন সংঘর্ষের জন্যে ভালো ক'রে তৈরি হ'তে পারবেন। অন্য-সকলের সঙ্গে আয়ারটন আর পেনক্র্যাফ্‌ট সমুদ্রতীরে নেমে এলো। আয়ারটন জামাকাপড় খুলে গায়ে খুব ক'রে চর্বি মেখে নিলে, যাতে ঠাণ্ডাটা একটু কম লাগে। ইতিমধ্যে নেব্‌ গিয়ে মার্সি নদীর তীর থেকে ক্যানুটা নিয়ে এলো। তখন আয়ারটন সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পেনক্র্যাফ্‌টের সঙ্গে গিয়ে নৌকোয় উঠল। দেখতে-দেখতে নৌকো প্রণালীর অন্য পারে গিয়ে হাজির হ'ল। অন্য-সকলে চিমনিতে গিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আয়ারটন আর পেনক্র্যাফ্‌ট উপদ্বীপ পেরুবার আগে চুপি-চুপি চারদিক দেখে নিলে। না, কোনো বোম্বেটেই তীরে নামেনি। নিরাপদে দ্বীপের অন্যধারে গিয়ে একটুও দ্বিধা না-ক'রে আয়ারটন সমুদ্রের জলে নেমে পড়ল। পেনক্র্যাফ্‌ট পাহাড়ের একটা ফাটলের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু আগে জাহাজে কয়েকটা আলো জ্বলেছিল। আয়ারটন নিঃশব্দে সেই আলো লক্ষ্য ক'রে জাহাজের দিকে এগুতে লাগল। শুধু বোম্বেটেদের ভয়ই নয়, সমুদ্রে হাঙরও

থাকতে পারে। কিন্তু আয়ারটন সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। আধ ঘণ্টা পরে জাহাজের কাছে উপস্থিত হ'য়ে নোঙরের মোটা শেকলটা ধ'রে ফেললে। একটু জিরিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে উপরে ডেকের কিনারে গিয়ে দেখতে পেলে—নাবিকদের কামিজ ঝুলছে। সে একটা কামিজ আর প্যান্ট প'রে চুপ ক'রে ব'সে সব কথাবার্তা শুনতে লাগল। জাহাজের সব লোক তখনও ঘুমোয়নি। কয়েকজন জাহাজি ব'সে গল্প করছে। আয়ারটন শুনতে পেলে তারা বলাবলি করছে : 'খাশা জাহাজটা পাওয়া গেছে ! সুন্দর চলে ! নামটাও জুৎসই, "স্পীডি" ! আমাদের কাপ্তেনও খাশা লোক !' হ্যাঁ, বব্ হার্ডি বড়ো জবরর কাপ্তেন !'

বব হার্ডি নামটা শুনে আয়ারটন চমকে উঠল। অস্ট্রেলিয়ায় থাকার সময় বব্ হার্ডিই কয়েদিদলের মধ্যে তার ডান-হাত ছিল। বব্ হার্ডি দুর্দান্ত সাহসী, একেবারে বেপরোয়া। নাবিক হিশেবেও খুব নিপুণ। অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলে নরফোক আইল্যাণ্ডে বব্ হার্ডি স্পীডি জাহাজটি দখল করে। জাহাজের মধ্যে বন্দুক, কামান, গুলি-বারুদ, অন্যান্য হাতিয়ার, খাবার-দাবার, যন্ত্রপাতি—কিছুরই অভাব ছিল না। হার্ডি তার কয়েদি সঙ্গীদের সাহায্যে জাহাজটি দখল ক'রে প্রশান্ত মহাসাগরে লুঠতরাজ চালিয়ে বেড়াচ্ছে।

বোম্বেটেরা মদ খেয়ে এইসবই আলোচনা করছিল। তারা কোন্‌দিন কোন্‌খানে কী-কী করেছিল, সবই আয়ারটনের কানে এলো। এই নরফোক আইল্যাণ্ডেই দুর্দান্ত সব ইংরেজ কয়েদিদের নির্বাসিত করা হ'ত। বোম্বেটেদের অনেকেই ছিল পলাতক ইংরেজ কয়েদি। বেশির ভাগ বোম্বেটে ছিল জাহাজের পিছন দিকে। কয়েকজন যাত্রী ছিল ডেকের উপরে। তারাই এইসব কথা বলাবলি করছিল। আয়ারটন জানতে পারলে, বোম্বেটে-জাহাজটা দৈবাৎ এই দ্বীপটিতে এসে পড়েছে। বব্ হার্ডি এই দ্বীপে আগে কখনো আসেনি। সমুদ্রপথে দ্বীপটা দেখতে পেয়ে দ্বীপে নেমে দেখ্‌বার সাধ হয়েছে। উপযুক্ত মনে করলে সে এখানেই ঘাঁটি করবে।

সাইরাস হার্ডিং আর তার সঙ্গীদের দৌলতে দ্বীপের বর্তমান অবস্থা এমনি লোভনীয় হয়েছে যে আয়ারটন বুঝতে পারলে, এই দ্বীপে একবার নামলে বব্ হার্ডি আর এখান থেকে নড়তে চাইবে না। সুতরাং বোম্বেটেদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। লড়াই ব্যতীত অন্য-কোনো পথ সামনে খোলা নেই। এদের একেবারে নির্মূল ক'রে ফেললেও অন্যায় হবে না। কিন্তু লড়াইয়ের আগে জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র আর লোকসংখ্যা জানতে হবে। আয়ারটন ঠিক করলে, যে ক'রেই হোক এই খবরটা নিতেই হবে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জাহাজের বেশির ভাগ লোক ঘুমিয়ে পড়ল। জাহাজের ডেক অন্ধকার। এই অন্ধকারের সুযোগটাই নিলে আয়ারটন। ডেকের উপরে গেল সে। ডেকের উপর ইতস্তত প'ড়ে আছে বোম্বেটেরা, ঘুমে অচৈতন্য। খুব সাবধানে আয়ারটন চারদিকে ঘুরে দেখল। জাহাজে চারটে কামান আছে, সবগুলোই আধুনিক ও মারাত্মক। ডেকের উপর দশজন লোক ঘুমিয়ে আছে, অন্যরা সম্ভবত নিচে।

কথাবার্তা শুনে আয়ারটন জানতে পেরেছিল জাহাজে পঞ্চাশ জন লোক আছে। ছ-জন দ্বীপবাসীর পক্ষে নেহাৎ ফ্যালনা নয়। আয়ারটন মনে-মনে একটু সংকল্প করলে। এতে তার প্রাণ যাবে বটে, কিন্তু অন্যরা নিরাপদ হবেন। সে ঠিক করলে, বারুদ-ঘরে আগুন দিয়ে জাহাজটা সে উড়িয়ে দেবে। অবশ্য বোম্বেটেদের সঙ্গে তারও প্রাণ যাবে, কিন্তু তার

পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে ।

বারুদ-ঘর যে জাহাজের নিচে পিছন দিকে থাকে, নাবিক আয়ারটন তা জানত । পা টিপে-টিপে সেদিকে চলল সে । মাস্তুলের কাছে গিয়ে দেখল, সেখানে একটা লণ্ঠন জ্বলছে । মাস্তুলের চারদিকে পিস্তল, বন্দুক ও অন্য-সব হাতিয়ার একটা র‍্যাকের মধ্যে সাজানো । সেই র‍্যাক থেকে একটা পিস্তল তুলে নিলে আয়ারটন । জাহাজ উড়িয়ে দিতে এই পিস্তলটাই যথেষ্ট । তারপর চুপি-চুপি নিচে নেমে বারুদ-ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হ'ল সে । বারুদ-ঘরের দরজায় তালা দেয়া । আয়ারটনের গায়ে জোর ছিল অসাধারণ । তালাটি ধ'রে সজোরে চাপ দিতেই তালা ভেঙে দরজা খুলে গেল ।

ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে একটা হাত এসে পড়ল আয়ারটনের কাঁধে । আয়ারটনের মুখের উপর আলো ফেলে ঢ্যাঙা একটা লোক কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে : 'তুমি এখানে কী করছো ?'

আয়ারটন তক্ষুনি লোকটাকে চিনতে পারলে । সে আর কেউ নয়, স্বয়ং বব্ হার্ডি । বব্ হার্ডি অবশ্য আয়ারটনকে চিনতে পারলে না । সে জানতো, আয়ারটন অনেকদিন আগেই মারা গেছে । আয়ারটনের কোমরবন্ধ ধ'রে বব্ হার্ডি আবার জিগেস করলে : 'কী করছো তুমি এখানে ?'

এ-কথার উত্তর না-দিয়ে আয়ারটন এক হ্যাঁচকা টানে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে । বব্ হার্ডি চীৎকার ক'রে উঠল : 'কে আছো, তোমরা শিগ্‌গির এসো !'

চীৎকার শুনে দু-তিনটে বোম্বেটে জেগে উঠল । তারা এসেই আয়ারটনকে পাকড়াবার চেষ্টা করলে । আয়ারটন পিস্তলের বাঁটের আঘাতে দুটি বোম্বেটেকে ধরাশায়ী করলে, কিন্তু তৃতীয় বোম্বেটের ছুরি এসে বিঁধল তার কাঁধে । এদিকে বব্ হার্ডি বারুদ-ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছে । ডেকের উপর বোম্বেটের পায়ের শব্দ শোনা গেল ।

আয়ারটন বেগতিক দেখে পালাবার মৎলব আঁটলে । আয়ারটন পর-পর দুটো গুলি ছুঁড়ল, একটা বব্ হার্ডিকে লক্ষ্য করে ; কিন্তু হার্ডির তাতে অনিষ্ট হ'ল না । শত্রুপক্ষ আচমকা এভাবে আক্রান্ত হ'য়ে বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছিল । সেই সুযোগে আয়ারটন পিস্তল ছুঁড়ে লণ্ঠন চুরমার ক'রে দিয়ে ডেকে ওঠবার সিঁড়ির দিকে ছুটল । অন্ধকার হ'য়ে যাওয়ায় আয়ারটনের সুবিধেই হ'ল । সেই মুহূর্তে দু-তিনটে বোম্বেটে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিল । আয়ারটনের চতুর্থ গুলিতে একটা বোম্বেটে শেষ হ'ল । অন্যরা হকচকিয়ে স'রে গেল । তক্ষুনি আয়ারটন একলাফে ডেকের উপর উঠে এলো । বাকি দুটি গুলিতে একটি বোম্বেটেকে খতম ক'রে আয়ারটন জাহাজের রেলিঙের উপর দিয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল । জাহাজ থেকে ছ-সাত ফুট যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চারদিকে মুহুর্মুহু বন্দুকের গুলি পড়তে লাগল ।

এতগুলো বন্দুকের আওয়াজ শুনে পেনক্র্যাফ্‌ট খুব বিচলিত হ'য়ে উঠল । চিমনি থেকে অন্যরাও সমস্ত শুনতে পেয়েছিলেন । সবাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সমুদ্রতীরে ছুটে এলেন । আয়ারটন যে ধরা প'ড়ে মারা গেছে, সে-বিষয়ে তাঁদের কোনো সন্দেহ রইল না ।

দুর্ভাবনার মধ্য দিয়ে আধ ঘণ্টা কেটে গেল । বন্দুকের আওয়াজও বন্ধ হ'য়ে গেছে । কিন্তু তবু পেনক্র্যাফ্‌ট কিংবা আয়ারটনের কোনো দেখা নেই । তবে কি দস্যুরা এসে উপদ্বীপটিই আক্রমণ করেছে ? পেনক্র্যাফ্‌ট আর আয়ারটনের সাহায্যের জন্যে কি তাঁদের

যাওয়া উচিত নয় ? কিন্তু যাবেন কী ক'রে ? তখন ভরা জোয়ার। প্রণালী পেরুনো অসম্ভব। নৌকোটাও অন্য তীরে রয়েছে। হার্ডিংদের দারুণ দুর্ভাবনা হ'ল।

অবশেষে রাত প্রায় বারোটার সময় পেনক্র্যাফ্‌ট ও আহত আয়ারটন নৌকো ক'রে এপারে এসে হাজির হ'ল। তাদের দেখে সবাই জড়িয়ে ধরলেন।

তক্ষুনি সবাই গিয়ে চিমনিতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে গিয়ে আয়ারটন সবকিছু খুলে বললে। বোম্বেটে-জাহাজ উড়িয়ে দেয়ার জন্যে যে-ফন্দি করেছিল, তাও বলতে বাকি রাখলে না। সবাই আয়ারটনের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

দ্বীপবাসীদের অবস্থা এখন রীতিমতো সঙিন। বোম্বেটেরা জানতে পেরেছে যে, লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে লোক আছে। তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দল বেঁধে দ্বীপে নেমে আসবে। তখন লড়াই অনিবার্য। সে-লড়াইয়ে হার হ'লে চরম সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে, 'আমাদের আর রেহাই নেই ! ওরা পঞ্চাশ জন, আর আমরা মাত্র ছ-জন।'

'হ্যাঁ,' বললেন হার্ডিং : 'আমরা ছ-জনই, তবে—'

'তবে কী ?' শুধোলেন স্পিলেট : 'আর কেউ আছে নাকি আমাদের দলে ?'

সাইরাস হার্ডিং নীরবে আকাশের দিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন। মুখ ফুটে বললেন না রহস্যময় সেই অজ্ঞাত শক্তির কথা, যে এতদিন তাঁদের উপকার ক'রে এসেছে।

নিরাপদেই কেটে গেল রাতটা। চিমনিতে থেকেই চারদিকে দৃষ্টি রাখলেন সবাই। দস্যুরা দ্বীপে নামবার কোনো চেষ্টা করলে না। আয়ারটনকে গুলি করবার পর থেকেই জাহাজ নীরব নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে। হয়তো চ'লেই গেছে। আসলে কিন্তু যায়নি। অন্ধকার ফিকে হ'লে পর কুয়াশার মধ্য দিয়ে দূরে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল বোম্বেটেদের 'স্পীডি'কে।

এটা সবাই বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুয়াশা যতক্ষণ আছে ততক্ষণই বাঁচোয়া। কেননা, কুয়াশার দরুন বোম্বেটেরা তাঁদের কোনো কাজই দেখতে পাবে না। এখন তাঁদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে বোম্বেটেদের বুঝতে দেয়া যে, দ্বীপবাসীদের সংখ্যা বেশি—তাঁরা বোম্বেটেদের বাধা দিতে সক্ষম।

ঠিক হ'ল, দ্বীপবাসীরা তিন ভাগে ভাগ হ'য়ে যাবেন। একদল থাকবে চিমনিতে, একদল মার্সি নদীর মুখে, আর তৃতীয় দল উপদ্বীপে। বোম্বেটেরা যখন দ্বীপে নামতে চাইবে, তখন সেখানে তাদের বাধা দিতে হবে। প্রত্যেকে একটা ক'রে বন্দুক নেবেন। গুলি-বারুদও যথেষ্ট আছে। পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে বোম্বেটেদের আক্রমণের ভয় থাকবে না। এবং গ্র্যানাইট হাউসে কেউ না-থাকলে সেটা বরং শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে। ভয়ের কারণ আছে শুধু একটাই। এমনও হ'তে পারে যে, শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করাটা অনিবার্য হ'য়ে উঠল। যাতে মুখোমুখি লড়াই করতে না-হয়, সেজন্যে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। সেজন্যে সবসময়েই আড়াল থেকে লড়াই করতে হবে। দরকার হ'লে গুলি চালাতে হবে। কিন্তু লক্ষ্যটি যেন সবসময়েই ঠিক হয়, সেদিকে রাখতে হবে তীক্ষ্ণ নজর। কেননা অযথা গুলি নষ্ট করা চলবে না। এই ব্যবস্থা-মতো যাতে কাজ করা যায় সেইজন্যে নেব্ আর পেনক্র্যাফ্‌ট তক্ষুনি গ্র্যানাইট হাউসে গিয়ে প্রচুর পরিমাণ গুলি-বারুদ নিয়ে এলো। গিডিয়ন স্পিলেট আর আয়ারটনের বন্দুকের হাত নিখুঁত, তাঁদেরই রাইফেলদুটো দেয়া হ'ল।

হার্ডিং, পেনক্র্যাফ্‌ট, নেব্‌ আর হার্বার্টের হাতে রইল বাকি চারটে বন্দুক। হার্বার্টের সঙ্গে হার্ডিং রইলেন চিমনিতে। এখান থেকে গ্র্যানাইট হাউসের তলা পর্যন্ত সমস্ত দেখতে পাওয়া যাবে। নেব্‌কে নিয়ে গিডিয়ন স্পিলেট গেলেন মার্সি নদীর মুখে। আয়ারটন আর পেনক্র্যাফ্‌ট উপদ্বীপে গিয়ে দু-জায়গায় অপেক্ষা করবে। এইভাবে চারটে আলাদা-আলাদা জায়গা থেকে বন্দুকের আওয়াজ হ'তে থাকলে বোম্বেটেরা ভাববে দ্বীপে অনেক লোক আছে, এবং তারা আত্মরক্ষায় আদৌ অপারগ নয়। উপদ্বীপে যদি এর মধ্যেই বোম্বেটেরা নেমে পড়ে, আর তারা যদি বাধা দিতে না-পারে, কিংবা যদি মনে করে যে বোম্বেটেরা তখন ফেরার পথ আটকে ফেলতে পারে, তাহ'লে আয়ারটন আর পেনক্র্যাফ্‌ট সঙ্গে-সঙ্গেই নৌকো ক'রে ফিরে আসবে ব'লে ঠিক হ'ল। এই ব্যবস্থার পর যে-যাঁর জায়গায় রওনা হওয়ার আগে সবাই একে আরেকের সঙ্গে করমর্দন ক'রে বিদায় নিলেন, তারপর যে-যাঁর জায়গায় চ'লে গেলেন।

তখন রাত ভোর হয়েছে। বেলা ছ-টা বাজে। একটু পরেই কুয়াশা পরিষ্কার হ'তে শুরু হ'ল। বোম্বেটে-জাহাজটা এখন বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কালো নিশানটা মাস্তুলে উড়ছে। দুরবিন দিয়ে সাইরাস হার্ডিং দেখতে পেলেন, কামানের নলগুলো দ্বীপকে লক্ষ্য ক'রে বসানো। হুকুম পেলেই শুরু হবে তার তাণ্ডব দাপট। স্পীডি তখনো নীরব। প্রায় তিরিশ জন বোম্বেটে ডেকের উপর হাঁটাহাঁটি করছে। দুটি লোক দুরবিন দিয়ে দেখছে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডকে।

রাত্রে জাহাজে যে-ঘটনাটা ঘ'টে গিয়েছে, বোম্বেটেরা তা তখনো ভালো ক'রে বুঝে উঠতে পারেনি। লোকটা বারুদ-ঘরের দরজা ভেঙেছিল। তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি নেহাৎ কম হয়নি। তার গুলিতে একজন বোম্বেটে মারা গেছে, আর দু-জন আহত হয়েছে। লোকটি কি বোম্বেটেদের গুলি খেয়েও নিরাপদে ফিরে গেছে? লোকটি এলো কোত্থেকে? উদ্দেশ্যই বা কী ছিল? বব্‌ হার্ভির বিশ্বাস, লোকটি এসেছিল বারুদে আগুন দিয়ে জাহাজ উড়িয়ে দেয়ার জন্যে। সত্যিই কি তাই ছিল উদ্দেশ্য? কে জানে! তবে একটা ব্যাপার স্পষ্টই বোঝা গেল যে, এই অজ্ঞাত দ্বীপটাতে লোকজন আছে। হয়তো তারা সংখ্যায় নেহাৎ কম নয়। হয়তো তারা দ্বীপটা রক্ষা করতে সক্ষম। কিন্তু সমুদ্রসৈকতে কিংবা পর্বত-চূড়োয় —কোথাও তো কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সমুদ্রতীরও নির্জন। তবে কি লোকজন দ্বীপের মধ্যে পালিয়ে গেছে, না আক্রমণের মৎলব আঁটছে? কে জানে! দেখাই যাক কী হয়।

এমনি ক'রে দেড় ঘণ্টা কেটে গেল। শেষে যখন দ্বীপের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আক্রমণের কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন একটা নৌকো ভাসিয়ে তাতে সাতজন বোম্বেটে চ'ড়ে বসল। তাদের সঙ্গে বন্দুক আছে। একজনের হাতে আছে জল মাপবার দড়ি। চারজন বোম্বেটে বসেছে দাঁড়ে, অন্য দুজন বন্দুক হাতে ক'রে নৌকোর মুখের কাছে হাঁটু গেড়ে প্রস্তুত হ'য়ে আছে। তাদের উদ্দেশ্য শুধু খবর নেয়া। নামবার মৎলব থাকলে নিশ্চয় সংখ্যায় আরো বেশি হ'ত। নৌকোর গতি দেখে বোঝা গেল, বোম্বেটেরা ঠিক করেছে প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ না-ক'রে উপদ্বীপটায় গিয়ে নামবে।

পাহাড়ের আড়াল থেকে আয়ারটন আর পেনক্র্যাফ্‌ট দেখতে পেলে, নৌকো ঠিক তাদের

দিকেই আসছে। তারা অপেক্ষা করতে লাগল, কতক্ষণে নৌকো বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসে।

আস্তে-আস্তে, খুব সতর্কভাবে এগুতে লাগল নৌকো। তখন দেখা গেল, একজনের হাতে শিসে-বাঁধা দড়ি—সে মার্সি নদীর মুখে প্রণালীর গভীরতা মেপে দেখছে। তাতে মনে হ'ল বব্ হার্ডির ইচ্ছে—জাহাজটাকে তীরের যথাসম্ভব কাছে আনা। নৌকো যখন উপদ্বীপ থেকে সাত-আটশো হাত দূরে, তখন থামল। হালের লোকটি উঠে দাঁড়ালে, তীরে নামবার মতো জায়গা পাওয়া যায় কি না দেখতে। ঠিক সেই মুহূর্তে দু-বার গর্জন ক'রে উঠল বন্দুক, ধোঁয়া উঠল পাহাড়ের আড়াল থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে হালের লোকটি আর যে জল মাপছিল—দুজনেই চিৎপটাং হ'য়ে নৌকোর মধ্যে প'ড়ে গেল। এর ঠিক পরক্ষণেই জাহাজ থেকে গ'র্জে উঠল কামান। সঙ্গে-সঙ্গে কামানের গোলা এসে আয়ারটন আর পেনক্র্যাফ্‌টের মাথার উপরের পাহাড়ের চুড়োটাকে ভেঙে একেবারে চুরমার ক'রে দিলে। সৌভাগ্যবশত তাদের দুজনের তাতে কোনো অনিষ্ট হ'ল না।

এদিকে মহা গণ্ডগোল বাধল নৌকোয়। হালের লোকটির জায়গায় আরেকজন এসে ব'সে নৌকোর মুখ ফেরালে।

এ-রকম অবস্থায় জাহাজে ফিরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু নৌকো জাহাজের দিকে রওনা হ'ল না, এবার চলল মার্সি নদীর মুখের দিকে। ওদের মৎলব হ'ল প্রণালীতে ঢুকে আয়ারটন আর পেনক্র্যাফ্‌টের ফেরার পথ এমনভাবে আটকে ফেলবে, যাতে তারা জাহাজের কামান আর নৌকোর বন্দুকের মাঝখানে প'ড়ে যাবে। বোম্বেটেদের মৎলব বুঝতে পেরেও আয়ারটন আর পেনক্র্যাফ্‌ট তাদের আশ্রয়টা ছাড়ল না। মার্সি নদীর মুখে আছেন স্পিলেট আর নেব্, চিমনিতে রয়েছেন হার্ডিং আর হার্বার্ট। তাঁদের উপর নির্ভর ক'রেই ওরা দুজনে লুকিয়ে রইলে। কুড়ি মিনিট পরে বোম্বেটেদের নৌকো যখন মার্সি নদীর মুখ থেকে চারশো হাত দূরে, তখন জোয়ার শুরু হ'ল। নৌকো বুঝি-বা মার্সি নদীর মধ্যেই ঢুকে পড়ে! বোম্বেটেরা প্রাণপণে দাঁড় টেনে কোনোমতে নৌকোটাকে প্রণালীর মাঝখানেই রাখলে বটে, কিন্তু মার্সি নদীর মুখের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দুটো গুলি এসে দস্যুদের আরো দুজনকে নৌকোর মধ্যে শুইয়ে দিলে। নেব্ আর স্পিলেট দুজনেরই লক্ষ্য হয়েছিল অব্যর্থ। ধোঁয়া লক্ষ্য ক'রে তক্ষুনি জাহাজ থেকে কামান গ'র্জে উঠল বটে, কিন্তু পাথর চুরমার করা ছাড়া আর-কিছুই করতে পারলে না।

নৌকোয় এখন মাত্র তিনজন বোম্বেটে কার্যক্ষম। স্রোতের টানে তীরের মতো ছুটল নৌকো।

নৌকোটা সাইরাস হার্ডিং আর হার্বার্টের সামনে দিয়েই গেল, কিন্তু পাল্লার বাইরে ছিল ব'লে তাঁরা গুলি করলেন না। নৌকো উপদ্বীপের উত্তর দিক ঘুরে দুটো দাঁড়ের সাহায্যে জাহাজের দিকে ফিরে চলল।

এ পর্যন্ত জয় হয়েছে দ্বীপবাসীদের। শত্রুদের চারজন লোক একেবারে যদি না-ও ম'রে থাকে, সাংঘাতিকভাবে যে আহত হয়েছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। বোম্বেটেরা যদি এমনিভাবেই আক্রমণ করতে থাকে, যদি তারা আবার নৌকোয় চ'ড়ে দ্বীপে নামবার চেষ্টা করে, তাহ'লে একটা-একটা ক'রে তাদের খতম করতে পারা যাবে।

আধঘণ্টা পরে নৌকোটা গিয়ে জাহাজের গায়ে ভিড়লে। সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজে ভয়ানক শোরগোল চ্যাঁচামেচি শুরু হ'য়ে গেল। রাগে আগুন হ'য়ে তক্ষুনি বারো জন নতুন দস্যু লাফিয়ে পড়ল নৌকোয়। জাহাজ থেকে আরেকটা নৌকো নামানো হ'ল, তাতে চড়ল আটজন লোক। প্রথম নৌকো ফের উপদ্বীপের দিকে চলল, দ্বিতীয় নৌকো চলল মার্সি নদীর মুখটা দখল করবার জন্যে।

আয়ারটন আর পেনক্র্যাফ্‌টের অবস্থা খুব বিপজ্জনক হ'য়ে পড়ল। প্রণালী পেরিয়ে দ্বীপে চ'লে-যাওয়া ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই।

তবু প্রথম নৌকোটা রাইফেলের পাল্লায় না-আসা পর্যন্ত তারা চুপ ক'রে রইলে। নৌকো পাল্লায় আসার সঙ্গে-সঙ্গে দুটো গুলি ছুটে গিয়ে নৌকোর লোকজনদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দিলে। তারপর আয়ারটন আর পেনক্র্যাফ্‌ট আশ্রয় ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। তাদের উপর দিয়ে, চারপাশ দিয়ে মুহুর্মুহু গুলি ছুটল শত্রুপক্ষের, তবু একবারও ভ্রূক্ষেপ করলে না তারা—লাফ দিয়ে গিয়ে উঠল নৌকোয়, তারপর প্রণালী পেরিয়ে একেবারে চিমনির আশ্রয়ে গিয়ে হাজির হ'ল। এদিকে দ্বিতীয় নৌকো মার্সি নদীর মুখের কাছে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ফের গ'র্জে উঠল বন্দুক। নৌকোর আটজন লোকের মধ্যে দুজন স্পিলেট আর নেবের গুলিতে ছিটকে পড়ল জলে। নৌকোটাও স্রোতের টানে জলের নিচের পাথরে লেগে মার্সির মুখের কাছে ডুবে গেল। যে ছ-জন দস্যু বেঁচে ছিল, তারা হাত উঁচু ক'রে জল পার হ'ল। তারপর মার্সি নদীর ডান পার ধ'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ফ্লোটসাম পয়েন্টের দিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

চিমনিতে ঢুকেই প্রশ্ন করলে পেনক্র্যাফ্‌ট: 'ক্যাপ্টেন, এখন অবস্থাটা কী-রকম দাঁড়িয়েছে ব'লে মনে করেন?'

'এখন লড়াইটা একটু নতুন ধরনের হবে,' বললেন হার্ডিং: 'কারণ বোম্বেটেরা বোকা নয়। এমন-একটা অসুবিধের অবস্থায় তারা বেশিক্ষণ থাকবে না। জোয়ারের সময় হয়তো তারা জাহাজ নিয়েই ঢুকবে প্রণালীতে। তখন বন্দুক দিয়ে কামানের সঙ্গে লড়াই চালানো বড়ো সুবিধের হবে না। কামানের গোলার মুখে আমাদের আশ্রয়গুলো তখন আর নিরাপদ থাকবে না।'

এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফ্‌ট: 'জাহান্নমে যাক শয়তানগুলো! ওরা দেখছি সত্যিই জাহাজের নোঙর তুলতে শুরু করেছে! এবার গ্র্যানাইট হাউসে গিয়ে আমাদের আশ্রয় নেয়া উচিত।'

'আরেকটু অপেক্ষা ক'রে দেখা যাক, কী হয়—' বললেন হার্ডিং: 'কেননা, নেব্‌ আর স্পিলেট তো এখনও ওখানে থেকে গেলেন। অবশ্য তাঁরা উপযুক্ত সময়েই এখানে এসে পড়বেন। আয়ারটন, তুমি তৈরি হ'য়ে নাও। তোমার আর মিস্টার স্পিলেটের বন্দুকের হাতের পরীক্ষা দেবার সময় এসেছে।'

সত্যই দেখা গেল, স্পীডি উপদ্বীপটার দিকে রওনা হওয়ার জন্যে একেবারে প্রস্তুত। জোয়ার শুরু হ'লেই প্রণালীর দিকে আসবে। কিন্তু প্রণালীতে প্রবেশ করা সম্পর্কে পেনক্র্যাফ্‌টের তখনো সন্দেহ ছিল।

এমন সময় আয়ারটন চেঁচিয়ে উঠল : 'ব্যাপার সাংঘাতিক ! স্পীডি রওনা হয়েছে !'

তখন হাওয়া ছিল দ্বীপের দিকে। স্পীডি পাল খাটিয়ে দ্বীপের দিকে আসতে লাগল। এত কাছে কামানের মুখে দ্বীপবাসীদের ভরসা কী ! বন্দুক ছুঁড়ে আর-কোনো লাভ হবে না। তাহ'লে দস্যুদের বাধা দেয়া যায় কী ক'রে ?

সাইরাস হার্ডিং গোটা ব্যাপারটা ভেবে দেখলেন। গ্র্যানাইট হাউসে অবরুদ্ধ অবস্থায় কয়েক মাস পর্যন্ত থাকা যাবে, প্রচুর রসদ মজুত আছেন ভাঁড়ারে ; কিন্তু তার পর কী হবে ? বোম্বেটেরা তো দ্বীপের মালিক হ'য়ে বসলে সবকিছু তছনছ ক'রে, ছারখার ক'রে দেবে ! এখন একটামাত্র আশা আছে। বব্ হার্ডি হয়তো প্রণালীতে ঢুকতে চেষ্টা করবে না, উপদ্বীপের বাইরেই থেকে যাবে। এত দূর থেকে কামানের গোলায় কোনো বিপদ হবে না।

কিন্তু ততক্ষণে জাহাজ উপদ্বীপের কাছে এসে হাজির হয়েছে। তারপর ধীরে-ধীরে এগুতে লাগল প্রণালীর দিকে। এতক্ষণ পরে সব কিছুই স্পষ্ট বোঝা গেল। বব্ হার্ডি প্রণালীতে ঢুকে চিমনির উপর গোলা ছোঁড়বার মৎলব এঁটেছে।

দেখতে-দেখতে স্পীডি এসে মার্সি নদীর মুখে দাঁড়ালে। গিডিয়ন স্পিলেট দেখতে পেলেন, সেখানে থাকলে বিষম শোচনীয় অবস্থার সম্ভাবনা, তাই নেব্‌কে নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি চিমনিতে অন্য সকলের কাছে ফিরে এলেন। তাঁরা পাহাড়ের আড়ালে-আড়ালে চ'লে এসেছিলেন ব'লে কোনোরকমে শত্রুর গুলির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন।

তাঁদের দেখেই হার্ডিং বললেন : 'আমরা লুকিয়ে-লুকিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে গিয়ে আশ্রয় নেবো ঠিক করেছি।'

স্পিলেট বললেন : 'তবে আর দেরি কেন ? শিগগিরই চলুন।'

সবাই চিমনি ছেড়ে চললেন। পাথরের দেয়ালের একটা বাঁকের আড়ালে থাকার দরুন জাহাজের লোকেরা তাঁদের দেখতে পেলে না। লিফ্‌টে উঠে গ্র্যানাইট হাউসের ভিতর ঢুকতে পুরো এক মিনিটও লাগল না। টপ আর জাপকে আগেই গ্র্যানাইট হাউসে বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। সবাই জানলার লতাপাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন, স্পীডি ক্রমশ প্রণালীর ভিতরে আসছে আর অবিরাম গোলা চালিয়ে চলেছে। ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে চিমনির পাথর। তাঁরা আশা করেছিলেন যে গ্র্যানাইট হাউস হয়তো বোম্বেটেদের নজর এড়িয়ে যাবে। সাইরাস হার্ডিং ভাগ্যিশ বুদ্ধি ক'রে লতাপাতা দিয়ে জানলাগুলো বন্ধ করেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা গোলা এসে গ্র্যানাইট হাউসের জানলায় লাগল।

চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফ্‌ট : 'সর্বনাশ ! ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে !'

হয়তো-বা বোম্বেটেরা দ্বীপবাসীদের দেখতে পায়নি। অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণের দরুনই একটা গোলা আচমকা এসে জানলায় লেগেছে। এমন সময় হঠাৎ একটা তীব্র গভীর গর্জন, তার সঙ্গে-সঙ্গেই ভয়ানক আর্তনাদ শুনতে পাওয়া গেল। সবাই ছুটে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন, জাহাজটা জলস্তম্ভের মতো একটা জিনিশের উচ্চণ্ড আক্ষেপে হঠাৎ উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে ফেটে দু-ভাগ হ'য়ে গেছে।

দশ সেকেণ্ডের মধ্যে স্পীডি খুনে বোম্বেটেদের নিয়ে অতল সমুদ্রগর্ভে ডুবে গেল।

বিস্ময়ে গোল হ'য়ে গেল হার্বার্টের চোখ । অবাক গলায় সে বললে, 'স্পীডি উড়ে গেল !'

তক্ষুনি পেনক্র্যাফ্‌ট আর নেবের সঙ্গে সমুদ্রতীরের দিকে রওনা হ'য়ে পড়ল হার্বার্ট । এই ব্যাপারটা এত আকস্মিক, এত অকল্পনীয়ভাবে সংঘটিত হ'ল যে কেউ তখনো গোটা ব্যাপারটা ঠিক-ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না । অন্য-সকলেও সংবিৎ ফিরতেই পেনক্র্যাফ্‌টের সঙ্গে চললেন । সমুদ্রতীরে পৌঁছে দেখা গেল, স্পীডির কোনো চিহ্নই নেই সমুদ্রে । ব্যাপারটা আগাগোড়া তখনও সকলের বোধগম্য হ'তে চাইছিল না ।

এমন সময় স্পিলেট প্রশ্ন করলেন : 'নৌকোটা ভেঙে যাওয়ার পর সেই ছ-টা বোম্বেটে যে মার্সির তীর দিয়ে পালিয়েছিল, তারা কোথায় ?' সবাই তখন সেইদিকে তাকালেন । কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না । হয়তো তারা তাদের জাহাজটার দুর্দশা দেখে দ্বীপের ভিতরে পালিয়ে গেছে ।

হার্ডিং বললেন : 'ওদের কথা পরে ভাবা যাবে । ওদের হাতে বন্দুক আছে—এইটে ভারি সাংঘাতিক কথা । যাক, ওরাও ছ-জন—আমরাও ছ-জনই—সমান-সমান আছি দু-দলই । কিন্তু ব্যাপারটা ভারি অপ্রত্যাশিত । ঠিক যেন অলৌকিক !'

'অলৌকিক ব'লে অলৌকিক !' বললে পেনক্র্যাফ্‌ট : 'বোম্বেটেগুলো ঠিক সময়টাতেই ধ্বংস হয়েছে, নইলে গ্র্যানাইট হাউসে আর বেশিক্ষণ থাকা যেত না !'

স্পিলেট বললেন : 'আচ্ছা পেনক্র্যাফ্‌ট, ব্যাপারটা ঘটল কী ক'রে বলো তো ?'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'কারণটা খুব সহজ । বোম্বেটে-জাহাজের তো আর যুদ্ধ-জাহাজের মতো আইনকানুন নেই ! পলাতক কয়েদির দল তো আর শিক্ষিত নাবিক নয় ! বারুদের ঘরটা ছিল খোলা, আর গুলি ছোঁড়বার সময় কখন হয়তো কোনো অসতর্ক লোকের হাত থেকে তাতে আগুন প'ড়ে গিয়েছিল । এ ছাড়া আর-কী কারণ থাকতে পারে ?'

হার্ডিং বললেন : 'আসল ব্যাপারটা বোধহয় আমরা ভাঁটার সময় জানতে পারবো । তখন তো ভাঙা জাহাজটা ভেসে উঠবে জলের উপর । একটু অপেক্ষা ক'রেই দেখা যাক ।'

ইতিমধ্যে সবাই গ্র্যানাইট হাউসে গিয়ে খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে আবার সমুদ্রতীরে ফিরে এলেন । স্পীডির কাঠামোটা আস্তে-আস্তে ভাসতে শুরু করল । কাৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে জাহাজটা । তলাটা আগাগোড়া দেখতে পাওয়া যায় । জলের নিচে কী-যে একটা বিরাট তাণ্ডবের ক্রিয়া হয়েছিল, তা বোঝবার সাধ্য নেই । সেই শক্তিই জাহাজটাকে কাৎ ক'রে উপরে জলস্তম্ভ রূপে প্রকাশ পেয়েছিল । সবাই জাহাজের চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগলেন ।

ভাঁটার সঙ্গে ক্রমে জাহাজটা ভেসে উঠলে পর সবাই, দুর্ঘটনার কারণটা না-হোক ফলটা দেখতে পেলেন । জাহাজের গলুইয়ের দিকে মুখ থেকে সাত-আট ফুট নিচে জাহাজের শরীরটার দু-পাশই চুরমার হ'য়ে গেছে । গলুই থেকে শুরু ক'রে জাহাজের সমস্ত মেরুদণ্ড ফেটে জাহাজের শরীর থেকে আলাদা হ'য়ে গেছে । প্রায় কুড়ি ফুট জায়গা জুড়ে এত-বড়ো ফুটো হয়েছে যে সে-ফুটো বন্ধ করা অসম্ভব । শুধু-যে তামার পাত আর তক্তা উড়ে গেছে তা নয়, পাতগুলোর আর মোটা-মোটা পেরেকগুলোরও কোনো অস্তিত্ব নেই । পেনক্র্যাফ্‌ট আর আয়ারটন পরীক্ষা ক'রে বললে যে জাহাজটাকে আর জলে ভাসানো

অসম্ভব। ততক্ষণে আরো জেগেছে জাহাজ। এবার সহজেই যাওয়া যাবে ডেকের উপরে। সবাই কুড়ুল হাতে ক'রে ডেকের উপরে গিয়ে উঠলেন। চুরমার হ'য়ে গেছে ডেক। নানান ধরনের বাক্স, প্যাকিং কেস ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। বেশিক্ষণ জলের নিচে থাকেনি ব'লে ভিতরের জিনিশপত্র শুকনো হওয়ারই কথা।

সবাই তখন মালপত্র নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনতে লাগলেন। অনেক দেরি আছে জোয়ারের। তার মধ্যেই সব কাজ গুছিয়ে নিতে হবে। আয়ারটন আর পেনক্র্যাফ্‌ট খুঁজতে-খুঁজতে একটা কপিকল আর দড়ি পেলে। তারই সাহায্যে বড়ো-বড়ো সিন্দুক আর পিপে নৌকোয় চালান ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'ল। জাহাজে জিনিশ ছিল নানান রকমের। বাসনকোশন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অজস্র রকম জিনিশ ছিল স্পীডিতে। এতসব জিনিশ দেখে সকলের আনন্দের সীমা রইল না। হার্ডিং কিন্তু একটা জিনিশ লক্ষ ক'রে ভারি অবাক হলেন। শুধু জাহাজের গলুইয়ের দিকটাই যে চুরমার হয়েছে তাই নয়, গলুইয়ের দিকে ভিতরের সবকিছুই নষ্ট হ'য়ে গেছে। দেখলেই মনে হয়, জাহাজের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা 'বমশেল' ফেটে গিয়েছে।

ক্রমে জাহাজের পিছনের দিকে গেলেন সবাই। আয়ারটনের কথামতো সেখানেই বারুদ-ঘরটা থাকার কথা। সাইরাস হার্ডিং আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বারুদ-ঘরে আগুন লাগেনি, বারুদের পিপেগুলো ব্যবহারের উপযুক্ত আছে। সচরাচর কোনো লাইনিং-দেওয়া বাক্সের মধ্যেই থাকে বারুদ, যাতে সহজে নষ্ট হ'তে না-পারে। বারুদ-ঘরের রাশি-রাশি গোলাবারুদের মধ্য থেকে বিশটা বারুদের পিপে বার করা হ'ল। পিপেগুলোর সবকটাই তামার লাইনিং দেয়া। পেনক্র্যাফ্‌ট বুঝতে পারলে, বারুদ-ঘর ফেটে স্পীডি ধ্বংস হয়নি, বরং বারুদ-ঘর যেখানে ছিল সেই জায়গাটারই ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে কম।

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে: 'বারুদ-ঘর তো আস্তই আছে দেখছি; তবে দুর্ঘটনাটা কী ক'রে হ'ল শুনি? আমি এ-কথা নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে প্রণালীর জলে লুকোনো পাহাড়টাহাড় কিচ্ছু নেই। আমার মনে হয়, এই আশ্চর্য পরিত্রাণের আসল রহস্য আমরা কোনোদিনই বুঝতে পারবো না।'

অনুসন্ধানে বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গিয়েছিল তাদের। এদিকে জোয়ার এসে গেল। এখন সব কাজ বন্ধ রাখতে হবে। জাহাজ জোয়ারের টানে ভেসে যাবে না, কেননা খুব গভীরভাবে তা ব'সে গিয়েছে। সুতরাং ভাবনার কিছুই রইল না; পরদিন এসে ফের কাজ শুরু করলেই চলবে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হ'ল, আর-কোনোমতেই উদ্ধার করা যাবে না জাহাজটা। কাজে-কাজেই, যত শিগগির পারা যায় জাহাজের বাকি সরঞ্জামগুলো বাঁচাতে হবে।

তখন বিকেল পাঁচটা। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে। সুতরাং সবাই খাওয়াদাওয়া সেরে নিলেন সব-আগে। জাহাজের মালগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন সবাই। বেশির ভাগ বাক্সর মধ্যেই পোশাক-আশাক পাওয়া গেল, জুতো-মোজাও পাওয়া গেল। দেখে সবাই খুশি হ'য়ে উঠলেন। পিপে-পিপে গুলি-বারুদ, রাশি-রাশি বন্দুক, পিস্তল, চাষবাসের জিনিশ, ছুতোরের যন্ত্রপাতি, ফসলের বীজ-ভরা বাক্স—কত-কী! আর সবই যেন একেবারে টাটকা। অল্প-কিছুক্ষণ জলের নিচে থাকায় কিছুই নষ্ট হয়নি। গ্র্যানাইট

হাউসের ভাঁড়ারে জায়গার অভাব নেই, কিন্তু সারাদিন খেটেও এত-সব জিনিশ ভাঁড়ারে তোলা যাবে না। চিমনিতে এনেই রাখা হয়েছিল মালপত্র ; রাত্রে সেগুলোকে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল। সবাই পালা ক'রে সারা রাত পাহারার কাজে ব্যস্ত রইলেন। পাহারার কারণ হ'ল, স্পীডির ছ-জন বোম্বেটে যে দ্বীপের অরণ্যে লুকিয়ে আছে, তাদের কথা তো ভুলে গেলে চলবে না!

উনিশে, বিশে আর একুশে অক্টোবর—এই তিন দিন ওই ভাঙা জাহাজ থেকে দরকারি জিনিশপত্র সংগ্রহ করতেই কেটে গেল। স্পীডির কল্যাণে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের অস্ত্রাগার পূর্ণ হ'ল। গ্র্যানাইট হাউসের ভাঁড়ার জিনিশপত্রে ভ'রে গেল। স্পীডির কামান চারটেও উদ্ধার করা সম্ভব হ'ল। পেনক্র্যাফ্‌টের উৎসাহের শেষ নেই। এর মধ্যেই ঠিক ক'রে ফেললে, গ্র্যানাইট হাউসে কামান চারটে বসিয়ে নেবে, আর তাহ'লে ভবিষ্যতে কোনো জাহাজের সাধ্য হবে না দ্বীপের সামনে আসতে।

মালপত্র সমস্ত জাহাজ থেকে নামানোর পর, তেইশে অক্টোবর রাত্রের দুর্যোগে বাকি জাহাজটা ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। সেজন্যে অবশ্য কারুই আপশোশের কোনো কারণ ছিল না।

স্পীডি জাহাজের দুর্ঘটনার পর, ভাঁটার সময়েও দুর্ঘটনার নিগূঢ় রহস্যের কোনো কারণ বোঝা যায়নি। রহস্যটা হয়তো অজ্ঞাতই র'য়ে যেতো, কিন্তু তিরিশে নভেম্বরের একটা ঘটনায় তার নিষ্পত্তি হ'য়ে গেল।

নেব্‌ সমুদ্র-সৈকত দিয়ে আসছিল। পথে লোহার একটা মোটা চোঙা দেখতে পেল, তাতে বিস্ফোরণের চিহ্ন রয়েছে। হার্ডিং অন্য সকলের সঙ্গে চিমনিতে ব'সে কাজ করছিলেন। এমন সময় নেব্‌ সেই চোঙাটা সেখানে এনে হাজির করলে।

গভীর কৌতূহলের সঙ্গে নেবের হাত থেকে চোঙাটা নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন সাইরাস হার্ডিং। ক্রমশ তাঁর মুখে মেঘ জমতে লাগল। সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে তিনি বললেন: 'স্পীডির ধ্বংসের কারণ এবার বোঝা গেল। এই চোঙাটাই সেই অদৃশ্য কারণ।'

'এই চোঙাটা স্পীডির ধ্বংসের কারণ!' অবাক হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফ্‌ট।

'হ্যাঁ, কেননা—' গম্ভীর কণ্ঠে হার্ডিং বললেন: 'চোঙাটা একটা টর্পেডোর অবশিষ্ট অংশ।'

স্তম্ভিত হ'য়ে সবাই সমস্বরে ব'লে উঠলেন: 'টর্পেডোর অংশ!'

'হ্যাঁ,' বললেন হার্ডিং: 'টর্পেডোটা কে জাহাজের তলা লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়েছিল, এই প্রশ্ন করলে উত্তরে শুধু এই বলতে পারি যে, আমি ছুঁড়িনি। কিন্তু এটা কেউ-না-কেউ ছুঁড়েছিল, এবং দ্বীপে এক অতুলনীয় শক্তির পরিচয়ও তোমাদের অজানা নেই। এর দৌলতেই বোম্বেটেদের হাত থেকে আশ্চর্যভাবে পরিত্রাণ পেয়েছি আমরা।'

২
হার্বার্ট আহত

টর্পেডোটা দেখে বিস্ফোরণের সব বিষয় পরিষ্কার হ'য়ে গেল। আমেরিকার লড়াইয়ের সময় সাইরাস হার্ডিং নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, টর্পেডোর ধ্বংসকারী শক্তি কীরকম সাংঘাতিক! এই শক্তির দরুনই প্রণালীর জলে সৃষ্টি হয়েছিল অসংখ্য উচ্চণ্ড জলস্তম্ভের। জাহাজের তলাটা চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে পলকের মধ্যে সেটাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। যে-টর্পেডো বিশাল যুদ্ধ-জাহাজকে চোখের নিমেষে ধ্বংস ক'রে ফ্যালে, তার কাছে স্পীডি তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ একটা বস্তু মাত্র।

হ্যাঁ, নিষ্পত্তি হ'ল বিস্ফোরণ রহস্যের। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, জলে টর্পেডো এলো কী ক'রে?

সাইরাস হার্ডিং গম্ভীর স্বরে সবাইকে বললেন: 'লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে আমাদের হিতৈষী একজন কেউ যে গোপনে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই রইল না এখন। এই নিয়ে কতবার যে তিনি আমাদের রক্ষা করলেন, তারও ইয়ত্তা নেই। এমনভাবে লুকিয়ে থেকে আমাদের উপকার করবার যে কী উদ্দেশ্য তাঁর, তা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আয়ারটনও তাঁর কাছে বিশেষ ঋণী। বোতলে যে-চিঠিতে আয়ারটনের আর টেবর আইল্যাণ্ডের অবস্থান জানিয়ে দেয়া ছিল, তা তাঁরই কাজ। বেলুন থেকে যখন প'ড়ে গিয়েছিলুম, তখন তিনিই ঢেউয়ের মধ্য থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। ফ্লোটসাম পয়েণ্টে মালপত্র-ভরা সিন্দুকটি তিনিই রেখেছিলেন। পিকারির পেটে যে-গুলি পাওয়া গিয়েছিল, সেও তাঁর কাজ। প্রসপেক্ট হাইটের উপরেও তিনিই আগুন জ্বালিয়েছিলেন। এককথায়, এ পর্যন্ত যতগুলো অলৌকিক, রহস্যময় ঘটনা দ্বীপে ঘটেছে, যা দেখেশুনে আমরা তাজ্জব হ'য়ে গেছি সমস্তই তাঁর কাজ। তিনি যেই হোন না কেন, আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর ঋণ আমাদের শোধ করা কর্তব্য।'

'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন ক্যাপ্টেন,' বললেন স্পিলেট: 'এই অপরিচিত উপকারীর ক্ষমতা অমানুষিক! গ্র্যানাইট হাউসের কুয়োর মধ্য দিয়ে উঠেই কি ইনি আমাদের কথাবার্তা পরামর্শ সব শোনেন? সিন্ধুঘোটকটাকে মেরে ইনিই কি টপকে বাঁচিয়েছিলেন? আপনাকেও কি উদ্ধার করেছিলেন ইনি? সব দেখে-শুনে তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তাহ'লে কি ইনি আমাদের মতো রক্তমাংসের মানুষ?'

হার্ডিং বললেন: 'হ্যাঁ, সত্যিই এঁর ক্ষমতা অতিমানবিক। এখনো অবশ্য অনেক রহস্য জানতে বাকি আছে। এঁর সন্ধান করতে পারলে সবকিছুই স্পষ্ট হবে। এখন কথা হচ্ছে, এই উপকারী বন্ধুটিকে কি খুঁজে বার করা উচিত? না, তাঁর ইচ্ছেমতো তাঁকে গোপনে থাকতে দেওয়াই কর্তব্য? তোমরা কী বলো?'

নেব্ বললে: 'আমার মনে হয়, তাঁর যখন ইচ্ছে হবে তখন তিনি নিজেই দেখা দেবেন। তা না-হ'লে হাজার খুঁজেও আমরা তাঁর দেখা পাবো না।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বললেন স্পিলেট : 'কিন্তু তাই ব'লে আমরা তাঁকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবো না কেন ? তাঁর দেখা হয়তো পাবো না, কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করা হবে ।'

এবার আয়ারটন কথা বলল । সে বললে : 'আমার মনে হয়, এই অজ্ঞাত ব্যক্তিকে তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে বার করা উচিত । হয়তো তিনি একলা থাকার দরুন কষ্ট পাচ্ছেন।'

'তবে এই কথাই ঠিক হ'ল,' বললেন হার্ডিং : 'যত-শিগগির-সম্ভব তাঁকে খুঁজতে শুরু করবো । দ্বীপের কোনো জায়গাই বাকি রাখব না । গুহা, গহ্বর—সবখানেই খুঁজে দেখবো ।'

এরপর কিছুদিন সবাই চাষবাসে মন দিলেন । আর পেনক্র্যাফ্‌ট গ্র্যানাইট হাউসের সামনে কামান চারটে বসানোর জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল । তার অনুরোধে কপিকলের সাহায্যে কামান চারটে গ্র্যানাইট হাউসে তুলে নেয়া হয়েছিল । জানলাগুলোর মাঝখানে ফুটো ক'রে কামান বসানোর ঘর করা হ'ল । কামানগুলোকে ঘ'ষে-মেজে পরিষ্কার ক'রে সাজানোর পর গ্র্যানাইট হাউস যেন রীতিমতো একটা দুর্গ হ'য়ে উঠল ।

আটই নভেম্বর কামানগুলোর পাল্লা কতদূর পর্যন্ত, তা পরীক্ষা ক'রে দেখবার ব্যবস্থা করা হ'ল । চারটে কামানেই বারুদ পুরে দেয়া হ'ল । অবশ্য বারুদের পরিমাণ হার্ডিংই ঠিক ক'রে দিলেন । প্রথম কামানের গুলি উপদ্বীপের উপর দিয়ে সমুদ্রে যেখানে পড়ল, সে-জায়গাটা কত দূরে তা ঠিক-ঠিক বোঝা গেল না । ফ্লোটসাম পয়েণ্টের কাছে যে-পাহাড়ের চুড়োটা ছিল, সেটা ছিল গ্র্যানাইট হাউস থেকে তিন মাইল দূরে । দ্বিতীয় কামানের গুলি সেই চুড়োটাকে চুরমার ক'রে দিল । ইউনিয়ন উপদ্বীপের কাছে যে বালিময় বেলাভূমি ছিল, সে-জায়গাটা গ্র্যানাইট হাউস থেকে ছিল বারো মাইল দূরে । তৃতীয় কামানের গুলি বেলাভূমির উপরের বালি উৎক্ষিপ্ত ক'রে সেখান থেকে লাফিয়ে সমুদ্রের জলে পড়ল । চতুর্থ কামানের গুলি পাঁচ মাইল দূরে ম্যাণ্ডিবল অন্তরীপের পাহাড়ে পাথর ভেঙে সমুদ্রের জলে পড়ল । কামানের পাল্লা দেখে সবাই খুশি হলেন । এবার আর-কোনো ভয় নেই ।

এবার সকলের প্রধান কর্তব্য হ'ল অনুসন্ধানের কাজ । এই কাজের পিছনে দুটি উদ্দেশ্য । এক নম্বর হ'ল সেই অজ্ঞাত উপকারী বন্ধুকে খুঁজে বার করা, আর দু-নম্বর হ'ল সেই সঙ্গে সেই ছ-টি বোম্বেটেরও খোঁজখবর নেয়া । অনুসন্ধানে নেহাৎ কম সময় লাগবে না । কাজে-কাজেই গাড়ি বোঝাই ক'রে রসদপত্র নিতে হবে । কিন্তু একটা ওনাগার পা খোঁড়া ছিল, দু-একদিন অপেক্ষা না-ক'রে সেটাকে দিয়ে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়, সেটাকে কয়েকদিন জিরোতে দিতে হবে । তাই বিশে নভেম্বর পর্যন্ত যাত্রা বন্ধ রাখতে হ'ল । সবাই ঠিক করলেন এ-কদিনে প্রসপেক্ট হাইটের কাজগুলো শেষ করবেন । আয়ারটনকেও একবার কোর‍্যালে যেতে হবে । সেখানে দু-দিন থেকে জন্তুগুলোর খাবারের ব্যবস্থা ক'রে আবার সে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে আসবে ব'লে ঠিক হ'ল ।

নয়ই নভেম্বর ভোরবেলা আয়ারটন কোর‍্যাল অভিমুখে যাত্রা করলে । একটা ওনাগা জুতে গাড়িটাও তার সঙ্গে নিলে । যাওয়ার আগে হার্ডিং তাকে জিগেস করেছিলেন অন্য-কাউকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে কি না । আয়ারটন কোনো সঙ্গী দরকার আছে ব'লে মনে

স্পিলেট তার হাতটা নিয়ে দেখলেন, নাড়ি খুব দ্রুত চলছে। তখন ভোর পাঁচটা। ভোরবেলাকার নরম সোনালি আলো এসে ছুঁয়েছে গ্র্যানাইট হাউসের জানলা। প্রসন্ন, পরিচ্ছন্ন দিনের পূর্বাভাস যেন আকাশে বাতাসে। কিন্তু হায়! বেচারি হার্বার্টের এইটেই বুঝি শেষ দিন। বিছানার পাশের ছোট্ট টেবিলটার উপর সূর্যের সোনালি আলো এসে পড়ল আলতোভাবে। মৃদু, কোমল হাওয়া বইছে জানলা দিয়ে।

এমন সময় পেনক্র্যাফ্‌ট অনতিস্ফুট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে টেবিলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে: সবাই দেখতে পেলেন, টেবিলের উপর ছোট্ট চৌকো একটা কাগজের বাক্স। অবাক কৌতূহল-ভরা কণ্ঠে হার্ডিং বাক্সটার উপরের আবরণের মধ্যে লেখা হরফগুলো উচ্চারণ করলেন:

'সালফেট অভ কুইনাইন!!'

৪

আরো আশ্চর্য ঘটনা

সালফেট অভ কুইনাইন!

সংবিৎ ফিরতেই বাক্সটা খুললেন গিডিয়ন স্পিলেট। ভিতরে প্রায় দুশো গ্রেন শাদা পাউডার। একটু জিভে দিয়ে দেখলেন স্পিলেট। সাংঘাতিক তেতো লাগল। আর-কোনো সন্দেহ নেই। সত্যিই পাউডারটি কুইনাইন।

স্পিলেটের নির্দেশমতো তক্ষুনি এক কাপ কফি বানিয়ে আনলে নেব্। কফিতে আঠারো গ্রেন কুইনাইন মিশিয়ে একটু চেষ্টা ক'রে খাওয়ানো হ'ল হার্বার্টকে। সকলের মনে একটু আশাও ফিরে এলো। দ্বীপের অধিদেবতা ঠিক সময়েই আবার তাঁদের সাহায্য করেছেন। সুতরাং আর তাহ'লে ভয় নেই।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অনেকটা শান্ত হ'ল হার্বার্ট। এবার সবাই এই আশ্চর্য ঘটনাটি আলোচনা করতে লাগলেন। এই ব্যাপারে অধিদেবতার হাত সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট, সবচাইতে বেশি উজ্জ্বল। কিন্তু রাত্রে কী ক'রে গ্র্যানাইট হাউসে প্রবেশ করলেন তিনি? এ-কথার কোনো জবাব নেই। লোকটি নিজে যেমন অদ্ভুত, তাঁর কাজকর্ম সবকিছুও তথৈবচ।

সারাদিন, তিন ঘণ্টা পর-পর হার্বার্টকে কুইনাইন দেয়া হ'ল।

পরদিন হার্বার্টের অবস্থার সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল। এখনো বিপদ দূর হয়নি। পালা-জ্বরটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। খুব যত্নের সঙ্গে শুশ্রূষা চলল। এবার ওষুধ আছে হাতের কাছেই, আর ভয় কীসের?

দশ দিন পরে, বিশে ডিসেম্বর থেকেই হার্বার্টের শরীরে রক্ত ফিরে আসতে লাগল।

শরীর এখনো খুব দুর্বল, কিন্তু জ্বর আর ফিরে এলো না। পেনক্র্যাফ্‌টের তখন আনন্দ

দ্যাখে কে ? তৃতীয় আক্রমণের সময়টা যখন নিরাপদেই কেটে গেল, তখন সে আনন্দে দিশেহারা হ'য়ে স্পিলেটকে এমনভাবে আলিঙ্গন করল যে স্পিলেটের দম বন্ধ হবার উপক্রম ।

ডিসেম্বর মাস শেষ হ'য়ে গেল ভালোয়-ভালোয় । আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিষ্টাব্দ শুরু হ'ল বেশ সুন্দর । আকাশ উজ্জ্বল, প্রসন্ন, পরিচ্ছন্ন—সমুদ্রের বাতাস ঠাণ্ডা, নরম, মনোরম । হার্বার্ট ধীরে-ধীরে ভালো হ'য়ে উঠছে । গ্র্যানাইট হাউসের জানলার পাশে সমুদ্রের হাওয়ায় ব'সে থাকতো সে । সেইজন্যে খিদে বাড়ল । নেব্ তার জন্যে নানান রকম পুষ্টিকর আহার্য তৈরি করতো ।

এই সময়ের মধ্যে বোম্বেটেদের একদিনও গ্র্যানাইট হাউসের ধারে কাছে দেখতে পাওয়া যায়নি । আয়ারটনেরও কোনো খবর পাওয়া গেল না । এতদিন তাঁরা হার্বার্টকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন ব'লে বেচারি আয়ারটনের জন্য কিছুই করতে পারেননি । এবার হার্বার্ট একটু সুস্থ হ'তেই আয়ারটনের জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন হার্ডিং । হার্বার্ট আর হার্ডিং-এর বিশ্বাস আয়ারটন বেঁচে আছে, কিন্তু অন্যেরা ধ'রে নিলেন যে বোম্বেটেদের হাতে নিহত হয়েছে সে । যা-ই হোক না কেন, হার্বার্ট সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে না-উঠলে এ-ব্যাপারের কোনো মীমাংসাই করা যাবে না ।

জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হার্বার্ট বিছানা থেকে উঠতে শুরু করল । প্রথম দিনে এক ঘণ্টা, দ্বিতীয় দিনে দু-ঘণ্টা, তারপর তৃতীয় দিনে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত ব'সে থাকবার অনুমতি পেলে । ক্রমে জানুয়ারির শেষ দিকে স্পিলেট তাকে প্রসপেক্ট হাইটে আর সমুদ্রতীরে বেড়াবার অনুমতি দিলেন । পেনক্র্যাফ্‌ট আর নেবের সঙ্গে গিয়ে সমুদ্রে স্নান ক'রে তার আশ্চর্য উন্নতি হ'ল ।

সাইরাস হার্ডিং ভাবলেন, এবার অনুসন্ধানে বেরুনো যেতে পারে । সেইজন্যে প্রস্তুতিও শুরু হ'য়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে । সবাই প্রতিজ্ঞা করলেন—বোম্বেটেদের সমূলে বিনাশ, আর অধিদেবতার অন্বেষণ অসম্পূর্ণ রেখে কিছুতেই গ্র্যানাইট হাউসে ফিরবেন না । মার্সি নদীর বাঁ-তীরের অরণ্য পাহাড়-পর্বত যা-কিছু আছে, তা আগেই দেখা হয়েছে । কিন্তু ডানদিককার জায়গাগুলো—ক্ল অন্তরীপ থেকে শুরু ক'রে রেপ্টাইল য়েণ্ড পর্যন্ত—ভালো ক'রে দেখা হয়নি । তাই ঠিক হ'ল, মার্সি নদীর ডান তীরে যত বন-জঙ্গল আর পর্বতের গুহা-গহ্বর আছে —সব আঁতিপাতি ক'রে না-খুঁজে ক্ষান্তি দেয়া চলবে না ।

ওনাগাদুটি বিশ্রাম পেয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে । রসদপত্র, বাসনকোশন, একটা স্টোভ —সবকিছুই গাড়িতে বোঝাই করা হ'ল । বোম্বেটেরা যে স্বাধীনভাবে বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে—সে-কথা ভুলে গেলে চলবে না । এই গভীর গহন অরণ্যের মধ্যে গুলি দু-পক্ষই চালাতে পারে । সুতরাং দ্বীপবাসীদের দলবদ্ধ হ'য়ে চলতে হবে, ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেলে চলবে না । এও ঠিক হ'ল যে, গ্র্যানাইট হাউসে কেউ থাকবে না । টপ আর জাপও যাবে দলের সঙ্গে । দুর্ভেদ্য গ্র্যানাইট হাউসে পাহারার কোনো দরকার নেই ।

চোদ্দই ফেব্রুয়ারি, যাত্রার আগের দিন ।

সেদিন ছিল রবিবার । সেদিনটা সবাই জিরোলেন ; হার্বার্টের জন্যে জায়গা ঠিক হ'ল গাড়ির ভিতরে, কারণ সে সুস্থ হ'য়ে উঠলেও তার শারীরিক দুর্বলতা অপগত হয়নি । পরদিন ভোরবেলা লিফ্‌ট্‌টা টুকরো-টুকরো ক'রে তুলে রাখা হ'ল। যে-সিঁড়িটা ছিল, সেটা

চিমনিতে নিয়ে গিয়ে মাটিতে গর্ত ক'রে পুঁতে রাখা হ'ল—ফিরে এসে যাতে সেটা সহজে পেতে পারেন।

সবাই গ্র্যানাইট হাউস থেকে ইতিপূর্বেই নেমে এসেছিলেন, সেখানে ছিল শুধু পেনক্র্যাফ্‌ট। সে তার কাজকর্ম শেষ ক'রে মোটা একটা দড়ি বেয়ে সকলের শেষে এসে নামলে।

চিমনির সামনে সমুদ্রতীরে গাড়িটা অপেক্ষা করছিল। হার্বার্ট প্রথম কয়েক ঘণ্টা গাড়িতেই যাবে। তবে, সে জাপকে তার পাশে বসিয়ে নিলে। জাপ অবিশ্যি তাতে কোনো আপত্তিই করলে না।

মার্সি নদীর বাঁক পেরিয়ে গাড়ি প্রথমে বাঁ-তীর দিয়েই এক মাইল পথ গেল। সেখানে সেতুটি পেরিয়ে অরণ্যের গহনে প্রবেশ করল। সুদূর পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত সেই অরণ্য। কুড়ুল দিয়ে অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে-ক'রে সবাই চলতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে তাঁদের আসার সঙ্গে-সঙ্গে নানান জাতের পাখি, এবং ফ্ল্যাগুটি, ক্যাপিবরা, ক্যাঙারু প্রভৃতি জন্তু ডেকে-ডেকে পালিয়ে যেতে লাগল।

সাইরাস হার্ডিং বললেন: 'জন্তুগুলোকে আগে যেমন দেখেছিলুম, এখন যেন তার চেয়ে ভিতু হয়েছে। সুতরাং এ-পথে নিশ্চয়ই বোম্বেটেরা যাওয়া-আসা করেছে। নিশ্চয়ই তাদের কিছু-না কিছু চিহ্ন পাওয়া যাবে।'

সত্যিই, জায়গায়-জায়গায় দেখে মনে হ'ল—যেন লোকজন সে-পথে গিয়েছে। ডালপালা ভাঙা, কোথাও-বা নরম মাটিতে পদচিহ্ন, আবার কোনোখানে প'ড়ে আছে ছাই। কিন্তু কোথাও একটা রীতিমতো আড্ডার জায়গা দেখা গেল না। সাইরাস হার্ডিং সবাইকে শিকার করতে বারণ করলেন। বন্দুকের আওয়াজ শুনলে বোম্বেটেরা হুঁশিয়ার হ'য়ে যাবে। তা ছাড়া শিকার করতে হ'লেই গাড়ি ছেড়ে দূরে যেতে হবে। হার্বার্টের গাড়ি নিঃসহায় রেখে যাওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রথম দিন সন্ধের আগে গ্র্যানাইট হাউস থেকে ন-মাইল দূরে একটা ঝরনার ধারে রাত্রি-বাসের ব্যবস্থা করা হ'ল। ঝরনাটা গিয়ে পড়েছে মার্সি নদীতে। এই ঝরনাটার কথা আগে জানা ছিল না। সারাদিনের পরিশ্রমে সাংঘাতিক খিদে পেয়েছিল। সবাই খুব তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন। এবার রাত্রিটা যাতে নিরাপদে কেটে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু বুনো জানোয়ারের কথা হ'লে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে ঘুমোলেই যথেষ্ট হ'ত। কিন্তু বোম্বেটেদের চিন্তাটাই বেশি, সুতরাং আগুন জ্বাললে ফল হবে বিপরীত। আগুন দেখে ভয় পাওয়া দূরে যাক, তারা আরো অতর্কিত আক্রমণের সুবিধের জন্যে উৎসাহিত হ'য়ে উঠবে। এমন অবস্থায় সতর্ক পাহারার প্রয়োজন। ঠিক হ'ল, এক দলে স্পিলেট আর পেনক্র্যাফ্‌ট, অন্য দলে হার্ডিং আর নেব্‌ পাহারা দেবেন।

নিরাপদেই কেটে গেল রাতটা। পরদিন ষোলোই ফেব্রুয়ারি আবার রওনা হলেন সবাই। বোম্বেটেদের আরো-কিছু চিহ্ন পাওয়া গেল। এক জায়গায় দেখা গেল সদ্য-নেবানো আগুনের অবশিষ্ট। তার আশপাশে মাটিতে পদচিহ্ন। গুনে দেখা গেল, পাঁচজনের পায়ের দাগ। ষষ্ঠ ব্যক্তির পায়ের দাগ নেই।

'তাহ'লে দেখা যাচ্ছে,' বললে হার্বার্ট: 'আয়ারটন তাদের সঙ্গে ছিল না।'

'না,' বললেন পেনক্র্যাফ্‌ট : 'আর তাদের সঙ্গে ছিল না ব'লেই বোঝা যাচ্ছে যে শয়তানরা ওকে হত্যা করেছে। শয়তানগুলোর যদি একটা নির্দিষ্ট কোনো আস্তানা থাকতো, আর সেখানে একবার গিয়ে হাজির হ'তে পারতুম—'

'কিন্তু এই প্রতিশোধে তো আয়ারটনকে ফিরিয়ে আনা যাবে না ! ষষ্ঠ পদচিহ্ন যখন দেখা গেল না, তখন, ঈশ্বর, আয়ারটনকে দেখবার আশা বুঝি-বা ছাড়তে হয় !'

সেদিন সন্ধের আগে গ্র্যানাইট হাউস থেকে চোদ্দ মাইল দূরে সবাই রাত কাটালেন। হার্ডিং হিশেব ক'রে দেখলেন, রেপ্টাইল য়েণ্ড আরো পাঁচ মাইল দূরে । পরদিন সবাই একেবারে শেষ সীমায় গিয়ে হাজির হলেন । গোটা অরণ্য ঘুড়ে দেখা হয়েছে । কিন্তু বোম্বেটেদের আস্তানা দেখতে পাওয়া গেল না । দ্বীপের গুপ্ত অধিদেবতার বাসস্থানটিও অজ্ঞাতই থেকে গেল ।

পরদিন আঠারোই ফেব্রুয়ারি রেপ্টাইল য়েণ্ড আর নদীধারার মধ্যবর্তী অরণ্য-অঞ্চল খুব ভালো ক'রে খুঁজে দেখা হ'ল, কিন্তু বোম্বেটেদের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না ।

সাইরাস হার্ডিং বললেন, 'বোম্বেটেরা তাহ'লে গেল কোন্ দিকে !'

'আমার মনে হয়,' বললেন পেনক্র্যাফ্‌ট : 'তারা আবার কোর‍্যালেই ফিরে গেছে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' বললেন হার্ডিং, 'কারণ তারা জানে যে আমরা তাদের খুঁজে-খুঁজে কোর‍্যালেও যেতে পারি । কোর‍্যালটা তো তাদের শুধু ভাঁড়ার । সেখানে দিন কাটানোর মৎলব তাদের একটুও নেই ।'

স্পিলেট বললেন : 'আমারও তা-ই মনে হ'ল । মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের কোথাও কোনো গুহার মধ্যেই নিশ্চয়ই তাদের আস্তানা ।'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'তাহ'লে আর দেরি কেন ? চলুন, কোর‍্যালেই যাওয়া যাক।'

'না,' বললেন হার্ডিং : 'শুধু তো বোম্বেটেদের আস্তানা বার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, পশ্চিম তীরের বনে-পর্বতে অধিদেবতার সন্ধানও করতে হবে ।'

সেদিন বিকেলে নদীর কাছেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা হ'ল ।

উনিশে ফেব্রুয়ারি সবাই সমুদ্রতীর ছেড়ে নদীর বাঁ-দিকের তীর ধ'রে চললেন । মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন এখান থেকে ছ-মাইল দূরে । নদীর উপত্যকা খুব ভালো ক'রে দেখতে-দেখতে খুব হুঁশিয়ার হ'য়ে কোর‍্যালের দিকে অগ্রসর হওয়াই ছিল হার্ডিং-এর মৎলব । কোর‍্যালটা যদি দস্যুরা দখল ক'রে থাকে, তবে দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে । আর যদি কোর‍্যাল ফাঁকা থাকে তবে কোর‍্যালেই বাস করা হবে ব'লে ঠিক হ'ল, কেননা সেখান থেকে মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনে অনুসন্ধান চালানো বেশি সুবিধের ।

মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের খুব-বড়ো দুটি শাখার মধ্যকার সংকীর্ণ উপত্যকাটি ধ'রে তাঁরা চললেন । চারদিকে উঁচু পাথরের স্তূপ । জমি অত্যন্ত এবড়ো-খেবড়ো । ইচ্ছে করলে আশপাশে একাধিক লোক লুকিয়ে থাকতে পারে । খুব সতর্ক হ'য়ে চললেন সবাই । বিকেল পাঁচটার সময় কোর‍্যালের বেড়া দেখতে যাওয়া গেল । কিন্তু কোর‍্যালে যাওয়ার আগে ভালো ক'রে খবর নিতে হবে সেখানে লোক আছে কি না । দিনের আলোয় সে-চেষ্টা করা বিপজ্জনক । এইভাবেই আহত হয়েছিল হার্বার্ট । কাজে-কাজেই রাত্রির ঘন অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে ।

রাত আটটার সময় স্পিলেট পেনক্র্যাফ্‌টের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে তৈরি হ'লেন। হার্ডিং ব'লে দিলেন : 'তোমরা খুব হুঁশিয়ার হ'য়ে, সবকিছু বিবেচনা ক'রে, কাজ কোরো। মনে রেখো, তোমরা শুধু দেখতে যাচ্ছো কোর‍্যালে লোক আছে কি নেই ; সেটা দখল করতে যাচ্ছো না।'

তারপর দুজনে যাত্রা করলেন। গাছের নিচে গাঢ় অন্ধকার। দশ-পনেরো হাত দূরের কিছুই দেখা যায় না। একটু শব্দ হ'লেই তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন। এইভাবে খুব সাবধান হ'য়ে দুজনে এগুতে লাগলেন। ক্রমশ তাঁরা অরণ্যের পরের খোলা জায়গাটায় এলেন–এর পর থেকে শুরু হয়েছে কোর‍্যালের বেড়া। এখানে এসেই তাঁরা থেমে দাঁড়ালেন। আর ত্রিশ ফুট দূরেই কোর‍্যালের দরজা। দূর থেকে মনে হ'ল দরজা যেন বন্ধ রয়েছে।

এই ত্রিশ ফুট জায়গা পেরুনোই সবচেয়ে বিপজ্জনক। সত্যি, বেড়ার ভিতর থেকে যদি দু-তিনটে বন্দুকের গুলি ছুটে আসে তাহ'লে বিপদের সম্ভাবনা। এমন অবস্থায় খুব বিবেচনা ক'রে কাজ করা চাই।

উত্তেজনায় সাত-পাঁচ না-ভেবেই এগুতে যাচ্ছিল পেনক্র্যাফ্‌ট, কিন্তু স্পিলেট তার হাত ধ'রে বাধা দিলেন। ফিশফিশ ক'রে বললেন, 'আরেকটু পরেই ঘুটঘুটে অন্ধকার হবে, তখন এই জায়গাটা পেরুবার চেষ্টা করবো।'

আস্তে-আস্তে আরো ঘন হ'ল অন্ধকার। স্পিলেট আর পেনক্র্যাফ্‌ট বন্দুক-হাতে বুকে হেঁটে কোর‍্যালের দিকে এগুলেন। কোর‍্যালের দরজার কাছে এলে দেখা গেল, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তাঁরা জানেন দস্যুরা কোর‍্যালের ভিতরেই আছে। বেড়ার ভিতরে কোনো শব্দ নেই। কোর‍্যাল একেবারে নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ। তাঁরা ভাবতে লাগলেন বেড়া পেরিয়ে ভিতরে যাবেন কিনা। কিন্তু তাহ'লে যে হার্ডিং-এর কথা মানা হয় না! কাজেই হার্ডিং-এর কাছে ফিরে যাওয়াই তাঁরা কর্তব্য ব'লে মনে করলেন। সন্তর্পণে ফিরে এসে তাঁরা হার্ডিংকে সবকিছু খুলে বললেন।

সব শুনে একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন হার্ডিং, তারপর বললেন : 'তবে আর দেরি নয়, চলো কোর‍্যালে। গাড়িটাও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। কেননা, গাড়িতে আমাদের সব জিনিশপত্র রয়েছে। তাছাড়া দরকার হ'লে গাড়িটাকে একটা ঢাল হিশেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।'

তখন গাড়ি নিয়ে সবাই কোর‍্যালের দিকে চললেন। ঘন ঘাসের উপর দিয়ে চলছিলেন ব'লে কোনো শব্দই হ'ল না। অন্ধকার তখন আরো ঘন হয়েছে। জাপ চলল সবার পিছনে। টপের গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে নেব্‌ চলল সবার আগে-আগে।

নিঃশব্দ পায়ে নিরাপদে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে এসে সবাই কোর‍্যালের বেড়ার কাছে এসে হাজির হ'লেন। সেখানে জাপ আর টপকে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে অন্য-সবাই দরজার দিকে চললেন। গিয়ে দেখলেন, দরজাটা একেবারে খোলা। সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন।

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, একটু আগে দরজা বন্ধ দেখে গেছি!'

ভাবনার কথা। বিপদেরও। দস্যুরা তাহ'লে কোর‍্যালের মধ্যেই আছে!

সম্ভবত কেউ-একজন দরজা খুলে বাইরে গিয়েছে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী ক'রে বোঝা যাবে। এদিকে হার্বার্ট একটু ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। সে দ্রুত পায়ে ফিরে এসে হার্ডিং-এর হাত চেপে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে: 'ভিতরে একটা আলো!'

'ঘরের মধ্যে?'

'হ্যাঁ।'

তখন পাঁচজনেই এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, ঘরের জানলা দিয়ে ক্ষীণ, কম্পিত একটা আলোকরেখা এসে পড়েছে বাইরে। হার্ডিং ফিশফিশ ক'রে বললেন: 'এইই আমাদের সুযোগ। দস্যুরা ঘরের মধ্যে একসঙ্গে রয়েছে। জানতেও পারেনি যে আম'রা এসেছি। এখন তো তারা হাতের মুঠোয়। এগিয়ে চলো সবাই!'

তখন দু-ভাগ হ'য়ে—এক দলে হার্ডিং পেনক্র্যাফ্‌ট আর স্পিলেট, অন্য দলে হার্বার্ট আর নেব্—সবাই কোর‍্যালের বেড়া ধ'রে-ধ'রে এগুলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুটিরের বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে হাজির হলেন সবাই। হার্ডিং শব্দহীন পায়ে চুপি-চুপি এগিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারলেন। ভিতরের একটা টেবিলে আলো জ্বলছে। টেবিলের পাশেই আয়ারটনের সেই বিছানা। বিছানার উপরে কে-একজন শুয়ে আছে।

হঠাৎ হার্ডিং পিছনের দিকে হ'ঠে এসে নিচু, উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন: 'আয়ারটন!' তক্ষুনি সজোরে দরজা খুলে সবাই ভিতরে ঢুকলেন। মনে হ'ল, আয়ারটন ঘুমুচ্ছে। তার সারা গায়ে আঘাতের নীল দাগ। বোঝা যায়, নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছে তার উপর।

তার হাত ধ'রে ঝাঁকি দিলেন হার্ডিং, বললেন: 'আয়ারটন!'

'কে? কে আপনি?' চোখ মেলে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে হার্ডিং-এর দিকে তাকিয়ে বললে আয়ারটন। তারপর বললে: 'ও! আপনি! আপনারা এসেছেন?'

'হ্যাঁ আয়ারটন, আমরা এসেছি।'

'আমি কোথায়?'

'কোর‍্যালে, তোমার সেই ঘরে।'

'একা ছিলুম?'

'হ্যাঁ একাই।'

'কিন্তু, তারা হয়তো এক্ষুনি ফিরে আসবে! শিগগির অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হোন!' —এই ব'লেই আয়ারটন আবার এলিয়ে পড়ল।

হার্ডিং বললেন: 'দস্যুরা কখন এসে আক্রমণ করবে, তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। পেনক্র্যাফ্‌ট, শিগগির গাড়িটা ভিতরে নিয়ে এসে কোর‍্যালের দরজা খুব ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দাও।'

পেনক্র্যাফ্‌ট আর নেব্‌কে নিয়ে এসে মুহূর্তেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন স্পিলেট। গিয়ে শুনলেন, টপ রাগে গোঁ-গোঁ করছে। এদিকে হার্ডিংও হার্বার্টকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। দরকার হ'লেই গুলি চালাবেন। কিন্তু কিছু দেখতে পাওয়ার আগেই শুনতে পেলেন, সেই মুহূর্তে ভীষণভাবে ডেকে উঠল টপ। দড়ি ছিঁড়ে ছুটল কোর‍্যালের পিছন দিকে। সবাই বন্দুক উঁচিয়ে তৈরি হ'য়ে রইলেন। এদিকে জাপও টপের কাছে ছুটে গেল।

শুরু ক'রে দিলে ভীষণ চ্যাঁচামেচি ।

জাপের পিছন-পিছন ছুটলেন সবাই । ছোট্ট ঝরনাটির কাছে এসে থামলেন । সেখানে চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, ঝরনার ধারে পাঁচটা মৃতদেহ প'ড়ে আছে । মৃতদেহ পাঁচটা পাঁচজন বোম্বেটের !!

এমন আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল কী ক'রে ? কে হত্যা করলে দস্যুদের ? আয়ারটন ? উঁহু, অসম্ভব ! মুহূর্ত আগেও সে বলেছিল—তৈরি হোন, কখন দস্যুরা ফিরে আসে । এই কথা বলবার পরক্ষণেই সেই-যে জ্ঞান হারিয়েছে, এখনো সে-জ্ঞান আর ফিরে আসেনি । সুতরাং এ-অন্য-কারু কাজ । কিন্তু, সেই অন্য-কেউটি কে ? কে ?—

সারা রাত্রি আয়ারটনের ঘরেই কাটালেন সবাই । পরদিন ভোরবেলা জ্ঞান ফিরে এলো আয়ারটনের । একশো চারদিন পরে সকলের সঙ্গে ফের দেখা হওয়ায় কী-রকম আনন্দের ব্যাপার হ'ল, তা নিশ্চয় না-বললেও চলবে । এরপর আয়ারটন তার যতটুকু জানা ছিল সবকিছুই খুলেই বললে :

—গত এগারোই নভেম্বর সে কোর‍্যালে যায় । তার পরদিনই রাত্রিবেলায় হঠাৎ বোম্বেটেরা এসে তার হাত-পা-মুখ এমনভাবে বেঁধে রাখলে, যাতে সে কথা বলতে না-পারে । তারপর তাকে মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের নিচে একটা ঘন-অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে নিয়ে রাখলে । সেই গহ্বরটাই ছিল বোম্বেটেদের আড্ডা । তাকে মেরে ফেলাই ঠিক হ'ল । পরদিন যখন দস্যুরা তাকে হত্যা করতে যাবে, এমন সময় দলের একটা বোম্বেটে তাকে হঠাৎ চিনতে পারলে : এ-যে অস্ট্রেলিয়ার সেই বেন্ জয়েস । তখন থেকে তাকে তাদের দলবদ্ধ করবার জন্যে বোম্বেটেরা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল । তারা এমন স্বপ্নও দেখতে শুরু করলে যে আয়ারটনের সাহায্যে দুর্ভেদ্য গ্র্যানাইট হাউস দখল করবে, হত্যা করবে সকলকে, তারপর মালিক হ'য়ে বসবে এই লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের ।

কিন্তু যখন কোনোমতেই আয়ারটনকে হাত করা গেল না, তখন বোম্বেটেরা তার হাত-পা বেঁধে, মুখে রুমাল ঢুকিয়ে দিয়ে সেই গহ্বরে ফেলে রাখলে । এইভাবে সেই গহ্বরে প্রায় চার মাস ছিল আয়ারটন । বোম্বেটেরা কোর‍্যালে থেকে আয়ারটনের জন্যে সঞ্চিত আহার্য এনে আহার করতো, কিন্তু কোর‍্যালে বাস করতো না । এগারোই নভেম্বর দুজন বোম্বেটে কোর‍্যালে গিয়েছিল । সেখানে তারা হঠাৎ দ্বীপবাসীদের দেখতে পায় । তক্ষুনি একজন বোম্বেটে হার্বার্টকে গুলি করে । অন্য বোম্বেটেটাকে হার্ডিং হত্যা করেন । যে-বোম্বেটেটা আহত হয়নি, তার মুখে আয়ারটন 'হার্বার্টের মৃত্যু হয়েছে' এই কথা শোনে । আসলে হার্বার্ট যে আহত হয়েছে, মারা যায়নি, এ-কথা আয়ারটন জানতে পারেনি । আহত হার্বার্টকে নিয়ে সবাই যখন কোর‍্যালে ছিলেন, তার মধ্যে দস্যুরা কখনও সেই গহ্বর পরিত্যাগ করেনি । এমনকী খেত-খামারের সর্বনাশ ক'রে ফের তারা ওই গহ্বরেই ফিরে এসেছিল ।

এর পর থেকে কিন্তু আয়ারটনের উপরে অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে গেল । দস্যুরা গহ্বর ছেড়ে খুব কমই বেরুত । আয়ারটনও দ্বীপবাসীদের আর-কোনো খবর জানতে পারেনি । অবশেষে দস্যুদের অকথ্য, অসহ্য যন্ত্রণায় বেচারার দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি প্রায় লোপ পেলো । তারপর কী-কী ঘটেছে, তা সে জানে না ।

এরপর আয়ারটন জিগেস করলে : 'আচ্ছা ক্যাপ্টেন, আমি তো গহ্বরে অজ্ঞান অবস্থায়

বন্দী ছিলুম, কিন্তু এখানে এলুম কী ক'রে ?'

'দস্যুরা যে ঝরনার পাশে ম'রে প'ড়ে আছে,' বললেন হার্ডিং : 'সেইটেই বা হ'ল কী ক'রে ?'

'কী !' সচমকে বললে আয়ারটন : 'কী ! ম'রে প'ড়ে আছে !!'—

এই কথা বলেই আয়ারটন ওঠবার চেষ্টা করলে। সবাই তাকে ধ'রে তুললেন, তারপর সেইভাবে ধ'রে-ধ'রে সেই ছোট্ট ঝরনার দিকে নিয়ে চললেন। ততক্ষণে পূর্বাকাশ ফিকে হ'য়ে এসেছে। রাত প্রায় ভোর হয়-হয়। চারদিক বেশ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

ঝরনাধারার পাশে পাঁচটা মৃতদেহ—ঠিক যেমনভাবে ছিল তেমনি প'ড়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে আয়ারটন একেবারে হতবাক হ'য়ে পড়ল। মনে হ'ল, তার বুদ্ধি যেন লোপ পেয়ে গেছে।

তখন হার্ডিং-এর নির্দেশ অনুযায়ী পেনক্র্যাফ্‌ট আর নেব্ মৃতদেহগুলো ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখল। স্পষ্ট আঘাতের চিহ্ন কারু শরীরে নেই। তবে, একটা ক'রে হাতের মতো লাল দাগ কারু বুকে, কারু পিঠে, কারু-বা কাঁধের উপর দেখতে পাওয়া গেল।

স্পিলেট বললেন : 'এই দাগগুলোই আঘাতের চিহ্ন। কিন্তু, এ কোন্ অস্ত্রের আঘাত?'

'এমন-কোনো অস্ত্রের আঘাত'—বললেন হার্ডিং : 'যার ক্রিয়া বিদ্যুতের মতো।'

'এমন সাংঘাতিক, প্রাণঘাতী আঘাত করলে কে ?'

হার্ডিং বললেন : 'আর কে করবে ? এও আমাদের সেই অজ্ঞাত উপকারী বন্ধুর কাজ। আয়ারটন, তোমাকেও তিনিই পর্বত-গহ্বর থেকে কোর‍্যালে এনে রেখেছিলেন।'

এরপর নেব্ আর পেনক্র্যাফ্‌ট ছাড়া অন্য-সবাই কোর‍্যালের ভিতরে চ'লে গেলেন। তারা দুজনে মৃতদেহগুলো দূরে বনের মধ্যে নিয়ে কবর দিলে।

আয়ারটন দস্যুদের কবলে পড়বার পর যে-সব ঘটনা ঘটেছিল, সবকিছুই তাকে খুলে বলা হ'ল। তারপর সাইরাস হার্ডিং বললেন : 'আমাদের কাজের অর্ধেকটা তো শেষ হ'ল। দস্যুদের আর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু, আমাদের ক্ষমতায় তো আর এ-কাজ সম্পন্ন হয়নি !'

'যাঁর ক্ষমতায় হয়েছে'—বললেন স্পিলেট : 'তাঁর খোঁজ করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ। মাউণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের গুহা, গহ্বর, সমস্তকিছু তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে আমাদের।'

হার্ডিং বললেন : 'নিশ্চয়ই দেখতে হবে। তবে আমি আবারও বলছি, তিনি ইচ্ছে ক'রে দেখা না-দিলে আমাদের কারু সাধ্য নেই যে তাঁকে খুঁজে বার করি।'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'আমাদের যে আরো-একটা কাজ বাকি রয়েছে। টেবর আইল্যাণ্ডে গিয়ে আয়ারটনের কথা জানিয়ে আসতে হবে।'

আয়ারটন শুধোলো : 'টেবর আইল্যাণ্ডে যাবে কী ক'রে ?'

'কেন ? বন্-অ্যাডভেনচার-এ চ'ড়ে !'

'বন্-অ্যাডভেনচার-এর অস্তিত্ব থাকলে তো ! দিন-আষ্টেক আগে বোম্বেটেরা বন্-অ্যাডভেনচার-এ চ'ড়ে সমুদ্রে বেরিয়েছিল। এদের কেউ তো হার্ডির মতো নৌকো চালাতে জানতো না ! কাজেই পাহাড়ে লেগে বন্-অ্যাডভেনচার ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে।'

'অ্যাঁ ! কী সর্বনাশ !'—

দারুণ দুঃখ পেলে পেনক্র্যাফ্‌ট, অন্যরাও অত্যন্ত মর্মাহত হ'লেন ।

হার্বার্ট বললে : 'দুঃখ কোরো না, পেনক্র্যাফ্‌ট, আমরা আরেকটা নৌকো বানিয়ে নেবো । এবার বানাবো আরো বড়ো ক'রে ।'

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'সে-রকম নৌকো বানাতে অন্তত পাঁচ-ছ মাস লাগবে ।'

'কী আর করা যাবে ।' বললেন স্পিলেট : 'এ-বছর টেবর আইল্যাণ্ডে যাওয়াটা বন্ধই রাখতে হবে ।'

এরপর, উনিশে ফেব্রুয়ারি অনুসন্ধান শুরু হ'ল । মাউণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের গুহাগহ্বরের সীমাসংখ্যা ছিল না । দ্বীপবাসীরা একটা-একটা ক'রে খুঁজে বার ক'রে দেখতে লাগলেন । অগ্ন্যুৎপাতের সময় থেকে যে-সব টানেল আর নালাগুলো ছিল, যার ভিতর দিয়ে একদা কত গলিত লাভা ইত্যাদি বেরিয়েছে—সবই তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখা হ'ল ।

একটা গহ্বরের শেষপ্রান্তে এসে হাজির হ'লে পর সাইরাস হার্ডিং শুনতে পেলেন, যেন পাহাড়ের ভিতরে গভীর গুম-গুম একটা গর্জন হচ্ছে । স্পিলেট তাঁর সঙ্গে ছিলেন । এই শব্দ তাঁরও কান এড়ালো না । মনে হ'ল—পৃথিবীর অভ্যন্তরের বহুকালের নিভন্ত আগুন যেন আবার জ্বলতে শুরু করেছে । অনেকক্ষণ শুনে দু-জনে ঠিক করলেন—মাটির নিচে কোনোরকম রাসায়নিক ক্রিয়া শুরু হয়েছে, যার ফল অত্যন্ত বিপজ্জনক ।

স্পিলেট বললেন : 'তবে তো দেখছি আগ্নেয়গিরি একেবারে ম'রে যায়নি !'

হার্ডিং বললেন : 'মরা আগ্নেয়গিরিও আবার অনেক সময় প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে ।'

স্পিলেট বললেন : 'মাউণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিন যদি আবার অগ্ন্যুদ্‌গার করে তবে তো লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের আর রেহাই নেই !'

'তা মনে হয় না—' বললেন হার্ডিং : 'অগ্ন্যুদ্‌গার হ'লেও পুরোনো পথ দিয়েই গলিত ধাতু প্রভৃতি সব জিনিশ হ্রদের দিকে পাহাড়ের উপত্যকার দিকে চ'লে যাবে । গ্র্যানাইট হাউসের কোনো বিপদ হবে ব'লে আমার মনে হয় না । তবু, এই অগ্ন্যুদ্‌গারটা হ'লে আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক মারাত্মক হবে । এটা না-হওয়াই বাঞ্ছনীয় ।'

সাইরাস হার্ডিং আর গিডিয়ন স্পিলেট গহ্বর থেকে বেরিয়ে অন্য-সবাইকে এই সম্ভাব্য বিপদের কথা বললেন ।

শুনে পেনক্র্যাফ্‌ট কথাটাকে উড়িয়েই দিলে । বললে : 'হুঁ, হোক না অগ্ন্যুৎপাত ! আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুই তো রয়েছেন । তাহ'লে আর ভয় কী ?'

সে যা-ই হোক, এত যে পরিশ্রম করা হ'ল, কষ্ট করা হ'ল, তার কোনো ফলই হ'ল না । কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না সেই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর । তখন সবাই এ-কথা মানতে বাধ্য হলেন যে, দ্বীপের উপরটায় উনি থাকেন না । এই সিদ্ধান্তকে হতাশভাবে মেনে নিয়ে সবাই পঁচিশে ফেব্রুয়ারি গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলেন ।

৫

রহস্য ঘনীভূত

রিচমণ্ড থেকে পালানোর পর লিঙ্কন দ্বীপে বাস তিন বছর পূর্ণ হয়েছে । লড়াই যে এতদিনে শেষ হয়েছে, দ্বীপবাসীদের সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । প্রায়ই এ-বিষয়ে এঁদের মধ্যে আলোচনা হ'ত । এতদিন পর্যন্ত দেশে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগই পাওয়া যায়নি । আর সুযোগ পাওয়া যায়নি ব'লেই দ্বীপটার উন্নতির জন্যে প্রাণপণে খেটেছে—বলা যায় তো না—হয়তো-বা এই দ্বীপ ছেড়ে যাওয়া জীবনে আর সম্ভব না-ও হতে পারে—আর এই দ্বীপেই যখন থাকতে হবে, তখন দ্বীপটাকে বাসযোগ্য ক'রে তোলা উচিত । এই ভেবে তাঁরা দ্বীপটার উন্নতির জন্যে খেটেছেন, খাটতে-খাটতে মায়া প'ড়ে গেছে দ্বীপটার উপর । আর তাই তাঁরা ঠিক করলেন যে নিজেদের হাতে-গড়া এই দ্বীপেই জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেবেন । তবে, তার আগে অন্তত দিন-কয়েকের জন্যে হ'লেও দেশে ফিরে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ক'রে আসার ইচ্ছে সকলের মনেই প্রবল । কিন্তু মানুষ তো অনেক কিছুই ভাবে—সব কি আর ঘটে ?

সে-ইচ্ছে পূর্ণ হ'তে পারে দুই উপায়ে—হঠাৎ যদি কোনো জাহাজ এসে লিঙ্কন দ্বীপে ভিড় জমায়, কিংবা সমুদ্রযাত্রার উপযোগী একটা বড়ো জাহাজ যদি এঁরা প্রস্তুত ক'রে নিতে পারেন । মোটামুটিভাবে কাজ-চালানো-গোছ একটা জাহাজ তৈরি করতে কম ক'রেও মাস-ছয়েক লাগবে ।

সাইরাস হার্ডিং একদিন পেনক্র্যাফ্‌টের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতে-করতে শুধোলেন : 'একটা বড়ো জাহাজ তৈরি করতে ক-দিন লাগবে বলতে পারো ? জাহাজ যখন তৈরি করতে হবে, তখন বেশ বড়ো ক'রে তৈরি করাই ভালো । স্কটিশ জাহাজ টেবর দ্বীপে আসবে কি না তার কোনো ঠিক নেই, হয়তো-বা এর মধ্যেই এসে সেখানে আয়ারটনের সন্ধান না-পেয়ে ফিরে গেছে । সুতরাং এমন জাহাজ তৈরি করতে হবে, যাতে শুধু টেবর দ্বীপে নয়—নিউজিল্যাণ্ড কিংবা অন্য-কোনো বড়ো দ্বীপে যাওয়াও সম্ভব হয় । তোমার কী মনে হয় পেনক্র্যাফ্‌ট ?'

'আমার মনে হয়—' পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'যখন কাঠ বা যন্ত্রপাতির কোনো অভাব নেই তখন যত বড়ো ইচ্ছে তত বড়ো জাহাজই আমরা তৈরি করতে পারবো । তবে, সময় লাগবে ।'

সাইরাস হার্ডিং কী-যেন ভাবলেন । বললেন : 'আচ্ছা, আড়াইশো-তিনশো টনের জাহাজ তৈরি করতে ক-দিন লাগবে ব'লে মনে হয় ?'

'সাত-আট মাস তো লাগবেই ।' পেনক্র্যাফ্‌ট জবাব দিলে : 'তার উপর আবার শীত পড়ছে শিগগিরই, সে-কথাটাও মনে রাখতে হবে—শীতের সময় কাঠের কাজ বড়ো ঝামেলার । তা এখন থেকে শুরু করলে আসছে নভেম্বর নাগাদ জাহাজ শেষ হ'তে পারে । আপনি নকশার খশড়া ক'রে ফেলুন—আমরা কাঠটাঠ কেটে সব ঠিক ক'রে রাখি ।'

চিমনির কাছেই একটা জায়গা ঠিক করা হ'ল। জাহাজ তৈরি করবার জন্যে সাইরাস হার্ডিং সেখানে একটা ডক-ইয়ার্ডের মতো তৈরি করলেন। জাহাজের ডেক, খোল, সবকিছুর জন্যেই বন থেকে কাঠ কেটে এনে ডক-ইয়ার্ডে জড়ো করা হ'ল। সাইরাস হার্ডিং তখন জাহাজের নকশা আর ছোটো একটা মডেল তৈরি করতে শুরু করলেন।

প্রসপেক্ট হাইটের সর্বনাশ ক'রে গিয়েছিল দস্যুরা। তাঁদের আবার নতুন ক'রে ঘর-বাড়ি, ফসলের খেত, মিল, সবকিছু তৈরি করতে হ'ল। টেলিগ্রাফের তার পর্যন্ত দস্যুদের নিষ্ঠুর হাত থেকে রেহাই পায়নি—তাও মেরামত করা হ'ল। দস্যুরা আর নেই, তাই আর দুর্ভাবনাও নেই এখন। তবু, নতুন-কোনো দস্যুদল যে এসে হাজির হবে না, তা কে জানে? দ্বীপের অধিবাসীদের দৈনন্দিন রুটিন হ'য়ে দাঁড়ালো প্রসপেক্ট হাইটের উপর থেকে দুরবিন নিয়ে চারদিক আঁতিপাঁতি ক'রে খোঁজা। বরাত ভালো যে সন্দেহজনক কিছু দেখা যায়নি কোনোদিন। তবু সাবধানের মার নেই ব'লে সর্বদা সতর্ক থাকতে হ'ত।

দিনের পর দিন কাটে। ক্রমে জুন মাস এলো। দারুণ হিম পড়েছিল ব'লে সবাইকে গ্র্যানাইট হাউসে আশ্রয় নিতে হ'ল। এই নিদারুণ বন্দিত্ব গিডিয়ন স্পিলেটকেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিত। একদিন স্পিলেট নেব্‌কে আকুল গলায় বললেন: 'নেব্, তুমি যদি আমাকে কোনোরকম একটা খবর-কাগজের গ্রাহক ক'রে দিতে পারো, তবে দেশে আমার যা-কিছু সম্পত্তি আছে সব তোমাকে লিখে-প'ড়ে দেবো।'

নেব্ অবিশ্যি তার শাদা ধবধবে বত্রিশটা দাঁত বের ক'রে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিলে, কিন্তু সত্যিই স্পিলেট এই নিদারুণ একঘেয়েমি কিছুতেই আর সহ্য করতে পারছিলেন না।

দেখতে-দেখতে জুন জুলাই আগস্ট—শীতের তিন মাস—কেটে গেল। এই দীর্ঘ শীতে গ্র্যানাইট হাউসের অধিবাসী সবারই স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল। বাচ্চা জাপের শীতটা একটু বেশি লাগতো ব'লে তাকে বেশ-পুরু একটা ড্রেসিং-গাউন তৈরি ক'রে দেয়া হয়েছিল। পরিচারক হিশেবে জাপ্ চমৎকার,—অমন চালাক-চতুর, কার্যক্ষম, পরিশ্রমী দ্বিতীয়-কাউকে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

শীত শেষ হ'য়ে গেল। বসন্ত এলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে নতুন একটা আশ্চর্য ঘটনা এসে হাজির হ'ল, যার পরিণাম ভয়াল ও ভয়ংকর। সাতই সেপ্টেম্বর সাইরাস হার্ডিং দেখতে পেলেন ফ্র্যাঙ্কলিন পাহাড়ের চুড়ো থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

ফ্র্যাঙ্কলিন পাহাড়ের চুড়ো থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে—এই কথা শুনে যে-যার কাজকর্ম ফেলে একদৃষ্টে পাহাড়ের চুড়োর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দীর্ঘ নিদ্রার পর আবার জেগেছে আগ্নেয়গিরি। তবে কি আবার অগ্নিবৃষ্টি শুরু হবে, আবার হবে অগ্ন্যুৎপাত? সে যা-ই হোক, অগ্ন্যুৎপাত হ'লেও সমস্ত লিঙ্কন দ্বীপটির বিপদ নাও ঘটতে পারে, আগেও এখানে অগ্ন্যুৎপাত হ'য়ে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে উত্তর দিকে রয়েছে আগেকার জ্বালা-মুখ, সেই পুরোনো পথেই হয়তো উৎক্ষিপ্ত গলিত পদার্থ ব'য়ে যাবে; সুতরাং দ্বীপের তেমন গুরুতর অবস্থা না-ও হতে পারে।

অদূর ভবিষ্যতে কী-কী বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে, সাইরাস হার্ডিং সকলকে বুঝিয়ে বললেন। বিপদ যদি উপস্থিতই হয়, তাকে বাধা দেবার সাধ্য কারু নেই। তবে গ্র্যানাইট হাউস নিরাপদ ব'লেই মনে হয়। অবিশ্যি দারুণ ভূমিকম্প হ'লে সারা পর্বত কেঁপে উঠবে,

তখন যদি ফ্র্যাঙ্কলিন পর্বতের ডান পাশে নতুন কোনো জ্বালামুখের সৃষ্টি হয়, তবে কোর‍্যালের গুরুতর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ।

সেদিন থেকে ধোঁয়া বের-হওয়া তো বন্ধ হ'লই না, বরং দিনের পর দিন যেন ধোঁয়ার পরিমাণ বেড়েই চলল ।

জাহাজের কাজে বাধা পড়ল না । ফসল তোলার জন্যে দিন-কয়েক কাজ বন্ধ ছিল, তারপর আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সবাই কাজে লাগলেন ।

পনেরোই অক্টোবর । রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই মিলে গল্পগুজব করছিলেন । অন্যদিনের চাইতে রাত সেদিন বেশি হয়েছিল । পেনক্র্যাফ্ট ঘুমোতে যাওয়ার জন্যে সবে তখন আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় খাবার ঘরের ইলেকট্রিক বেলটা হঠাৎ ক্রিং-ক্রিং ক'রে বেজে উঠল ।

সাইরাস হার্ডিং, গিডিয়ন স্পিলেট, হার্বার্ট, আয়ারটন, পেনক্র্যাফ্ট, নেব্—সবাই এখানে, কোর‍্যালে তো কেউ নেই । তবে কেন ইলেকট্রিক বেল বাজল ? আর, বাজালোই বা কে ?

হতভম্ব হ'য়ে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগলেন সবাই । একটু পর সংবিৎ ফিরলে সাইরাস হার্ডিং বললেন : 'দাঁড়াও—ঘণ্টা যে-ই বাজাক না কেন, যদি কোনো সংকেত করবার জন্যে বাজিয়ে থাকে, তবে আবার নিশ্চয়ই বাজাবে ।'

নেব্ বললে : 'কিন্তু বাজালে কে ?'

পেনক্র্যাফ্ট বললে : 'উনি—উনি ছাড়া আর কে বাজাবেন ?'

পেনক্র্যাফ্টের কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার ঘণ্টা বেজে উঠল ।

সাইরাস হার্ডিং যন্ত্রটার কাছে গিয়ে টরে টক্কা ক'রে প্রশ্ন করলেন : 'কী দরকার ? কী চাই ?'

একটু বাদে জবাব এল : 'এক্ষুনি কোর‍্যালে চ'লে এসো ।'

সাইরাস হার্ডিং উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন : 'এতদিনে সব রহস্যের সমাধান হবে ব'লে মনে হচ্ছে !'

হ্যাঁ, এ পর্যন্ত দ্বীপে পর-পর যে-সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে, এতদিনে তার মীমাংসার সম্ভাবনা এসেছে !

অবসাদ, শ্রান্তি-ক্লান্তি, ঘুম—সব ভুলে নীরব কৌতূহলে তক্ষুনি সবাই সমুদ্রতীরে নেমে গেলেন । শুধু জাপ আর টপ গ্র্যানাইট হাউসে রইল ।

কালো ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি । মেঘে-মেঘে আকাশ ছাওয়া । তারার মিটি-মিটি পর্যন্ত নেই । একটু পরেই হয়তো শুরু হবে ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত । যত গাঢ় অন্ধকার হোক না কেন, কোর‍্যালের পথ চেনা, সেখানে যেতে অসুবিধে হবে না । গভীর গহন অন্ধকারেই সবাই রওনা হলেন । কৌতূহলে আর উত্তেজনায় সকলেরই হৃদ্‌স্পন্দন চলেছে দ্রুত, কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই । পেনক্র্যাফ্ট দু-একবার বললে : 'একটা মশাল নিয়ে এলে ভালো হ'ত ।

সাইরাস হার্ডিং জবাব দিলেন : 'মশাল কোর‍্যালে গেলেই পাওয়া যাবে ।'

গ্র্যানাইট হাউস থেকে কোর‍্যাল পাঁচ মাইল দূরে । রাত সাড়ে-নটার সময় সবাই তিন মাইল পথ পেরুলেন । এমন সময় বিদ্যুতের নখে-নখে আকাশ ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার হ'য়ে যেতে লাগল—শুরু হ'ল ঘন-ঘন বজ্রপাত । সেদিকে গ্রাহ্য নেই কারু—একটা অদম্য আকর্ষণ

সবাইকে কোর‍্যালে টেনে নিয়ে চলল ।

রাত দশটার সময় বিদ্যুতের উজ্জ্বল ঝলকে কোর‍্যালের বেড়া দেখতে পাওয়া গেল। কোর‍্যালের দরজায় পৌঁছনোর সঙ্গে-সঙ্গে সাংঘাতিক ঝড়ে উন্মাদ হ'য়ে উঠল আকাশ। মুহূর্তমধ্যে কোর‍্যাল পেরিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন সবাই। ভিতরে অন্ধকার জমাট বেঁধে। হার্ডিং দরজায় শব্দ করলেন, কোনো জবাব নেই। সবাই ঘরের ভিতর ঢুকলেন। নেব্‌ আলো জ্বাললে। না, নেই, কেউ নেই, ঘরের মধ্যে কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই।

কিন্তু এর মানে ? তবে কি সমস্তই স্বপ্ন ? কিন্তু তাও বা কী ক'রে হবে ? টেলিগ্রাম স্পষ্ট বলেছে : 'এক্ষুনি কোর‍্যালে চ'লে এসো, এক্ষুনি !' তবে কেউ নেই কেন এখানে ?

এমন সময় হার্বার্ট দেখতে পেলে টেবিলের উপর একটা চিঠি প'ড়ে আছে। হার্ডিং চিঠিটা পড়লেন। তাতে শুধু লেখা : 'নতুন তারটি অনুসরণ করো।'

চিঠি প'ড়েই সাইরাস হার্ডিং বললেন : 'চলো—এই তার ধ'রেই।'

স্পষ্টই বোঝা গেল যে, খবর কোর‍্যাল থেকে পাঠানো হয়নি। পুরোনো তারে নতুন তার লাগিয়ে সেই অজ্ঞাত অধিকর্তার গোপন বাসস্থান থেকে সোজা গ্র্যানাইট হাউসে খবর পাঠানো হয়েছে।

নেব্‌ লণ্ঠন হাতে নিয়ে এগুল—সবাই কোর‍্যাল পরিত্যাগ করলেন।

কোর‍্যাল থেকে বেরিয়ে সাইরাস হার্ডিং বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেলেন, টেলিগ্রাফের প্রথম খুঁটিটাতেও একটা নতুন তার ঝুলছে ; তারটির এক মাথা উপরের তারের সঙ্গে লাগানো ; তারপরই তারটা মাটিতে প'ড়ে সরাসরি বনের মধ্য দিয়ে যেন পশ্চিম দিকে চ'লে গেছে।

এই তার অনুসরণ ক'রেই সবাই চললেন। তারটা কখনো গাছের নিচু ডালের উপর দিয়ে, আবার কখনো-বা মাটির উপর দিয়ে চলেছে। সাইরাস হার্ডিং ভেবেছিলেন তারটি হয়তো-বা উপত্যকার প্রান্তসীমায় গিয়ে শেষ হবে, আর সেখানেই সন্ধান পাওয়া যাবে সেই অজ্ঞাত অধিদেবতার গোপন বাসস্থানের। কিন্তু সেখানে এসে তার তবুও চলেছে দেখা গেল। তাঁরা পাহাড়ের গায়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ধ'রে চললেন। মাঝে-মাঝে এক-একজন ঝুঁকে প'ড়ে তারটা আছে কিনা দেখতে লাগলেন। বোঝা গেল, তার ক্রমে সমুদ্রের দিকে চলেছে। সমুদ্রের কিনারে পাহাড়ের অভ্যন্তরে বোধহয় গোপন বাসস্থানের খোঁজ পাওয়া যাবে।

রাত প্রায় এগারোটা তখন। হার্ডিং দলবল নিয়ে পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটা উঁচু ঢিবির উপর এসে পৌঁছুলেন। সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়। প্রায় পাঁচশো ফুট নিচে সমুদ্রের ঢেউ আলুথালু হ'য়ে গর্জনে-গর্জনে ফেটে পড়ছে।

এখানে এসে তারটি পাহাড়ের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে একটা প্রকাণ্ড ফাটলের ধার দিয়ে ! জায়গাটা ভালো নয়, যে-কোন সময়ে বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু সকলে তখন অদম্য কৌতূহলে দ্রুত পায়ে চলেছেন। বিপদের কথা কারু মনেও হ'ল না। একবারের জন্যেও না। এই সাংঘাতিক জায়গাটা সাবধানে পেরিয়ে শেষে তাঁরা নিচের দিকে নামতে-নামতে দেখতে পেলেন, তারটা তাঁদের সমুদ্রতীরে নিয়ে এসেছে। সাইরাস হার্ডিং তখন হাত দিয়ে তারটা ধ'রে দেখলেন। তারটা সমুদ্রের জলের নিচে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

দারুণ নিরাশায় সবাই হতভম্ব হ'য়ে পড়লেন। তবে কি গোপন আস্তানা সন্ধান করবার জন্যে জলে ডুবতে হবে ? সাইরাস হার্ডিং সবাইকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন।

পাহাড়ের গায়ে একটা গহ্বরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বললেন : 'আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এখন ভরা জোয়ার—ভাঁটার সময় নিশ্চয়ই পথটা ভেসে উঠবে।'

পেনক্র্যাফ্‌ট শুধোলে : 'পথ যে একটা আছে, এ আপনি কী ক'রে আন্দাজ করলেন ?'

'ওঁর কাছে যাবার পথ না-থাকলে,' দৃঢ় কণ্ঠে হার্ডিং জবাব দিলেন : 'উনি কক্ষনো আমাদের ডেকে পাঠাতেন না।'

এমন দৃঢ়তার সঙ্গে সাইরাস হার্ডিং এ-কথা বললেন যে সকলেরই বিশ্বাস হ'ল যে পথ জোয়ারের জলে ডুবে গেছে ; ভাঁটার সময় সেটা যে ভাসতে পারে, আর তখন সে-পথে যাওয়া সম্ভবপর—এ তো আর কোনো অসম্ভব আজব ব্যাপার নয় !

সবাই সেই গহ্বরের ভিতর অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড়ে-পাহাড়ে তুফানি হাওয়া আর বজ্রপাতের শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'য়ে সৃষ্টি করছে এক তুলকালাম কাণ্ড।

রাত তখন দুপুর, সাইরাস হার্ডিং লণ্ঠন হাতে সমুদ্রতীরে নামলেন। হার্ডিং-এর আন্দাজই ঠিক। স্পষ্টই দেখা গেল, জলের নিচে একটা বিশাল গহ্বরের চিহ্ন বেশ ফুটে উঠেছে। তারটিও ঠিক সেখানে খাড়া হ'য়ে গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

হার্ডিং ফিরে এলেন আর-সকলের কাছে। বললেন, 'আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এই পথটার ভিতর যাওয়া যাবে।'

পেনক্র্যাফ্‌ট শুধোলো : 'পথটা আছে তাহ'লে ?'

হার্ডিং বললেন : 'তোমার কি তাতে সন্দেহ ছিল নাকি ?'

হার্বার্ট বললে : 'শুকনোও তো থাকতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা হেঁটেই যেতে পারবো। আর যদি জল থাকেই তবে আমাদের যাবার জন্যে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা আছে।'

একটা ঘণ্টা কেটে গেল। সকলে এই জল-ঝড় মাথায় নিয়েই সমুদ্রতীরে নেমে গেলেন। তখন প্রায় আট ফুট উঁচু পথ বেরিয়েছে। পথের মুখ সেতুর খিলানের মতো। তার তলা দিয়ে গর্জন করতে করতে ছুটেছে সমুদ্র-তরঙ্গ। সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে হার্ডিং দেখতে পেলেন, একটা কালো-মতো কী যেন ভাসছে। সেটাকে টেনে কাছে এনে দেখা গেল সেটা একটা ডিঙি নৌকো, গহ্বরের ভিতরে পাথরের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। নৌকোটা লোহার পাত দিয়ে মোড়া। নৌকোর পাটাতনে দুটো দাঁড় প'ড়ে আছে।

তক্ষুনি নৌকোয় উঠে বসলেন সকলে। নেব্ আর আয়ারটন দাঁড় ধরলে। পেনক্র্যাফ্‌ট বসলে হাল ধ'রে। সাইরাস হার্ডিং লণ্ঠন হাতে নৌকোর মুখে দাঁড়ালেন, অন্ধকারে পথ দেখাবার জন্যে।

গহ্বরের ভিতরে ঢোকবার পরেই ধনুক-বাঁক ছাদটা খুব উঁচু হ'য়ে পড়ল।

গভীর অন্ধকার। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় গহ্বরের বিশালতা, উচ্চতা—কোনো কিছুই বোঝা গেল না।

চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। বাইরের বজ্রপাতের প্রচণ্ড আওয়াজ পর্যন্ত সেখানে ঢুকতে পারে না।

গহ্বরটা কতদূর পর্যন্ত গেছে ? দ্বীপের মধ্যভাগ পর্যন্ত ? কে জানে !

মিনিট পনেরো চলার পর হার্ডিং বললেন : 'নৌকোটাকে আরো ডানদিকে নিয়ে যাও।' তাঁর মৎলব, তারটা দেয়ালের গায়ে লাগানো আছে কি না দেখা। দেখা গেল, তার ঠিকই চলেছে। আরো মিনিট পনেরো কাটল। ততক্ষণে তাঁরা আধ মাইলটাক এসেছেন। সাইরাস হার্ডিং হঠাৎ বললেন, 'থামো।'

নৌকো থামলো। সকলে দেখতে পেলেন, সামনের একটা তীব্র উজ্জ্বল আলোয় সেই বিশাল গহ্বরটি আলোকিত হ'য়ে আছে। প্রায় একশো ফুট উঁচু বাঁকানো ছাদটা কালো-কালো থামের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। এমন গভীর, এত-বড়ো একটা গহ্বর যে দ্বীপের নিচে আছে, তা তাঁরা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। তীব্র উজ্জ্বল আলোয় গহ্বরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত চোখের সামনে ফুটে উঠল। আলোটা এত উজ্জ্বল আর এত ধবধবে শাদা যে মনে হ'ল, আলোটা নিশ্চয়ই বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে জ্বালানো হয়েছে।

নৌকোটা আলোর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। এখানে জল প্রায় সাড়ে-তিনশো ফুট গভীর। আলোর পরেই বিশাল পাথরের দেয়াল। সেদিকে আর এগুবার পথ নেই। এখানে গহ্বরটা খুব চওড়া। দ্বীপের নিচে যেন বড়ো-একটা হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে।

এই হ্রদের মাঝখানে ঠিক চুরুটের মতো দেখতে একটা বিরাট বিশাল জিনিশ ভাসছে। জিনিশটা স্থির, নিস্তব্ধ। এর গায়ে যেন জ্বলন্ত দুটো চোখ, তার মধ্যে দিয়েই সেই উজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে।। জিনিশটাকে দেখে মনে হয় যেন প্রকাণ্ড একটা তিমি। প্রায় আড়াইশো ফুট লম্বা, আর জলের উপর দশ-বারো ফুট উঁচু।

নৌকো আস্তে-আস্তে আরো কাছে গেল। সাইরাস হার্ডিং উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন। তারপর হঠাৎ স্পিলেটের হাত চেপে সজোরে ঝাঁকুনি দিলেন : 'এ তিনি ! তিনি ছাড়া আর-কেউ হ'তে পারে না ! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি !' এরপর ব'সে প'ড়ে গিডিয়ন স্পিলেটের কানে ফিশফিশ ক'রে একটা নাম বললেন।

গিডিয়ন স্পিলেটও সেই নাম জানতেন। শুনেই তীব্র উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন স্পিলেট : 'অ্যাঁ ! এ আপনি কী বলছেন, ক্যাপ্টেন হার্ডিং ! তিনি ! তিনি তো সাংঘাতিক অপরাধী !'

হার্ডিং ঘাড় নাড়লেন : 'হ্যাঁ, তিনিই।'

সাইরাস হার্ডিং-এর কথামতো নৌকোটাকে এই ভাসমান জিনিশটার গায়ে লাগানো হ'ল। জিনিশটার বাঁ পাশ থেকে পুরু কাঁচের মধ্য দিয়ে তীব্র ঝলসানো আলোর রেখা বেরুচ্ছিল। হার্ডিং দলবল নিয়ে এর উপরে উঠলেন। উঠে দেখলেন, ভিতরে যাওয়ার একটা দরজা রয়েছে। সেই দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেন। সিঁড়ির নিচে জাহাজের ডেকের মতো ডেক—তীব্র আলোয় উজ্জ্বল। এই ডেকের শেষে একটা দরজা। হার্ডিং দরজাটা খুললেন। খুব সাজানো-গোছানো একটা ঘর পেরিয়ে লাইব্রেরি ঘর। এই ঘরের ছাদ থেকে উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে ঘরটা আলোকিত করেছে। লাইব্রেরি-ঘরের শেষে একটা বন্ধ দরজা। হার্ডিং সেই দরজাটাও খুললেন।

বড়ো জাহাজের সেলুনের মতো প্রকাণ্ড একটা ঘর ; যেন একটা মিউজিয়াম । নানান রকমের অজস্র মূল্যবান জিনিশপত্র আর আশবাবে ঘরটা এমনভাবে সাজানো-গোছানো যে, তাঁদের মনে হ'ল, যেন হঠাৎ কোনো জাদুঘরে এসে পড়েছেন. ।

ঘরে ঢুকে সবাই দেখলেন, একটা দামি সোফার উপর আধ-শোয়া অবস্থায় একজন লোক । চোখদুটো আলতোভাবে বোজা । ভদ্রলোক তাঁদের প্রবেশ যেন লক্ষ্যই করেননি ।

হার্ডিং ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেলেন : 'ক্যাপ্টেন নেমো ! আপনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমরা এসেছি ।'

সবাই এই কথা শুনে স্তম্ভিত বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন ।

৬

সমস্যার সমাধান

সাইরাস হার্ডিং-এর কথা শুনে ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসলেন । বৈদ্যুতিক আলো এসে পড়ল তাঁর চোখে মুখে । উদাস ও উজ্জ্বল অবয়ব, কপালটা উঁচু, চোখে প্রতিভার দ্যুতি, ধবধবে শাদা দাড়ি, মাথার চুল এসে পড়েছে কাঁধে ।

শক্ত, সম্ভ্রান্ত, গম্ভীর চেহারা । কিন্তু দেখেই বোঝা গেল, শরীর বয়সের ভারে দুর্বল হ'য়ে পড়েছে । কিন্তু কণ্ঠস্বর তখনো বেশ জোরালো ।

সাইরাস হার্ডিং-এর কথার জবাবে বললেন : 'আমার তো কোনো নাম নেই !'

সাইরাস হার্ডিং বললেন : 'আপনার কোনো নাম থাক বা না-থাক, আপনার কথা আমি জানি ।'

ক্যাপ্টেন নেমো তীক্ষ্ণ চোখে হার্ডিং-এর দিকে তাকালেন । চোখের তারাদুটো একবার জ্ব'লে উঠল । পরমুহূর্তে সোফার কুশনের উপর হেলান দিয়ে বললেন : 'যাক, তাতে এখন আর কোনো ক্ষতি নেই—আমি তো মরতেই চলেছি ।'

সাইরাস হার্ডিং ক্যাপ্টেন নেমোর কাছে গেলেন । গিডিয়ন স্পিলেট তাঁর হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে দেখলেন, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে । ক্যাপ্টেন নেমো হাত টেনে নিয়ে সাইরাস হার্ডিং আর স্পিলেটকে বসতে ইঙ্গিত করলেন ।

উত্তেজনায় আর কৌতূহলে সবাই তখন অস্থির ।

ক্যাপ্টেন নেমো সোফায় ব'সে হাতের উপর ভর দিয়ে হার্ডিংকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগলেন । একটু বাদে শুধোলেন : 'আমার আগেকার নাম আপনি জানেন ?'

হার্ডিং ঘাড় নাড়লেন : 'হ্যাঁ, জানি । আর আপনার "নটিলাসে"র কথাও জানি ।'

ক্যাপ্টেন নেমো যেন অবাক হলেন একটু : 'কী ক'রে জানলেন ? আমাদের তো অনেক বছর ধ'রে পৃথিবীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ! তিন বছর ধ'রে আমি একলা সমুদ্রের নিচে বাস করছি । তবে কে আমার এই অজ্ঞাতবাসের কথা প্রকাশ করলে ?'

'এমন-একজন লোক প্রকাশ করেছেন, আপনার সঙ্গে যাঁর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই—'

হার্ডিং উত্তর করলেন : 'সুতরাং তাকে বেইমান বলা চলে না ।'

'হুঁ, বুঝতে পেরেছি ।' ক্যাপ্টেন নেমো বললেন : 'ষোলো বছর আগে যে ফরাশি অধ্যাপকটি হঠাৎ আমার জাহাজে এসে পড়েছিল, সে-ই তবে আমার কথা ব'লে বেড়িয়েছে সবার কাছে !'

হার্ডিং ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন ।

ক্যাপ্টেন নেমো বললেন : 'তাহ'লে সেই ফরাশি অধ্যাপক আর তাঁর সঙ্গী দুজন নরোয়ের সেই ঘূর্ণিপাকে ডুবে মরেনি ? নটিলাস তখন ঐ ঘূর্ণিপাক থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল ব'লে ওদের দিকে নজর রাখতে পারেনি ।'

'তারা মরেনি । তারপরই "টোয়েণ্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী" (সমুদ্রতলে ষাট হাজার মাইল) নামে একটা বই ছাপা হয়েছে । সেই বইতে আপনার ইতিহাস লেখা আছে ।

'আমার ইতিহাস ? ও হ্যাঁ—কয়েক মাসের ইতিহাস মাত্র ।'

হার্ডিং কাঁধ ঝাঁকালেন : 'সে-কথা ঠিক । কিন্তু সেই কয়েক মাসের আশ্চর্য ইতিহাসই আপনাকে পরিচিত করাবার পক্ষে যথেষ্ট ।'

অবজ্ঞার হাসি হাসলেন ক্যাপ্টেন নেমো : 'অপরাধী হিশেবে, মানুষের শত্রু হিশেবে পরিচিত করতে তা-ই যথেষ্ট, না ?'

হার্ডিং আহত হলেন একটু : 'ক্যাপ্টেন নেমো ! আপনার অতীত জীবনের কাজকর্মের বিচার করবার অধিকার আমার নেই—সে-চেষ্টাও আমি করিনি । কেন যে আপনি অমন অদ্ভুত জীবন যাপন করতেন, তার কারণ আমি জানি না । আমি শুধু এইটুকু জানি যে, লিঙ্কন দ্বীপে পৌঁছুনোর পর থেকে একজন উপকারী বন্ধু সবসময় আমাদের সাংঘাতিক-সাংঘাতিক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা ক'রে আসছেন । আমরা যে বেঁচে আছি, সে শুধু সেই শক্তিশালী দয়ালু মহাত্মার কল্যাণে । সেই অজ্ঞাত বন্ধু আপনি স্বয়ং ।'

এই কথার জবাবে ক্যাপ্টেন নেমো শুধু একটু মৃদু হাসলেন ।

হার্ডিং আর স্পিলেট উঠে দাঁড়ালেন । সকলেরই মন কৃতজ্ঞতায় ভরা । সে-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে সবাই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন । ক্যাপ্টেন নেমো তা বুঝতে পারলেন । ইশারায় সবাইকে শান্ত ক'রে বললেন, 'দাঁড়ান, আগে আমার সমস্ত ইতিহাস শুনে নিন ।'

ক্যাপ্টেন নেমো সংক্ষেপে তাঁর কাহিনী শেষ করলেন । শেষ পর্যন্ত বলতে গিয়ে তাঁর দেহ মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল । অনেকবার হার্ডিং তাঁকে বিশ্রাম করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সে-কথায় কান না-দিয়ে তিনি সব খুলে বললেন । ক্যাপ্টেন নেমোর কাহিনীর সারমর্ম এ-রকম দাঁড়ায় :

ক্যাপ্টেন নেমো একজন ভারতীয় । তখনকার স্বাধীন রাজ্য বুন্দেলখণ্ডের রাজার ছেলে, নাম ছিল যুবরাজ ডাক্কার । তাঁর যখন দশ বছর বয়স, তাঁর বাবা তাঁকে ইওরোপে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছিলেন । সব বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে দেশে ফিরে এসে অধঃপতিত

বুন্দেলখণ্ডকে ইওরোপের মতো ক'রে তুলতে হবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। আশ্চর্য বুদ্ধি ছিল ব'লে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই কলা, বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যায় অদ্ভুত নৈপুণ্য লাভ করলেন ডাক্কার। সারা ইওরোপে তিনি চ'ষে বেড়ালেন। রাজার ছেলে, তাই টাকা-কড়ির অভাব নেই। সবখানেই সমাদর পেলেন। জ্ঞানপিপাসু ডাক্কারের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভবিষ্যতে যাতে একটা স্বাধীন, সুসভ্য দেশের রাষ্ট্রনায়ক হিশেবে বিখ্যাত হ'তে পারেন।

আঠারোশো উনপঞ্চাশ খ্রিষ্টাব্দে ডাক্কার বুন্দেলখণ্ডে ফিরে এলেন। অভিজাত বংশের একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'ল, দুটি ছেলেও হ'ল তাঁর। কিন্তু পারিবারিক সুখ-সৌভাগ্য তাঁকে তাঁর উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। ডাক্কার তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

এমন সময়, আঠারোশো সাতান্ন খ্রিষ্টাব্দে শুরু হ'ল সিপাহী বিদ্রোহ। অন্য সকলের মতো ডাক্কারও বিদ্রোহে যোগ দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সবার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি লড়াই করতেন। কুড়িটি লড়াইয়ে দশবার তিনি আহত হয়েছিলেন। একসময়ে বিদ্রোহের অবসান হ'ল। এই বিদ্রোহে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে ডাক্কার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিদ্রোহের অবসান হ'লে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন, যুবরাজ ডাক্কারকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে অঢেল পুরস্কার দেয়া হবে। বিস্তর ইনাম, আর সেইসঙ্গে ভূষণ ও খেতাব।

বুন্দেলখণ্ড ইংরেজদের দখলে এল। ডাক্কার বুন্দেলখণ্ডের পাহাড়ে পাহাড়ে লুকিয়ে বেড়াতে লাগলেন। জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা নির্মূল হ'য়ে গেল। ডাক্কার গোড়ায় দ'মে গিয়েছিলেন। সভ্য জগতের প্রতি, সারা মানব-জাতির প্রতি তাঁর একটুও শ্রদ্ধা রইল না। ধন-দৌলত যা-কিছু ছিল সব সংগ্রহ ক'রে কুড়িজন বিশ্বাসী অনুচরসমেত যুবরাজ ডাক্কার একদিন অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। তাঁর গতিবিধির চিহ্ন কিছুই প্রকাশ পেলো না।

ডাক্কার তবে কোথায় গেলেন তখন? স্বাধীন দেশের স্বপ্ন যখন চূর্ণ-চূর্ণ হ'য়ে গেল, তখন কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন ডাক্কার?—সমুদ্রের অতলে; যেখানে পৃথিবীর কেউ তাঁর অনুসরণ করতে পারবে না।

বীর নির্ভীক যোদ্ধা এবার বৈজ্ঞানিক হ'য়ে দাঁড়ালেন। প্রশান্ত মহাসাগরে একটি নির্জন নিরালা দ্বীপে ডক তৈরি ক'রে নিজের পছন্দসই ডুবোজাহাজ তৈরি করলেন। নিজের আবিষ্কৃত উপায়ে বৈদ্যুতিক শক্তিকে এমনভাবে কাজে লাগালেন যে, জাহাজ চালানো, জাহাজের আলোর কাজ, জাহাজের শীততাপ-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সবকিছুই ঐ বৈদ্যুতিক শক্তিতেই সম্পন্ন হ'ত। এই শক্তির শেষ নেই ... সমুদ্রের স্রোত থেকে ইচ্ছেমতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। রত্নগর্ভ সমুদ্র। এ ছাড়া, মানুষ কত সময় কত মূল্যবান জিনিশপত্র, ধনদৌলত এই সমুদ্রগর্ভে হারিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সমুদ্রের অতলে মাছ, শাকসব্জিও প্রচুর। সুতরাং ডাক্কারের আর-কোনো অভাবই রইল না। এত দিনে তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবে। ডুবোজাহাজে ক'রে সমুদ্রের অতলে স্বাধীনভাবে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জাহাজের নাম দেয়া হ'ল 'নটিলাস'। নিজে নাম নিলেন ক্যাপ্টেন নেমো অর্থাৎ 'কেউ-না'।

অনেক বছর ধ'রে ডাক্কার সমুদ্রের অতলে এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন। নির্জন সমুদ্রগর্ভ থেকে তিনি কত-যে ধনদৌলত সংগ্রহ করলেন তার সীমা নেই।

সতেরোশো দুই সালে কোটি-কোটি স্বর্ণমুদ্রা-সমেত স্পেনের একটা জাহাজ ভিগো উপসাগরে ডুবেছিল। ক্যাপ্টেন নেমো সেই সম্পদ সমুদ্রগর্ভ থেকে সংগ্রহ করলেন। যারা নিজেদের দেশ স্বাধীন করবার জন্যে লড়াই করতো, নিজের নাম গোপন রেখে এই ধনদৌলত দিয়ে ক্যাপ্টেন নেমো তাদের সাহায্য করতেন।

এইভাবেই অনেকদিন পৃথিবীর লোকের সঙ্গে কোনো সংস্রব না-রেখে সমুদ্রগর্ভে বাস করলেন তিনি। শেষে আঠারোশো ছেষট্টি খ্রিষ্টাব্দের ছয়ই নভেম্বর রাত্রে দৈবাৎ তিনজন লোক তাঁর জাহাজে এসে পড়ে। সেই লোক তিনজন হ'ল—একজন ফরাশি অধ্যাপক, তাঁর পরিচারক, আর ক্যানাডার এক তিমি-শিকারী। 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' নামে একটা আমেরিকার জাহাজ নটিলাসকে তাড়া করেছিল, নটিলাসের সঙ্গে সেই জাহাজের ধাক্কা লাগে। তখন এরা তিনজন নটিলাসের উপর প'ড়ে গিয়েছিল।

সেই ফরাশি অধ্যাপকের কাছে ক্যাপ্টেন নেমো শুনেছিলেন যে নটিলাসকে পৃথিবীর লোকে তিমি-জাতীয় কোনো বিশাল জানোয়ার কিংবা বোম্বেটে ডুবোজাহাজ ব'লে মনে করে —আর এই নটিলাসকে অন্য-সব জাহাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ক্যাপ্টেন নেমো এদের তিনজনকে কয়েদির মতো নটিলাসে আটক রাখলেন। সাত মাস পর্যন্ত তারা সমুদ্রের অতলের আশ্চর্য-আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পেয়েছিল।

আঠারোশো সাতষট্টি সালের বাইশে জুন লোক তিনজন নটিলাসের একটা নৌকোয় চ'ড়ে পালিয়ে যায়। সেই সময়ে নটিলাস নরোয়ে উপকূলের সমুদ্রতলের নিদারুণ ঘূর্ণিপাকের পাল্লায় গিয়ে পড়েছিল। নরোয়ের মেলস্টর্ম তার প্রলয়ক্ষমতার জন্যে কুখ্যাত। ক্যাপ্টেন নেমো তাই ভেবেছিলেন যে এরা সমুদ্রে ডুবে মরেছে। এদিকে তারা যে সৌভাগ্যবশত রেহাই পেয়েছিল, সে-কথা ক্যাপ্টেন নেমো জানতে পারেননি। এই ফরাশি অধ্যাপকই দেশে ফিরে ক্যাপ্টেন নেমোর সাত মাসের ঘটনাবলি 'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী' বইতে লিখে বের করেছিলেন।

এই ঘটনার পর অনেকদিন পর্যন্ত ক্যাপ্টেন নেমো সমুদ্রতলে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা ক্রমশ একে-একে মারা যেতে লাগলেন। শেষে এই সমুদ্রতলের অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র বেঁচে রইলেন ক্যাপ্টেন নেমো। তাঁর বয়স তখন ষাট। একলা হ'লেও নটিলাস নিয়ে তিনি লিঙ্কন দ্বীপের নিচে জলগর্ভে যে একটি বিশাল গহ্বরের মধ্যে তাঁর একটা আশ্রয় ছিল, সেখানে হাজির হলেন। এই ধরনের বন্দর আরো ছিল, দরকার হ'লে তিনি সে-রকম বন্দরে গিয়ে বিশ্রাম করতেন। লিঙ্কন দ্বীপের বন্দরে ছ-বছর ধ'রে আছেন ক্যাপ্টেন নেমো। এখন আর সমুদ্রের নিচে ঘুরে বেড়ান না। সঙ্গীদের সঙ্গে মেলবার জন্যে মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন।

এমন সময় একদিন ক্যাপ্টেন নেমো দেখতে পেলেন, একটা বেলুন জনকয়েক লোক নিয়ে লিঙ্কন দ্বীপে এসে শূন্য থেকে পাক খেতে-খেতে পড়ছে। তিনি তখন ডুবুরির পোশাক প'রে সমুদ্রতীর থেকে খানিক দূরে জলের নিচে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় সাইরাস হার্ডিং বেলুন থেকে জলে প'ড়ে গেলেন। হার্ডিং-এর অবস্থা দেখে তাঁর মমতা হ'ল। হার্ডিংকে জল থেকে উদ্ধার করলেন নেমো।

এর-পর থেকে তাঁর একমাত্র চিন্তা হ'ল, এই পরিত্যক্ত পাঁচজনের কাছ থেকে দূরে

পালানো। কিন্তু তাঁর আশ্রয় থেকে বেরুবার পথ বন্ধ হ'য়ে পড়েছিল। আগ্নেয়গিরির আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার অত্যাচারে গহ্বরের মুখের উপর পাথর নেমে পড়েছিল। ছোটোখাটো জাহাজের পক্ষে গহ্বরের মুখ যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু নটিলাসের পক্ষে সে-পথ কিছুই না। সুতরাং সেখানেই আটকে থাকতে হ'ল তাঁকে।

ক্যাপ্টেন নেমো তখন গোপনে এঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। দেখলেন, এরা সৎ, সহিষ্ণু, পরিশ্রমী, কার্যক্ষম—আর সকলের মধ্যে আশ্চর্য একতা রয়েছে। নেমো ডুবুরির পোশাক প'রে গ্র্যানাইট হাউসের কুয়োর কাছে যেতেন পাহাড়ের গা বেয়ে খানিকটা উঠে; দ্বীপবাসীদের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা হ'ত তা শুনতে। এমনিভাবে একদিন শুনতে পেলেন, দাস-ব্যাবসা বন্ধ করবার জন্যে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বেধেছে। সাইরাস হার্ডিংরা সবাই দাসত্বপ্রথা নিবারণের পক্ষের লোক। কাজে-কাজেই ক্যাপ্টেন নেমোর সহানুভূতি পাওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আগেই বলেছি, নেমো সাইরাস হার্ডিংকে জল থেকে বাঁচিয়েছিলেন। উনিই কুকুর টপকে নিয়ে গিয়েছিলেন চিমনিতে; ঝিলের জল থেকে টপকে তিনিই উদ্ধার করেছিলেন; সমুদ্রতীরে দ্বীপবাসীদের অত্যাবশ্যকীয় জিনিশপত্রে ভরা সিন্দুকদুটিও রেখেছিলেন উনি; ক্যানুটাকে আবার মার্সি নদীর জলে এনে দিয়েছিলেন উনিই; বানরের দল গ্র্যানাইট হাউস আক্রমণ করবার সময় উপর থেকে দড়িটা নিচে ফেলে দিয়েছিলেন উনিই; আয়ারটনের খবর লিখে উনিই সমুদ্রের জলে বোতল ভাসিয়ে দিয়েছিলেন; প্রসপেক্ট হাইটের উপরে যে-আগুন দেখে পেনক্র্যাফ্‌ট পথ চিনেছিল, সে-আগুন উনিই জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন; উনিই প্রণালীর জলে টর্পেডো দেগে দস্যুদলের জাহাজ উড়িয়ে দিয়েছিলেন। হার্বার্টকে সাক্ষাৎ-মৃত্যুর কবল থেকে কুইনাইন এনে দিয়ে রক্ষা করেছিলেন উনিই; উনিই ইলেকট্রিক গুলি মেরে দস্যু পাঁচজনকে হত্যা করেছিলেন: এই ইলেকট্রিক গুলির রহস্য শুধু ওঁরই জানা ছিল, এই গুলি দিয়ে সামুদ্রিক জীবজন্তু শিকার করতেন উনি।

লিঙ্কন দ্বীপে যতগুলো রহস্যময়, অত্যাশ্চর্য, বিস্ময়কর, অতিমানবিক ঘটনা ঘটেছিল, এতদিনে মীমাংসা হ'ল সেগুলোর: সবগুলো ঘটনাতেই ক্যাপ্টেন নেমোর মহত্ত্ব আর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয়চিহ্ন অঙ্কিত।

তবু ক্যাপ্টেন নেমোর মনে দ্বীপবাসীদের আরো উপকার করবার ইচ্ছে হয়েছে, তাদের আরো অনেক বিষয়ে উপদেশ দিতে হবে; তাই গ্র্যানাইট হাউসের লোকদের বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে ডেকে পাঠিয়েছেন এখানে।

...

ক্যাপ্টেন নেমো তাঁর জীবন-কাহিনী শেষ করলে সাইরাস হার্ডিং সকলের তরফ থেকে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

ক্যাপ্টেন নেমো সাইরাস হার্ডিং-এর কথায় কান দিলেন না, শুধু বললেন: 'আমার কাহিনী তো শুনলেন, এখন আমার কার্যকলাপ সম্পর্কে আপনাদের মত কী?'

একটা বিশেষ ঘটনা সম্পর্কেই ক্যাপ্টেন নেমো সকলের মত জানতে চেয়েছিলেন। সেই ফরাশি অধ্যাপক পালিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন নেমোর কাহিনী লিখে যে-বই প্রকাশ করেছিল, সেই বইতে ওই বিশেষ ঘটনাটির উল্লেখ ছিল, আর তা প'ড়ে সারা ইওরোপে তখন একটা

শোরগোল প'ড়ে গিয়েছিল। ফরাশি অধ্যাপক ও তাঁর সঙ্গী দুজন পালিয়ে যাবার কিছুদিন আগে অতলান্তিক মহাসাগরের-উত্তরভাগে নটিলাসকে একটা জাহাজ তাড়া করেছিল—বাধ্য হ'য়ে নটিলাস সেই জাহাজটা ডুবিয়ে দিয়েছিল। সাইরাস হার্ডিং-এর বুঝতে বাকি রইল না যে ক্যাপ্টেন নেমো এই বিশেষ ঘটনাটি সম্পর্কেই তাঁদের মত জানতে চেয়েছেন। হার্ডিং চুপ ক'রে রইলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

তখন ক্যাপ্টেন নেমো আবার বললেন : 'একটা কথা মনে রাখবেন, সেটা ছিল শত্রুজাহাজ। আর ওটাই আগে আমাকে তাড়া করেছিল। তখন আমি ছিলুম একটা সংকীর্ণ উপসাগরের মধ্যে যেখানে জল কম, জাহাজটা আমার পথ আটকে ফেলেছিল। আমি সেটাকে ডুবিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলুম। এখন বলুন, কাজটা কি আমার অন্যায় হয়েছিল, না আমি ঠিকই করেছিলুম ?'

সাইরাস হার্ডিং বললেন : 'দেখুন, আপনার কাজের বিচার করবার অধিকার আমার নেই। মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে কাজের প্রেরণা পায়, তার ফলাফলের বিচারকও ঈশ্বরই। ক্যাপ্টেন নেমো ! আমাদের শুধু এইটুকুই বলার আছে যে, আপনার মতো এমন মহৎ ও উপকারী বন্ধু হারিয়ে আমাদের মনে দারুণ দুঃখ হবে।'

হার্বার্ট ক্যাপ্টেন নেমোর কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে তাঁর হস্তচুম্বন করল। হার্বার্টের মাথায় হাত রেখে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে নেমো বললেন : 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

তখন সকাল হ'য়ে গেছে। কিন্তু সূর্যালোকের একটি কণাও প্রবেশ করল না গহ্বরে। তখন ভরা জোয়ার। গহ্বরের মুখও বন্ধ হ'য়ে গেছে। নটিলাসের বিদ্যুতালোকেই চারদিক আলোয় আলোময়।

ক্যাপ্টেন নেমো উত্তেজনায় ক্লান্ত হ'য়ে সোফার উপর এলিয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রায় অজ্ঞানের মতো প'ড়ে রইলেন তিনি। সাইরাস হার্ডিং আর গিডিয়ন স্পিলেট মনোযোগ দিয়ে ওঁর অবস্থা দেখতে লাগলেন। এ-কথা বুঝতে বাকি রইল না যে, তাঁর শক্তি-সামর্থ্য ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে আসছে। তাঁকে বাঁচানোর আর-কোনো উপায় নেই।

পেনক্র্যাফ্‌ট বললে : 'বাইরে নিয়ে গেলে হয় না ? খোলা হাওয়ায় আর রোদে হয়তো সুস্থ হ'তে পারেন।'

'কোনো লাভ নেই।' ঘাড় নাড়লেন সাইরাস হার্ডিং : 'তাছাড়া নটিলাস ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজি হবেন না উনি। প্রায় বারো বছর ধ'রে উনি একাই নটিলাসে আছেন। ওঁর ইচ্ছে, এই নটিলাসেই যেন ওঁর মৃত্যু হয়।'

সাইরাস হার্ডিং-এর কথা বোধহয় শুনতে পেলেন ক্যাপ্টেন নেমো। মাথা তুলে দুর্বল অথচ স্পষ্ট গলায় বললেন : 'ঠিক, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। নটিলাসেই আমার মৃত্যু হোক এই আমার ইচ্ছে। এখন আমার একটা অনুরোধ আছে। আপনারা কথা দিন যে আমার অন্তিম কামনাটি আপনারা পূর্ণ করবেন, তাহ'লেই আপনাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করা হবে।'

সবাই শপথ করলেন যে তাঁরা ক্যাপ্টেন নেমোর অন্তিম কামনা পূর্ণ করবেন।

তখন ক্যাপ্টেন নেমো বললেন : 'কাল আমার মৃত্যু হবে, আর এই নটিলাসেই হবে আমার সমাধি। আমার বন্ধুবান্ধব সবাই সমুদ্রের অতলে আশ্রয় নিয়েছেন, এই সমুদ্রগর্ভেই

আমারও আশ্রয় হোক। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। গহ্বরের মুখটা ছোটো হ'য়ে গেছে, তাই নটিলাস আটকা প'ড়ে গেছে। তবে, বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব না-হ'লেও জল খুব গভীর এখানে, নটিলাস সহজেই ডুবতে পারবে এবং আমার সমাধি হবে। কাল আমার মৃত্যুর পরে আপনারা নটিলাস থেকে চ'লে যাবেন। এইসব মূল্যবান জিনিশপত্র, আশবাবপত্র ইত্যাদি সমেত নটিলাসও আমার সঙ্গে বিনষ্ট হবে। শুধু একটি উপহার যুবরাজ ডাক্কারের স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে আপনাদের কাছে থাকবে। এই যে বাক্সটা দেখছেন, এর মধ্যে অনেক লক্ষ টাকা দামের অনেকগুলো হিরে-জহরৎ আছে। যাবার সময় এই বাক্সটা আপনারা নিয়ে যাবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনাদের মতো সৎ ব্যক্তি এই টাকা ভালোকাজেই খরচ করবেন। আমার মৃত্যুর পরেও আপনাদের প্রত্যেক কাজে আমি পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে যোগ দেবো। কাল আপনারা এই বাক্সটা নিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে চ'লে যাবেন। তারপর নটিলাসের ডেকের উপর উঠে নিচে দরজাটা একেবারে বন্ধ ক'রে দেবেন।'

সাইরাস হার্ডিং বললেন : 'আপনার সমস্ত আদেশই আমরা পালন করবো।'

'হ্যাঁ ভালো কথা।' ক্যাপ্টেন নেমো বললেন : 'তারপর আপনারা যে-নৌকোটা চ'ড়ে এসেছিলেন, সেই নৌকোয় চ'ড়ে চ'লে যাবেন। যাবার আগে আরেকটা কাজ করবেন। নটিলাসের মুখের কাছে গেলে দেখতে পাবেন, ঠিক জলের সমতলে এক লাইনে দু-পাশে দুটো ফুটো আছে ; সেই ফুটোর মুখ বন্ধ, সেই মুখ খুলে দেবেন। তাহ'লে জল আস্তে-আস্তে নটিলাসের নিচের চৌবাচ্চায় ঢুকবে, আর নটিলাস আস্তে-আস্তে একেবারে ডুবে যাবে। আপনাদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। ততক্ষণে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং আপনারা মৃত ব্যক্তিকেই সমাধিস্থ করবেন। আমার আর কিছু বলবার নেই। আশা করি আমার ইচ্ছেগুলো সব আপনারা পূরণ করবেন।'

সাইরাস হার্ডিং বললেন : 'আমরা কথা দিচ্ছি, আপনার সকল আদেশই পালিত হবে।'

ক্যাপ্টেন নেমো সকলকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর বললেন : 'এখন ঘণ্টাকয়েকের জন্যে আপনারা এ-ঘর থেকে একটু চ'লে যান।'

...

এরপর সবাই খাবার ঘর ও লাইব্রেরি-ঘর থেকে বেরিয়ে এঞ্জিন-ঘরে এসে পৌঁছুলেন। এই ঘরটা ছিল নটিলাসের সামনের দিকে—এই ঘরেই সব যন্ত্রপাতি ছিল। নটিলাসের বিরাট এঞ্জিন-ঘর দেখে সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

দ্বীপবাসীরা নটিলাসের উপরের প্ল্যাটফর্মটাকে উঠলেন। প্ল্যাটফর্মটা জল থেকে সাত ফুট উঁচুতে। সেখানে দেখলেন, খুব পুরু কাঁচের লেন্সের মতো আবরণ দিয়ে ঢাকা, বড়ো-বড়ো চোখের মতো ফুটো রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বার হচ্ছে। এর পিছনেই একটা ঘর। এই ঘরের মধ্যে নটিলাসের হালের চাকা। চালক এই ঘরে উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে নটিলাসকে সমুদ্রগর্ভে চালাতো।

সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। সকলের মন আবেগে ভ'রে আছে। যে-মহাপুরুষ এতকাল নানাভাবে তাঁদের অজস্র উপকার করেছেন, যাঁর সঙ্গে সবেমাত্র তাঁদের পরিচয় হয়েছে, তিনি কিনা মৃত্যুশয্যায়!

আরম্ভের আগে

এই রোমাঞ্চকর উপন্যাসটি জুল ভের্ন-এর 'রবিনসনদের দ্বীপ' নামক অ্যাডভেনচার-পুস্তকের উপসংহার। য়োহান হ্বিস যেখানে 'স্যুইস ফ্যামিলি রবিনসনে'র সমাপ্তি ঘোষণা করেন, জুল ভের্ন তাঁর কাহিনী শুরু করেন ঠিক যেখানে থেকে। সেইজন্যেই এই বইয়ের অপর একটি নামও বৈদেশিক পাঠকমহলে পরিচিত ; তা হ'লো, 'দ্য ফাইনাল অ্যাডভেনচার্স অভ স্যুইস ফ্যামিলি রবিনসন'।

য়োহান হ্বিস-এর এই বিখ্যাত উপন্যাসটি জুল ভের্ন-এব সাহিত্যিক প্রতিভাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিলো। মাত্র কয়েকজন আগ্রহী ও উদ্যোগী ব্যক্তির চেষ্টায় কোনো জনহীন দ্বীপ কী ক'রে মনুষ্যবাসের উপযোগী হ'য়ে ওঠে, য়োহান হ্বিসের গ্রন্থে তার যে-বর্ণনা আছে, তার বিচিত্র ও রোমাঞ্চ-সংকুল সম্ভাবনা জুল ভের্ন-এর কল্পনাকে উত্তেজিত করেছিলো। নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের কথা তাঁর চিন্তাকে অধিকার ক'রে বসেছিলো ব'লেই শেষ পর্যন্ত তিনি এই বই না-লিখে পারেননি।

ইওরোপের শিশুসাহিত্য জুল ভের্ন-এর সাহিত্যিক প্রতিভার কাছে যে-ভাবে ঋণী, তেমন বোধহয় আর-কারুর কাছেই নয়। একের পর এক বিজ্ঞাননির্ভর অ্যাডভেনচার উপন্যাস রচনা করেছিলেন তিনি, তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত মস্ত মাপের উপন্যাস 'বারজাক মিশন' সমেত, তাঁর রচিত গ্রন্থসংখ্যা দুশোকেও অতিক্রম ক'রে যায়। এমন নয় যে তাঁর প্রত্যেকটি কাহিনীই একেবারে প্রথম শ্রেণীর রচনা ; সকল সাহিত্যিককেই, অতিপ্রজ হ'লে, কোনো-না-কোনো বইতে পাঠকের আক্ষেপের কারণ হ'তে দেখা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর যে-কোনো বই-ই কোনো-না-কোনো দিক থেকে আমাদের আকৃষ্ট ক'রে তুলতে পারে। তিনি যে ফরাশি আকাদেমির সভ্য হয়েছিলেন, তার কারণ কি এই নয় যে তাঁর জনপ্রিয়তা ও প্রতিভা তখন পাঠকদের ভিতর নির্দ্বিধায় স্বীকৃত হয়েছিলো ? এখনোও বিশ্বের বহুদেশে তাঁর ভক্তপাঠকেরা 'জুল ভের্ন ক্লাব' স্থাপন ক'রে নানা রকম গবেষণা ও আলোচনা ক'রে থাকেন ; এবং সম্প্রতি আবার যে তাঁর জনপ্রিয়তা সকল মহাদেশেই বেড়ে চলেছে, তার কারণ কি এই নয় যে, তাঁর মৃত্যুর পর অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যেই জগৎ বুঝে নিয়েছে যে, তাঁর উত্তরসূরিগণ কিছুতেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা রাখেন না, এবং বারে-বারে আমরা তাঁর এই রোমাঞ্চকর উপন্যাসগুলি প'ড়ে নিতে পারি। 'বারজাক মিশন' তো বটেই, তাছাড়াও তাঁর অন্য অনেক উপন্যাস, যেমন, 'টোয়েণ্টি থাউজ্যাণ্ড লিগস আণ্ডার দ্য সী', 'অ্যারাউণ্ড দ্য ওয়ার্লড ইন এইটি ডেজ', 'ফ্রম দি আর্থ টু দ্য মুন', 'জার্নি টু দ্য সেণ্টার অব দি আর্থ,' 'মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড', 'অ্যাড্রিফট ইন দ্য প্যাসিফিক', 'দ্য লাইট-হাউস',

'ফাইভ উয়িকস্ ইন এ বেলুন,' 'পারচেজ অভ দ্য নর্থ পোল' প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ এখনো আমদের বিনোদের কারণ হ'তে পারে ।

'স্যুইস ফ্যামিলি রবিনসন' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা অনায়াসেই এই ফাইনাল অ্যাডভেনচার্স প'ড়ে নিতে পারেন । এই উপন্যাসটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব'লেই তার আকর্ষণ স্বতন্ত্র । শুধু যে-টুকু জানা নিতান্তই প্রয়োজন, সংক্ষেপে তারই চুম্বক এখানে দিয়ে দেয়া হচ্ছে ।

'রবিনসনদের দ্বীপে'র গল্প শুরু হয়েছে *ইউনিকর্ন* নামক এক জাহাজের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে । *ইউনিকর্ন* হ'লো একটি ত্রিমাস্তুল ব্রিটিশ জাহাজ, লিউটেনান্ট লিট্‌লস্টোন তার কাপ্তেন । ভারত মহাসাগরের যে-অংশে নিউ-সুইৎজারলাণ্ড অবস্থিত, সেই অঞ্চলে অভিযান-চালানোর ভার ছিলো তাঁর উপর । *ইউনিকর্নে* যাত্রী ছিলেন য়ুলস্টোন পরিবার—স্বামী, স্ত্রী এবং তাঁদের দুই কন্যা—হ্যানা আর ডলি ।

ইউনিকর্ন যখন আবার নোঙর তুললো, হ্যানাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী নিউ সুইৎজারল্যাণ্ডেই থেকে গেলেন । এবার *ইউনিকর্নের* যাত্রী হ'লো ফ্রিৎজ আর ফ্রাংক জেরমাট, এবং জেনি মণ্টরোজ । গন্তব্যস্থল ইংল্যাণ্ড, সেখানে জেনির বাবা কর্নেল মণ্টরোজ আছেন হয়তো, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই যাচ্ছে জেনি । ফ্রিৎজ আর ফ্রাংক যাচ্ছে ব্যাবসা-সংক্রান্ত কাজে । আর ডলি য়ুলস্টোন যাচ্ছিলো তার দাদা জেমসের সঙ্গে দেখা করতে । জেমস বিবাহিত, বছর চার-পাঁচের একটি ছেলেও আছে তাঁর, নাম রবার্ট, ওরফে বব । তিনি সপরিবারে কেপটাউনে থাকেন ।

মিস্টার য়ুলস্টোনের আশা যে, জেমসও সপরিবারে ডলির সঙ্গে নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডে বসবাস করতে চ'লে আসবে । আর বিলেত থেকে ফিরে আসার পর জেনি বিয়ে করবে ফ্রিৎজকে, এইভাবে সেও জেরমাট পরিবারের একজন হ'য়ে উঠবে ।

ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়লো *ইউনিকর্ন* । দ্বীপে যাঁরা থেকে গেলেন, তাঁরা আগ্রহে তার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন । নতুন ঔপনিবেশিক আসবেন কয়েকজন, সেইজন্য দ্বীপটিকে বাসযোগ্য ও স্বচ্ছন্দ ক'রে তোলার জন্য দ্বীপবাসীরা প্রচুর পরিশ্রম করতে লাগলেন । প্রথমেই জমি সেচের জন্যে একটি খাল কাটা হ'লো । মিস্টার য়ুলস্টোন সুদক্ষ এঞ্জিনিয়ার । বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন চতুর ও চিন্তাশীল আরনেস্টের সাহায্যে সহজেই তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে কাজে অনুবাদ ক'রে নিতে পারলেন ।

এখন দ্বীপের বাসিন্দা মাত্র সাতজন । মঁসিয় আর মাদাম জেরমাট, মিস্টার আর মিসেস য়ুলস্টোন, অ্যাডভেনচার ও শিকারপ্রিয় জাক জেরমাট, আরনেস্ট আর তন্বী হ্যানা । আরনেস্ট আর হ্যানা এরমধ্যেই পরস্পরকে ভালোবাসতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো । কোনো সুখী পরিবার বলতে যা বোঝায়, এই সাতজনে দ্বীপে ছিলো ঠিক তা-ই ।

জেরমাটরা নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডে এসেছিলেন দশবছর আগে । এই দশ বছর দ্বীপের অতি অল্প অংশেই তাঁরা পদার্পণ করেছিলেন । এখন স্থির করা হ'লো যে গোটা দ্বীপটিই ভালো ক'রে ঘুরে-ফিরে দেখতে হবে । ছোট্ট জলপোত 'এলিজাবেথ'-এ ক'রে তাই তাঁরা দ্বীপের অজানা উপকূলে অভিযান চালালেন । এইভাবে অভিযান বেরিয়ে নৌ-চালনার উপযোগী ছোট্ট একটি নদী দেখতে পেলেন তাঁরা—জেনির কথা মনে ক'রে এই নদীর নাম দেয়া হ'লো রিভার মণ্টরোজ ।

দ্বীপের দক্ষিণ দিকে ছিলো মস্ত একটি পাহাড় । মিস্টর য়ুলস্টোন আর আরনেস্টের ইচ্ছে ছিলো রিভার মন্টরোজ দিয়ে নৌকোয় ক'রে একেবারে পাহাড়টির পাদদেশে গিয়ে হাজির হন । কিন্তু যাবার সময় পথে মস্ত একটি নিরেট বাঁধ পড়লো ব'লে আস্ত পরিকল্পনাটাই তাঁদের বাতিল ক'রে দিতে হ'লো ।

তারপরে সবাই ফিরে এলেন রক-কাসলে । ফিরতে-না-ফিরতেই শুরু হ'লো মেঘলা, একঘেয়ে, ধূসর বর্ষাকাল—বিষণ্ণতায় ভরপুর । শুধু-তা-ই নয় এবার আগেকার চেয়ে অনেক বেশিবার ঝড় হ'লো, যার ফলে দ্বীপের কতগুলি খামারবাড়ির ভীষণ ক্ষতি হ'য়ে গেলো । বর্ষা-বাদলের ঝমঝমে দিনগুলি শেষ হ'তেই আরেকটি অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হলেন তাঁরা —ঠিক হ'লো, এবার ডাঙা দিয়েই দক্ষিণের সেই পাহাড়টির পাদদেশে গিয়ে হাজির হবেন । জাক আর আরনেস্টকে নিয়ে অভিযানে যাবেন মিস্টার য়ুলস্টোন, আর মহিলাদের নিয়ে রক-ক্যাসলে থাকবেন মঁসিয় জেরমাট—এটাই তাঁরা স্থির করলেন ।

অভিযানকারীদের তিনজনেরই প্রতিজ্ঞা ছিলো, পাহাড়ের শেষচূড়ায় না-উঠে থামবেন না । এই প্রতিজ্ঞা অটুট রাখতে গিয়ে অনেক বাধা-বিপত্তি সহ্য করতে হ'লো তাঁদের । পাহাড়ে শেষ চুড়োয় ব্রিটিশ পতাকা প্রোথিত ক'রে দিলেন তাঁরা, কারণ লিউটেনাণ্ট লিটিলস্টোন আগেই গ্রেটব্রিটেনের নামে নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের স্বত্ব গ্রহণ করেছিলেন । এই সর্বোচ্চ চুড়োটির নাম দেয়া হ'লো জাঁ জেরমাট পীক । ওই চুড়ো থেকেই দুরের সমুদ্রে ত্রিমাস্তুল একটি জাহাজ দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা, তার মাস্তুলে উড়ছিলো ব্রিটিশ নিশান । কিন্তু তাঁদের হতাশ ক'রে কোনো সংকেতের উত্তর না-দিয়েই জাহাজটি দিগন্তের কাছে অন্তর্হিত হ'য়ে গিয়েছিলো ।

অভিযানকারীরা কয়েকদিন দেরি ক'রে ফেলেছিলেন ফিরতে ; সেইজন্যে রক-কাসলের বাসিন্দাদের উদ্বেগের সীমা ছিলো না । শেষকালে যখন মিস্টার য়ুলস্টোন ফিরে এলেন, তখন দেখা গেলো তাঁর সঙ্গে শুধু আরনেস্ট আছে, কিন্তু জাক নেই ।

অ্যাডভেনচারের গন্ধ পেলেই জাকের রক্ত চনচনে হ'য়ে যেতো । তিনটে হাতি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা পথে, অমনি জাক হাতির পিছন-পিছন উধাও হ'য়ে গেলো । মৎলবটা হ'লো অন্য দুটি হাতিকে হত্যা ক'রে বাচ্চা হাতিটিকে ধ'রে নিয়ে আসবে ।

আরনেস্টরা অনেক খুঁজেছিলো তাকে, কিন্তু কোথাও তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না । শেষকালে শোচনীয় কোনো বিয়োগান্ত ব্যাপার ঘটেছে ব'লেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হলেন ।

জাক কিন্তু কয়েকদিন পরে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে ফিরে এলো । কিন্তু সঙ্গে যে-খবর সে আনলে, তাতে মারাত্মক একটি বিপদের পূর্বাভাস থাকলো । তার কথা শুনে বোঝা গেলো যে দ্বীপবাসীদের শান্তি নিরাপত্তার পরিমাণ অতি সীমিত । কেননা জাক জংলিদের হাতে বন্দী হয়েছিলো—সে অবশ্যি তার নির্ভীকতা আর দুঃসাহসের সাহায্যে জংলিদের হাত থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে, তবু সবাই বুঝতে পারলেন যে, এবার জংলিরা প্রমিসড ল্যাণ্ডে মানুষ থাকে জেনে—বন্দীর পলায়নে খাপ্পা হ'য়ে—দ্বীপ আক্রমণ করবে ।

এদিকে *ইউনিকর্নের* তখন ফিরে আসার কথা । অথচ তার কোনো খবরই নেই

কোনোখানে। এমন অবস্থায় দ্বীপের এই সাতজন অধিবাসী দ্বিগুণ উদ্বেগ আর আশঙ্কার ভিতর দিন কাটাতে লাগলো।

এই অতিকায় আতঙ্কের ভিতরেই 'রবিনসনদের দ্বীপ' উপন্যাসটির যবনিকা, পড়েছে। বর্তমান উপন্যাসটির আখ্যানভাগ শুরু হয়েছে ঠিক তার পর থেকেই। পরিণামে তাঁদের কী হ'লো আর দ্বীপের ভিতরেই বা কোন রোমাঞ্চকর আবর্ত রচিত হ'লো—এটাই হ'লো 'দ্য ফাইনাল অ্যাডভেনচার্স অভ স্যুইস ফ্যামিলি রবিনসন'-এর উপজীব্য। জুল ভের্ন-এর বিচক্ষণ কল্পনা যে-ভাবে এই উত্তেজক আখ্যানটিকে নিজের মতো ক'রে সাজিয়ে নিয়েছিলো তা যে-কোনো পাঠকের কাছে আনন্দের কারণ হবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। শিহরণ, রোমাঞ্চ ও বিস্ময়ে এর প্রতিটি অধ্যায়ে ভরপুর—শুধু কেবল এই মন্তব্যটিই আরম্ভের আগে যথেষ্ট।

১

ঝড়, ঢেউ, স্রোত, অন্ধকার

কালো কুচকুচে একটি রাত্রি। সমুদ্র কোথায় আর আকাশ কোথায়—তা-ই বুঝে ওঠা মুশকিল। ভারি মেঘ ঝুলে আছে আকাশে, প্রায় স্রোত ছোঁবে যেন—বাঁকাচোরা, ছেঁড়া, নিচু মেঘ—আর তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মতো বাঁকা বিদ্যুৎ বারে-বারে তাকে চিরে দিচ্ছে। আর তারপরেই গুমগুমে গলায় গম্ভীর বাজেরা গড়িয়ে চ'লে আসছে—একের পর এক। বিদ্যুৎ যখনই চমকে ওঠে, তখনই নিমেষের জন্য উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে শূন্য, বিষণ্ণ ও পরিত্যক্ত দিগন্ত।

ঢেউ নেই, নেই ফেনার কলস্বর, শুধু নিয়মিত ও একঘেয়েভাবে বিদ্যুতের আলোয় কেঁপে-কেঁপে উঠছে জল। একফোঁটাও হাওয়া নেই এই মস্ত মহাসাগরে, এমনকী ঝড়ের রাগি, তাপে ভরা, নিশ্বেস পর্যন্ত না। শুধু বিদ্যুৎ, এই আবহাওয়ায় এত ভীষণভাবে ঢেউ তুলে-তুলে ব'য়ে যাচ্ছে যে শুধু এক-ধরনের ফসফরভরা আলো চুঁইয়ে পড়ছে মেঘ থেকে। চার-পাঁচ ঘণ্টা হ'লো সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু দিনের সেই ঘাম-ঝরানো তাপ এখনও একটুও কমেনি।

নিচু গলায় আস্তে কথা বলছে দুটি লোক—তারা ব'সে আছে একটি মস্ত জাহাজের নৌকোয়, ঠিক মাস্তুলের তলায়। যখনই ঢেউ এসে একঘেয়েভাবে তাকে ধাক্কা দিয়ে যায়, তার পাল যেন ডানার মতো কেঁপে-কেঁপে ওঠে। লোক দুটির মধ্যে একজনে শক্ত ক'রে হাল ধ'রে আছে, যাতে নিষ্ঠুর সেই ঢেউ নৌকোকে উলটে না-দেয়। বয়েস তার চল্লিশ হবে, দোহারা গড়ন, শক্তসমর্থ ; তার আস্ত কাঠামোটাই যেন ইস্পাতে তৈরি, যাকে আজ পর্যন্ত কোনো পরিশ্রম, অনাহার, হতাশা বিচলিত করতে পারেনি ; পরনে তার নাবিকের পোশাক, জাতে ইংরেজ, নাম জন ব্লক। অন্যজনের বয়স আঠারো হবে কিনা সন্দেহ; মোটেই তাকে নাবিকের মতো দেখায় না।

নৌকোর একপ্রান্তে পাটাতনের উপর নিস্তেজভাবে শুয়ে আছে আরো কয়েকজন মানুষ

—জীর্ণ তারা পরিশ্রমে, এখন একেবারে উত্থানশক্তি রহিত ; আর তাদেরই ভিতর রয়েছে একটি বছর পাঁচেকের বাচ্চা ছেলে, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে—চুমো, আদর আর নানারকম ছেলেভুলোনো কথা দিয়েও তার মা তাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছেন না।

মাস্তুলের ঠিক সামনে স্তব্ধ ও অবিচল ব'সে আছে আরো দুজন ; হাতে হাত দিয়ে আছে তারা, বিষাদে আর চিন্তায় ডুবে গেছে সম্পূর্ণভাবে। রাত এত কালো যে কেবল বিদ্যুৎই মাঝে-মাঝে সকলকে উদ্ভাসিত ক'রে দিয়ে যাচ্ছে, না-হ'লে একে-অন্যকে হয়তো দেখতেই পেতো না তারা।

জন ব্লক তার পাশের যুবকটিকে বলছিলো, 'না, না। সন্ধে পর্যন্ত ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখেছি দিগন্তকে—কিন্তু ডাঙার কোনো চিহ্নই চোখে পড়েনি—এমনকী কোনো পাল পর্যন্ত না। কিন্তু আজ সন্ধেবেলায় চোখে পড়লো না ব'লেই যে কাল সকালে কিছুই দেখতে পাবো না, এমন-তো কোনো কথা নেই।'

'কিন্তু যদি আর দু-দিনের মধ্যে আমরা ডাঙায় পৌঁছুতে না-পারি, তো সকলেই একেবারে শেষ হ'য়ে যাবো।'

'তা ঠিক।' জন ব্লক সায় দিলে। 'ডাঙাকে দেখা দিতেই হবে—দিতেই হবে। দেশ, মহাদেশ, দ্বীপ—এ-সব তা না-হ'লে আছে কী করতে ? নিশ্চয়ই মানুষকে আশ্রয় দেবার জন্যে—কাজেই শেষকালে নিশ্চয়ই ডাঙায় পৌঁছুনো যাবে।'

'যদি অবশ্য হাওয়া সাহায্য করে।'

'হাওয়ার তো জন্মই হয়েছে সেইজন্যে।' জন ব্লক উত্তর দিলে, 'আজকে, আমাদের দুর্ভাগ্যের দরুন, তা নিশ্চয়ই ব্যস্ত ছিলো অন্যখানে—অতলান্তিক কি প্রশান্ত মহাসাগরে হয়তো। কিন্তু, দেখো, কাল নিশ্চয়ই হাওয়া আমাদের ডাঙায় পৌঁছিয়ে দেবে।'

'নয়তো গিলে খাবে আস্ত।'

'না, না, তা হ'তেই পারে না ! আমাদের উদ্ধারের যত পথ আছে, তার মধ্যে এইটেই হ'লো সবচেয়ে খারাপ।'

'কে জানে কী আছে আমাদের ভাগ্যে ?'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ ব'সে জলের টুকরো-টুকরো আওয়াজ শুনতে লাগলো, তারপর তরুণটি আবার জিগেস করলে, 'কাপ্তেন কেমন আছেন ?'

'কাপ্তেন গুড দিব্যি ভালোমানুষটি, অথচ শয়তানগুলো কিনা তাঁকেও বরদাস্ত করলে না। ভালো নেই তিনি—মাথায় যে-ক্ষতটা আছে তা তাঁকে ব্যথায় এতটাই দুমড়ে দিয়েছিলো যে তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠেছিলেন। আর সব কিনা করলে সেই অফিসারটি, যাঁর উপর তাঁর আস্থা ছিলো অবিচল—সে-ই কিনা সবাইকে খেপিয়ে তুললে ! না, না ! তুমি ঠিক দেখো একদিন ওই বোরাপ্ট—আস্তে একটা রাস্কেল লোকটা—ঘুরপাক খেতে-খেতে নরকে আছড়ে পড়বে—'

'জানোয়ার ! আস্ত একটা জানোয়ার !' রাগে তরুণটির হাত নিশপিশ ক'রে উঠলো। 'বেচারি হ্যারি গুড ! সন্ধের সময় আজ তুমি তাঁর ক্ষতে পট্টি বেঁধে দিয়েছো তো, ব্লক ?'

'হ্যাঁ, ব্যানডেজ বেঁধে দেবার পর আস্তে ক'রে আবার যখন গলুইয়ের কাছে তাঁকে শুইয়ে

দিলাম, আস্তে, ক্ষীণগলায় তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিলেন—যেন আমি সাড়ে-সাত লক্ষ ধন্যবাদ চেয়েছিলাম ! "আর ডাঙা ? ডাঙার কী হ'লো ?" জিগেস করেছিলেন তিনি । আমি সোজা ব'লে দিলাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কাপ্তেন, যে ডাঙা নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও আছে —হয়তো কাছেই আছে ।" আমার দিকে একবার তাকিয়ে তিনি আস্তে-আস্তে চোখ বুজে ফেললেন ।' তারপরে সে গলা নামিয়ে স্বগতোক্তি শুরু ক'রে দিলে, 'ডাঙা ? ডাঙা ? বোরাপ্ট আর তার সাগরেদরা ভালোই জানে কী তাদের আসল মৎলব । যখন আমাদের ডেকের তলায় ঘরের ভিতর বন্দী ক'রে রেখেছিলো, তখনই তারা জাহাজের দিক পালটে দিয়েছিলো । এই নৌকোটায় ক'রে আমাদের নামিয়ে দেবার আগে কয়েকশো মাইল অন্য পথে জাহাজ চালিয়েছে তারা—শেষকালে এমন-এক জায়গায় এসে আমাদের নামিয়ে দিয়েছে, ক্বচিৎ যেখান দিয়ে জাহাজ যায় ।'

তরুণটি এতক্ষণ হেলান দিয়েছিলো; এবার হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে কী-যেন শোনবার চেষ্টা করতে লাগলো । 'তুমি কিছু শুনতে পাওনি, ব্লক ?' জিগেস করলে সে ।

'না, কিছুই না । এমনকী জলের ছল্‌লোচ্ছল শব্দও আর নেই তো এখন—যেন জলের বদলে আস্ত সমুদ্রটাই হঠাৎ তেলতেলে হ'য়ে গেছে ।'

তরুণটি আর-কোনো কথা না-ব'লে বুকের উপর হাত রেখে আবার আগের মতো হেলান দিয়ে বসলে । আর ঠিক এমন সময়ে যাত্রীদের ভিতর একজন উঠে ব'সে হতাশ গলায় বললে, 'এর চেয়ে বরং মস্ত এক ঢেউ এসে এই নৌকোটাকে আস্ত গিলে ফেলুক —অনাহারে মরার চেয়ে তা অনেক বেশি ভালো । কালকেই তো সব রসদ ফুরিয়ে যাবে —কুটোটি পর্যন্ত থাকবে না যে মুখে দেয়া যাবে ।'

'আগামী কাল হ'লো আগামী কাল, মিস্টার য়ুলস্টোন ।' ব্লক উত্তর দিলে, 'নৌকোটা যদি উলটে যায় তো আগামী কাল ব'লে আর-কিছুই থাকবে না । অথচ যতদিন আগামী কাল আছে—'

'ব্লক ঠিক কথাই বলেছে,' তরুণটি উত্তর দিলে, 'আমাদের আশা ছেড়ে দিলে চলবে না, জেমস । বিপদ যতই ভীষণভাবে ভয় দেখাক না কেন, আমরা ভগবানের হাতে আছি —যা তিনি ভালো মনে করেন, তা-ই তো হবে । একমাত্র তিনিই তো আমাদের সঙ্গে আছেন এখন—আর আমরা যদি তার বদলে এভাবে তাঁর উপর রাগ ক'রে বসি, তাহ'লে অন্যায় করা হবে ।'

জেমসের মাথা ঝুঁকে এলো, ফিশফিশ ক'রে বললেন, 'জানি, কিন্তু সবসময়ে যে নিজের উপর আস্থা রাখতে পারি না ।'

আরেকজন যাত্রী—বয়স তার প্রায় ত্রিশ ; এতক্ষণ সে গলুইয়ের কাছে ব'সে ছিলো —জন ব্লকের দিকে এগিয়ে এলো । 'আমাদের হতভাগ্য কাপ্তেন যখন থেকে আমাদের সঙ্গে একই নৌকায় নিক্ষিপ্ত হয়েছেন—তাও তো প্রায় এক সপ্তাহ হ'য়ে গেলো—তখন থেকে তুমিই তাঁর স্থান অধিকার করেছো । কাজেই আমাদের প্রাণ এখন তোমার হাতেই নির্ভর করছে । সত্যি বলো, তোমার কি কোনো আশা আছে এখনও ?'

'আমার কোনো আশা আছে কি না ?—নিশ্চয়ই আছে । আমি ঠিক জানি হাওয়া আসবে একটু পরে—এবং নিরাপদে বন্দরে পৌঁছিয়ে দেবে ।'

'নিরাপদে বন্দরে পৌঁছিয়ে দেবে ! এই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি ক'রে সেই যাত্রীটি তন্নতন্ন ক'রে কালো রাতকে খুঁজে দেখলো, ধারে-কাছে কোথাও কোনো আলোর রেখা দেখা যায় কিনা ।

আবার বললে ব্লক, 'এটা তো ঠিক যে বন্দর আছে কোনোখানে । আমাদের শুধু তার দিকে নৌকোটাকে চালিয়ে নিতে হবে—আর হাওয়া এসে পালগুলি ফাঁপিয়ে দিয়ে সাহায্য করবে আমাদের । আমি যদি ভগবান হতুম তো এখুনি আধ-ডজন দ্বীপ বানিয়ে দিতুম নৌকোর চারপাশে—সবগুলি দ্বীপ তৈরি থাকতো আমাদের সুবিধের জন্য ।'

'এতটা অবশ্য আমরা চাচ্ছি না, ব্লক,' না-হেসে থাকত পারলে না যাত্রীটি ।

'আগে থেকেই আছে এমন কোনো দ্বীপের দিকে যদি তিনি নৌকোটিকে নিয়ে যান, তাহ'লেই যথেষ্ট হবে—আমাদের জন্যই দ্বীপ বানাতে হবে, এমন আবদার অবশ্য তাহ'লে আর করবো না । তবে সমুদ্রের এখানটায় তিনি বড্ড কৃপণের মতো দ্বীপ বানিয়েছেন, এটা বলতেই হয় !'

'কিন্তু আমরা এখন কোথায় আছি ?'

'তা জানি না । এটা তো জানেনই যে, গোটা একটা সপ্তাহ আমরা বন্দী হ'য়ে ছিলাম, কাজেই জাহাজটি কোন পথে চলেছিলো, উত্তরে না দক্ষিণে, তা কিছুই বুঝতে পারিনি । তবে গন্তব্যস্থল থেকে যে অনেক দূরে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ।'

'তা তো জানি—কিন্তু কোন দিকে গিয়েছিলাম আমরা ?'

'তা আমার কিছুই জানা নেই । ভারত মহাসাগরে না-গিয়ে জাহাজ কি প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়েছিলো ? যেদিন বোরাপ্ট বিদ্রোহ করলে, সেদিন আমরা মাদাগাস্কার ছাড়িয়েছিলাম । কিন্তু তারপর থেকে তো হাওয়া কেবল পশ্চিম দিক থেকেই বয়েছে—হয়তো সেখান থেকে কয়েকশো মাইল দূরে চ'লে এসেছি আমরা, সেণ্ট পল আর আমস্টারডামের দ্বীপগুলির দিকেই হয়তো এসেছি !'

'যেখানে কেবল ভীষণ জংলিরা ছাড়া আর কোনো জনমানব থাকে না,' জেমস য়ুলস্টোন মন্তব্য করলেন, 'কিন্তু, তাহ'লেও, যে-লোকগুলি আমাদের জাহাজ থেকে নামিয়ে দিলে, তারাও মোটেই ভালো ছিলো না ।'

'একটা বিষয় ঠিক জানি,' ব্লক ঘোষণা করলে । 'হতভাগা বোরাপ্ট নিশ্চয়ই *ফ্ল্যাগ*-এর গতিপথ বদলে দিয়ে এমন দিকে জাহাজ চালিয়েছিলো, যেখানকার সমুদ্রে আস্তানা নিলে শাস্তির হাত এড়িয়ে ভালোভাবেই বোম্বেটেগিরি করা যায় । কাজেই মনে হয় আসল পথ থেকে অনেক দূরে এসে সে আমাদের নৌকোয় ক'রে নামিয়ে দিয়েছিলো । কিন্তু এখানে কোনো দ্বীপে গিয়ে নৌকো ঠেকলে ভালো হ'তো—এমনকী জনশূন্য কোনো দ্বীপ হ'লেও ক্ষতি নেই । মাছ ধ'রে আর শিকার ক'রেই দিন কাটানো যাবে— হয়তো কোনো মস্ত গুহা পাবো আস্তানা হিশেবে ।*ল্যাণ্ডলর্ড* জাহাজের লোকেরা যে-ভাবে নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড বানিয়েছে, আমরাও হয়তো সে-রকম ক'রে বানিয়ে নিতে পারবো এই দ্বীপ । মাথা খাটিয়ে, পরিশ্রম ক'রে, সাহস আর গায়ের জোরে—'

'খুব সত্যি,' জেমস য়ুলস্টোন ব'লে উঠলেন, 'কিন্তু *ল্যাণ্ডলর্ড* তার যাত্রীদের একটা দ্বীপে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো । শুধু তা-ই নয়, জাহাজের সব মালপত্রও বাঁচাতে পেরেছিলো

তারা। আর আমরা ? *ফ্ল্যাগ*-এর একটা জিনিশও আমরা পাবো না কোনোকালে !'

হঠাৎ আলোচনায় বাধা প'ড়ে গেলো। কাতর একটি স্বর শোনা গেলো অন্ধকারে : 'জল ! একটু জল !'

'কাপ্তেন গুডের গলা।' যাত্রীদের একজন ব'লে উঠলো, 'জ্বরে একেবারে খেয়ে ফেলছে তাঁকে ! ভাগ্যিশ প্রচুর জল আছে, তাই —'

'ওটা আমার কাজ,' বললে ব্লক, 'একজন কেউ এসে একটু হালটা ধরো। জলের কলসটা কোথায় আমি জানি, কয়েক ফোঁটা জল খেলেই কাপ্তেন একটু সুস্থ বোধ করবেন।' এই ব'লে সে নৌকোর গলুইয়ের দিকে এগিয়ে গেলো। অন্য তিনজন চুপ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগলো। দু-তিন মিনিট পরেই সে ফিরে এসে আবার হাল ধ'রে বসলো।

'কেমন আছেন কাপ্তেন ?' একজন জিগেস করলে।

'আমার আগেই আরেকজন গিয়ে পড়েছিলো,' ব্লক উত্তর দিলে, 'মেয়েদের মধ্যে একজন দেখলাম তাঁর মুখে জল ঢেলে দিচ্ছেন। ঘামে ভিজে গিয়েছিলো কপাল, ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছিয়েও দিয়েছেন তা। কাপ্তেন গুডের জ্ঞান আছে কিনা, জানি না। প্রলাপ বকছেন মনে হ'লো, ডাঙার কথা বলছিলেন তিনি। "সামনেই ডাঙা থাকা উচিত," এই কথাই বলছেন বারে-বারে, আর নির্জীবভাবে হাতটা শূন্যে উঠে দিকনির্দেশ করার চেষ্টা করছে। "ঠিক বলেছেন, কাপ্তেন। কাছেই কোথাও ডাঙা আছে। শিগগিরই সেখানে গিয়ে পৌঁছুবো আমরা। ডাঙার গন্ধ পাচ্ছি আমি, নিশ্চয়ই উত্তরে কোনো দ্বীপ আছে।" এই কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। আমরা যারা অনেক দিন থেকে জাহাজে কাজ করছি, আমরা দূর থেকেই ডাঙার গন্ধ পাই। আরো বললাম, "আপনি একটুও অস্বস্তি বোধ করবেন না, কাপ্তেন —সব ঠিক আছে। শক্তই আছে নৌকোটা, ঠিকভাবে যাতে চলে আমি সেইজন্যে হাল ধ'রে থাকবো। নিশ্চয়ই অনেক দ্বীপ আছে এদিকে—হয়তো শেষকালে মুশকিলই পড়বো কাকে ছেড়ে কাকে রাখি। যেটায় সুবিধে হবে, সেটাতেই নৌকো বাঁধবো আমরা—আর দ্বীপের লোকেরা আমাদের নিশ্চয়ই স্বাগত জানিয়ে আশ্রয় দেবে—সেখান থেকেই আবার আমরা গন্তব্যের দিকে রওনা হ'তে পারবো।" মনে হয়, আমার কথা তিনি সবই বুঝতে পারলেন। যখন লণ্ঠনটা মুখের কাছে তুলে ধরলাম, দেখলাম মুখে তার হাসির রেখা ফুটে উঠেছে —বিষাদে-ভরা কী শুকনো হাসি ! তারপরে আবার আস্তে ক'রে চোখ বুজে প'ড়ে থাকলেন, মনে হ'লো তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন। ডাঙার কথা বলার সময় নিশ্চয়ই অনেক মিথ্যে বলেছি আমি—এমন ভঙ্গি করেছি যেন কয়েক মাইল দূরেই আস্ত একখানা মহাদেশ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। কিন্তু সেটা কি আমার দোষ হ'লো ?'

'না, ব্লক,' তরুণটি উত্তর করলে, 'এই ধরনের মিথ্যে কথাই ভগবান পছন্দ করেন।'

এর পরেই কথাবার্তা সব থেমে গেলো ; সব স্তব্ধ—শুধু মাঝে-মাঝে মস্ত পালটা আছড়ে পড়ছে মাস্তুলের গায়ে—তা-ও নৌকো যখন ঢেউয়ের আঘাতে একদিকে কাৎ হ'য়ে যায়। নিরবচ্ছিন্ন দুশ্চিন্তা, পথশ্রম, আর দীর্ঘ উপবাস সকলকেই কাতর ক'রে ফেলেছিলো— অনেকেই তারা গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়ে সব ভয়-ভাবনা ভুলে গেলো। এই অসুখী লোকগুলির কাছে যেটুকু জল আছে, তাতে আরো কয়েক দিন কাটিয়ে দেয়া হয়তো যায়,

কিন্তু আগামী দিনগুলো যে কী ক'রে তুমুল খিদের হাত থেকে বাঁচবে, তা কেউ জানে না। কয়েক সের নোনা মাংস ছুঁড়ে ফেল দেয়া হয়েছিলো নৌকোয়—এখন তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। নৌকোয় লোক আছে এগারোজন, অথচ শুধু একটা থ'লে ভর্তি সমুদ্রের বিস্কুট ছাড়া আর-কোনো খাবারই নেই। সমুদ্র যদি এমনি শান্ত নিশ্চল থাকে, তবে তারা বাঁচবে কী ক'রে ? এই দমবন্ধ আবহাওয়াকে গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় হাওয়ার ক্ষীণতম নিশ্বাসও কাঁপিয়ে দিয়ে যায়নি—কোনো মুমূর্ষু যখন শ্বাসকষ্ট হ'লে হাপরের মতো শব্দ ক'রে হাওয়া নিতে চায়, যদি পারতো তো গোটা সমুদ্রই হয়তো সেইভাবে হাওয়ার জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠতো। আবহাওয়া যদি এমনিই থাকে, তাহ'লে অনাহারে মৃত্যু ছাড়া আর-কোনো গতি নেই--আর তারও যে খুব-একটা দেরি হবে, তাও মন হয় না।

তখনকার দিনে বাষ্পচালিত নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা হয়নি। কাজেই হাওয়ার অভাবে কোনো জাহাজই যে এদিকে আসবে না, হাওয়া না-থাকায় নৌকোটিও যে ডাঙায় পৌঁছুতে পারবে না—এ-তো একেবারে সুনিশ্চিত-প্রায়।

এই নিদারুণ হতাশার সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে চাই শুধু ভগবানের উপর পূর্ণ আস্থা, আর নয়তো জন ব্লকের এই দুর্মর আশাবাদ ; সে তো যেন পণ ক'রে আছে যে কোনো-কিছুর উজ্জ্বল দিক ছাড়া আর-কিছুই সে গ্রাহ্য করবে না। এমনকী এই আবস্থাতেও সে স্বগতোক্তি ক'রে চলেছে একটানা : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি জানি ; এমন-একটা সময় আসবে যখন শেষ বিস্কুটটাও গলাধঃকরণ করা হ'য়ে যাবে ; কিন্তু যতক্ষণ উদর ব'লে জিনিশটা আছে, ততক্ষণ কোনো যথোচিত খাদ্য না-পেলেও গাঁইগুঁই করা উচিত নয়। কেননা যথেষ্ট খাদ্য আছে অথচ উদর ব'লেই কোনো কিছু নেই—তার চেয়ে নিশ্চয়ই এমন অবস্থা অনেক ভালো!'

দুই ঘণ্টা কেটে গেলো। এতক্ষণ তবু সমুদ্রের ফেঁপে-ওঠা ঢেউয়েরা নৌকোকে কাঁপিয়ে দিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে যেতো কিন্তু এখন তাও নেই—নৌকো যেখানে ছিলো, সেখানেই আছে। জলের কোনো গতি আছে কিনা দেখবার জন্য কাল কয়েক টুকরো কাঠকুঠো জলে ফেলে দেয়া হয়েছিলো ; সেগুলো এখনও নৌকোর পাশে-পাশে ভেসে আছে। আর পালটাও একবারও এতটা ফোলেনি যে নৌকোকে ঠেলে নিয়ে যায় সামনে। এমনি যখন নিস্তরঙ্গ অবস্থা, তখন হাল ধ'রে ব'সে থাকার কোনোই অর্থ হয় না। কিন্তু নির্দিষ্ট আসনটি ছেড়ে উঠতে একটুও ইচ্ছে হয় না ব্লকের। হাল ধ'রে থেকে অন্তত নৌকোটিকে বারে-বারে কাৎ হওয়ার হাত থেকে বাঁচানো যেতে পারে।

রাত তখন তিনটে, এমন সময় জন ব্লকের মনে হ'লো তার চিবুক ছুঁয়ে হালকা একটু হাওয়া যেন ব'য়ে গেলো দিগন্তের দিকে। উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে আপন মনেই সে বললে, 'তবে কি হাওয়া এলো এতক্ষণে ?' দক্ষিণ দিকে ফিরে তাকালে সে, একটা আঙুল মুখে পুরে ভিজিয়ে নিয়ে সেটা বাড়িয়ে থাকলো সামনে। একটু ঠাণ্ডা লাগলো আঙুলে, আর ঝাপসা একটা চ্ছলোচ্ছল শব্দ ভেসে এলো দূর থেকে। মাঝখানের বেঞ্চে যে-যাত্রীটি একজন মহিলার পাশে ব'সে ছিলো তার দিকে ফিরে তাকালে সে। 'মিস্টার ফ্রিৎজ!' ব্লক ডাক দিলে।

ফিৎজ রবিনসন মাথা তুলে ঘুরে তাকালে। 'কী ব্যাপার, ব্লক ?'

'ওদিকে তাকিয়ে দেখুন তো—পুবদিকে ।'

'কেন ? কী আছে সেদিকে ?'

'জলরেখা বরাবর তাকিয়ে দেখুন — একটা বন্ধনীর মতো জায়গায় অন্ধকার কি একটু পাৎলা নয় ?'

সত্যিই দিগন্তের কাছে সেদিকে একটু বেশি আলো দেখা গেলো—সমুদ্র থেকে আকাশকে সেখানে স্পষ্ট রেখায় আলাদা ক'রে নেয়া যায় । যেন ওই পাৎলা আলোভরা জায়গাটুকু কুয়াশা, বাষ্প, হাওয়ার তৈরি একটি গোল বৃত্তের মতো দাঁড়িয়ে আছে ।

জন ব্লক ঘোষণা করলে, 'ওই-যে হাওয়া এলো !'

'ভোরবেলাকার পূর্বাভাসও তো হ'তে পারে,' যাত্রীটি সন্দেহ প্রকাশ করলে ।

'হ্যাঁ, দিনের আলো হ'তে পারে অবশ্য, কিন্তু এখনও সকাল হ'তে অনেক বাকি আছে তবে হাওয়াও তো হ'তে পারে ! এইমাত্র আমার দাড়ির ভিতর দিয়ে ক্ষীণ-একটা কাঁপুনি ব'য়ে গেলো—এই দেখুন এখনও কাঁপছে দাড়ি । পাল ফাঁপিয়ে দেবার মতো হাওয়া নয় হয়তো, কিন্তু গত চব্বিশ ঘণ্টায় যেমন ছিলো, তার চেয়ে এখন হাওয়ার জোর অনেক বেশি । কানে হাত চাপা দিয়ে শুনুন আপনি—তাহ'লে নিশ্চয়ই হাওয়ার শব্দ শুনতে পাবেন ।'

ফ্রিৎজ একটু ঝুঁকে প'ড়ে বললে, 'তুমি ঠিকই বলেছো, ব্লক । হাওয়াই বটে ।'

'আর তার জন্যে আমরা একেবারে পাল তুলে দিয়ে তৈরি হ'য়ে আছি ।'

'কিন্তু এই হাওয়া আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে ?'

'যেদিকে অভিরুচি । আমি শুধু চাই কোনোরকমে এই অভিশপ্ত সমুদ্রের হাত থেকে রেহাই পেতে ।'

কুড়ি মিনিট কেটে গেলো । হাওয়ার স্রোত আস্তে-আস্তে ঘুরে-ঘুরে ছুটে এলো নৌকোর দিকে, জলের শব্দও আগের চেয়ে বেড়ে গেলো অনেক । নৌকো কয়েকবার কেঁপে উঠলো—ঢেউয়ের জন্যে নয়, হাওয়ার জন্যে । পালের ভাঁজগুলি খুলে ছড়িয়ে গেলো আস্তে-আস্তে, কিন্তু এখনও হাওয়া তাকে পুরোটা ভ'রে দিতে পারলে না । তার জন্যে সময় চাই, আর চাই প্রতীক্ষার ক্ষমতা ।

পনেরো মিনিট পরে পাৎলা একটি জাগরণ দেখে বোঝা গেলো ধীরে-ধীরে আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে । আর ঠিক এমন সময়েই গলুইয়ের কাছ থেকে একজন যাত্রী উঠে ব'সে পুবদিকের মেঘের রাশির দিকে তাকিয়ে জিগেস করলে, 'হাওয়া এলো কি তবে ?'

'হ্যাঁ,' ব্লক উত্তর দিলে । 'এবার মনে হচ্ছে তাকে পাওয়া গেছে—মুঠোর ভিতর পাখির মতো—আর তাকে ছেড়ে দেয়া চলবে না ।'

মেঘের ভিতর দিয়ে ধীরে-ধীরে এগিয়ে এলো হাওয়া, আর এলো প্রথম আলোর বাঁকা রশ্মির ঝিলিক । দক্ষিণ দিকে পুব থেকে পশ্চিমে—পাঁজা-পাঁজা ভারি মেঘ ঝুলে আছে তখনও, তখনও নৌকো থেকে বেশি দূরে তাকিয়ে দেখা যায় না—আর আশপাশে কোথাও কোনো জাহাজের চিহ্নই নেই । ক্রমশ যখন হাওয়া বেড়ে উঠলো, ব্লক পালটিকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ ক'রে সব কিছু ঠিকঠাক ক'রে দিলে । তারপরেই হাওয়ায় ফেঁপে গেলো সেই মস্ত শাদা নিশেনের মতো পালটি, আর নৌকোটি তার নাক ডুবিয়ে দিলে প্রথম ঢেউয়ে —যেন ডানা মেলে এগিয়ে এলো কোনো শুভ্র মরাল ।

একটু-একটু ক'রে লাল ছোপ লাগলো আকাশে, আর মেঘেরা জানলার পাল্লার মতো খুলে গিয়ে উন্মোচিত ক'রে দিলো এক আরক্তিম আকাশ । আবার আরেকবার ডাঙায় গিয়ে পৌঁছুবার আশা ফিরে এলো যাত্রীদের মনে, 'নয়তো একটু পরেই কোনো জাহাজের সঙ্গে হয়তো দেখা হ'য়ে যেতে পারে ।'

পাঁচটার সময় রঙিন মেঘেরা কেঁপে-কেঁপে দূরে স'রে গিয়ে আকাশের অনেকখানি উন্মোচিত ক'রে দিলে — যেন ধীরে-ধীরে কোনো মঞ্চের উপরকার যবনিকা স'রে গেলো —এখন আসল নাটক শুরু হবে । দিন ফুটে উঠলো ধীরে-ধীরে, উষ্ণ মণ্ডলের জ্যোতির্ময় প্রভাতবেলা । দিগন্তের কাছে জলের তলা থেকে উঠে এলো জ্বলজ্বলে লাল রশ্মিরা, যেন কোনো মস্ত পাখনা ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে গেলো আকাশে । গোল, নিটোল, বিপুল এক জ্বলজ্বলে রেকাবির মতো ধীরে-ধীরে উঠে এলো সূর্য, দিগন্তকে ছুঁয়ে সে স্পষ্ট একটি রেখা এঁকে সমুদ্র আর আকাশকে ভাগ ক'রে দিলো । তক্ষুনি আলোর রশ্মিরা রঙ ছিটিয়ে দিলো ঝুলে-থাকা মেঘের রাশিতে, লাল রঙের যত-রকম ছায়া আছে সব যেন ফুটে উঠলো মেঘের গায়ে কিন্তু যত বাষ্প গিয়ে উত্তরে জমা হয়েছিলো, কিছুতেই আলো তাকে ভেদ করতে পারলো না, তাই সামনের দিকে কিছুই দেখতে পাবার উপায় থাকলো না । সবুজ জলের উপর শাদা ফেনার দীর্ঘ রেখা এঁকে রাজহাঁসের মতো এগিয়ে এলো নৌকো ।

আর তারপরেই দিগন্তের কাছে পুরো উঠে এলো সূর্য, আরো-বড়ো দেখালো তাকে এখন, আরো-লাল, আরো-জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো রশ্মিরা—এত উজ্জ্বল যে চোখ ধাঁধিয়ে দিলো প্রায় । নৌকোর উপরে সবাই চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হ'লো সেই গরীয়ান অভ্যুত্থান থেকে । শুধু উত্তরের দিকেই তাকাতে পারে তারা এখন—কিন্তু কুয়াশা এখন পর্দার মতো সেদিকে যে কী ঢেকে রেখেছে, কিছুই বোঝার উপায় নেই ।

অবশেষে, ঠিক সাড়ে-ছটার সময়, যাত্রীদের একজন ধীরে-ধীরে যখন মাস্তুলের ডগায় চ'ড়ে বসলো ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখার জন্যে, অমনি একটানে পুবদিকের সব কুয়াশাকে সরিয়ে দিলো সূর্য । আর কলস্বরে সে চেঁচিয়ে উঠলো : 'ডাঙা ! ডাঙা !'

২

ঝড়ের নখ, ঝড়ের থাবা

ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে *ইউনিকর্ন* যেদিন নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড থেকে রওনা হয়েছিলো, সেটা ছিলো অক্টোবরের কুড়ি তারিখ । সে ফিরে গেলে পর সেনাবাহিনী থেকে নতুন উপনিবেশের অধিকার নেবার জন্যে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে, তখন উত্তমাশা অন্তরীপে কয়েকদিনের জন্যে থেমে, তাকে ফ্রিৎজ আর ফ্রাংক জেরমাট, জেনি মণ্টরোজ আর ডলি য়ুলস্টোনকে নিয়ে ফিরে আসার কথা । য়ুলস্টোন পরিবার যে-দুটো বার্থ নিয়েছিলেন, সেই দুটো বার্থই নিয়েছিলো দুই ভাই—য়ুলস্টোনরা তো এখন দ্বীপেই থেকে গেলেন, কাজেই বার্থ

দুটো ফাঁকাই ছিলো। যে-কামরাটায় সুখ-সুবিধে বেশি, সেটা থাকলো জেনি আর তার ছোট্ট সঙ্গিনী ডলির জন্যে—ডলি কেপটাউন যাচ্ছে ; জেমস য়ুলস্টোন, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর ছেলের কাছে।

আবহাওয়ার জন্যে পথে দেরি হয়েছিলো, কিন্তু অবশেষে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে কেপটাউনে নোঙর ফেললো *ইউনিকর্ন*—এক সপ্তাহ সে থাকবে এখানে। প্রথম যে-ব্যক্তি জাহাজে তার আত্মীয়স্বজনের কাছে দেখা করতে এলেন তাঁরই নাম জেমস য়ুলস্টোন। মা-বাবা আর তাঁর দুই বোন এই জাহাজে ক'রে আসছেন, এই খবর পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু জাহাজে উঠে কেবলমাত্র ছোট্ট এক বোনকে দেখে তিনি যে কী-রকম বিস্মিত ও হতাশ হলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। ফ্রিৎজ আর ফ্রাংক জেরমাটের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলে ডলি।

আলাপ হবার পর ফ্রিৎজ তাঁকে সবিস্তারে নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের কথা খুলে বললে। 'আপনার মা-বাবা ও বোন হ্যানা এখন নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডে আছেন, মিস্টর য়ুলস্টোন। বারো বছর আগে *ল্যাণ্ডলর্ড* জাহাজের দুর্দশার পর ওই অজানা দ্বীপটায় গিয়ে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম। আপনার মা-বাবা সেখানেই থাকবেন ব'লে ঠিক করেছেন—এবং আপনিও সেখানে বসবাস করতে যাবেন ব'লে তাঁরা আশা করেন। ইওরোপ থেকে ফেরবার সময় *ইউনিকর্ন* আপনাকে সপরিবারে সেই দ্বীপে নিয়ে যাবে—অবশ্য আপনি যদি যেতে রাজি থাকেন, তবেই।'

'*ইউনিকর্ন* কবে কেপটাউনে ফিরবে?' জেমস য়ুলস্টোন জানতে চাইলেন।

'আট-ন মাসের মধ্যেই। তারপর সোজা যাবে নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডে—আমরা গিয়ে দেখবো সেখানে তখন ব্রিটিশ নিশেন উড়ছে। আমার ভাই ফ্রাংক আর আমি লণ্ডনে কর্নেল মণ্টরোজ-এর কাছে তাঁর মেয়েকে পৌঁছিয়ে দিতে যাচ্ছি—আশা করি তিনিও তাঁর মেয়েকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে এই নতুন উপনিবেশে যেতে রাজি হবেন।'

জেমস বললেন, 'বেশ। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখি—মনে হয় তিনি রাজি হবেন। আমার নিজের তো কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এখন আপনারা আমার বাড়িতে চলুন—*ইউনিকর্ন* যে ক-দিন এখানে থাকবে, সেই ক-দিন আমার আতিথ্য গ্রহণ করলে, আমরা খুব সুখী হবো।'

ইউনিকর্ন কেপটাউনে থাকলো দশ দিন—অর্থাৎ সাতাশে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই দশ দিনে সকলের মুখেই নতুন উপনিবেশের সব খুঁটিনাটি আর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলেন জেমস। এবং, বলাই বাহুল্য, সব শুনে তাঁরা নতুন দ্বীপে যাবার জন্যে মন স্থির ক'রে ফেললেন। এই আট-ন মাসে ব্যাবসা গুটিয়ে নিয়ে সব টাকাকড়ি তুলে নিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হবেন তিনি—*ইউনিকর্ন* ফিরে এলেই সপরিবারে গিয়ে উঠবেন জাহাজে।

সাতাশে ডিসেম্বর যখন *ইউনিকর্ন* ফের রওনা হ'লো, তখন আবহাওয়ার অবস্থা মোটেই ভালো না। সেইজন্যেই ১৪ই ফেব্রুআরির আগে চেষ্টা ক'রেও ইংল্যাণ্ডে পৌঁছনো গেলো না। পোর্টমাউথে নোঙর ফেলতেই লণ্ডন যাবার জন্য বড্ড ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো জেনি --সেখানে তার খুড়ি থাকেন। কর্নেল যদি এখনো অবসর না-নিয়ে থাকেন তাহ'লে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে আছেন—কেননা যে-কাজের জন্যে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, তা আরো

কয়েকবছরের আগে শেষ হবে না। তবে অবসর গ্রহণ ক'রে থাকলে নিশ্চয়ই তিনি ভ্রাতৃবধূর কাছাকাছি থাকারই চেষ্টা করবেন—আর তাহ'লে *ডোরকা* জাহাজের বিপর্যয়ের পর যাকে তিনি মৃত ব'লে ভেবেছিলেন, তার সঙ্গে তাঁর আবার সাক্ষাৎ হবে।

জেনির সঙ্গে ফ্রিৎজ-এর বিয়ে ঠিক হ'য়ে আছে—কিন্তু শুধু-যে সেই কারণে, তা-ই নয়, লণ্ডনে তাদেরও কিছু-কিছু টুকরো কাজ আছে ব'লে জেনির সঙ্গে ফ্রিৎজ আর ফ্রাংক লণ্ডন চ'লে এলো। তারা যেদিন লণ্ডন পৌঁছুলো, সেদিন ফেব্রুআরির ২৩ তারিখ।

জেনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে লণ্ডনে তার জন্যে তীব্র এক দুঃসংবাদ অপক্ষো করছে। তার খুড়ি জানালেন যে গত অভিযানে শোচনীয়ভাবে নিহত হয়েছেন কর্নেল, 'আহা, মৃত্যুর আগে তিনি জানতেও পারলেন না যে যার মৃত্যু-সংবাদ শুনে তিনি দুঃখে-শোকে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, 'সে আসলে মরেনি—বেশ ভালোভাবেই বেঁচে আছে।' ভারত মহাসাগরের সুদূর সবুজ জলরাশি থেকে এতদূরে এলো তাঁকে দেখার জন্যে, বিয়ের আগে নিতে এলো তাঁর আশীর্বাদে, অথচ জেনি কিনা তাঁকে আর-কোনোদিনই দেখতে পাবে না! শোকে-দুঃখে-বিবাদে সে একেবারে ভেঙে পড়লো; ব্যর্থ হ'লো তার খুড়ির সব সান্ত্বনাবাক্য, মিথ্যেই ফ্রিৎজ তার দুঃখ নিজের ব'লে ভাগ ক'রে নিলে। মর্মান্তিক এই আঘাত—স্বপ্নেও সে ভাবেনি যে তার বাবা এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন।

কয়েকদিন পরে একদিন ফ্রিৎজ আর জেনিতে কথাবার্তা হচ্ছিলো—কথা বলতে-বলতে জেনির গলা ধ'রে আসে, চোখ জলে ভ'রে যায়, আর এক আকুল বিষাদ তাকে স্তব্ধ ক'রে দেয়।

'ফ্রিৎজ, তুমি না-থাকলে এত-বড়ো দুঃখের আঘাত আমি সামলাতে পারতুম কী ক'রে! সমানভাবে তুমি আমার দুঃখ ভাগ ক'রে নিয়েছো! এই দুঃসংবাদের পরেও যদি তোমার মন বদলে গিয়ে না-থাকে—'

'কী বলছো তুমি, জেনি! আমি—'

'জানি আমি, ফ্রিৎজ! কিন্তু আমি কী করবো বলো? কিছুই আর ভাবতে পারছি না আমি। বাবা বেঁচে থাকলে তোমাকে দেখে কী সুখীই না হতেন! আমি ঠিক জানি তিনি আমাদের সঙ্গে নতুন দ্বীপে গিয়ে বসবাস করতে রাজি হতেন। কিন্তু ততটা সুখ কি আমার সইতো! এখন কিনা জগতে আমি একেবারেই একা—নিজের উপরেই কিনা আমাকে নির্ভর করতে হবে এখন! একা! না তো—তুমি তো আছো ফ্রিৎজ! আমাকে তুমি ক্ষমা করো—আমার মাথার ঠিক নেই।'

'জেনি, তোমাকে যদি একটুও সুখী করতে পারি, তাহ'লেই আমার তৃপ্তির শেষ থাকবে না!'

'কিন্তু আমাকে পেয়ে কি তুমি সুখী হবে, ফ্রিৎজ? এখন তো আর বাবা বেঁচে নেই, এমন-কোনো আত্মীয়ই নেই যে যাঁর সম্মতি নিতে হবে, কাজেই এখন আমার দায়িত্ব আরো বেশি—'

'কিন্তু বার্নিং রকে যে-দিন তোমাকে পেলাম, সেদিন কি তুমি আমাদের গোটা পরিবারকেই পাওনি? কে বললে তুমি একা? ওরা তো সবাই আছে।'

'তাঁদের সবাইকে আমি ভালোবাসি, ফ্রিৎজ। এও জানি যে, তাঁরাও আমাকে সকলেই

ভালোবাসেন। আর কয়েকমাস পরেই তো আমরা ফিরে যাবো —'

'বিয়ের পর নিশ্চয়ই ?'

'যদি তুমি চাও, তাহ'লে তা-ই হবে ফ্রিৎজ।'

তারপর থেকে জেনি তার কাকার বাড়িতেই থাকলো। আর এই ফাঁকে ফ্রিৎজ আর ফ্রাংক তাদের জরুরি কাজগুলো সেরে নিলে। তাছাড়া তাড়াতাড়ি ক'রে বিয়েরও ব্যবস্থা করা দরকার।

দ্বীপে যে-সব জিনিশ পাওয়া গিয়েছিলো, মুক্তো প্রবাল নানারকম দামি পাথর সব বিক্রি ক'রে আট হাজার পাউণ্ড পাওয়া গেলো—স্পষ্ট বোঝা গেলো মঁসিয় জেরমাটের আন্দাজ মোটেই ভুল হয়নি। এই টাকা দিয়ে মঁসিয় জেরমাটের নির্দেশ মতো রক্-কাসল আর প্রমিস্‌ড্ ল্যাণ্ডের পথের জন্যে জরুরি নানা জিনিশ কিনে নেয়া হ'লো। এতে প্রায় এক চতুর্থাংশ টাকা গেলো। বাকি টাকাটা জমা দেয়া হ'লো ব্যাংক অভ ইংল্যাণ্ডে—কর্নেল মন্টরোজ-এর জমিজমা বিক্রি ক'রেও প্রায় হাজার পাউণ্ড পাওয়া গেলো; সেই টাকাটাও ওই সঙ্গে ব্যাংকে জমা দেয়া হ'লো। হিশেবটা থাকলো মঁসিয় জেরমাটের নামে। অদূর ভবিষ্যতে যখন রাজধানীর সঙ্গে উপনিবেশের যোগাযোগ সুনিয়মিত হবে, তখন প্রয়োজন মতো এই টাকা তুলে জিনিশপত্র কেনাকাটা করা হবে।

ল্যাণ্ডলর্ড জাহাজে যে সব হিরে-জহরৎ ছিলো সে-সব সরকারের হাতে তুলে দিয়ে যথাযোগ্য মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হ'লো।

আর ঠিক একমাস পরে একদিন *ইউনিকর্নের* বিশপমশাইয়ের তত্ত্বাবধানে লণ্ডনের একটি গির্জেয় ফ্রিৎজ আর জেনির বিয়ে হ'য়ে গেলো। এই জাহাজেই বাগ্‌দত্ত অবস্থায় এসেছে তারা—এই জাহাজেই ফিরে যাবে বিবাহিত অবস্থায়—কাজেই জাহাজের পাদ্রিমশাইকেই তারা অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপনের জন্যে অনুরোধ করেছিলো।

ভারত মহাসাগরের এক অজ্ঞাতদ্বীপে একটি পরিবার বারো বছর কাটিয়েছে, জেনির রোমাঞ্চকর অ্যাডভেনচার ও বার্নিং রকে তার আবাস—এইসব খবর ইংল্যাণ্ডে প্রচুর উত্তেজনা ও কৌতূহলের সঞ্চার ক'রে দিলে। জাঁ জেরমাট নিজেদের কাহিনী নিয়ে যে-উপন্যাসটি লিখেছিলেন, বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষায় তার তর্জমা বেরিয়েছিলো, এবং তার নাম দেয়া হয়েছিলো *দ্য সুইস ফ্যামিলি রবিনসন*। ডানিয়েল ডিফোর অপর উপন্যাসটির মতো এই বইটির খ্যাতিও অচিরেই সারা জগতে ছড়িয়ে পড়লো। আর এইসবেরই যোগ্য ফলাফল হিশেবে কর্তৃপক্ষ নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। ঠিক হ'লো, কয়েক মাসের মধ্যেই লিউটেনান্ট লিটলস্টোনের—এবার তাঁকে কাপ্তেন ক'রে দেয়া হ'লো—নেতৃত্বে *ইউনিকর্ন* পুনরায় নতুন দ্বীপের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়বে। ফ্রিৎজ আর জেনি আর ফ্রাংক জেরমাটও যাবে ওই জাহাজে—পথে কেপটাউন থেকে জেমস, সুসান আর ডলি যুলস্টোনকে তুলে নেবে।

জুন মাসের ২৯ তারিখের সকালবেলায় *ইউনিকর্ন* আবার নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়লো—তার মাস্তুলে উড়তে লাগলো ব্রিটিশ পতাকা; এই পতাকাটিই নতুন দ্বীপের মাটিতে প্রোথিত করা হবে ব'লে ঠিক ছিলো।

ইউনিকর্নের একটি কামরা ফ্রিৎজ আর জেনিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো—ঠিক তার

পাশের কামরাটাই ছিলো ফ্রাংকের। ক্যাপ্তেন লিট্‌লস্টোনের টেবিলেই তারা আহার গ্রহণ করতো। পথে বিশেষ কিছুই ঘটলো না, যথাসময়ে—অগস্টের ১০ তারিখে—কেপটাউনে পৌঁছুলো *ইউনিকর্ন*, কিন্তু কতগুলি অনিবার্য কারণে অক্টোবরের শেষভাগের আগে তার পক্ষে নোঙর তোলা সম্ভব হবে না—এই তথ্যটি যখন যাত্রীরা জানতে পারলো, তখন তাদের ভালো লাগলো না। নতুন দ্বীপে ফিরে যাবার জন্যে তাদের মন কেমন করছিলো। সৌভাগ্যবশত, বন্দরে আরেকটি জাহাজ ছিলো তখন, তার নাম *ফ্ল্যাগ*—পনেরো দিনের মধ্যেই সে রওনা হবে। পাঁচশো টনের একটি ত্রিমাস্তুল জাহাজ, তার কর্তা হলেন, ক্যাপ্তেন হ্যারি গুড ; সানডে আইল্যাণ্ডের বাটাভিয়ার উদ্দেশে রওনা হবেন তিনি—যদি যোগ্য পারিশ্রমিক পান, তবে পথে তিনি অনায়াসেই নতুন দ্বীপে তাদের তিনি নামিয়ে দিতে পারেন —এই তিনি জানিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজি হ'য়ে গেলো তারা— ২০শে আগস্ট সন্ধেবেলায় সকলে ক্যাপ্তেন লিট্‌লস্টোনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নতুন জাহাজে গিয়ে উঠে বসলো,—অবশ্য নভেম্বরের শেষে ক্যাপ্তেন লিট্‌লস্টোনও তাঁর জাহাজ নিয়ে সেই দ্বীপে গিয়ে হাজির হবেন—কাজেই এই বিচ্ছেদ তো নেহাৎই সাময়িক।

পরদিন সকালবেলায় *ফ্ল্যাগ* অনুকূল বাতাসে পাল তুলে রওনা হ'য়ে গেলো—একটুপরেই কালো একটি ফুটকির মতো মিলিয়ে গেলো দিগন্তে।

নাবিক হিশেবে হ্যারি গুড যথেষ্ট সুনাম পেয়েছিলেন—নির্ভীক তিনি, বিপদের সময়েও মাথা ঠাণ্ডা ক'রে চলতে পারেন। বয়েস তাঁর বিয়াল্লিশ—তাঁর যোগ্যতায় কর্তৃপক্ষের আস্থা ছিলো অবিচল। *ফ্ল্যাগ*-এর সেকেণ্ড অফিসারের নাম ছিলো রবার্ট বোরাপ্ট, কর্তৃপক্ষ কিন্তু তার প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারও বয়েস ওই রকমই, ঈর্ষাপরায়ণ, রাগি, বদমেজাজি, নিষ্ঠুর। তার ধারণা যে সে তার যোগ্যতার যথার্থ প্রশংসা পেলো না কোনোদিনই—আর এইজন্যেই বুকের ভিতর হিংসা আর রাগ পুষতো সে। কিন্তু তার এই গোপন দ্বেষ জন ব্লকের চোখ এড়ায়নি—সে নিতান্তই এক সাধারণ খালাশি, নির্ভীক ও ক্যাপ্তেনের অনুরক্ত।

ফ্ল্যাগ-এর খালাশিরা কেউই প্রথম শ্রেণীর ছিলো না। রবার্ট বোরাপ্ট তাদের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা দিয়ে তাদের প্রায় হাত ক'রে এনেছিলো, এমনকী কর্তব্যে অবহেলা করলেও সে তাদের কিছুই বলতো না। এইসব কিছুই ব্লকের চোখ এড়ায়নি, কিন্তু সে ভেবেছিলো বিপদের সম্ভাবনা দেখলে পরেই ক্যাপ্তেনকে সাবধান ক'রে দেবে।

২২শে আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের নয় তারিখ পর্যন্ত এমন-কিছুই ঘটলো না, যাকে উল্লেখযোগ্য বলা চলে। সমুদ্র আর আবহাওয়া সমভাবেই প্রসন্ন—যদি ঠিক এইভাবে এগিয়ে যেতে পারে, তাহ'লে অক্টোবরের মাঝামাঝি নাগাদ যাত্রীরা নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডে পৌঁছে যাবে। কিন্তু ঠিক এই সময়েই খালাশিদের মধ্যে বিক্ষোভের নানা চিহ্ন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠলো। দেখা গেলো যে জাহাজের নিয়মকানুন কিছুই মানতে চাচ্ছে না তারা, আর রবার্ট বোরাপ্টও এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ জানাচ্ছে না। সেপ্টেম্বরের নয় তারিখে *ফ্ল্যাগ* প্রায় ভারত মহাসাগরের মধ্যভাগে এসে পড়লো, ঠিক মকরক্রান্তিবৃত্তের উপরে—২০.১৭ অক্ষাংশ ও ৮০.৪৫ দ্রাঘিমা। আগের রাতে খারাপ আবহাওয়ার লক্ষণ দেখা গেছে ; হঠাৎ ব্যারোমিটার নেমে গেছে, ঝোড়ো মেঘ ছুটে এসেছে হাতির পালের মতো কালো শুঁড় বাড়িয়ে—আর দুটোই হ'লো রাগি হারিকেনের চিহ্ন, যা এই অঞ্চলে প্রায়ই বিভীষিকার সৃষ্টি ক'রে তোলে।

প্রায় তিনটের সময় বিকেলের দিকে আচমকা ঝড় এসে হাজির—এমনভাবে জাহাজের ঝুঁটি ধ'রে সে নড়াতে লাগলো, যে *ফ্ল্যাগ* প্রায় কাৎ হ'য়ে ডুবে যায় আর-কি। কোনোভাবেই প্রতিরোধ করা গেলো না মত্ত ঢেউকে, সমুদ্রের দয়ার হাতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকলো না। ঝড় শুরু হ'তেই যাত্রীরা নিজেদের কামরায় চ'লে গিয়েছিলো, কেননা ডেকের উপরে থাকা তখন খুব বিপজ্জনক—ঢেউ এসে একেবারে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চ'লে যাবে। শুধু ফ্রিৎজ আর ফ্রাংক নাবিকদের সাহায্যে করবার জন্য কামরার বাইরে থেকে গেলো।

সেই মারাত্মক মুহূর্তে একটু ভুলচুক হ'লেই জাহাজটি ডুবে যেতে পারে, তা-ই কাপ্তেন গুড প্রত্যেককে সাবধানে নির্দেশ দিতে লাগলেন। কিন্তু তবু ভয়ানক একটি ত্রুটি ঘটলো, যার জন্যে একমাত্র রবার্ট বোরাপ্টই দায়ী। উঁচু মাস্তুলের পালটাকে এমন-এক মুহূর্তে টাঙিয়ে দেয়া হ'লো যে জাহাজটি প্রায় ডোবে আর-কি! মস্ত এক ঢেউ তুমুল জলরাশি নিয়ে উঠে গেলো জাহাজের উপর, আর আরও কাৎ হ'য়ে পড়লো *ফ্ল্যাগ*।

'বোরাপ্ট দেখছি আমাদের ডুবিয়ে মারতে চাচ্ছে!' কাপ্তেন গুড চেঁচিয়ে উঠলেন।

'তা-ই যদি তার মৎলব থাকে তো সে ব্যর্থ হয়নি,' স্টারবোর্ডের উপরে আঁটো ক'রে হাত ধ'রে ছিলো ব্লক, সে বললে এই কথা।

কাপ্তেন তাড়াতাড়ি ডেকের দিকে লাফিয়ে গেলেন—যে-কোনো মুহূর্তে ঢেউ এসে তাঁকে ভাসিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তবু তিনি নিজের বিপদকে গ্রাহ্যই করলেন না। মরীয়ার মতো লড়াই করতে-করতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। গিয়েই রাগি গলায় ব'লে উঠলেন, 'তোমার ঘরে চ'লে যাও—ঘরে গিয়ে সেখানেই ব'সে থাকো চুপ ক'রে।'

বোরাপ্টের ভুলটি এতই সাংঘাতিক ছিলো যে, খালাশিরা কেউই কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস পেলো না—অথচ তারা তখন বোরাপ্টের কথাতেই ওঠ-বোস করে, সে বললে তক্ষুনি হয়তো তারা বিদ্রোহ ক'রে বলতো। কিন্তু বোরাপ্ট সেই আদেশ অমান্য না-ক'রে নিজের ঘরের দিকে ফিরে গেলো।

সেই অবস্থায় যা-কিছু মানুষের সাধ্যে কুলোয়, সব ক্যাপ্তেন গুড করলেন। ক্ষিপ্র একটি নেকড়ের মতো তিনি যেন প্রায় একাই একশো হ'য়ে উঠলেন। তাঁরই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে জাহাজ আবার খাড়া হ'য়ে উঠলো, কিন্তু ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি একটুও থামলো না, আর ঝড়ও তিনদিন ধ'রে সমানে একটা রাগি বাঘের মতো গর্জাতে লাগলো। এই তিনদিন মেয়েরা একবারও কামরা থেকে বেরুতে পারলো না, কিন্তু ফ্রিৎজ, ফ্রাংক আর জেমস য়ুলস্টোন বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে যথাসাধ্য সাহায্য করলেন।

অবশেষে সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে ঝড়ের রোষ একটু ক'মে গেলো। প'ড়ে গেলো হাওয়া; সমুদ্র অবশ্য তখনই শান্ত হ'লো না, কিন্তু ঢেউয়ের আক্রোশ আগের চেয়ে অনেকটাই ক'মে গেলো। মেয়েরা সবাই কামরা থেকে চট ক'রে বেরিয়ে এলো। কাপ্তেনের সঙ্গে বোরাপ্টের যে মনোমালিন্য হ'য়ে গেছে, এবং তার ফলে বোরাপ্টকে এই ক-দিনের জন্যে কর্মচ্যুত করা হয়েছে, এটা সবাই জানতো। দেশে ফিরে গেলে নৌবাহিনীর আদালতে বোরাপ্টের বিচার হবে, সেখানেই নিয়ন্ত্রিত হবে তার ভবিষ্যৎ। তারই গাফিলতির জন্যে পালের ক্যানভাসের নানা জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছিলো, তার মেরামতের ভার যাদের উপর পড়েছিলো ব্লকের উপর নির্দেশ এলো তাদের তদারকি করার। সে গিয়ে স্পষ্ট দেখলো যে

খালাশিরা সকলেই আগুনের পাহাড়ের মতো গর্জাচ্ছে—যে-কোনো মুহূর্তে বিদ্রোহের সূত্রপাত হ'তে পারে ।

এই অবস্থা ফ্রিৎজদেরও চোখ এড়ায়নি ; ঝড় তাদের যতটা ভাবিয়ে তুলেছিলো, তার চেয়েও অনেক বেশি ঘাবড়ে গেলো তারা । কাপ্তেন গুড অবশ্য বিদ্রোহ দমনের জন্যে কঠোর হ'তে দ্বিরুক্তি করবেন না, কিন্তু এখন কি বড্ড বেশি দেরি হ'য়ে যায়নি ?

পরবর্তী সপ্তাহে কিন্তু মোটেই কোনোকিছু ঘটলো না, সব যথারীতি নিয়মমাফিক চলতে লাগলো । আরো পুবদিকে এগিয়ে গেলো *ফ্ল্যাগ*, নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড যে-দেশান্তরে অবস্থিত ঠিক সেই দাঘিমারেখায় এসে পড়লো সে । কিন্তু ২০শে সেপ্টেম্বর বেলা দশটার সময় বোরাপ্ট সকলকে অবাক ক'রে দিয়ে ডেকে এসে হাজির । এইজন্যেই সবাই অবাক হ'লো যে তখনও তার বন্দী হ'য়ে থাকার কথা । যাত্রীরা সবাই ডেকে ব'সে গল্প করছিলো, তাকে দেখেই সকলের মুখ কালো হ'য়ে গেলো, মুহূর্তে ঠোঁটের উপর তাদের সব কথা ম'রে গেলো । অবস্থা যে সঙিন হ'য়ে উঠেছে, এটা বুঝেই সকলের ভয় যেন অসীমে পৌঁছুলো ।

কাপ্তেন গুড তৎক্ষণাৎ বোরাপ্টের দিকে এগিয়ে গেলেন । 'মিস্টার বোরাপ্ট,' তিনি বললেন, 'আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । অথচ আপনি এখানে এসেছেন কেন ? উত্তর দিন আমাকে ।'

'দিচ্ছি উত্তর,' ব'লেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'বন্ধুগণ, এক্ষুনি চ'লে এসো ।'

জাহাজের প্রতিদিক থেকে সমস্বরে বোরাপ্টের জয় ঘোষিত হ'লো । শুনেই, কাপ্তেন গুড ছুটে চ'লে গেলেন নিজের কামরায়, পরক্ষণেই একটি পিস্তল হাতে ফিরে এলেন আবার । কিন্তু পিস্তলটি ব্যবহার করবার আর সময় পেলেন না তিনি । তৎক্ষণাৎ বোরাপ্টের পিছন থেকে একটি নাবিক তাঁর মাথা তাগ ক'রে গুলি ছুঁড়লো । হাত থেকে খ'সে পড়লো তাঁর পিস্তল, তৎক্ষণাৎ তিনি ব্লকের বাহুতে ঘুরে পড়লেন ।

খামকাই অন্যরা প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলে । গোটা জাহাজশুদ্ধু লোকের বিপক্ষে জন ব্লককে নিয়ে ফ্রিৎজরা মাত্র চারজন—কাপ্তেন গুড তো রক্তস্রাবে হতচেতন । দশ মিনিটের মধ্যেই বিদ্রোহীরা তাদের জিতে নিলে : কাপ্তেন শুদ্ধু তাদের সকলকে ডেকের তলায় একটা ঘরে গোরুভেড়ার মতো ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়া হ'লো । আর জেমসের বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে ডলি এবং সুসানকেও একটা কামরায় বন্দী হ'য়ে থাকতে হ'লো, আর শুধু তা-ই নয়, বোরাপ্টের নির্দেশে কড়া পাহারার ব্যবস্থা হ'তে একটুও দেরি হ'লো না ।

উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় কাতর হ'য়ে পড়লো সবাই । এক-এক ক'রে সেই বন্ধ ঘরে কেটে গেলো সাতদিন—শুধু জলের শব্দ আর বাইরে নাবিকদের হল্লা ছাড়া আর-কিছু শোনা যায় না, শুধু বোঝা যায় যে জাহাজটি পুরোদমে এগিয়ে চলেছে । কিন্তু সে-যে কোন দিকে যাচ্ছে, কত মাইল পেরুচ্ছে দিনে—তা কিছুই বোঝার উপায় থাকলো না । দিনের মধ্যে দুইবার মাত্র দরজা খোলে দু-তিন মিনিটের জন্যে—খাবার পৌঁছিয়ে দেয়া হয় তাদের, তারপর আবার যেমনকে-তেমন ।

সাতদিন পরে কিন্তু হঠাৎ সবাই বুঝতে পারলে যে, জাহাজ জলের উপর থেমে গেলো । সবাই সচমকে দেখলে, তৎক্ষণাৎ খুলে গেলো তাদের ঘরের দরজা, আর তাদের নির্দেশ

দেয়া হ'লো বেরিয়ে আসতে । ডেকের উপর এসে তারা দেখলে, মেয়েদেরও তেমনি বের ক'রে আনা হয়েছে । আর জাহাজের একপাশে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে মস্ত একটা নৌকো, দড়ি দিয়ে সে জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ।

এক-এক ক'রে সবাইকে নামিয়ে দেয়া হ'লো নৌকোয় । তখন সূর্য ডুবছে দিগন্তে, বাঁকাভাবে লাল রশ্মিগুলো এসে পড়লো বোরাপ্টের চোখমুখে যখন সে ডেক থেকে কিছু খাবার দেবার নির্দেশ দিলে । রক্তের মতো লাল রশ্মিগুলো তাকে টকটকে তাজা রক্তে ছুপিয়ে দিয়েছে । খাবার নামিয়ে দেবার পরেই তার সংকেত পেয়ে একটি নাবিক যে-দড়ি দিয়ে নৌকোটা বাঁধা ছিলো, সেটা কেটে দিলে । তারপরেই অজগরের গর্জনের মতো ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ ক'রে ঘুরে গেলো জাহাজের চাকা—একটু পরেই সন্ধের অন্ধকার সেই আস্ত জাহাজটিকে তার জঠরে পুরে নিলে । শুধু রইলো নৌকোটা, আর মস্ত সমুদ্র, আর তার ফেনিল শ্যামল জলরাশি—দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ও অবারিত ।

৩

যবনিকা কম্পমান

মাস্তুলের উপর থেকে 'ডাঙা ! ডাঙা !' ব'লে যে চেঁচিয়ে উঠেছিলো, সে হ'লো ফ্রাংক । সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো সে মাস্তুলের ডগায়, দেখতে পেলো আস্তে ক'রে যেন স'রে গেলো দিগন্তের কুয়াশা, আর আবছাভাবে জেগে উঠলো তীরভূমির বাঁকা, কালো রেখা । আর সেইজন্যেই আড়ভাবে বসানো মাস্তুলের সেই কাঠটায় ব'সে সে অপলকে তাকিয়ে থাকলো উত্তরদিকে যে-দিকে কুয়াশা একবার স'রে গিয়ে তাকে নিমেষের জন্যে এক শ্যামল উদ্ভাস দেখিয়ে দিয়েছিলো । আরেকবার যখন আবার সেই শ্যামলতা তার চোখের সামনে উন্মোচিত হ'লো, দশ মিনিট কেটে গেছে । এবার আর একটুও দেরি না-ক'রে সে তরতর ক'রে নিচে নেমে এলো ।

'ডাঙা দেখতে পেয়েছিস ?' তক্ষুনি ফ্রাংক তাকে জিগেস ক'রে বসলো ।

'হ্যাঁ, ওই দিকে । ওই-যে ঘন মেঘ ঝুলে আছে এখন দিগন্তে, তারই আড়ালে লুকিয়ে আছে তীরভূমির কালো রেখা ।'

'ঠিক জানেন আপনার কোনো ভুল হয়নি, মিস্টার ফ্রাংক ?' জন ব্লক জিগেস করলে ।

'না, না, ব্লক, আমার মোটেই ভুল হয়নি । মোটেই বিভ্রম নয়, কিংবা নয় মেঘের কোনো চাতুরী । এখন অবশ্য আবার মেঘ এসে তাকে পর্দার মতো ঢেকে আছে, কিন্তু বাজি রেখে বলতে পারি তারই আড়ালে লুকিয়ে আছে ডাঙা । স্পষ্ট দেখলাম আমি, কিছুতেই ভুল হয়নি আমার ।'

জেনি উঠে দাঁড়িয়ে তার স্বামীর বাহু চেপে ধরলে । 'ফ্রাংক যা বললে, তা-ই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে । তার চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ—আমার মনে হয় না এত-বড়ো একটা ভুল করবে সে ।'

'কোনো ভুল করিনি আমি,' তক্ষুনি ফ্রাংক ব'লে উঠলো, 'স্পষ্ট আমি দেখতে পেলাম কালো একটি পাহাড় উঠে গেছে সমুদ্র থেকে । একটা জায়গায় জানলার মতো কপাট খুলে দিয়েছিলো মেঘ, আর তারই ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ডাঙার সেই শ্যামল প্রতিশ্রুতি। পুবে না পশ্চিমে, কোন দিকে সে গেছে তা আমি জানি না ; কিন্তু দ্বীপই হোক কি মহাদেশই হোক, ডাঙা ওদিকে আছে, তা নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি ।'

যে-কথাটা ফ্রাংক এত জোর দিয়ে বলছে, সেটা তারা এখন আর অবিশ্বাস করে কীভাবে ? নৌকো তীরে ভিড়লে পরেই জানা যাবে, এই তীরভূমি কোন দেশের । কিন্তু যে-দেশই হোক না কেন তক্ষুনি সেই তীরভূমিতে নামা হবে ব'লে সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলা হ'লো । যদি এই তীরভূমি বাসযোগ্য না-হয়, যদি জীবনধারণের কোনো উপকরণই পাওয়া না যায় এখানে, কিংবা জংলিদের জন্যে তীরভূমির আশ্রয় সাংঘাতিক ও বিপজ্জনক হ'য়ে পড়ে, তখন না-হয় আবার এই বিপুল জলধিতে নৌকো ভাসিয়ে দেয়া যাবে ।

তক্ষুনি কাপ্তেন গুডকে খবরটা জানিয়ে দেয়া হ'লো ; শুনেই তিনি সব ব্যথা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও জেদ ধ'রে বসলেন তাঁকে গলুইয়ের ধারে নিয়ে যাবার জন্যে ।

কুয়াশার আড়াল যে-শ্যামল দেশ তাদের জন্যে ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এই সংকেত পাঠিয়ে দিলে, ফ্রিৎজ তার সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য করতে লাগলো। 'এই মুহূর্তে যে-খবরটা আমাদের কাছে সবচেয়ে জরুরি তা হ'লো এই : ডাঙা এখান থেকে কত দূরে ? মাস্তুলের ডগা থেকে তাকে দেখেছিলো ফ্রাংক, আর আবহাওয়াও কুয়াশায় ঝাপশা—কিন্তু সব ধরলেও দূরত্ব বোধহয় বারো থেকে পনেরো মাইল হবে । এদিকে এখন হাওয়া বইছে উত্তরমুখো, কাজেই ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বোধহয় তীরে পৌঁছুনো যাবে ।'

'দুর্ভাগ্যবশত,' ফ্রাংক বললে, 'হাওয়ার মেজাজ খুব অনিশ্চিত—যে-কোনো মুহূর্তেই সে বেঁকে বসতে পারে । যদি হাওয়া একেবারেই ক'মে না-যায় তো দিকবদল ক'রে বসবে ব'লেই আমার আশঙ্কা ।'

'দাঁড়গুলোর কথা তো আমরা ভুলে যাইনি,' তৎক্ষণাৎ ফ্রিৎজ তার মুখের কথা কেড়ে নিলে, 'আমি, ফ্রাংক, আর জেমস এই তিনজনের বৈঠা চালাবো, আর ব্লক হাল ধরবে তা-ই না, ব্লক ? অন্তত ঘণ্টা কয়েক তো বৈঠা চালাতে পারবো আমরা ।'

'এক্ষুনি দাঁড় বাওয়া শুরু ক'রে দাও,' আবছা গলায় কাপ্তেন গুড জানালেন । এখন তিনি যে বৈঠা হাতে নেবার মতো অবস্থায় নেই, এটা সত্যিই তাদের দুর্ভাগ্য । তাহ'লে চারজনের হাতে দাঁড় থাকলে ব্লক নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবেই নৌকোটিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতো । তাছাড়া সকলেই খুব স্বাস্থ্যবান ও পরিশ্রমী হ'লে হবে কি, অনাহারে ও পরিশ্রমে সবাই এখন ক্লান্ত ও দুর্বল। *ফ্ল্যাগ* থেকে নামিয়ে দেবার পর এক সপ্তাহ গেছে এই উদ্বেগ ও পরিশ্রমের ভিতর । কম ক'রে খেয়েও খাবারে মোটেই কুলোয়নি—মাত্র একদিনের উপযোগী খাদ্য আছে এখন তাদের হাতে । তিন-চার বার অবশ্য তারা এরই মধ্যে নৌকোর দাঁড় ব্যবহার ক'রে সমুদ্রের মাছ ধরেছে, কিন্তু সম্পত্তি বলতে এখন যা তাদের আছে তা হ'লো এই : একটি উনুন, ছোট্ট একটি সসপ্যান আর কয়েকটা ছোট্ট পকেট-ছুরি । ওই তীরভূমি যদি কেবল একটি খাড়া পাথুরে পাহাড় হয়, তাহ'লে তো আবার ভাসতে হবে এই নৌকোয় ক'রে এই বিপুল জলরাশিতে—আর তখন, তখন তাদের কী হবে ?

কিন্তু দুর্মর তাদের আশা জেনে নিয়েছে নতুন জন্ম। এখন যেন তারা একটা দাঁড়াবার জায়গা পেলে পায়ের তলায়, আশা তাদের এমনি উন্মুখ ক'রে দিলে ওই তীরভূমির জন্যে। আর অন্তত ঝড়ের হাতে প'ড়ে চর্কির মতো ঘুরপাক খাবে না তাদের নৌকো, আর অন্তত মনে হবে না কাগজের নৌকোয় ক'রে তারা সাগর-পাড়ি দিচ্ছে। অন্তত ওই তীরে একটা গুহা তো পাওয়া যাবে, যা তাদের আশ্রয় হ'তে পারে, যা তাদের রক্ষা করবে মারাত্মক আবহাওয়ার হাত থেকে। আর, বলা তো যায় না, যদি কোনো শ্যামল ও উর্বর তীরভূমিতে গিয়ে পড়ে তারা, যেখানে প্রকৃতি প্রসন্ন ও অকৃপণ, তাহ'লে তো জন্মান্তর হবে যেন তাদের। তাহ'লে আর ভয় নেই—কোনো-না-কোনো জাহাজ এসে নিশ্চয়ই একদিন তাদের তুলে নিয়ে যাবে। যেন কোনো অলৌকিক ইন্দ্রজালের মতো কাজ ক'রে গেলো এই আশা ; সে যেন কোনো পরির মতো অগোচরে এসে পর্দা তুলে কালো রাত, কুয়াশা আর ভয়কে সরিয়ে দিয়ে ছিটিয়ে গেলো ঝলমলে ঊষাবেলার অভয়পত্র।

মকরক্রান্তিবৃত্তের পিছনে যে-দ্বীপপুঞ্জ আছে, এই তীরভূমি কি সেইসব দ্বীপের অন্তর্ভূত কোনো-একটি ? ব্লকের সঙ্গে এই কথাটিই নিচু গলায় আলোচনা করতে লাগলো ফ্রিৎজ। জেনি আর ডলি আবার তাদের আগের জায়গায় গিয়ে বসেছে, আর শ্রীমতী যুলস্টোনের কোলে ঘুমোচ্ছে সেই বাচ্চাটি। কাপ্তেন গুডকে জ্বর যেন প্রায় ছিঁড়ে খাচ্ছিলো—আবার তিনি শুয়ে আছেন অচৈতন্য, আগের জায়গাতেই, জেনি গিয়ে তাঁর কপালে জলপট্টি দিতে লাগলো, যাতে তাঁর যন্ত্রণা কিছুটা কমে।

ফ্রিৎজ ব'সে-ব'সে এমন তত্ত্বকথা বলতে লাগলো যার কোনোটাই আশাপ্রদ নয়। বিদ্রোহের পর আস্ত একটি সপ্তাহ ধ'রে *ফ্ল্যাগ* পুবমুখো চলেছিলো—এ-বিষয়ে সে একেবারে নিঃসন্দেহ। আর সে-ক্ষেত্রে নৌকোটি নিশ্চয়ই ভারত মহাসাগরের এমন অঞ্চলে আছে, যেখানে কোনো দ্বীপ আছে ব'লে কোনো মানচিত্র বলে না—শুধু নিউ-আমস্টারডাম, আর সেন্টপল, আর কেরগুলেন দ্বীপপুঞ্জের কথা শোনা যায় এই এলাকায়। কিন্তু নৌকো যদি এইসবের কোনোটায় গিয়ে ভিড়তে পারে, তাহ'লে তো মুক্তি একেবারে নিশ্চিন্ত—বলা যায় না, হয়তো অচিরেই নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডে পৌঁছোবার কোনো ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে।

তাছাড়া যদি ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে নৌকোটি উত্তরমুখো হাওয়ায় ভেসে গিয়ে থাকে, তাহ'লে এমনও হ'তে পারে এই তীরভূমি হ'লো অস্ট্রেলিয়ারই কোনো-এক অংশ। যদি হোবার্ট-টাউন, মেলবোর্ন কি অ্যাডেলাইড-এ পৌঁছুনো যায়, তাহ'লে আর-কোনো ভয় নেই। কিন্তু নৌকো যদি গিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় *ঠেকে* যায়, কিং জর্জেস বে কি লেউইন অন্তরীপে, যেখানে জংলি ও নরখাদকদের রামরাজত্ব, তাহ'লেই সর্বনাশ। কেননা তার চেয়ে এই সমুদ্র ভালো—এখানে বরং কোনো-একদিন জাহাজের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

সেদিন হ'লো অক্টোবরের তেরো তারিখ। *ইউনিকর্ন*নে ক'রে নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড ছাড়বার পর প্রায় একবছর কেটে গেছে। এখন তাদের উপনিবেশে ফিরে যাবার কথা। রক-কাসল-এ নিশ্চয়ই জেরমাট-পরিবার আর যুলস্টোন-পরিবার তাদের জন্যে দিন গুনছেন। এদিকে আর কয়েক সপ্তাহের ভিতর কেপটাউন থেকে নোঙর তুলে *ইউনিকর্ন* নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডে গিয়ে হাজির হবে, আর তখন জানতে পারবেন যে তাঁদের আত্মীয়-

স্বজন *ফ্ল্যাগ* ব'লে এক জাহাজে ক'রে আসছিলো—কিন্তু সেই জাহাজটিকে আর-কোনোদিনই দেখা যায়নি। হয়তো তাঁরা ভেবে নেবেন যে গোটা জাহাজশুদ্ধু তারা ঝড়ের পাল্লায় প'ড়ে ভারত মহাসাগরে তলিয়ে গেছে। সব আশাই ত্যাগ ক'রে তাঁরা ভগবানের কথা স্মরণ করবেন তখন। কিন্তু এইসবই হ'লো ভবিষ্যতের কথা—নিছকই এক দূরকল্পনা। এখন তাদের আত্মরক্ষার ব্যাপারটা এতই জরুরি যে, এ-সব কথা ভাববারও অবসর নেই।

ডাঙা কোনদিকে, সেটা যখন থেকে ফ্রাংক নির্দেশ করেছে, তখন থেকেই আস্তে কিন্তু দৃঢ়ভাবে ব্লক নৌকোটাকে সেইদিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। কম্পাস ছাড়া এই কাজটুকু করা খুব-একটা সহজসাধ্য ছিলো না। ফ্রাংক যেখানটায় ডাঙার অবস্থান ব'লে দেখিয়েছিলো, সেটা তো কেবলই আন্দাজের উপর নির্ভর ক'রে ; উপরন্তু পুরু একটি পর্দা এখন ঢেকে রেখেছে দিগন্তরেখা—তারা ঠিক সমুদ্রের সমতল থেকে তাকে দেখতে পাচ্ছে ব'লে তার দূরত্ব নিশ্চয়ই আরো দশ-বারো মাইল।

দাঁড়গুলি তক্ষুনি বের ক'রে নেয়া হয়েছিলো। ফ্রিৎজ আর জেমস তাদের সব জোর প্রয়োগ ক'রে দাঁড় টানছিলো বটে, কিন্তু সেই জীর্ণ অবস্থায় সেই বিপুল ভারওলা নৌকোটাকে তাড়াতাড়ি চালিয়ে নেয়া ছিলো তাদের সাধ্যাতীত। এখন যা নৌকোর গতি, তাতে এই দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে গোটা দিনটাই লেগে যাবে। কিন্তু তার জন্যেও চাই ভগবানের দয়া—এখন যদি হাওয়া প'ড়ে যায়, কিংবা দিকবদল ক'রে ফ্যালে, তাহ'লেই সব গেলো। যদি সন্ধে পর্যন্ত এইরকম চলে, তাহ'লে অবশ্য কোনোরকমে তারা পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু এখন যদি উত্তর থেকে হাওয়া দেয়, তাহ'লে তো নৌকোটা একেবারে উলটো দিকে অনেক দূর চ'লে যাবে।

সকাল থেকে এ-পর্যন্ত তারা ক-মাইল এসেছে, ঠিক দুপুরবেলায় এই প্রশ্নটাই তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো। বিপরীতমুখি কোনো স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, এ-রকম একটি আশঙ্কা প্রকাশ করলে ব্লক। কিন্তু দুটোর সময়ে হঠাৎ নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে উঠলো ব্লক, তারপরেই তার গলা শোনা গেলো, 'হাওয়া আসছে জোর—অনুভব করতে পারছি আমি হাওয়াকে। পালটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে—দাঁড়গুলি এতটা করতে পারতো না।'

ভুল বলেনি ব্লক। জলের শব্দ চ্ছলোচ্ছল ক'রে এগিয়ে গেলো উত্তর-পুবে, হাওয়া এলো দূর থেকে, এসে ঠ্যালা দিলে তাদের নৌকায়। 'ব্লক, তুমি যে ভুল বলোনি তা তো বোঝাই যাচ্ছে,' ফ্রিৎজ বললে, 'কিন্তু তবু হাওয়ার জোর এখনো এত কম যে আমাদের দাঁড় টানতেই হবে।'

'দাঁড় টানা আমরা থামাবো না,' ব্লক তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলো, 'যতক্ষণ-না পালটা একেবারে ফুলে উঠছে হাওয়ায়, ততক্ষণ আমাদের দাঁড় নিয়ে লেগেই থাকতে হবে।'

'কিন্তু ডাঙা কোনদিকে, সেটাই হ'লো প্রশ্ন।' মিথ্যেই ফ্রিৎজ চেষ্টা করলে কুয়াশার পর্দার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখার।

'নিশ্চয়ই আমাদের সামনে আছে।'

'এতটা নিশ্চিন্ত কি হওয়া উচিত ব্লক,' এবার কথা বললে ফ্রাংক।

'যদি উত্তরের ওই কুয়াশার আড়ালেই ডাঙা না-থাকবে, তাহ'লে কোন দিকে সে আছে?' তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে ব্লক।

'আমরা তো সেদিকেই যাচ্ছি,' জেমস য়ুলস্টোন বললেন, 'কিন্তু কোনো কিছুই তো নিশ্চয়ই ক'রে বলা যায় না ।'

জোরে হাওয়া না-এলে নিশ্চয় ক'রে কিছু জানার উপায় নেই । কিন্তু বাতাস যে খুব তাড়াতাড়ি আসবে তাদের সাহায্যের জন্যে, এমন লক্ষণ তেমনভাবে দেখা গেলো না । শুধু তিনটের পরে মস্ত সেই শাদা পালের পেট যখন অনেকটা ফুলে উঠলো, তখন তবু একটু আশ্বস্ত হওয়া গেলো । কিন্তু এই হাওয়া যদি ছলনা করতেই এসে থাকে, যদি কেবল সাময়িকভাবে এসে তাদের হৃৎপিণ্ডকে একটু নাচিয়ে দিতে চায়, তাহ'লে এখন আর কুয়াশার সেই পর্দা ছিঁড়ে ফেলার কোনো চেষ্টাই সে করবে না । আরো কুড়ি মিনিট ধ'রে দ্বিধা, সন্দেহ আর সংশয় তাদের উপর রাজত্ব ক'রে গেলো । তারপরেই জোরে পিছন থেকে নৌকোকে ধাক্কা মারলে হাওয়া, ফুলে উঠলো পালের ভাঁজে ভবিষ্যতের গর্ভ, আর তারা এগিয়ে গেলো উত্তর দিকে । হাওয়া যখন দিগন্তে গিয়ে পৌঁছুবে, তখন কুয়াশা ছিঁড়ে যাবে—এই তারা আশা করলে মনে-মনে । আর সেইজন্যেই সবাই অপলকে তাকিয়ে রইলো দিগন্তের দিকে : অন্তত যদি মুহূর্তের জন্যে পর্দা স'রে গিয়ে উন্মোচিত হয় সেই তীরভূমি, তাহ'লেই যথেষ্ট হ'লো ভেবে সন্তুষ্ট হবে তারা—শুধু এই কৃপাটুকু ছাড়া আর-কিছুই তারা চায় না ।

সূর্য ধীরে-ধীরে হেলে পড়লো পশ্চিমে, আর পাঠিয়ে দিলো তার রশ্মিগুলিকে তীক্ষ্ণ লাল বর্শার মতো—আর তারই সঙ্গে-সঙ্গে হাওয়াও ক্রমশ উপার্জন করতে লাগলো নবজন্ম, পেলো স্বাস্থ্য আর শক্তি আর উদ্যম—কিন্তু সেই পর্দা আর সরলো না কিছুতেই । নৌকো এবার বেশ দ্রুতই এগিয়ে চলেছে । ফ্রিৎজ আর ব্রক এবার আশঙ্কায় ভ'রে গেলো । তাহ'লে কি ডাঙার পাশ দিয়ে চ'লে এসেছে তাদের নৌকো, আর কুয়াশার জন্যে তারা তা টেরই পায়নি ? আবার নিশাচরদের মতো সুযোগ পেয়েই এগিয়ে এলো সন্দেহ আর ভয়, লাফিয়ে পড়লো চোরা নখওলা থাবা-সমেত ; আর তারা শুধু এই কথাই ভাবতে লাগলো তাহ'লে কি ভুল করেছে ফ্রাংক, সবই কি তবে তার বিভ্রম ও ইচ্ছাপূরণকারী দিবাস্বপ্ন ? সত্যি কি সে চর্মচক্ষুতে উত্তরের সেই তীরভূমিকে দেখেছিলো ?

আবার ফ্রাংক জোর গলায় সমর্থন করলে নিজেকে, 'উঁচু হ'য়ে উঠে এসেছে সমুদ্র থেকে, প্রায় একটা লম্বের মতো মাথা তুলেছে সে সমুদ্র থেকে—মেঘের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলা একেবারেই অসম্ভব ।'

'বুঝলাম, কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে আমাদের সেখানে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিলো ।' ফ্রিৎজ বললে, 'চোদ্দ-পনেরো মাইলের বেশি দূরে হবার তো কথা নয় তাহ'লে ।'

'তুমি ঠিক জানো, ব্রক, তুমি নৌকোকে কেবল একদিকেই চালিয়েছো ?' ফ্রাংক জিগেস করলে, 'আর ডাঙা যে আমি উত্তর দিকেই দেখেছি, এটাও কি তুমি নিশ্চিত ক'রে জানো ?'

'ভুল আমাদের হ'তেই পারে,' ব্রক সোজাসুজিই স্বীকার করলে, 'কেননা আমাদের সঙ্গে কোনো কম্পাস নেই । কাজেই আমার মনে হয় যতক্ষণ-না দিগন্তের কুয়াশা স'রে যাচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করাই ভালো—তাতে যদি গোটা একটা রাত এখানে কাটাতে হয়, তাহ'লেও ।'

সেটাই নিশ্চয়ই সবচেয়ে বুদ্ধিমান সংকল্প । কিন্তু কুয়াশার জন্যে তো কিছুই বোঝা

যাচ্ছে না—যদি দৈবাৎ নৌকোটা এখন তীরের কাছে এসে প'ড়ে থাকে, তাহ'লে স্রোত আর ঢেউ হয়তো একসময় রাগি হাতে তাকে তীরের পাথরের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। কাজেই সবাই এখন কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে, যদি তীরের পাথরের গায়ে ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার শব্দ ভেসে আসে। কিন্তু কিছুই শোনা গেলো না। শোনা গেলো না স্রোত ঢেউ আর জলের তুমুল উচ্ছ্বাস, যা তীরের উপর বিস্ফোরণের মতো ছড়িয়ে পড়ে—শোনা গেলো না ফেনা আর জলের গর্জন আর চ্যাঁচামেচি—শুধু একটানা একটি হ্লোচ্ছল শব্দ, তার মধ্যে যেন অতল জলের আহ্বান পাঠিয়ে দিয়েছে বিপুল সমুদ্র।

কাজেই অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করাই সমীচীন ব'লে ঠিক করলে তারা। সাড়ে পাঁচটা যখন বাজে, তখন ব্লকের নির্দেশে বড়ো পালটা নামিয়ে ফেলা হ'লো—যাতে ডাঙা চোখে না-পড়া পর্যন্ত নৌকোর গতি ধীর থাকে।

মিশকালো অন্ধকার নিয়ে নেমে আসবে উষ্ণ এক রাত, যখন পাশের লোকটিকেও স্পষ্ট ক'রে দেখা যাবে না, আর তখন হাওয়া যদি পালের ভাঁজে পুরে দেয় আবেগ আর উদ্যমের মত্ততা, তাহ'লে নৌকো হয়তো গিয়ে আছড়ে পড়বে তীরের পাথরে। এমন অবস্থায় মস্ত জাহাজগুলি আবার খোলা সমুদ্রে ফিরে গিয়ে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করে। কিন্তু একটি জাহাজের পক্ষে যা করা সম্ভব, এইটুকু একটি নৌকোর বেলায় সেই প্রশ্নই ওঠে না—কেননা তাহ'লে হয়তো উলটো হাওয়ার হাতে নাস্তানাবুদ হ'তে-হ'তে অনেক দূরে চ'লে যাবে নৌকো। সেই কারণেই—উত্তরদিকে মুখ ক'রে—যেখানে ছিলো, সেখানেই থাকতে দেয়া হ'লো নৌকোকে।

কিন্তু অবশেষে হঠাৎ সব অনিশ্চয় ও সন্দেহ মুহূর্তে দূর হ'য়ে গেলো। সন্ধে যখন ছটা, তখন হঠাৎ জলের ভিতর ডুবে যাবার আগে সূর্য একবার নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে তার আরক্তিম রশ্মিগুলিকে পাঠিয়ে দিলে কোনো রহস্যময় সংগোপন লিপিকার মতো। এই লিপিকার রক্তিম অক্ষরগুলিতেই বুঝি নির্দেশ ছিলো—কেননা স'রে গেলো সব কুয়াশার পর্দা সেই রঙিন আলোয়, ঝলমল ক'রে উঠলো দিগন্ত আর তার দশ মিনিট পরেই সেই মস্ত গনগনে গোল চাকাটা দিগন্তে রেখার কাছে ছিটকে পড়লো আকাশ থেকে সমুদ্রে, আর তার পরেই জল তাকে গিলে নিলে।

আর সূর্যের এই অস্তগমন দেখেই উত্তর দিকটা কোনদিকে, সেটা ফ্রিৎজ চট ক'রে বুঝে নিলে। নৌকোর মুখ এতক্ষণ যে-দিকে ছিলো, তার একটু বাঁয়েই হ'লো আসল উত্তরদিক। সেদিকে নির্দেশ করলে সে আঙুল দিয়ে—'ওই যে, ওই হ'লো আসল উত্তর দিক।'

আর ঠিক তক্ষুনি সমবেত গলার ঐকতান তার কথার উত্তর পাঠিয়ে দিলে : 'ডাঙা! ডাঙা!'

এইমাত্র সব কুয়াশা ছিঁড়ে, ফেঁড়ে টুকরো-টুকরো হ'য়ে গিয়ে উন্মোচিত করেছে তীরভূমিকে—নৌকো থেকে ডাঙা তখন এক মাইলেরও কম দূরে।

ব্লক তৎক্ষণাৎ নৌকোকে সেই দিকে চালাতে লাগলো। আবার টাঙিয়ে দেয়া হ'লো বড়ো পালটা, আর বেলাশেষের দ্রুত হাওয়া মস্ত পেট-ফোলা অজ্ঞাত ভবিষ্যতের মতো ফুলিয়ে দিলো তার জঠর। আধঘণ্টা পরে যখন তারা বালুভরা বেলাভূমিতে নিরাপদে

নৌকোকে নিয়ে গেলো, সামনে তখন মস্ত এক শরীর নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ভীমকায় পাথুরে পাহাড়—সন্ধেবেলার আবছায়ায় তাকে দেখালো মস্ত কোনো রহস্যের স্তম্ভের মতো।

৪

বেলাভূমির গান

অবশেষে তবে ডাঙায় পৌঁছুতে পারলো তারা। এই পক্ষকাল ধ'রে নানা বিপজ্জনক পরিস্থিতির ভিতর যেভাবে ক্ষুধা আর পরিশ্রমের ভিতর তারা দিন কাটিয়েছে, তাতে পুরোপুরি জীর্ণ ও শ্রান্ত হ'য়ে পড়লে অস্বাভাবিক হ'তো না ; কিন্তু সৌভাগ্যবশত কেউই তেমনভাবে দুমড়ে যায়নি। শুধু কাপ্তেন গুডকে জ্বর যেন প্রায় খেয়ে ফেলছিলো—কিন্তু তাহ'লেও, জীবনসংকট যাকে বলে, তা অবশ্য নয়—কয়েক দিন বিশ্রাম করতে পারলেই তিনি আবার চাঙা হ'য়ে উঠতে পারবেন।

এখন শুধু একটিই জিজ্ঞাসা তাদের : কোন তীরে এসে তাদের নৌকো ভিড়লো—কোনো দেশে, না দ্বীপে ? যে-জায়গাই হোক না কেন, দুর্ভাগ্যবশত এটা কিছুতেই নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড নয়। রবার্ট বোরাপ্ট ও তার শাগরেদরা যদি বিদ্রোহ না-করতো, তাহ'লে এতদিনে অবশ্য সেই দ্বীপেই তারা পৌঁছে যেতো। 'রক কাসলে'র স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের বদলে কী তাদের উপহার দেবে এই অজ্ঞাত তীর ?

কিন্তু এইসব জিজ্ঞাসায় একতিলও সময় নষ্ট করার অবসর নেই তাদের। রাতটা এত কালো যে দানবের মতো মস্ত এক উঁচু পাহাড় ছাড়া আর-কিছুই চোখে পড়ছে না। ঠিক হ'লো যতক্ষণ সূর্য না-উঠছে, ততক্ষণে তারা নৌকোর উপরেই আশ্রয় নেবে ; ফ্রিৎজ আর ব্লক পাহারা দেবে সারারাত। হয়তো উপকূলে জংলিরা বাস করে, তা-ই সাবধান থাকা ভালো। এই উপকূল কি অস্ট্রেলিয়ার কোনো অংশ, না প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো দ্বীপ—কিছুই জানা নেই ; কিন্তু তবু পাহারা দেয়াটা খুব জরুরি, কেননা হঠাৎ আক্রান্ত হ'য়ে পড়লে বারদরিয়ায় নৌকো ভাসিয়ে দেয়া যাবে।

জেনি, ডলি আর সুসান সেইজন্যে কাপ্তেন গুডের পাশে গিয়ে নিজেদের আসনে ব'সে থাকলো। ফ্রাংক আর জেমস টান হ'য়ে শুয়ে থাকলো নৌকোর মাঝখানে—দরকারের সময় যাতে চট ক'রে লাফিয়ে উঠতে পারে সাহায্যের জন্যে। কিন্তু তখন তারা সহ্যের একেবারে শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিলো—তা-ই শুয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো।

গলুইয়ের সামনে ব'সে নিচু গলায় আলাপ করতে লাগলো ব্লক আর ফ্রিৎজ।

'শেষ পর্যন্ত তাহ'লে একটা বন্দরে এসে পৌঁছুনো গেলো, মিস্টার ফ্রিৎজ,' বললে ব্লক, 'আমি আগেই জানতুম, একসময়ে নির্ঘাৎ আমরা ডাঙায় গিয়ে পৌঁছুবো। সত্যিকার কোনো বন্দর যদি এটা নাও হয়, তবু ডুবো পাহাড়ের গায়ে নোঙর ফেলার চেয়ে এটা নিশ্চয়ই

অনেক ভালো। অন্তত রাতটার জন্যে তো আমাদের নৌকো নিরাপদ। কাল সব ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে বোঝা যাবে ব্যাপারটা কী।'

'তোমার বেপরোয়া ফূর্তির ক্ষমতাকে আমি ঈর্ষা করি, ব্লক,' ফ্রিৎজ উত্তর দিলে, 'আশপাশের চেহারা দেখে আমি কিন্তু কিছুতেই আস্থা ফিরে পাচ্ছি না। আর বন্দরটি অজানা ব'লেই আমাদের অবস্থা মোটেই সুখপ্রদ নয়।'

'উপকূল হ'লো গিয়ে উপকূল—তার ভিতর থাকে পাথুরে পাহাড় বেলাভূমি, ছোটোখাটো·দু-একটা জলধারা : অন্যান্য উপকূল যেমন হ'য়ে থাকে এটাও তেমনিই। আমাদের পায়ের ভারে এটা ডুবে যাবে না নিশ্চয়ই। এখানে থাকা না-থাকার প্রশ্ন যদি তোলেন সেটা পরে সব দেখেশুনে ঠিক করতে হবে।'

'কাপ্তেন গুড কিছুটা সামলে নেবার আগে আমাদের হয়তো আবার সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ার প্রয়োজন হবে না, আশা বলতে ঐটুকুই আমার আছে। এখানটায় যদি কোনো লোকজন না-থাকে, আর যদি যথেষ্ট পরিমাণ আহার্য পাওয়া যায়, এবং উপরন্তু যদি জংলিদের হাতে-পড়ার ভয় না-থাকে, তাহ'লে এখানে কয়েক দিন কাটিয়ে যাওয়াই আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে।'

'আমার তো যতদূর মনে হ'লো এখানটায় কোনো লোকজন থাকে না,' ব্লক বললে, 'আর তা-ই বোধহয় আমাদের পক্ষে সুবিধের।'

'আমারও তা-ই মনে হয়, ব্লক। আর রসদপত্র অন্তত মাছ ধ'রেই বাড়িয়ে নেয়া যাবে —শিকারের সুবিধে আছে কিনা অবশ্য জানি না।'

'উপকূলে যদি শিকার বলতে শুধু সামুদ্রিক পাখিই থাকে, তাহ'লে সত্যিই অসুবিধের। তবে তখন হয়তো বনের ভিতরে গিয়ে ছোটোখাটো জীবজন্তুকে কায়দা ক'রে খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। অবশ্য কোনো পিস্তল-বন্দুক ছাড়া—'

'একেবারে জানোয়ার লোকগুলো! একটাও আগ্নেয়াস্ত্র দেয়নি আমাদের!'

'না-দিয়ে তারা ভালোই করেছে—নিজেদের সুবিধে বেড়েছে তাদের। পিস্তল থাকলে যাবার আগে আমি নির্ঘাৎ ওই রাস্কেলটাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারতুম।' ব্লক বললে, 'সব কটাই আস্ত একেকটা বেইমান। এর ফল একদিন তাদের পেতেই হবে।'

হঠাৎ সজাগভাবে কান খাড়া ক'রে ফ্রিৎজ ব'লে উঠলো, 'তুমি কিছু শুনতে পেলে, ব্লক?

'না-তো, কেবল জলের শব্দই তো শোনা যাচ্ছে। এতটা উদ্বিগ্ন হবার তো কিছুই দেখলাম না এখনো; আর রাত যদিও ঝুলকালো, তবু আমার চোখ অন্ধকারেও বেশ ভালো দেখতে পায়।'

'তাহ'লে তোমার ওই চোখ আপাতত বুজিয়ে ফেলো না। সব বিপদ-আপদের জন্যেই তৈরি থাকতে হবে আমাদের।'

'যে-কোনো মুহূর্তে যাতে বারদরিয়ায় গিয়ে পড়া যায়, তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।' ব্লক বললে, 'দরকার হ'লেই কেবল লগি দিয়ে একটা ঠ্যালা দেবার অপেক্ষা —তাহ'লেই নৌকো একেবারে কুড়ি গজ দূরে চ'লে যাবে।'

রাতের বেলায় অবশ্য ফ্রিৎজ আর ব্লক একাধিকবার খুব সজাগ ও টান-টান হ'য়ে উঠলো। একটুতেই তারা ভাবলে যেন বেলাভূমিতে কারু চলাফেরার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আসলে কিন্তু গভীর স্তব্ধতা ছিলো আশপাশে। বাতাস তখন ম'রে গেছে ; সমুদ্র শান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যেন। শুধু অল্প কয়েকটি স্রোত ভেঙে-ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের পাথরে, আর তারই শব্দ শোনা যাচ্ছে সেই ঝিমঝিমে স্তব্ধ রাতে। কয়েকটি রাতজাগা পাখি তীক্ষ্ণ গলায় ডেকে ডানা ঝাপটে চ'লে গেলো—সিন্ধুসারস, গাংচিল বা ওই জাতীয় কতগুলি সামুদ্রিক পাখিই এত রাতে তাদের আস্তানা খুঁজতে বেরিয়েছে পাহাড়ের খোপে-খোপে। আস্তে-আস্তে নিরাপদেই বেলাভূমির প্রথম রাত্রি কেটে গেলো।

জলের তলা থেকে টকটকে সেই গোল থালাটা যখন রশ্মি ছিটিয়ে ধীরে-ধীরে জেগে উঠলো তখন সবাই ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। কিন্তু বেলাভূমির দিকে তাকিয়েই হতাশায় তারা ভ'রে গেলো।

আগের দিন ফ্রিৎজ বেলাভূমির কিছুটা দেখতে পেয়েছিলো রশ্মিজ্বলা দিগন্তের আলোয়; তখন তারা তীর থেকে মাইল খানেক দূরে। সেখান থেকে মনে হয়েছিলো পুবে-পশ্চিমে দশ-বারো মাইল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে সেই বালুভরা উপকূল। পাহাড়ের যেদিকটায় গিয়ে নৌকো নোঙর ফেলেছিলো, সেখান থেকে কেবল তার পাঁচ ভাগের এক ভাগই দেখতে পাওয়া যায়—দুটি কোণের ভিতরে বন্ধ খানিকটা জায়গা যেন—দূরে শুধু সমুদ্রের বিপুল জলরাশি ; ডান দিকে তা স্বচ্ছ ও আলোকিত হ'লে কী হবে, বাঁদিকে তখনও তা আবছায়ায় ভরা। তীর চ'লে গেছে মাইল খানেক পর্যন্ত—ছড়িয়ে আছে হলুদ বালি, যার উপর প'ড়ে আছে শামুক আর মরা ঝিনুক আর কড়ি, আর ইতস্তত কতগুলি কোণতোলা চোখা ত্যাড়াবাঁকা পাথর—তারপরেই উঠেছে কালো এক পাহাড়ের শরীর, যেন ওই পাহাড় হ'লো বেলাভূমির এক তন্দ্রাহীন প্রহরী।

পাহাড়টি অন্তত আট-নশো ফিট উঁচু হবে, সোজা উঠে গেছে বেলাভূমি থেকে শূন্যে, একেবারে খাড়াই—শুধু নিচের দিকটা ঘুরে-ঘুরে গড়িয়ে নেমে এসেছে। পাহাড়টার ও-পাশটা কি আরো উঁচু ? বেলাভূমির উপর তার ছায়া পড়লে সেই ছায়া মেপে মোটামুটি আন্দাজ ক'রে নেয়া যাবে তার উচ্চতা—পূর্বদিকে অবশ্য পাহাড়টিকে লম্বের মতো দেখায় না, এখান থেকে দেখলে সহজেই যা মনে হ'য়ে যায়। পাহাড়ে চড়তে যে খুব কষ্ট হবে, এটা সহজেই বোঝা গেলো ; পুবদিক থেকে ওঠা খুব একটা সহজ ব্যাপার হবে না।

সেই বন্য, ফাঁকা, শূন্য বেলাভূমি দেখে কাপ্তেন গুডের সঙ্গীরা একেবারে মর্মাহত হ'য়ে পড়লো—শুধু খোঁচা তুলে এদিক-ওদিক উঠে আছে কতগুলি পাথর, এছাড়া আর কিছুই নেই। নেই কোনো গাছপালা কি শ্যামল ঝোপঝাড়, উদ্ভিদের কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। মরুভূমির মতো বিষাদে-ভরা ভীষণ-এক প্রান্তর যেন তাদের কাছে নিজেকে মেলে ধরলো। প্রাণের চিহ্ন বলতে যা আছে তা শুধু শ্যাওলা—পাথরের গায়ে গজিয়েছে তারা, সবুজ, কালো, কোথাও-বা তাদের রং অঙ্গারের মতো। মূল নেই, নেই মৃণাল কি পল্লব, নেই কোনো মুকুল কি ডালপালা—শুধু যেন মোটা তুলি দিয়ে কেউ কিছু রং লেপে দিয়ে গেছে পাথরের গায়ে —আর ঝাপসা হলুদ থেকে জ্বলজ্বলে লাল রঙের মধ্যকার সবরকম আভাসই তার ভিতর ছোপ লাগিয়ে গেছে। পাহাড়ের গায়ে একটুও তৃণপল্লব নেই। কতগুলি উদ্ভিদ আছে যারা

মাটি ছাড়াই পাথরের গায়ে গজিয়ে উঠতে পারে—সে-সব পর্যন্ত নেই এই গ্রানাইট পাথরের দেয়ালে।

তাহ'লে উপরের সেই মালভূমির জমিও কি এইরকমই অনুর্বর ? তাহ'লে কি নৌকো এসে ভিড়লো সেইসব মরুদ্বীপের কোনো-একটিতে, নাবিকেরা যাদের কোনো নামই দেয়নি ।

'না, সত্যি, জায়গাটা নেহাৎই মন খারাপ করা,' ফ্রিৎজকে ফিশফিশ ক'রে বললে ব্লক ।

'হয়তো পূর্বে বা পশ্চিমে কোথাও নৌকো ভিড়লে অপেক্ষাকৃত ভালো জায়গা পেতুম আমরা ।'

'হয়তো তা-ই হ'তো,' ব্লক উত্তর দিলে, 'তবে একটা বিষয়ে খুব নিশ্চিন্ত—জংলিদের হাতে পড়তে হবে না এখানে ।'

এই শূন্য তীরে যে জংলিরাও টিকতে পারতো না এটা এতই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিলো, বলাটাও বাহুল্য ব'লে মনে হ'লো ব্লকের কাছে । 'প্রমিসড ল্যাণ্ড'-এর শ্যামল প্রতিশ্রুতির থেকে এই এলাকাটি এতই অন্যরকম যে ভগবান যেন ঠিক তার বিপরীতকে সৃষ্টি করবার জন্যেই এই জায়গাটুকু বানিয়ে দিয়েছেন । এমনকী 'বার্নিং রক' পর্যন্ত বিষণ্ণ ও নিরানন্দ হ'য়েও জেনিকে ঝর্নার জল আর বনের ফলমূল উপহার দিয়েছিলো । অথচ পাথর আর বালি ছাড়া কিছুই নেই এখানে, বাঁদিকে কেবল কড়ি শামুক আর ঝিনুক, আর শুধু সমুদ্র-শৈবালের দীর্ঘ রেখা চ'লে গেছে দূরের দিকে—শুকিয়ে কালো হ'য়ে আছে রোদে । সত্যিই, যাকে বলে পরিত্যক্ত, একেবারে তাই । পশুপক্ষী বলতে আছে কেবল কতগুলি সমুদ্রের পাখি—সিন্ধুসারস, সোয়ালো, ব্ল্যাকডাইভার, গাংচিল, সিন্ধুশকুন—এইসব । তাদের নির্জনতা ভাঙতে এই মানুষগুলি এসেছে দেখে তারা কেবল চেরা গলায় টেনে-টেনে ডাকতে লাগলো—যেন তাদের কানে তালা লাগিয়ে দিতে চাচ্ছে । আর অনেক উঁচুতে আছে হ্যালসিয়ন, মস্ত ফ্রিজেট-পাখি, আর অ্যালবাট্রস—'জাহাজের সহযাত্রী, সঙ্গদাতা, পথের বান্ধব' ।

শেষে ব্লকই প্রথম কথা বললে, 'তা এই তীর যদি আপনাদের নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের মতো ভালো না-ও হয়, তাহ'লেও এখানে না-নামার কোনো মানে হয় না ।'

'তাহ'লে চলো, নেমে পড়ি সকলে ।' ফ্রিৎজ উত্তর দিলে, 'আশা করি পাহাড়ের গায়ে আশ্রয় নেবার উপযোগী কোনো-না-কোনো জায়গা পেয়ে যাবো ।' তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জেনিকে বললে, 'তুমি ডলি আর মিসেস যুলস্টোনের সঙ্গে নৌকোতেই থাকো, আমরা ঘুরে-ফিরে দেখে আসি কী আছে আশপাশে । বিপদের কোনো লক্ষণই তো নেই, কাজেই তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই ।'

'তাছাড়া আমরা কখনও বেশি দূরেও যাবো না—আশপাশেই থাকবো সবসময়,' ব্লক জুড়ে দিলে ।

ফ্রিৎজ লাফিয়ে নেমে পড়লো বালির উপর, পরক্ষণেই অন্যরাও নেমে পড়লো তার দেখাদেখি । আর ডলি নৌকো থেকে চেঁচিয়ে বললে, 'আমাদের ডিনারের জন্যে কিছু আনতে ভুলো না যেন, ফ্রাংক । আমরা তোমার উপরেই নির্ভর ক'রে আছি ।'

'বরং আমাদেরই তোমার উপর নির্ভর করার কথা, ডলি ।' ফ্রাংক বললো, 'পাথরের আড়ালে কয়েকটা বঁড়শি ফেলে মাছ ধরতে ব'সে যাও — কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই পেয়েই যাবে ।'

'মোদ্দা কথা হ'লো,' ফ্রিৎজ বললে, 'যে-কটা বিস্কুট রেখে গেলাম সেগুলো যেন থাকে। বলা তো যায় না, হয়তো আবার আমাদের সমুদ্রযাত্রা শুরু করতে হ'তে পারে।'

'শুনুন, মিসেস ফ্রিৎজ,' জন ব্লক বললে, 'উনুনটা জ্বালিয়ে রাখবেন। শামুকের ঝোল কি নুড়ি সেদ্ধ খেয়ে পেট ভরাবার লোক নই আমরা—কিছু শক্তজাতের পুষ্টিকর জিনিশ এনে দিতে পারবো আপনাকে, এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

আবহাওয়া ভালোই ছিলো—পুবদিকের মেঘের আড়াল থেকে বাঁকা ভাবে নেমে এসেছে কতগুলি ঝলমলে রশ্মি। ফ্রিৎজ, ফ্রাংক, জেমস আর ব্লক দল বেঁধে পাশাপাশি এগিয়ে গেলো বেলাভূমির উপর দিয়ে। ভিজে বালির উপর তাদের পায়ের ছাপ প'ড়ে থাকলো সার বেঁধে—জোয়ারের জন্যে বেশ খানিকটে দূর পর্যন্ত ভিজে আছে বালি। দশ ফিট উপরে গিয়ে সমুদ্র-শৈবালেরা আঁকাবাঁকাভাবে এগিয়ে গেছে দূরের দিকে। কোনো-কোনো শৈবাল আবার বেশ রুচিকর খাদ্য। দেখেই ব্লক চেঁচিয়ে উঠলো : 'আরে! এ-সব তো খায় লোকে —বিশেষ ক'রে আর-কিছু যখন থাকে না, তখন তো বটেই। আমার দেশে, আয়ারল্যাণ্ডের বন্দরে, এইসব থেকে একধরনের চাটনি বানানো হয়।'

তিন-চারশো গজ এদিক দিয়ে হেঁটে আসার পর ফ্রিৎজ আর তার সঙ্গীরা পাহাড়ের পশ্চিম দিকের তলায় এসে দাঁড়ালে। খাড়া একটা লম্বের মতো উঠে গেছে পাহাড়, মস্ত সব পাথর দিয়ে তৈরি তার পিচ্ছিল শরীর, সোজা গিয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের জলে—আর ঢেউ এসে গড়িয়ে-গড়িয়ে ভেঙে পড়ছে তার গায়ে। সাত-আট ফ্যাদম নিচে তার ভিত্তি, টলটলে জলের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা গেলো। এই পাহাড় বেয়ে ওঠা যে কেবলমাত্র দুঃসাধ্য তা-ই নয়, একেবারে অসম্ভব ; কেননা তা একেবারে একটি সরলরেখার মতো উঠে গেছে শূন্যে। এখন পাহাড়ে ওঠার পরিকল্পনা ত্যাগ করার মানেই হ'লো নৌকোয় ক'রে এদিকটা ঘুরে অন্যপাশে যেতে হবে তাদের। কিন্তু আপাতত যেটা সবচেয়ে জরুরি তা হ'লো পাহাড়ের গায়ে কোনো গুহা আছে কিনা, তা খুঁজে দেখা। অন্তত একটা মাথা গোঁজার মতো আশ্রয় তো চাই তাদের।

কাজেই তারা সৈকতের উপর দিয়ে চ'লে এলো পাহাড়ের একেবারে তলায়। কোণায় এসে যখন পৌঁছুলো, তখন সামুদ্রিক শৈবালের এক পুরু আস্তর দেখতে পেলে তারা—গালচের মতো বিছিয়ে আছে শুকনো সেই শৈবাল। জোয়ারের জল যেখানে পৌঁছোয়, জলের দাগ দেখে বোঝা গেলো, তা আরো দুশো গজ নিচে। এইসব শৈবাল তবে জোয়ারের জল ছুঁড়ে ফেলে যায়নি, আসলে এ-সব এখানে এনেছে দক্ষিণের ঝোড়ো হাওয়া, এই এলাকায় যা মাঝে-মাঝে ক্ষুধিত নেকড়ের মতো হন্যে হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়।

'যদি আস্ত শীতকালটাই এখানে কাটাতে হয় আমাদের, তাহ'লে এইসব সমুদ্রের শৈবাল অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের জ্বালানির কাজ চালাবে। কাঠ-কুটো কিছু পাবো ব'লে তো মনে হচ্ছে না।'

ফ্রিৎজের কথা শুনে ব্লক বললে, 'এ-সব আবার খুব তাড়াতাড়ি জ্বলে। অবশ্য যে-বিশাল স্তূপ দেখা যাচ্ছে, তা শেষ করতে অনেকদিন লাগবে। তবে আজকে তবু সসপ্যান গরম করার মতো জ্বালানি আমাদের সঙ্গেই আছে। এখন দেখতে হবে সসপ্যানে দেবার মতো কিছু পাওয়া যায় কি না।'

'দেখা যাক খুঁজে-পেতে,' উত্তর দিলে ফ্রাংক ।

নানাধরনের পাথরের স্তর দিয়ে পাহাড় তৈরি । পাথরগুলির কেলাসিত প্রকৃতির ভিতর একাধিক ধরনের মিশ্রণও চোখে পড়ে—যে-জাতের পাথর সবচেয়ে বেশি, তা হ'লো গ্র্যানাইট । ডেলিভারেন্স বে থেকে ফলস্ হোপ পয়েন্ট পর্যন্ত যে মস্ত দেয়াল চ'লে গেছে, তার সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই, সেখানে কেবল চুনাপাথরই ছিলো প্রধানত—যা এতই নরম যে হাতুড়ি বা শাবল দিয়ে অনায়াসেই ভেঙে ফেলা যায় । রক কাসলের সেই সুড়ঙ্গটা এইভবেই কেটে-কেটে তৈরি করা হয়েছিলো । কিন্তু এই কঠিন ও নিরেট গ্র্যানাইটের মধ্যে এ-রকম কোনো সুড়ঙ্গ তৈরি করা একেবারে অসম্ভব কাজ । অবশ্য আপাতত সেই কাজে উদ্যত হওয়ারও কেনো প্রয়োজন নেই । গুহাও, দেখা গেলো, অনেক আছে । পশ্চিম প্রান্ত থেকে একশো গজ স'রে আসতেই দেখা গেলো পাথরের গায়ে অনেকগুলি গহ্বর—পাল্লাহীন দরজার মতো হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে । যেন তারা মস্ত এক মৌচাকের খোপ, এমনি দেখালো তাদের—বোধহয় এইরকম কোনো-একটি গহ্বর দিয়েই পাথরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাবে । আর পাওয়া গেলো কতগুলি ঘরের মতো গুহা—যেন প্রকৃতি নিজের হাতে এই ঘরগুলি বানিয়ে রেখেছেন জাহাজডুবির পর আশ্রয়প্রার্থী নাবিকদের জন্যে । কতগুলি আবার খুব ছোটো—যেন জমি খানিকটা ব'সে গেছে ভিতর দিকে । অন্যগুলি খুব গভীর, আর সামনে স্তূপ হ'য়ে শৈবাল আছে ব'লে আলোর রেখা ঢুকতে পারে না, আর তাই কালো অন্ধকার মেলে ব'সে আছে আগন্তুকদের জন্যে । সম্ভবত যে-দিকটা সমুদ্রের হাওয়ার সরাসরি মুখোমুখি নেই, সেদিকে আরো-ভালো কতগুলি গুহা দেখা যাবে, যেখানে গিয়ে তারা আশ্রয় নিতে পারবে ।

নৌকোটা যেখানে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, যথাসম্ভব তার কাছাকাছিই থাকার চেষ্টা ক'রে ফ্রিৎজ তার সঙ্গীদের নিয়ে পুবদিকে এগিয়ে গেলো । পুবদিকে যেখানে পাহাড় জলের গায়ে নেমে এসেছে, সেদিকটা অপেক্ষাকৃত গড়িয়ে গেছে ব'লে পাহাড়টা ঘুরে ওপাশে যেতে পারবে ব'লে তারা আশা করেছিলো । এবার তাদের ভাবনায় কোনো ভুল হয়নি । তার ঠিক কোনার দিকে একটা গুহা দেখা গেলো, খুব সহজেই যেখানে আশ্রয় নিতে পারা যায় । পুব, উত্তর আর দক্ষিণ দিকে পাহাড়টা এমনভাবে তাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে যে ওই তিনদিকের হাওয়ার হাত থেকে অনায়াসেই রেহাই পাওয়া যায়—শুধু পশ্চিম দিকটা উন্মোচিত—কিন্তু এই এলাকায় পশ্চিম থেকে হাওয়া আসে না সচরাচর, তাই আশ্রয় নেবার পক্ষে এটাকেই সবচেয়ে উপযোগী ব'লে তাদের মনে হ'লো ।

চারজনেই তৎক্ষণাৎ গুহার ভিতর ঢুকে পড়লো—আলো বেশ ভালোই ঢোকে এই গুহায়, ঘুরে-ঘুরে ভিতরটা দেখতে কোনো অসুবিধেই হ'লো না তাদের । প্রায় বারো ফিট উঁচু আর কুড়ি ফিট চওড়া, আর তার গভীরতা হবে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফিট—এমনভাবে কতগুলি পাথর থামের মতো নেমে এসেছে যে মনে হয় মস্ত একটা হলঘরকে চার-পাঁচটা ছোটো-ছোটো ঘরে ভাগ ক'রে নেয়া হয়েছে । মোলায়েম গালচের মতো ছড়িয়ে আছে মিহি কোমল বালু, মোটেই স্যাঁতসেতে লাগলো না । প্রবেশপথটাও এমনভাবে তৈরি যে হয়তো অনায়াসেই বন্ধ ক'রে রাখা যাবে ।

'আমি তো নাবিক, কাজেই আমার মতের একটা দাম আছে । ব্লক ঘোষণা ক'রে

দিলে, 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি এর চেয়ে ভালো কোনো আশ্রয় খুঁজে বের করা দস্তুরমতো অসাধ্য হবে। এমন সুবিধে যে পাবো, তা আমার কল্পনাতীত ছিলো।'

'তা মানি।' ফ্রিৎজ বললে, 'কিন্তু আমাকে যেটা ভাবাচ্ছে তা হ'লো এই একেবারে শূন্য ভাবটা। একেবারে ফাঁকা আর পরিত্যক্ত এদিকটা—মনে হয় উপরের মালভূমিও এ-রকমই হবে।'

'আগে তো গুহাটা দখল ক'রে নেয়া যাক, তারপর ধীরে-সুস্থে না-হয় বাকি-সব দেখা যাবে।'

'রক কাসলে আমাদের যে-বাড়ি ছিলো, তা এর চেয়ে কত ভালো। পাশেই ছিলো জ্যাকেল রিভার—এখানে তো ছোট্ট একটা ঝর্নাও দেখছি না আশপাশে!'

'ধৈর্য ধরো, ধৈর্য!' ব্লক বললে, 'আস্তে-ধীরে সবই হবে। হয় কোনো ঝরনা আবিষ্কার করবো, নয়তো দেখবো পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট্ট একটা স্রোতের রেখা এসেছে ঘুরে-ঘুরে।'

'সে-সব কিছু বুঝি না।' ফ্রিৎজ ঘোষণা ক'রে দিলে 'শুধু-কেবল এটুকুই বুঝি যে এই উপকূলে আমরা চিরকালের মতো ডেরা বসাতে যাচ্ছি না। এই পাহাড়টা যদি অতিক্রম ক'রে যেতে না-পারি তো নৌকোয় ক'রে জলপথেই এটাকে প্রদক্ষিণ ক'রে দেখে আসতে হবে। যদি দেখি যে এটা একটা ছোট্ট দ্বীপমাত্র, তাহ'লে কাপ্তেন গুড যতদিন-না সুস্থ হচ্ছেন, শুধু সেই-ক'টা দিনই এখানে থাকবো। আর তার জন্যে বোধহয় পনেরো দিনই যথেষ্ট।'

'তা মেনে মিলেও এটা তো ঠিক যে স্বয়ং ঈশ্বর-নির্মিত একটি বাড়ি পেয়ে গেছি আমরা।' জন ব্লকের সুচিন্তিত মন্তব্য শোনা গেলো, 'আর বাগানের কথা?—কে জানে, হয়তো ধারে-কাছেই কোথাও আছে—অন্তরীপের ওপাশেও হ'তে পারে হয়তো।'

গুহাটা ছেড়ে এসে সিন্ধুসৈকত ধ'রে তারা হেঁটে গেলো—উদ্দেশ্য, যদি অন্তরীপের এই পাহাড়টার ওপাশে যেতে পারা যায়। গুহা থেকে পাহাড়ের গায়ের পাহাড়গুলি পর্যন্ত প্রায় দুশো গজ পাথুরে জমি প'ড়ে আছে—বেলাভূমির বাঁ-পাশে যে-রকম স্তূপের মতো সমুদ্রের শৈবাল ছিলো, এদিকে কিন্তু তেমন-কিছুই নেই। আর এখানকার পাথরগুলি দেখে মনে হয়, তারা যেন চুড়ো থেকে ভেঙে পড়েছে। গুহার পাশ দিয়ে যদি এদিকে যেতে হয়, তাহ'লে কিছুতেই পারা যাবে না—পাহাড়গুলি এখানে এমন বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে আছে--বরং সমুদ্রের কাছে এ-জায়গাটা অপেক্ষাকৃত কম দুর্গম।

হঠাৎ জলধারার শব্দ শনে ব্লক থেমে পড়লো। গুহার প্রায় একশো ফিট দূরে থেকে ছোট্ট একটি ঝরনা পাথরের ভিতর দিয়ে মর্মর তুলে শুধু তরল কতগুলি সুতোর মতো ব'য়ে যাচ্ছে। পাথরগুলি এখানে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ব'লে তারা সেই ঝরনার পাশে চ'লে যেতে পারলে। লাফিয়ে-লাফিয়ে নেমে যাচ্ছে জল, আর ছিটকে ফেনা তুলে, চঞ্চলভাবে ছুটে চ'লে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে।

'এই তো আমাদের জলাশয়!' অঞ্জলি ক'রে জল তুলে নিয়ে পান ক'রে দেখলো ব্লক। 'বেশ তাজা মিষ্টি জল।'

'সত্যি বেশ মিষ্টি জল!' ফ্রাংকও পান ক'রে দেখলো।

'তাহ'লে পাহাড়ে চূড়োয় গাছপালা কিছু গজায়নি কেন ? 'ব্লক জানতে চাইলে, 'ঝরনাটা ছোটো হ'লেও জল তো বটেই ।'

'হয়তো এখানকার জল থাকে কেবল বছরের এই সময়েই—গরমের সময়ে হয়তো ধারাটা শুকিয়ে যায়, আবার বর্ষার দিনে প্লাবন বইয়ে দেয় ।' ফ্রিৎজ বললে ।

'তাহ'লে যেন আরো কিছুদিন এভাবে স্রোত তুলে ব'য়ে যায়—তবেই আমাদের কাজ চলবে—তার বেশি আর-কিছুই চাই না ।' বলা বাহুল্য এই দার্শনিক উক্তিটি শ্রীযুক্ত জন ব্লকেরই ।

ফ্রিৎজ আর তার সঙ্গীরা যা চাচ্ছিলো, তা-ই পেয়ে গেলো : আশ্রয় নেবার মতো মস্ত একটি আলোভরা গুহা, আর নৌকোর জলপাত্র ও পিপে ভর্তি ক'রে রাখার টাটকা আর মিষ্টি জল । এখন কেবল খাদ্যের সমস্যাটা চুকে গেলেই আর-কিছু তারা চায় না । কিন্তু এই বিষয়ে দ্বীপ তাদের তেমন ভরসা দিলে না । এই ঝরনাটা পেরিয়ে গিয়ে নতুন ক'রে আবার একটি গভীর হতাশায় তারা ভ'রে গেলো ।

এই পাথরভরা বেলাভূমির পরে দেখা গেলো মস্ত একটি জলাশয় সেই সৈকতের উপর—চওড়ায় প্রায় আধমাইল হবে— বালি আর কাদায় একেবারে ভরপুর আর পিছন দিকে অতিকায় এক শাস্ত্রীর মতো পাহারা দিচ্ছে সেই মস্ত পাহাড় । আর তাই অন্যপ্রান্তে বিকট এক ঠাট্টার মতো লম্বের আকারে উঠে গেছে দেয়াল—সমুদ্রের ঢেউ তার পা ধুইয়ে দেয় প্রতিমুহূর্তে ।

বেলাভূমি কিন্তু এখানেও তেমনি ফাঁকা, শূন্য আর পরিত্যক্ত । এখানেও সমুদ্রের শৈবাল ছড়িয়ে আছে স্তূপের মতো—বোঝা গেলো জোয়ার এসে তাদের বারে-বারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে । তাহ'লে কি এটাকে দ্বীপও বলা চলে না—এটা কি তারও কোনো-এক ছোটো সংস্করণ, শুধু পাথর দিয়ে ভরা, পরিত্যক্ত ও জনহীন, মনুষ্যবাসের অনুপযোগী—প্রশান্ত মহাসাগরের সেইসব অসংখ্য ডুবো-পাহড়ের একটি, যারা হঠাৎ একদিন জলের তলা থেকে মাথা বাড়িয়ে তারাভরা আকাশ দ্যাখে ? এ-পর্যন্ত যা-কিছু তাদের চোখে পড়লো, তাতে এই ধারণাটাই সত্য ব'লে মনে হয় । আর সেই জলাভূমি পর্যন্ত যেতে চাইলো না তারা । কীই-বা আর দেখবে—শুধু তো পাথর বালি আর শ্যাওলার স্তূপ, যা দিয়ে এই শুকনো ডাঙা তৈরি ।

নৌকোয় ফিরে যাবার জন্যে তারা পিছন ফিরছে, এমন সময় তীরের দিকে হাত বাড়িয়ে জেমস ব'লে উঠলেন, 'বালির উপর ওগুলো কী বলো তো ?—কালো-কালো, ওই-যে কী-সব ন'ড়ে বেড়াচ্ছে ?'

'আরে ! ও-তো দেখছি একপাল কাছিম !' ব্লক চেঁচিয়ে উঠলো ।

'তোমার ধারণাই যেন ঠিক হয় ।'

ব্লকের দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা সত্যিই তাজ্জব করার মতো । বালির উপরে ওগুলো সত্যিই একপাল কাছিম—আস্তে-আস্তে দল বেঁধে বুকে হেঁটে চলাফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে সৈকতে । ফ্রিৎজ আর জেমস সেখানেই থেকে গেলো, শুধু ফ্রাংক আর ব্লক দু-পাশ দিয়ে নেমে গেলো সেই কাছিমগুলির দিকে ।

কাছিমগুলি কিন্তু ছোটো মাপের—বারো থেকে পনেরো ইঞ্চি হবে লম্বায়, শুধু ল্যাজটাই বেশি লম্বা । তারা সেই জাতের কাছিম, যাদের প্রধান আহার্য হ'লো পোকামাকড় । সংখ্যায়

তারা পঞ্চাশ হবে, কুচকাওয়াজ ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে সেই ঝরনার দিকে—তাদের শক্ত মস্ত চাকা-চাকা দাগ-কাটা কালো খোলায় রোদ প'ড়ে চকচক ক'রে উঠেছে। আর জমির এইদিকটায় ভিজে মাটির পর সমুদ্রের বুদ্বুদের মতো প'ড়ে আছে বালির স্তূপ। দেখেই ফ্রাংক চেঁচিয়ে উঠলো ; 'ওইসব গর্তের ভিতর বালির আড়ালে কাছিমের ডিম আছে।'

'আপনি তবে ডিমগুলো বের ক'রে নিন,' ব্লক ব'লে উঠলো, 'আমি শ্রীমানদের কায়দা করার ব্যবস্থা করছি। নিশ্চয়ই সেদ্ধ-করা নুড়িপাথরের চেয়ে খাদ্য হিশেবে এগুলো অনেক সুস্বাদু—আর এতেও যদি মহিলারা সন্তুষ্ট না-হন–'

'ডিমগুলোকে যে তুমুল হৈ-চৈ ক'রে স্বাগত জানানো হবে, এটা আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

'কাছিমগুলোকেও নির্ঘাৎ পছন্দ করবেন তাঁরা। ভারি চমৎকার জীব এরা— সুরুয়া রাঁধলে দারুণ লাগে খেতে!'

একটু পরেই দেখা গেলো ব্লক আর ফ্রাংক দুজনে মিলে অনেকগুলি কাছিমকে চিৎ ক'রে ফেলেছে। একবার তাদের চিৎ ক'রে খোলার উপর শুইয়ে দিলেই তারা ভারি অসহায় হ'য়ে পড়ে। আধ-ডজন কাছিম আর ডজনখানেক কাছিমের ডিম নিয়ে তারা সবাই হৈ চৈ করতে-করতে নৌকোয় ফিরে এলো।

জন ব্লকের কাছ থেকে আগাগোড়া সবকথাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন কাপ্তেন গুড। নৌকোর দুলুনি থেমে যেতেই তাঁর যন্ত্রণার পরিমাণ অনেকটা ক'মে গিয়েছিলো, জ্বরের ঘোরও একটু কম, সপ্তাহখানেক বিশ্রাম করলেই আবার উঠে দাঁড়াতে পারবেন ব'লে মনে হয়। মাথার ক্ষত সাধারণত গুরুতর না-হ'লে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় ; বুলেটটি কেবল মাথার উপর দিয়ে চ'লে গিয়েছিলো—চিবুকেরও খানিকটা ছ'ড়ে গিয়েছিলো—আরেকটু হ'লেই একেবারে মাথার খুলি ভেদ ক'রে চ'লে যেতো। এখন সবাই মিলে তাঁর শুশ্রূষা করার অবকাশ পাবে—তাছাড়া তিনিও যথেষ্ট বিশ্রাম পাবেন—কাজেই উদ্বেগের পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক ক'মে গেলো।

উপসাগরের মুখে কাছিমেরা গণ্ডায়-গণ্ডায় ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনে কাপ্তেন গুড খুব খুশি হলেন। কাছিমদের সম্মানেই এই উপসাগরের নাম দেয় হ'লো টার্টল বে। কাছিমের মানেই হ'লো প্রচুর পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য—এবং অনেক দিনের সঞ্চয়। আবার যখন নৌকো ভাসিয়ে দেবার সময় হবে তখন লবণ মাখিয়ে অনেক মাংস সঙ্গে ক'রে নেয়া চলবে। আর নৌকো তো একদিন আবার জলে ভাসাতেই হবে। পাহাড়ের উপরকার মালভূমি যদি বেলাভূমির মতোই অনুর্বর হয় তাহ'লে নৌকোয় ক'রে উত্তরদিকে যেতেই হবে তাঁদেব—দ্বীপ হয়তো সেইদিকে যথেষ্ট অতিথিপরায়ণ হবে।

'এবার, ডলি, তোমার মত কী, শুনি। জেনি, তুমিও বলো। কেমন লাগছে সবকিছু? আমরা যতক্ষণ ছিলুম না, ততক্ষণে ক-টা মাছ ঠুকরোলো?'

'বেশ ভালোই', গলুইয়ের কাছে কয়েকটা মরা মাছ প'ড়ে ছিলো, জেনি তাদের দেখিয়ে দিলে।

'এর চেয়েও ভালো আরেকটি জিনিশ আছে তোমাদের জন্যে,' খুশি গলায় ডলি তাকে জানালে।

'কী ?'

'একধরনের ঝিনুক,' ডলি উত্তর দিলে, 'স্তূপ হ'য়ে ছিলো ওই অন্তরীপের কাছে। সসপ্যানে তো এখন ঝিনুকগুলোই সেদ্ধ করা হচ্ছে।'

'তাই নাকি! বাঃ, চমৎকার তো।' ফ্রাংক ব'লে উঠলো, 'অবশ্য আমাদের কৃতিত্বও কিছু কম নয়, কারণ আমরা কেউই খালি হাতে ফিরিনি। এই দ্যাখো কতগুলি ডিম—'

ছোট্ট বব তক্ষুনি জিগেস করলে, 'মুরগির ?'

'না, কাছিমের।'

'কাছিমের ?' জেনি তো অবাক। 'তোমরা কি কাছিম পেয়েছো নাকি ?'

'একদঙ্গল!' ব্রুক জানিয়ে দিলে, 'রীতিমতো একটা ফৌজ হবে। যতদিন-না এখন থেকে নোঙর তুলছি ততদিন এরাই আমাদের জীবনধারণের ভার নেবে।'

'নোঙর তোলবার আগে,' কাপ্তেন গুড ব'লে উঠলেন, 'আমাদের অবশ্য পাহাড়ের চুড়োয় উঠে দেখতে হবে। উপকূলকেও বাদ দিলে চলবে না।'

'তার জন্যে অবশ্য তাড়াহুড়োর দরকার নেই।' ব্রুক বললে, 'তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে। যে-কটা বিস্কুট আছে, তা কিন্তু এখন আর ছোঁয়া চলবে না!'

'আমরাও তা-ই ভালো ব'লে মন হয়, ব্রুক।'

'সবচেয়ে আগে যেটা জরুরি,' ফ্রাংক বললে, 'তা হ'লো আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হ'য়ে উঠুন। তারপরে আপনিই সব ভেবেচিন্তে নির্দেশ দেবেন।'

বাকি সময়টুকু নৌকোর সব জিনিশপত্র আস্তে-আস্তে গুহায় নিয়ে যেতেই কেটে গেলো। বিস্কুটের ব্যাগ, নানাধরনের সব বাটি, জ্বালানি, ছুরি-কাঁটা হাতা-বেড়ি, জামাকাপড়—সব নিয়ে যাওয়া হ'লো গুহায়। ছোট্ট উনুনটাকে বসানো হ'লো গুহার এককোনায়—প্রথম সেটা কাজে লাগলো কাছিমের সুরুয়া রাঁধতে।

ফ্রিৎজ আর ব্রুক দুজনে মিলে কাপ্তেন গুডকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে এলো; শুকনো শ্যাওলা বিছিয়ে তাঁর জন্যে একটি আরামদায়ক বিছানা পাতা হয়েছিলো—তার উপর শুয়ে তিনি কয়েক ঘণ্টার জন্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

৫

উপক্রমণিকা

গুহার বাসার চেয়ে ভালো-কোনো আশ্রয় খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিলো তাদের পক্ষে। মস্ত কতগুলি পাথরের থাম এমনভাবে নেমে এসেছিলো যে সহজেই তারা অনেকগুলি কুঠুরি পেয়ে গেলো। গুহার মধ্যে অবশ্য দিনের বেলাতেও বেশি আলো ঢোকে না, আর এটা সত্যিই তাদের পক্ষে মস্ত অসুবিধের; তবে একটা কথা তো ঠিক যে আবহাওয়া খুব-একটা খারাপ না-থাকলে সন্ধের আগে গুহার ভিতর গিয়ে আশ্রয় নেবার খুব-একটা দরকার ছিলো

না তাদের। একেবারে ঊষাবেলায় কাপ্তেন গুডকে ধরাধরি ক'রে তারা গুহার বাইরে নিয়ে আসে, যাতে সমুদ্রের লোনা হাওয়া আর কড়া রোদে তিনি একটু আরাম বোধ করেন।

কুঠুরিগুলোর ভিতর একটিতে থাকে জেনি তার স্বামীর সঙ্গে। অপেক্ষাকৃত বড়ো-একটা কুঠুরিতে জেমস তাঁর স্ত্রী ও শিশুকে নিয়ে থাকলেন। ফ্রাংক সেই বড়ো হলঘরটার একটা কোনা নিজের দখলে পেয়েই সন্তুষ্ট, সেখানে তার সঙ্গে থাকে ব্লক আর কাপ্তেন গুড।

বাকি দিনটা সেদিন বিশ্রাম নিতেই কেটে গেলো। গত কয়েকদিনে সকলের স্নায়ুর উপর দিয়েই ভীষণ অত্যাচার গেছে, মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে পর-পর অনেকগুলি বিপদের—এখন একটু বিশ্রাম না-দিলে পরে হয়তো সত্যি কোনো স্নায়বিক দুর্ঘটনা ঘ'টে যাবে। তাছাড়া সবদিক ভেবে-চিন্তে তারা এই উপসাগরের মুখে দিন পনেরো কাটাবে ব'লে স্থির করেছিলো—অন্তত নিরাপত্তা সম্বন্ধে এই ক-টা দিন এখানে বেশ নিশ্চিন্ত। এমনকী যদি কাপ্তেন গুড মোটেই না-থাকতেন, তাহ'লেও তারা এই সিদ্ধান্তই নিতো—তক্ষুনি রওনা হবার কথা ভাবতেই পারতো না কিছুতেই।

কাছিমের সুরুয়া, কাছিমের মাংস, আর কাছিমের ডিম—সন্ধের সময় আবার এই খাদ্য গলাধঃকরণ ক'রে ফ্রাংকের নেতৃত্বে প্রার্থনায় বসলো সবাই, তারপরে গুহার ভিতর ঢুকে পড়লো। জেনি আর ডলির শুশ্রূষায় কাপ্তেন গুড তখন অনেকটা সুস্থ—জ্বরের তপ্ত ঘোর আর নেই, ক্ষতস্থানটিও শুকিয়ে যাচ্ছে এখন, কাজেই ব্যথাও অনেকটা কম। তারা যা ভেবেছিলো তার চেয়েও তাড়াতাড়ি তিনি আরোগ্যের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। রাতের বেলায় পাহারার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। এই নিষ্প্রাণ তীরভূমিতে ভয়ের কিছুই নেই—না কোনো বুনো জানোয়ার, না কোনো জংলি বাসিন্দা। এই কালো, বিষণ্ণ ও মন-খারাপ করা পরিত্যক্ত অঞ্চলে আগে কোনোদিন কোনো মানুষ পদার্পণ করেনি ব'লেই মনে হ'লো তাদের। শুধু সামুদ্রিক পাখিরা যখন দিগন্ত থেকে উড়ে আসছিলো তাদের পাহাড়ি বাসায়, তখন শুধু তাদের গলার কর্কশ ও বিষণ্ণ চীৎকারে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছিলো স্তব্ধতা। আস্তে-আস্তে হাওয়া ম'রে গেলো সেই বেলাভূমিতে—সূর্যোদয় পর্যন্ত একটুও হাওয়া থাকলো না আশপাশে।

সকাল হ'তে-না-হ'তেই পুরুষেরা সবাই বেরিয়ে পড়লো গুহা ছেড়ে। প্রথমে বেরুলো ব্লক, বেলাভূমি ধ'রে সে গেলো অন্তরীপের দিকে নৌকোর কাছে। তখনো ভাসছে নৌকোটি, কিন্তু একটু পরেই ভাঁটার টানে জল ক'মে গেলে প'ড়ে থাকবে বালির উপর, একলা। দুই দিক দিয়েই দড়ি দিয়ে বাঁধা—আর সেই জন্যেই কোনো সংঘাতই লাগেনি তীরের পাথরের গায়ে। আর তারই দরুন জোয়ার-ভাঁটায় কোনো ক্ষতিই হবে না তার, আর যতক্ষণ পুব থেকে হাওয়া বইবে, ততক্ষণও কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। তবে দক্ষিণের হাওয়া যদি কখনও তোড়জোড় ক'রে এসে পড়ে, তাহ'লেই ভয়ের কথা—তখন চটপট কোনো-একটি ভালো আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে নৌকোর জন্যে। আবহাওয়া অবশ্য এখন বেশ প্রসন্ন—বোধকরি এটাই দ্বীপের সবচেয়ে ভালো ঋতু।

ফিরে এসে ফ্রিৎজকে ডেকে ব্লক বললে, 'এই বিষয়টায় আমাদের একটু ভাবতে হবে, কেননা অন্যসব কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে নৌকোটা অনেক-বেশি জরুরি। গুহাটা অবশ্য বেশ ভালোই, কিন্তু গুহায় ক'রে তো আর কেউ সমুদ্রপাড়ি দেয় না। আর যখন এই দ্বীপ ত্যাগ ক'রে যাবার সময় আসবে—যদি আদৌ তা আসে—তাহ'লে এটাই মনে রাখতে

হবে যে আমরা যেন সমুদ্রপাড়ি দিতে পারি ।'

'নিশ্চয়ই ! সে-কথা আর বলতে ! নৌকোর কোনো ক্ষতিই যাতে না-হয়, সে-বিষয়ে আমাদের সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে । আচ্ছা, অন্তরীপের অন্যপাশে নৌকোর জন্যে কোনো ভালো বন্দর পাওয়া যাবে কি ? তোমার কী মনে হয় ?'

'সেটা দেখতে হবে । এদিকে যখন এখন সব ঠিকঠাক আছে, তখন আমি অন্যপাশে ঘুরে গিয়ে কাছিম শিকার ক'রে আসবো । আপনি যাবেন আমার সঙ্গে ?'

'না, একাই চ'লে যাও তুমি । আমি একটু কাপ্তেনের কাছে যাচ্ছি । কাল রাতে বেশ ভালোই ঘুমিয়েছিলেন তিনি, তাতে বোধহয় জ্বর একটু কমেছে । জেগে উঠে তিনি নিশ্চয়ই সবকিছু জানতে চাইবেন । আমার তখন সেখানে থাকা দরকার, কেননা তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর পরামর্শ আমাদের কাছে খুবই জরুরি ।'

'ঠিক কথা—তাঁকে বলবেন যে এখন আর-কোনো বিপদের ভয় নেই ।' এই ব'লে ব্লক পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে অন্তরীপের সেই দিকে চ'লে গেলো, গতকাল যেখানে সে আর ফ্রাংক কচ্ছপদের কুচকাওয়াজ দেখেছিলো ।

ফ্রিৎজ গুহায় ফিরে এলো । ফ্রাংক আর জেমস তখন সমুদ্রের শ্যাওলা ব'য়ে আনতে ব্যস্ত । ছোট্ট ববকে জামাকাপড় পরিয়ে দিচ্ছেন সুসান । জেনি আর ডলি তখনো কাপ্তেনের কাছে, তাঁর শুশ্রূষার ব্যস্ত । এককোনায় গনগনে আগুন জ্বলছে চুল্লিতে, আর কেটলির জল ফোঁশ-ফোঁশ ক'রে টগবগিয়ে উঠছে ।

কাপ্তেনের সঙ্গে সব কথাবার্তা শেষ ক'রে জেনিকে নিয়ে বেলাভূমির দিকে চ'লে গেলো ফ্রিৎজ । একটু দূরে গিয়ে তারা আবার মোড় ফিরলো, আর সামনেই দাঁড়িয়ে রইলো সেই মস্ত পাহাড়, যেন বিরাট এক জেলখানার দেয়াল তাদের আটকে রেখেছে । ফ্রিৎজ যখন কথা বললে তখন তার গলার স্বর গভীর, ভরাট : 'অনেক কষ্ট দিলাম তোমাকে, জেনি । মনে আছে তোমার, সেই-যে বার্নিং রক-এ প্রথম তোমাকে পেয়েছিলাম, তারপর ছোট্ট-একটা ডিঙি নৌকোয় ক'রে ফিরছি দুজনে ? শেষে যখন রক-কাসলে পৌঁছুলাম, তখন তোমাকে দেখে সকলের সে-কী বিস্ময় আর আনন্দ । তারপর তো দেখতে-দেখতে দুটো বছর কেটে গেলো, যেন দুটো দিন মাত্র । আমাদের এই ছোট্ট গণ্ডিতে তুমিই ছিলে আনন্দ আর সুখের উৎস । এই জীবনের সঙ্গে এতটাই জড়িয়ে পড়েছিলাম যে, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এই দ্বীপের বাইরে কোনো জীবন আছে । পরে যে *ইউনিকর্ন*-এ ক'রে আমরা রওনা হলাম, তা কেবল তোমার বাবার কথা ভেবেই—না-হ'লে হয়তো কোনোকালেই নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড ত্যাগ করতাম না আমরা !'

'হঠাৎ এ-সব কথা বলছো কেন, ফ্রিৎজ ?'

'তোমাকে সব বলতেই চাই, জেনি । তুমি জানো না এই দুর্দশার ভিতর পড়ার পর থেকে আমি কেবল বিশেষ ক'রে তোমার কথাই ভাবছি । এত-যে কষ্ট পেতে হচ্ছে তোমাকে, তার জন্যে আমিই পুরোপুরি দায়ী । নিজের উপর এক অসহায় রাগে ভ'রে গিয়ে আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে ।'

'দুর্দশাকে তুমি ভয় পাচ্ছো, ফ্রিৎজ । তোমার মতো সাহস যার আছে, সে কেন এভাবে ভেঙে পড়বে ? না, না ফ্রিৎজ, তুমি যদি এতটা হতাশ হ'য়ে পড়ো, তাহ'লে আমি যে

আর-কাউকে মুখ দেখাতে পারবো না ।'

'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না জেনি, নিজের উপর আমার কী-রকম রাগ হচ্ছে । তুমি তো দেশেই পৌঁছে গিয়েছিলে, তোমার আত্মীয়-স্বজনেরা আছেন সেখানে—তাদের মধ্যে সুখেই দিন কাটাতে । তার বদলে কিনা—'

'সুখ ? তোমাকে ছাড়া, ফ্রিৎজ ? তোমাকে ছাড়া—সুখ ? তুমি কি ভুলে যাচ্ছো যে আমি তোমার স্ত্রী ?'

'কিন্তু, জেনি, তাতে তো এই তথ্যটা চাপা পড়ে না যে আমি নতুন ক'রে আবার তোমাকে দুঃখ-দুর্দশা-মৃত্যুর মুখে টেনে আনলাম—আর এই পাথর, কাদা, আবর্জনায় ভরা বেলাভূমির দিকে তাকাতেই আমার বুক ভ'য়ে শুকিয়ে যায় । কী ভীষণ বিপদের মধ্যে আমরা আছি, তা কি আর তোমাকে ব'লে বোঝাতে হবে ? ঈশ ! সেই নাবিকগুলিকে হাতের কাছে পেলে আমি বোধহয় ছিঁড়েই ফেলতুম—নিষ্ঠুরের মতো তারা আমাদের জলে ভাসিয়ে দিলে ! আর তুমি—তুমি তো একবার *ডোরকা* জাহাজ ডুবে যাবার পর একলাই মেনে নিয়েছিলে ভীষণ সমুদ্রকে—এখনো আবার ভাসমান সেই জীবন মেনে নিতে হ'লো তোমাকে । আগে বরং তুমি বার্নিং রক-এ গিয়ে পৌঁছেছিলে, কিন্তু এখন আমরা যে-দ্বীপে এসে পৌঁছেছি, তা তো মনুষ্য-বাসেরই অযোগ্য ।'

'কিন্তু এবার তো আর আমি একলা নই । তুমি আছো আমার সঙ্গে, আর আছে ফ্রাংক আর আমাদের অন্যান্য বন্ধুজন । ফ্রিৎজ, বিপদকে আমি কোনোই ভয় করি না, যতক্ষণ তুমি আমার সঙ্গে আছো । আমি জানি আমাদের নিরাপত্তার জন্যে যা-কিছু করা সবই তুমি করবে ।'

'সবই করবো, জেনি, সবই করবো,' ফ্রিৎজের গলা ধ'রে এলো, 'কিন্তু তবু তোমার কাছে এই মুহূর্তে ক্ষমা চাইতে হবে আমাকে । আমারই জন্যে—'

জেনি তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে একটু চাপ দিলে । 'ফ্রিৎজ, এই ব্যাপারগুলির জন্যে কেউই দায়ী নয় । *ফ্ল্যাগ* জাহাজে যে বিদ্রোহ ঘটবে, আর আমাদের এভাবে অজানা সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হবে—এ-সব কথা মানুষ কী ক'রে আগে জানতে পারতো ? আর কেবল দুর্দশার দিকটাই তুমি বড়ো ক'রে দেখছো কেন ? আমাদের ভাগ্যে আরো বিষম বিপদ থাকতে পারতো—জাহাজের নাবিকেরা যে আমাদের হত্যা করেনি, এটা কি খুব-একটা কম কথা হ'লো ? আর খিদে কি তৃষ্ণায় শুকিয়ে মরতুম হয়তো আমরা নৌকোয়, কিন্তু তার হাত থেকেও তো উদ্ধার পেয়ে গেলাম । ঝড়ের পাল্লায় প'ড়ে আমাদের নৌকো তো ডুবেও যেতে পারতো । তার বদলে আমরা কিনা ডাঙায় এসে পৌঁছেছি, *আশ্রয়* পেয়েছি এখানে ; এটা কোন দেশ, তা অবশ্য জানি না । সেটা জেনে নিয়ে, প্রয়োজন হ'লে হয়তো এই জায়গা ছেড়ে অন্য-কোনোখানে চ'লে যাবো—অন্য-কোনোখানে, যেখানে ঈশ্বর আমাদের নিয়ে যেতে চান ।'

জেনির কাছ থেকে ধীরে-ধীরে আবার আশা ফিরে পেলে ফ্রিৎজ। এখন সে অতিমানুষিক ক্রিয়াকলাপেও অংশগ্রহণ করতে পারে, তার মনের জোর ঠিক এতটাই বেড়ে গেলো ।

বেলা দশটার সময়ে, আবহাওয়া যথেষ্ট প্রসন্ন হ'য়ে আছে দেখে, অন্তরীপের একেবারে

শেষপ্রান্তে কাপ্তেন গুড নিজেই রোদ পোয়াতে এলেন। ততক্ষণে ব্লক তার অভিযান শেষ ক'রে ফিরে এসেছে। ঝরনা পেরিয়ে অনেকটা পুবে গিয়েছিলো সে, যেখানে সেই মস্ত দেয়ালটা লম্বের মতো নেমে এসেছে। তার ওপাশে যাওয়া অসম্ভব। ঝরনার কাছে জেমসের সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে গিয়েছিলো। দুজনে মিলে প্রচুর পরিমাণে কাছিম শিকার ক'রে এনেছে। বলা তো যায় না, যে-কোনো মুহূর্তে হয়তো তাদের আবার ভেসে পড়তে হবে —সেইজন্যেই সবসময়ে অনেক খাদ্য জমিয়ে-রাখা দরকার।

মধ্যাহ্নভোজের পর পুরুষেরা সবাই আলোচনা-সভা বসালে, আর মেয়েরা সবাই যা-কিছু বাড়তি কাপড় ছিলো সব কাচতে বসলো। ঝরনার জলেই কাপড় ধুলো তারা—রোদের প্রখরতা এত বেশি যে চট ক'রেই তা শুকিয়ে যাবে। এরপরে সব জামাকাপড় শেলাই ক'রে তৈরি হ'য়ে থাকতে হবে, যাতে প্রয়োজন-মতো রওনা হ'য়ে পড়তে একটুও দেরি না-হয়।

দ্বীপ ছেড়ে যেতে হবে কিনা, এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ছোট্ট-একটি প্রশ্নের উপর। এই জায়গাটার ভৌগোলিক অবস্থান কী? কোনো যন্ত্রপাতি ছাড়া তা কি জানতে পারবে তারা? শুধু কি মধ্যদিনের খর সূর্যকেই তারা ধ'রে নেবে হিশেবের মূলসূত্র? কিন্তু সূর্যের অবস্থান দেখে তারা যা নির্ণয় করবে, তা যে পুরোপুরি নির্ভুল হবে, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। কিন্তু আজ সবকিছু দেখে-শুনে আবার তাদের মনে হ'লো এই জায়গাটুকু ত্রিশ থেকে চল্লিশ অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু উত্তরে-দক্ষিণে তার দ্রাঘিমা-রেখা কত, তা তারা বুঝতেই পারলে না। তার উপর আরেকটা সমস্যারও সমাধান অত্যন্ত জরুরি। ওই উপরের মালভূমিতে কী ক'রে পৌঁছুনো যায়। কাপ্তেন সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে ওঠার আগেই তাদের এই খবরটা নেয়া জরুরি নয় কি যে কোথায় তারা এসে পড়েছে—কোনো দ্বীপে, না মহাদেশে, না কি কোনো দ্বীপভূমিরই ক্ষুদ্র কোনো সংস্করণ এটা? আর পাহাড়টা তো সাত-আটশো ফিট উঁচু, কাজেই তার চুড়ো থেকে সমুদ্রের দিকে তাকালে অন্য-কোনো দ্বীপও হয়তো চোখে পড়ে যাবে তাদের। ফ্রিৎজ, ফ্রাংক আর ব্লক পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রে নিলে যে, তারা তিনজনে একদিন চুড়োয় উঠে চারদিক দেখে আসবে।

কয়েকদিন কেটে গেলো, কিন্তু পরিস্থিতি থাকলো আগের মতোই। এই কথাটি সবাই মর্মে-মর্মে বুঝে গিয়েছিলো যে, যে-ক'রেই হোক এই বেলাভূমি থেকে তাদের চ'লে যেতে হবেই, না-হ'লে হয়তো অবস্থা আরো খারাপ হ'য়ে পড়বে। এখনো অবশ্য আবহাওয়া ভালোই আছে, কিন্তু তাপ বড্ড বেশি। এরই মধ্যে ফ্রিৎজ, ফ্রাংক আর ব্লক কয়েকবার চেষ্টা করেছে পাহাড়ে চড়ার, কিন্তু প্রত্যেকবারই ব্যর্থতাকে মেনে নিতে হয়েছে তাদের। এত খাড়াই যে, কিছুতেই পাহাড়ে চড়া সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে কাপ্তেন অবশ্য প্রায় পুরোপুরিই সুস্থতা অর্জন ক'রে নিচ্ছিলেন। ব্যানডেজ তখনো ছিলো বটে, কিন্তু ক্ষতটা শুকিয়ে গিয়েছিলো। জ্বরও আর হয় না। ধীরে-ধীরে বল ফিরে আসছে শরীরে, তবে এখন কারু সাহায্য ছাড়া একা-একাই হাঁটতে পারেন! নৌকোয় ক'রে উত্তরদিকে পাড়ি দেবার কথাটা প্রায়ই তিনি বলেন ফ্রিৎজকে। পঁচিশ তারিখ সকালবেলায় ঝরনা পেরিয়ে একেবারে খাড়া দেয়ালটা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন তিনি; দেখে-শুনে তিনিও তাদের সঙ্গে একমত হলেন: এখান দিয়ে ঘুরে-যাওয়া অসম্ভব।

ফ্রিৎজ গিয়েছিলো তাঁর সঙ্গে ; আর ছিলো ফ্রাংক আর ব্লক। ফ্রিৎজ বললে যে সাঁৎরে ওদিকে যাবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু স্রোত এত প্রখর, আর এত ভীষণভাবে ঢেউয়ের মাতামাতি যে, তৎক্ষণাৎ প্রবল গলায় কাপ্তেন তাকে নিষেধ করলেন। ভালো সাঁতারু হ'লেও এতটা দুঃসাহস নিছকই বিপদকে ডেকে আনবে। 'তাছাড়া খামকা বিপদ ডেকে এনে কী লাভ ?' কাপ্তেন তাকে বোঝালেন। 'আমরা বরং নৌকোয় ক'রে প্রাথমিক একটা পর্যবেক্ষণ করে আসবো ওদিকটার। তবে আমার তো মনে হচ্ছে পাহাড়ের ও-পাশটাও এমনি ফাঁকা আর শূন্য।'

'আপনি কি তবে বলতে চাচ্ছেন আমরা কোনো পাহাড়ের গায়ে এসে পড়েছি—একদিন যা জলের তলায় ছিলো ?' ফ্রাংক জিগেস করলে।

'তার সপক্ষে অবশ্য অনেক যুক্তি আছে,' কাপ্তেন উত্তর দিলেন।

'তা না হয় মানলাম,' ফ্রিৎজ বললে, 'কিন্তু আশপাশে অন্য-কোনো দ্বীপও তো থাকতে পারে ? এমনও হ'তে পারে এটা একটা দ্বীপপুঞ্জের অংশ।'

'কোন দ্বীপপুঞ্জের ?' তক্ষুনি কাপ্তেন জিগেস ক'রে বসলেন। 'যতদূর মনে হচ্ছে আমরা এখন অস্ট্রেলিয়া কি নিউজীল্যাণ্ডের আশপাশে আছি। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অংশে তো কোনো দ্বীপপুঞ্জ নেই।'

'মানচিত্রে নেই ব'লে কি থাকতে পারে না ?' ফ্রিৎজ ব'লে উঠলো, 'মানচিত্রে তো নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের উল্লেখ ছিলো না—'

'ঠিক কথা, কিন্তু তার কথা কেবল এইজন্যেই ছিলো না যে, নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড যেদিকে অবস্থিত, সেদিক দিয়ে কোনো জাহাজ যেতো না। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ অংশে সমুদ্র সবসময়েই শশব্যস্ত—সেখানে যদি কোনো দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ থাকে, তা কি নাবিকদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারতো ?'

'এমনও তো হ'তে পারে আমরা অস্ট্রেলিয়ারই কাছে কোনো ছোট্ট দ্বীপে এসে উঠেছি !'

'হ'তে পারে, কিন্তু সেই সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এমনকী অস্ট্রেলিয়ার একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এসে পড়েছি, এটা জানলেও আমি মোটেই অবাক হবো না। কিন্তু সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার হিংস্র ও নরখাদক জংলিদের ভয় করতে হবে আমাদের।'

ব্লক ব'লে উঠলো, 'তাহ'লে বরং এই-ই ভালো। জংলিদের কবলে পড়ার চেয়ে বরং শূন্য ও পরিত্যক্ত একটি দ্বীপে থাকাও অনেক ভালো।'

'পাহাড়ের চুড়োর উঠলেই সব ঠিকঠাক জানতে পারবো আমরা,' ফ্রাংক বললে।

'কিন্তু এমন-কোনো জায়গা তো দেখলাম না যেখান দিয়ে পাহাড়ে চড়া যায়,' বললে ফ্রিৎজ। 'এমনকী অন্তরীপের পাহাড় বেয়েও উঠতে পারা যাবে না। এত খাড়া যে মই ব্যবহার করতে হবে আমাদের, আর তাতেও যে উঠতে পারবো, তার কোনো ঠিক নেই। যদি কোনো চিমনি দেখা যেতো, যেখানে দড়ি বেয়ে ওঠা যায়, তাহ'লে হয়তো চুড়োয় উঠতে পারা যেতো। কিন্তু সে-রকম কোনো চিমনিই তো চোখে পড়লো না।'

'তাহ'লে নৌকোয় ক'রে ঘুরে যেতে হবে আর-কি,' কাপ্তেন গুড ব'লে দিলেন।

'আপনি আগে পুরোপুরি সেরে উঠুন, তারপরে সেটা হবে।'

'আমি তো প্রায় সেরেই উঠেছি। সবাই মিলে যে-রকম যত্ন করছেন, তাতে কি আর অন্যথা হবার কোনো জো আছে ? আর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হ'তে পারবো।'

'পুবে, না-পশ্চিমে ?' ফ্রিৎজ জিগেস করলে।

'হাওয়ার গতি দেখে তা ঠিক করা যাবে'খন,' কাপ্তেন উত্তর দিলেন।

কাজেই এটাই তারা ঠিক করলে যে সাতাশে অক্টোবর নৌকোয় ক'রে তারা উপকূল ধ'রে পাহাড়ের ওপাশে যাবে—ক-দিন লাগবে জানা নেই ব'লেই সবাই মিলেই যাবে এই অভিযানে। কিন্তু পরে আবার আলোচনা করে স্থির হ'লো যে ফ্রিৎজ আর ব্লককে নিয়েই কাপ্তেন যাবেন—অন্য সবাই এই গুহাতেই থাকবে। অন্যরা যাতে খামকাই উদ্বিগ্ন হ'য়ে না-পড়ে, সেইজন্যে যতদূর-সম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে আসারই চেষ্টা করা হবে। তবু এই প্রস্তাবটি সকলকে উদ্বিগ্ন ক'রে দিলো। কী হবে, কে জানে ? এমনও তো হ'তে পারে যে তারা জংলিদের কবলেই প'ড়ে গেলো, তখন ? হয়তো তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলো না কোনো কারণে—হয়তো ফিরলোই না ! এইসব সম্ভাবনাই জেনি তুলে ধরলো। ভীষণ তর্কাতর্কি চললো কিছুক্ষণ তারপর আবার একেবারে গোড়ার সিদ্ধান্তটাই বহাল করা হ'লো। সবাই মিলেই যাবে অভিযানে—এটাই শেষ পর্যন্ত কাপ্তেন মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

যখনই সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুনো গেলো, তখনই নৌকোটাকে ঠিকঠাক করতে লেগে গেলো ব্লক। ঠিকঠাক মানে এই নয় যে, সবকিছুই মেরামত করার ছিলো, কেননা জলে ভাসিয়ে দেবার পর থেকে কোনো বিপদেই পড়েনি নৌকোটি। কিন্তু তবু আবার ভালো ক'রে দেখে-শুনে নিশ্চিত হওয়া ভালো—হয়তো দূরের সমুদ্রেই যেতে হ'তে পারে, কেননা ভবিষ্যতের গোপন দেরাজ খুলে কী বেরিয়ে আসবে, তা কেউ জানে না। হয়তো দেখা যাবে যে কাছেই রয়েছে কোনো বনানী-ঘেরা বিজন দ্বীপ, আর সেখানেই তাদের যেতে হ'লো। কাজেই নৌকোটাকে আরো বেশি ক'রে ভ্রমণের উপযোগী ক'রে তোলার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো ফ্রিৎজ। পাটাতনের একটা দিক সে ঘিরে দিলে ছাউনির মতো, যাতে মহিলারা ঢেউ আর ঝড়ের হাত থেকে রেহাই পান, যাতে আগের চেয়ে আরো-বেশি আরাম বোধ করেন এবার।

কিন্তু এ-সব কাজও একসময় শেষ হ'য়ে গেলো, তারপরে আর অপেক্ষা করা ছাড়া আর-কিছুই করণীয় থাকলো না তাদের। ছাব্বিশ তারিখ সকালবেলাতেই সব প্রস্তুতি শেষ হ'য়ে গেলো তাদের ; আর এমন সময়েই আকাশের চেহারা দেখে ফ্রিৎজের মুখ শুকিয়ে গেলো। কালো-কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে আকাশের দক্ষিণ প্রান্তে—এখনও অনেক দূরেই আছে বটে, কিন্তু যদি হাওয়া আসে জোরে, আর তাড়িয়ে নিয়ে আসে তাদের খ্যাপা হাতির মতো, তাহ'লে ? এখন অবশ্য হাওয়া নেই তেমন—তবু নিরেট একটা ভয়ের মতো ঘুরে-ঘুরে মেঘ এসে জমায়েৎ হ'তে লাগলো। এই বাজ-ফাটা ঝড় যদি শুরু হয়, তাহ'লে তার সব চোটই গিয়ে পড়বে টার্টল বে-র উপর।

এতদিন অন্তরীপের মস্ত পাহাড় নৌকোটিকে পুব হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে—পশ্চিমের হাওয়ায় তাকে ছুঁতে পারতো না, নৌকোটা এমন এক জায়গায় তারা বেঁধে রেখেছিলো। কিন্তু যদি রাগি সমুদ্র লাফিয়ে এগিয়ে আসে বেলাভূমির দিকে তাহ'লে নৌকোটি একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে। অথচ নৌকোটা এখন যেখানে আছে, সেটাই হ'লো সবচেয়ে

নিরাপদ জায়গা—দ্বীপের অন্যান্য উপকূলে তো শান্ত আবহাওয়াতেও স্রোত আর ঢেউ গর্জাতে থাকে। 'কী করা যায়, বলো তো, ব্লক—,' ফ্রিৎজ জিগেস করলে, কিন্তু এই প্রথমবার নাবিক ব্লক কোনো না-ব'লে চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। দূরের থেকে গুমগুম ক'রে গড়িয়ে আসছে মেঘের ডাক, ওই-যে অনেক দূরে জলস্তম্ভের মতো ফুলে-ফেঁপে গর্জন ক'রে উঠলো সমুদ্র, আর এখনই উপকূলের কাছে জলের মধ্যে ভীষণ মাতামাতি শুরু হ'য়ে গেছে।

কোনো কথা না-ব'লে একদৃষ্টে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন কাপ্তেন গুড।

'নির্ঘাৎ কোনো ডাইনির কারসজি এ-সব,' ফ্রিৎজ তাঁকে বললে, 'দেখছেন জলের কী রোষ।'

এবার ব্লক কথা বললে, 'না, আর আমাদের ব'সে থাকলে চলবে না। সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে নৌকোটাকে ডাঙার উপর নিয়ে আসতে হবে। অবশ্য তার আগে সব জিনিশপত্র নামাতে হবে নৌকো থেকে, যাতে হালকা হ'য়ে পড়ে।'

তৎক্ষণাৎ তারা কাজে লেগে গেলো। পালগুলি সব খুলে বালির উপর নামিয়ে রাখা হ'লো, খুলে ফেলা হ'লো মাস্তুলের জোড়, নামিয়ে আনলো হাল আর দাঁড়গুলি, এমনকী পাটাতনটা শুদ্ধু খুলে নিয়ে গুহায় গিয়ে রেখে এলো তারা।

জোয়ারের জল যখন একটু ঢিলে দিলে, নৌকোটি তখন কুড়ি ফিট উপরে উঠে এসেছে। কিন্তু মোটেই যথেষ্ট নয় এটুকু, ঢেউয়েরা থাবা বাড়িয়ে নিমেষের মধ্যে তাকে নিজের কবলে নিয়ে যেতে পারে। এখানে তো কোনো কপিকল তো নেই, ঠেলাঠেলি ক'রে, ধাক্কা দিয়ে তাকে নিয়ে আসতে হবে তীরে—সবাই মিলে যত-জোরে-সম্ভব ঠ্যালা মারতে লাগলো। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হ'য়ে গেলো, কোনো কাজেই এলো না তাদের এত পরিশ্রম ও উদ্যম। সেই মস্ত আর ভারি নৌকোটা বালির উপর চেপে ব'সে গেছে যেন—এক ইঞ্চিও নড়লো না সে তার জায়গা থেকে। খামকাই নিজেদের তারা ক্লান্ত করলে—ওই ভীষণ গরমে মধ্যে ঘামে ভিজে গেলো শরীর, টকটকে লাল হ'য়ে গেলো মুখচোখ, এমন কড়া রোদ যে মনে হয় যে সব রক্ত চট ক'রে মাথায় উঠে গেলো—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। এঁটে ব'সে থাকলো নৌকোটা, যেন সে পণ করেছে একচুলও নড়বে না।

এদিকে বেলা যতই গড়িয়ে গেলো, ততই বাড়তে লাগলো হাওয়ার বেদম তোড়। রকমসকম দেখে মনে হ'লো বুঝি-বা হারিকেন শুরু হ'য়ে যায়। কালো পাহাড়ের মতো মেঘ জ'মে আছে আকাশ জুড়ে, আর তারই ভিতর চাবুকের মতো বিদ্যুৎ কেটে বসতে লাগলো বার-বার, যার পরেই আলো ফেটে পড়ে বিকট গর্জনে। আর দ্বীপের ওই মস্ত পাহাড় তারই প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে দেয় দিগন্তের দিকে, আর গোটা দ্বীপটাই যেন থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে। আর ক্রমশই ফুলে-ফেঁপে আসছে ঢেউ—একটু পরেই তারা এতটাই এগিয়ে আসবে যে নৌকোটা দু-হাতে তুলে আছাড় মারতে তাদের কোনো অসুবিধেই হবে না। যেন তারা সন্তর্পণে একটু-একটু ক'রে হিংস্র ও আমিষখোর লোভ নিয়ে এগুতে চাচ্ছে নৌকোর দিকে—এমন তাদের সব লক্ষণ। আর সবকিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতেই বড়ো-বড়ো ফোঁটায় ঝ'রে পড়তে লাগলো বৃষ্টি—সেই ঝমঝমে বাদলকে এতটাই আচ্ছন্ন ক'রে আছে বিদ্যুতের প্রবাহ যে মনে হচ্ছে যেন বেলাভূমির উপর ঝ'রে প'ড়েই তারা মস্ত এক বিস্ফোরণের মতো গর্জন ক'রে ফেটে পড়বে।

'আর তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থেকো না, জেনি,' ফ্রিৎজ তাকে বললে। 'তুমি বরং গুহার

ভিতর চ'লে যাও । ডলি, তুমিও যাও ভিতরে । আপনি ওদের নিয়ে যান, মিসেস য়ুলস্টোন ।'

স্বামীকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছে না দেখে কাপ্তেন গুড কর্তৃত্বের সুরে বললেন, 'ভিতরে যান, মিসেস ফ্রিৎজ ।'

'আপনিও আসুন, কাপ্তেন,' জেনি বললে, 'এখন আপনার বৃষ্টিতে ভেজা মোটেই উচিত হবে না ।'

'এখন আর আমার ভয়ের কিছু নেই,' হ্যারি গুড তাকে বললেন, 'আপনি ভিতরে চ'লে যান এক্ষুনি, আর একটুও সময় নেই নষ্ট করার ।'

মহিলারা গুহায় চ'লে যাবার পরেই ভীষণভাবে বর্ষা শুরু হ'য়ে গেলো, আর ঝড়ের গর্জনও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেলো । শুধু পাঁচজন পুরুষ ভীতভাবে দাঁড়িয়ে রইলো নৌকোর পাশে । গুমগুম ক'রে গড়িয়ে যাচ্ছে বাজ, আর শোঁ-শোঁ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে হাওয়া, আর তারই সঙ্গে তাল রেখে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের কলরোল । তারপরেই হঠাৎ একসঙ্গে প্রায় কুড়ি জায়গায় ছিঁড়ে ফেঁশে ছত্রখান হ'য়ে গেলো আকাশ, প্রায় কুড়িটা চোখ মেলে মস্ত এক দানব যেন গর্জন ক'রে উঠলো, আর সেই রক্তিম চোখের ভীষণ আগুন যেন ফেটে পড়লো মারাত্মক অগ্নিগিরির মতো । আর সমুদ্র—সে যেন মস্ত এক কবন্ধ, কেবল রুষ্টভাবে সে এগিয়ে এলো বেলাভূমির দিকে—এমনভাবে ফুলে-ফেঁপে গর্জন ক'রে এলো সে যে মনে হ'লো যেন আকাশ-গেলা এক হাঁ সে—নৌকোটাকে গিলে খেতে চাচ্ছে ।

ঢেউয়ের আঘাতে শুয়ে পড়লো পাঁচজন, প্রাণপণে আঁকড়ে থাকলো শৈবালের স্তূপ, আর নিশ্চয়ই কোনো কুহক তাদের রক্ষা করলে, কেননা ঢেউ যখন ফিরে গেলো, তখন কাউকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেলো না । কোনোরকমে তারা যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন দেখলো কেবল নৌকোটিই তার জায়গায় নেই—সে প'ড়ে আছে অন্তরীপের পাহাড়ের ধারে—একেবারে টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেছে সে, শতখণ্ডে চুরমার—যেন ওই প্রবল ঢেউ এসেছিলো কেবল নৌকোটিকেই চূর্ণ ক'রে দেবে ব'লে । সমুদ্রে—সে যেন কোনো জীবন্ত ও রাগি দানব—সে চায় না যে আবার তারা ওই নৌকোয় ক'রে সমুদ্রে ভাসুক ।

যতক্ষণ-না সেই ভাঙাচোরা কাঠগুলোকে ঢেউ তার নিজের কবলে টেনে নিলে, ততক্ষণে তারা আচ্ছন্নের মতো কেবল অপলকে তাকিয়ে রইলো । একটু পরেই অতিকায় কোনো-এক চতুর ঐন্দ্রজালিকের মতো লোফালুফি করতে-করতে ঢেউয়েরা দিগন্তের দিকে চ'লে গেলো ।

৬

পাখির ডানা

আরো খারাপ হ'য়ে গেলো তাদের দশা, আগের চেয়ে আরো-অনেক-বেশি খারাপ । যতক্ষণ তারা নৌকোয় ছিলো, অকূল জলধির সব সর্বনাশ ও ধ্বংসের মুখোমুখি, ততক্ষণে তবু একটা

আশা ছিলো যে, পথে কোনো জাহাজের দেখা পেলে উদ্ধার পাবে, নয়তো কোনো ডাঙায় গিয়ে পৌঁছুবে। কোনো জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়নি তাদের। আর ডাঙায় অবশ্য পৌঁছেছে, তবু সেটার দশা এমন যে তা মনুষ্যবাসের প্রায় অযোগ্য—আর এখন কিনা এই ডাঙা ছেড়ে কোথাও চ'লে যাবার আশা একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে গেলো।

'তবু ভালো,' ফ্রিৎজকে বোঝালে ব্লক, 'মাঝ-সমুদ্রে যদি এ-রকম কোনো ঝড়ের পাল্লায় পড়তো আমাদের নৌকো, তাহ'লে সবশুদ্ধু একেবারে সলিলসমাধি হ'য়ে যেতো।'

ফ্রিৎজ এ-কথার কোনো উত্তর দিলে না। বরং এই ভীষণ ঝড়বৃষ্টির ভিতর শশব্যস্তে চ'লে গেলো গুহার দিকে, যেখানে মহিলারা সবাই উদ্বেগে ও আশঙ্কায় একেবারে টান হ'য়ে আছেন। ভাগ্যিশ গুহাটা ছিলো অন্তরীপের পাহাড়ের আড়ালে, না-হ'লে সমুদ্রের ঢেউ এসে নির্ঘাৎ তার ভিতরটা ভাসিয়ে চ'লে যেতো।

বৃষ্টি মধ্যরাতে থেমে গেলো। থামতেই জন ব্লক গুহার মুখে রাশি-রাশি সমুদ্রশৈবাল জড়ো ক'রে রাখলে, তারপরেই ঝলসে উঠলো জ্বলজ্বলে আগুনের শিখা—ভিজে জবজবে জামাকাপড়গুলি শুকোবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করলে সে।

ঝড়ের ভীষণ রাগ যতক্ষণ-না প'ড়ে গেলো ততক্ষণ মনে হ'লো গোটা আকাশেই যেন আগুন ধ'রে গেছে। গুমগুম ক'রে গড়িয়ে গেলো বাজ—যেন ঝড়ের হাজার ঘোড়ার রথ চাকার শব্দ ক'রে ছুটে চলেছে ; আর সেই সঙ্গে মেঘেরাও চটপট উত্তর দিকে চ'লে যেতে থাকলো। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত দিগন্তের কাছে বিদ্যুৎ তার বাঁকা শিখার আগুন ছিটিয়ে দিতে লাগলো, ততক্ষণ পর্যন্ত চমকে-চমকে উঠলো ভীত উপসাগর, আর হা-হা ক'রে ব'য়ে গেলো প্রবল হাওয়া; সে-ই দুই হাতে তুলে নিয়ে এলো মস্ত-সব স্তম্ভের মতো ঢেউ, তারপর আছাড় মারলে সেই শূন্য বেলাভূমিতে।

সকালবেলায় পুরুষেরা সবাই গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো। পাহাড়ের চুড়ো ছুঁয়ে যাচ্ছে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, কেউ-কেউ আবার ঝুলে প'ড়ে যেন চুড়োটাকে নিরীক্ষণ করতে চাচ্ছে। রাতের বেলায় নানা জায়গায় বাজ ফেটেছিলো—মস্ত-সব পাথরের টুকরো গড়িয়ে নেমে এসে প'ড়ে আছে তলায়। কিন্তু এমন-কোনো নতুন চিহ্ন বা লক্ষণ দেখা গেলো না যা তাদের কাছে আশাপ্রদ ব'লে মনে হ'তে পারে : পাহাড়ে ওঠবার কোনো সুবিধেই হয়নি পাথর ভেঙে পড়ায়, কোনো খাঁজই পড়েনি, যেন কেউ মসৃণভাবে করাৎ চালিয়ে ওইসব মস্ত পাথরকে কেটে-কেটে ছুঁড়ে ফেলেছে।

কাপ্তেন গুড, ফ্রিৎজ আর জন ব্লক—এই তিনজনে মিলে নৌকোর অবশিষ্ট জিনিশপত্র ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখলে। আছে শুধু মাস্তুল, আর সামনের মস্ত পালটা, আর আছে পাটাতন, দাঁড়, হাল, নোঙর আর দড়ি, কাঠের আসন, আর কয়েক পিপে টাটকা জল। ঝড়ে অনেক ক্ষতি হয়েছে বটে, তবু এখনও এইসব জিনিশকে জরুরি কতগুলি কাজে লাগানো যাবে।

'ভাগ্য আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে নিষ্ঠুরের মতো,' ফ্রিৎজ বললে, 'যদি ওই বাচ্চা ছেলেটি আর মহিলা তিনজন আমাদের সঙ্গে না-থাকতেন, তাহ'লে হয়তো এতটা হতাশ লাগতো না। এখন এই শূন্য তীরে কী-যে আছে তাদের ভাগ্যে, তা শুধু ভবিষ্যৎই জানে।' ফ্রাংকের ঈশ্বর-বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সমস্ত বিশ্বাস সত্ত্বেও তাকে এবার

চুপ ক'রে থাকতে হ'লো। কী-ই বা তার বলার আছে ? কিন্তু জন ব্লক আরেকটি বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা তাদের কাছে তুলে ধরলে। ওইসব ঢেউয়ের প্রচণ্ডতায় সবই তো তছনছ হ'য়ে গেছে—কাছিম আর তার ডিমগুলোও নিশ্চয়ই চুরমার হ'য়ে ছিটকে পড়েছে। আর যদি তা সত্যি হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই ক্ষতিকে আর কিছুতেই পূরণ ক'রে নেয়া যাবে না। ইশারায় ফ্রাংককে ডেকে নিয়ে নিচু গলায় কতগুলি কথা বললো ব্লক। তারপর দুজনে অন্তরীপে পেরিয়ে চ'লে গেলো ঝরনার দিকে, যেখানে ওইসব কাছিমের আস্তানা তারা আবিষ্কার করেছিলো প্রথম দিনে।

এই পরিত্যক্ত দুর্ভাগারা উপকূল ত্যাগ করার আগেই যদি বর্ষাবাদলের দিন নেমে আসে, কোনো জাহাজ যদি তাদের তুলে না-নেয়, তাহ'লে তারা এই উপকূল ছেড়ে যাবেই বা কী ক'রে ?—তাহ'লে শীতকালটা শুদ্ধু এখানে কাটাবার ব্যবস্থা করতে হয়। ভারি আবহাওয়ার সময় গুহাটা অবশ্য নিরাপদ এক আশ্রয় হবে তাদের পক্ষে—সমুদ্রের এইসব শ্যাওলার স্তূপ ব্যবহার করা যাবে জ্বালানি হিশেবে, এগুলো জ্বালিয়েই ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। শিকার ধ'রে যা পাবে তাতেই হয়তো ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে। কাজেই এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ হ'লো কাছিমদের বিষয়ে জন ব্লকের আশঙ্কা সত্যি কিনা, তা ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে দেখা। গিয়ে অবশ্য দেখা গেলো, তার আশঙ্কার কোনোই কারণ ছিলো না। ঘণ্টাখানেক ছিলো তারা ঝরনার ওপাশে—যখন দুজনে ফিরে এলো দেখা গেলো আগের মতোই মাংসের এক বিরাট স্তূপ নিয়ে ফিরে এসেছে—কাছিমগুলি গিয়ে পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিলো ঝড়ের সময়। তবে ডিমের কোনো চিহ্নই নেই আশপাশে কোনোখানে—সব ঢেউয়ে ভেসে গেছে। জন ব্লক অবশ্য হেসে বললে, 'তাতে আর কী হয়েছে। আবার ওরা ডিম পেড়ে যাবে, না-হ'লে আর কাছিমজন্ম মেনে নিলো কেন ?'

ব্লকের এইসব ছোটোখাটো রসিকতাগুলি এমনি ভারিক্কি চালে বেরিয়ে আসে যে না-হেসে কিছুতেই পারা যায় না। এদিকে কাপ্তেন গুড, ফ্রিৎজ আর জেমস আবার চারপাশে পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়েছিলেন—আবারও হতাশভাবে তাঁদের এটাই মেনে নিতে হ'লো যে জলপথে ছাড়া ওই মস্ত পাহাড়টার ওপাশে যাবার কোনো উপায়ই নেই। আর জলপথে যাবার চেষ্টা করাটাও বিপদসংকুল—কেননা অন্তরীপের পাহাড়গুলি যেখানে এসে জলে নেমেছে, সেখানে সাংঘাতিক স্রোত—ভীষণ জোরে ঢেউয়েরা এসে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে, আর ফেনিয়ে চর্কি দিয়ে ঘুরে-ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছে জল। দুই দিকেই তা-ই ; এমনকী শান্ত আবহাওয়ার সময়েও মারাত্মক স্রোত থাকে, ফলে নৌকো ক'রে যেতেও ভয় হয় ; আর সাঁতার দিয়ে যাবার চেষ্টা করা তো নিছকই বাতুলতা—সবচেয়ে পাকা যে-সাঁতারু, তাকেও অনায়াসে লোফালুফি করে ওই ঢেউ হয় পাথরে আছড়ে ফেলবে, নয়তো টেনে বার-দরিয়ায় নিয়ে যাবে। কাজেই যে-কোনোভাবে পাহাড়ে চড়ার পরিকল্পনাটাই অবশ্যকৃত্য হ'য়ে উঠলো তাদের কাছে—এখন কোনো নৌকো নেই ব'লেই এই কাজটা আরো-বেশি জরুরি।

'কিন্তু তা করবো কী করে ?' সেই অনধিগম্য চূড়োর দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে ফ্রিৎজ বললে একদিন!

'দেয়ালগুলি যখন হাজার ফিট উঁচু, তখন কী ক'রে লোকে জেলখানা থেকে

পালাবে ?' জেমসের উত্তর আরো হতাশা নিয়ে এলো ।

'যদি-না এর ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে বানানো যায়,' ফ্রিৎজ একটি উপায় বাৎলে দিলে ।

'এই গ্র্যানাইট পাথরের স্তূপের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ ? প্রস্থই হয়তো উচ্চতার চেয়ে বেশি হবে ।'

'তা আর কী করা যাবে ? এই জেলখানাতেই তো আর চিরকাল কাটাতে পারি না ।' অসহায় এক রাগে ভ'রে গিয়ে ফ্রিৎজ ব'লে উঠলো ।

'একটু ধৈর্য ধ'রে আস্থা রাখো, তাহ'লেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে,' আবারও ফ্রাংক তাদের জানালে ।

'ধৈর্য আমার অনেক আছে,' তৎক্ষণাৎ ব'লে দিলে ফ্রিৎজ, 'কিন্তু আস্থা—সে হ'লো অন্য কথা !'

আর সত্যিই-তো কীসের উপরেই বা আস্থা রাখবে তারা ? উদ্ধারের একমাত্র পথ এখন সমুদ্র—যদি উপসাগরের পাশ দিয়ে কোনো জাহাজ যায়, তাহ'লেই কেবল মুক্তি আসতে পারে । কিন্তু যদি কোনো জাহাজ এখান দিয়ে যায়, সে কি বেলাভূমির জ্বলজ্বলে সংকেত দেখতে পাবে ? যদি তাদের জ্বালিয়ে-রাখা গনগনে অগ্নিকাণ্ড তার চোখে না-পড়ে ?

ডাঙায় পৌঁছুবার পর এক-এক করে পনেরো দিন কেটে গেছে । আরো কয়েক সপ্তাহ কেটে গেলো এমনি ক'রেই—কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তনই হ'লো না । এখন খাদ্য বলতে আছে কেবল কাছিম আর তার ডিম, আর আছে করাত মাছ, মস্ত-সব চিংড়ি., আর কাঁকড়া । ওইসব মৎস্যশিকারে ব্লকেরই উৎসাহ আর অভিরুচি বেশি, কেননা সে-ই একটু মাছ-ধরার অ-আ-ক-খ জানে । প্রায় সময়েই সে ওই মৎস্যশিকারে ব্যস্ত থাকে, আর তার সঙ্গে থাকে ফ্রাংক, সাহায্যের দরকার হ'লে সে-ই এগিয়ে যায় । নৌকোর পেরেকগুলি হয়েছে তাদের বঁড়শি—একটু বাঁকিয়ে নিতে হয়েছে অবশ্য—তার দড়িগুলো হয়েছে ছিপের সুতো ।

এখানকার জলে সবচেয়ে বেশি যে-মাছের আনাগোনা, তা হ'লো কুকুরমাছ । খেতে ভালো না মোটেই, কিন্তু তাদের চর্বি দিয়ে এক ধরনের মোমবাতি তৈরি ক'রে নিলে তারা —ভিতরকার সলতে হ'লো বেলাভূমির সেইসব শৈবাল । শীতকালটা এখনে কাটাতে হবে —এই ভাবনাটাই যেন তাদের মাথার উপর বাজ ফাটিয়ে দেয় ; তারপর বর্ষাকালের দীর্ঘ, কালো, মেঘলা দিনগুলি তো আছেই । যতদূর-সম্ভব সাবধানভাবে সেইসব অনাগত দিনের জন্যে তারা তৈরি হ'তে লাগলো । একবার কয়েকশো হেরিংমাছ ঝাঁক বেঁধে দ্বীপের কাছে বেড়াতে এসেছিলো হঠাৎ—ব্লক সেগুলোকে পাকড়াও ক'রে ফূর্তিতে রীতিমতো হৈ-চৈ শুরু ক'রে দিলে । সেইসব মাছ পুড়িয়ে নুন মাখিয়ে তারা রেখে দিলে—ভবিষ্যতের জরুরি সঞ্চয় ।

এই ছ-সপ্তাহের মধ্যে পাহাড়ের চুড়োয় ওঠবার জন্যে কম চেষ্টা করেনি তারা । সবগুলি চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হ'লো তখন ফ্রিৎজ আর-কোনো আপত্তিই শুনতে চাইলো না, অন্তরীপের ওই পাহাড়ের কাছ দিয়ে সাঁৎরে পুবদিকে যাবে ব'লে মনস্থির ক'রে ফেললে । কিন্তু জন ব্লক ছাড়া আর-কাউকেই সে তার মনের কথা খুলে বললে না, কেননা বললে সবাই তাকে বাধা দেবে । ডিসেম্বরের সাত তারিখে একেবারে সকালবেলায় দুজনে নিলে ঝরনার দিকে চ'লে গেলো—যাবার আগে ব'লে গেলো কাছিম শিকারে যাচ্ছে ।

সেখানে বিপুল এক নিরেট পাথরের গায়ে রাগি আক্রোশে আছড়ে পড়ছে ঢেউ—সাঁৎরে এ-জায়গাটুকু পেরুবার চেষ্টা করার মানেই হ'লো খামকা নিজের প্রাণকে বিপন্ন করা। বিব্রত ভাবে জন ব্লক বারে-বারে তাকে এই মৎলবটি ত্যাগ করতে অনুবোধ করলে, কিন্তু শেষকালে ফ্রিৎজ যখন কোনো নিষেধই শুনলো না, তখন তাকে সাহায্য করা ছাড়া আর-কিছুই তার করার থাকলো না। জামাকাপড় ছেড়ে ফ্রিৎজ তার কোমরে শক্ত একটা দড়ি বেঁধে নিলে—নৌকোরই একটা দড়ি—তারপর তার একটা প্রান্ত ব্লকের হাতে তুলে দিয়েই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বিপদ আসতে পারে দু-দিক দিয়ে। এক হ'তে পারে, ঘূর্ণির হাতে প'ড়ে স্রোতের ধাক্কায় পাথরে আছড়ে পড়লো, নয়তো দড়ি ছিঁড়ে ভেসে গেলো সমুদ্রে। দু- দু-বার সে চেষ্টা করলে ঢেউয়ের হাত এড়িয়ে ও-পাশে চ'লে যাবার—কিন্তু কোনো লাভই হ'লো না। তৃতীয়বারে কোনোমতে সে পাহাড়ের ও-পাশটায় একটু তাকাতে পারলো। কিন্তু পরক্ষণেই বিপদের সম্ভাবনা দেখে জন ব্লক দড়ি ধ'রে টান দিয়ে তাকে ডাঙায় তুলে আনলে।

'তারপর ? কী চোখে পড়লো ?'

'কেবল পাথর আর পাথর !' ফ্রিৎজ হাঁপাচ্ছিলো, কোনোরকমে একটু সামলে নিয়ে বললে, 'কেবল দেখলাম পাহাড়—ত্যাড়াবাঁকাভাবে নানা জায়গায় সমুদ্রে এসে ডুবেছে। সোজা উত্তরদিকে চ'লে গেছে এই পাহাড়।

'আমার কিন্তু মোটেই অবাক লাগছে না।' ব্লক উত্তর দিলে, 'অনুসন্ধানের ফলাফল যে এমনি হবে, আমি তা আগেই আশঙ্কা করেছিলুম।'

যখন এই অনুসন্ধানের ফলাফল সবাইকে জানিয়ে দেয়া হ'লো—খবরটা শুনে জেনির মনের ভাব কী-রকম হ'য়ে উঠেছিলো, সহজেই তা অনুমান করা যায়—তখন আশার শেষ রশ্মিটুকুও যেন দপ ক'রে নিভে গেলো। এই দ্বীপ—যেখান থেকে কাপ্তেন গুড ও তাঁর সঙ্গীদের মুক্তি পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই—সেই দ্বীপ কিনা কেবল বাসের অযোগ্য মস্ত এক পাথুরে পাহাড় ! আর এই অসুখী অবস্থা কিনা আরো-কতগুলি দুঃখী জটিলতার সৃষ্টি ক'রে দিলে ! বিদ্রোহ না-হ'লে *ফ্ল্যাগ* এতদিনে প্রমিস্‌ড ল্যাণ্ডের শ্যামলশোভন বনভূমিতে গিয়ে পৌঁছুতো—এবং তাও আরো দু-মাস আগে ! নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড-এ যারা তাদের প্রতীক্ষা ক'রে আছে, তাদের মনোভাবটা এখন কী, তা ভাবতেও তাদের শরীর শিউরে উঠলো। কাপ্তেন গুড ও তাঁর সঙ্গীদের চেয়ে কিছুমাত্র ভালো অবস্থায় নেই তাঁরা। বরং ফ্রিৎজদের কাছে এটুকু অন্তত সান্ত্বনা আছে যে তাদের প্রিয়জনেরা নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডে নিরাপদে আছে—যে-সান্ত্বনাটুকু তাঁদের নেই।

ভবিষ্যৎ যেন উদ্বেগে আশঙ্কায় ভারি হ'য়ে ঝুলে পড়লো তাদের মাথার উপর, যে-কোনো মুহূর্তে মস্ত এক নেকড়ের মতো তা যেন লাফিয়ে পড়বে তাদের উপর, আর একেবারে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে যাবে। বিপদের আরেকটি সংকেত যুক্ত হয়েছিলো সেইসঙ্গে, যা কেবল জানতেন কাপ্তেন গুড আর জন ব্লক। কাছিমরা নাকি ক্রমেই সংখ্যাই ক'মে যাচ্ছে—প্রত্যহ যে-ভাবে তারা কাছিম-শিকারে বেরোয়, তার ফলেই এটা হয়েছে ! এর জন্যে ব্লককে বাধ্য হ'য়েই মাছ-ধরার ব্যাপারে আরো-বেশি ক'রে মনোনিবেশ করতে হ'লো। ডাঙা যা একটু পরেই আর দিতে চায় না, লুকিয়ে ফ্যালে নিজের জঠরে, সমুদ্র অন্তত কখনও তা দিতে

গররাজি হবে না। বলাই বাহুল্য, কেবল যদি মাছ, কি ঝিনুক, কি কাঁকড়ার উপর নির্ভর করতে হয়, তাহ'লে স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়বে। আর হঠাৎ যদি অসুখ শুরু হ'য়ে যায়, তাহ'লে তা হবে উটের সেই কুঁজো পিঠে শেষ খড়ের মতো।

এই অবস্থায় ভিতরেই ধীরে-ধীরে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ এগিয়ে এলো। আবহাওয়া এখনও ভালোই আছে—কেবল মধ্যে দু-একবার বাজ-ফাটা ঝড় গ'র্জে উঠেছিলো—কিন্তু তাও প্রথম ঝড়ের মতো এতটা ভয়ানক নয়। দিনের বেলায় গরম এত বেশি থাকে যে মাঝে-মাঝে সহ্যের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। সর্দি-গর্মিতে যে একটা-কিছু বিপদ হ'লো না, তা কেবল ওই পাহাড়ের জন্য। তার ছায়া কালো হ'য়ে পড়তো বেলাভূমিতে, কমিয়ে দিতো তাপের এই অসহ্য প্রখরতা। যেন এই ছায়ার ভিতর এই শূন্য দ্বীপ তার মমতাকে পাঠিয়ে দিয়েছে সংগোপনে—আর মায়ের স্নেহের মতো তা তাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

অনেক পাখি ওড়ে আজকাল তীরের কাছ দিয়ে—সকলেই যে সমুদ্রের পাখি তা নয়; কখনও-কখনও উড়ে যায় ঘুঘু আর সারস—আর ফ্রিৎজের কেবলই মনে প'ড়ে যায় প্রমিস্‌ড ল্যাণ্ডের সেই মরাল সরোবরের কথা। মাঝে-মাঝে অন্তরীপের চুড়োয় এসে বসে মস্ত-সব অ্যালবাট্রস—জাহাজের সহযাত্রী যারা, যারা সঙ্গ দেয় একলা জলপোতকে, পথের বন্ধুর মতো খবর দিয়ে যায় অন্য দিগন্তের। আর তাদের দেখে জেনির কেবল তার পোষা অ্যালবাট্রসটির কথা মনে প'ড়ে যায়, যার গলায় চিরকুট বেঁধে বার্নিং-রক থেকে সে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

পাখিগুলি অবশ্য সবসময়েই দূরে-দূরে থাকে। যখন তারা অন্তরীপের চুড়োয় গিয়ে বসে, তখন হতাশভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে-থাকা ছাড়া আর-কিছুই করার থাকে না, কেননা কাছে যাবার চেষ্টা করাটাই তখন বাতুলতা। ডানা ঝাপটে তারা যখন পাহাড়ের চুড়োর উপর দিয়ে উড়ে যায়, তখন তাদের আরো মন-খারাপ হ'য়ে যায়: কী অনায়সে তারা উড়ে যায়, অথচ তাদের কিনা প'ড়ে থাকতে হচ্ছে শূন্য এই সিন্ধু-সৈকতে, যেখানে মরুভূমির মতো হা-হা ক'রে ছড়িয়ে আছে শুধু বালি আর পাথর।

একদিন হঠাৎ বেলাভূমি থেকে উত্তেজিত গলায় ব্লক সকলকে ডাক দিলে। 'দেখুন, দেখুন, ঐ যে!' উপরের মালভূমি দিকে ইঙ্গিত ক'রে সে একটানা চ্যাচাতেই লাগলো।

'কী?' ফ্রিৎজ জিগেস করলে তাকে।

'কালো দাগের একটা সারি দেখা যাচ্ছে না?'

'ও-তো সব পেঙ্গুইন পাখি,' ফ্রাংক ব'লে উঠলো।

'হ্যাঁ, পেঙ্গুইনই তো বটে,' কাপ্তেন গুড সায় দিলেন, 'অত উঁচুতে আছে ব'লেই ছোট্ট-ছোট্ট কাকের মতো দেখাচ্ছে।'

'হুঁ,' ফ্রিৎজ ব'লে উঠলো, 'ওই পেঙ্গুইনগুলি যদি উপরের ওই মালভূমিতে উঠে থাকতে পারে, তার মানেই হ'লো পাহাড়ের ওদিকটা মোটেই অনধিগম্য নয়।'

তার আন্দাজে যে কোনোই ভুল হয়নি, তার কারণ হ'লো পেঙ্গুইনরা সব নড়বোড়ে অপ্রতিভ আর ভারি জাতের পাখি—ডানার বদলে আছে থপথপে পা। নিশ্চয়ই তারা উড়ে যায়নি ওখানে। কাজেই দক্ষিণ দিক থেকে সম্ভব না-হ'লেও উত্তরদিক থেকে নিশ্চয়ই পাহাড়ে

উঠতে পারা যায় । কিন্তু নৌকো নেই ব'লে উত্তরদিকে গিয়ে পাহাড়ের ওঠার অভিলাষ তাদের ত্যাগ করতে হ'লো ।

বড়োদিন গেলো বিষাদের ভিতর । কী দুর্বৎসর এটা— কোথায় তারা এখন রক-কাসলের হলঘরে বড়োদিনের উৎসব করবে, না তার বদলে এখন প'ড়ে আছে শূন্য এক বেলাভূমিতে যার উপর ঝুলে আছে উদ্বেগ আর আশঙ্কার ভারি কালোছায়া । তবু এত-সব কষ্টের দুর্ভাবনার ভিতর দিন কাটলেও এখনও তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়নি । জন ব্লককে কাবু করতে গিয়ে কষ্টের দিনগুলো নিশ্চয়ই হতাশাকে মেনে নিয়েছে । প্রায়ই সে বলে, 'দিনের পর দিন কুঁড়ে হ'য়ে ব'সে-থাকার ফলে মুটিয়ে যাচ্ছি রীতিমতো । শেষকালে একটা হাতির মতো থপথপ করবো । হাতে কোনো কাজ না-থাকলেই এমন হয় ।'

হাতে কোনো কাজ নেই—এ-কথাটা মর্মান্তিকভাবে সত্যি । কিছুই করার নেই তাদের । শুধু হতাশভাবে শূন্যতাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর-কিছুই নেই তাদের সামনে । এরই মধ্যে উনত্রিশ তারিখের বিকেলবেলায় এমন একটা ঘটনা ঘ'টে গেলো, যা সুখী দিনের স্মৃতি জাগিয়ে দিলে তাদের মনে । অন্তরীপের যেদিকটায় ওঠা যায়, সেখানে এসে একটা মস্ত পাখি ব'সে ছিলো ।

পাখিটা হ'লো একটি অ্যালবাট্রস, বোধহয় অনেক দূর থেকে এসেছে, কেননা ভারি ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো তাকে । পা দুটি এলিয়ে গেছে তার, ডানা দুটো ভাঁজ ক'রে রেখেছে, শুয়ে আছে সে একটি পাথরের উপর । পাখিটাকে ধরবে ব'লে মনস্থির ক'রে ফেললে ফ্রিৎজ । ফাঁস-লাগা দড়ি ছুঁড়তে যথেষ্ট ওস্তাদ সে—ঠিক করলে ওই ল্যাসোর সাহায্যেই পাখিটাকে সে কাবু করবে । এমনি মস্ত একটা দড়ির ফাঁস তৈরি ক'রে দিলে ব্লক, আর ফ্রিৎজ সন্তর্পণে অন্তরীপের পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু ক'রে দিলে । নিশ্বেস রোধ ক'রে সবাই তার দিকে তাকিয়ে রইলো । কিন্তু পাখিটা একতিলও নড়লো না । কয়েক গজ দূর থেকে ফ্রিৎজ তার ল্যাসো ছুঁড়ে পাখিটাক পেঁচিয়ে ফেললো । কিন্তু তবু পাখিটা নিজেকে মুক্ত ক'রে নেবার কোনো চেষ্টাই করলে না । ফ্রিৎজ তাকে কোলে ক'রে নিচে বেলাভূমিতে নেমে এলো ।

পাখিটাকে দেখেই জেনি আর বিস্ময় চেপে রাখতে পারলো না । 'আরে ! এই-তো —এই-তো আমার পাখি !' পাখিটার গায়ে আদর ক'রে হাত বুলোতে-বুলোতে সে চেঁচিয়ে উঠলো ।

'তার মানে ? তুমি কী তবে বলতে চাচ্ছো যে—'

'হ্যাঁ, ফ্রিৎজ, ঠিক তা-ই । ও-ই আমার অ্যালবাট্রস—বার্নিং-রকে ও-ই ছিলো আমার একমাত্র বন্ধু । ওর গলাতেই আমি চিরকুট বেঁধে দিয়েছিলুম—আর সেই চিরকুট পেয়েই তোমরা আমাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলে ।'

এমন-কোনো আশ্চর্য ঘটনা কি সম্ভব ? জেনি কি কোনো ভুল করেনি ? তিন-তিন বছর পরে সত্যিই কি পুরোনো সেই অ্যালবাট্রসই আবার ফিরে এলো, যে উপকূল থেকে দূরের দিকে উড়ে গিয়েছিলো ?

কিন্তু জেনির যে কোনোই ভুল হয়নি, তা তারা স্পষ্ট বুঝতে পারলে, যখন দেখা গেলো যে পাখির পায়ে এখনও ছোট্ট-একটা সুতো বাঁধা আছে । যে-কাপড়ের টুকরোর উপর ফ্রিৎজ তার উত্তর লিখেছিলো, তার অবশ্য কোনো চিহ্নই নেই ।

যদি অ্যালবাট্রসটি এত দূর উড়ে আসতে পারে, তা কেবল এইজন্যেই সম্ভব যে এই পাখিরা বিপুল দূরত্বকে পাড়ি দিতে পারে। সেইজন্যেই হয়তো ভারত মহাসাগরের পুবদিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলে সে উড়ে আসতে পেরেছে, অনায়াসেই পাড়ি দিয়েছে হাজার মাইল।

বার্নিং-রকের এই ডাক হরকরাকে আদর দিয়ে-দিয়ে একেবার ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললো তারা। সে যেন কোনো সুমাত্রাসূত্র—যা টার্টল বে আর নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের মধ্যে এক সংগোপন যোগাযোগ গ'ড়ে তুলেছে।

তারই দু-দিন পরে ১৮১৭ সাল শেষ হ'য়ে গেলো। নতুন বছরের গোপন দেরাজে কী তোলা আছে তাদের জন্যে, তা শুধু ভবিতব্যই জানে।

৭

দিগন্তের সংকেত

কাপ্তেন গুড যদি তাঁর হিশেবে কোনো ভুল না-ক'রে থাকেন, যদি তাঁরই আন্দাজ মতো দ্বীপটা অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি কোনো অঞ্চলে অবস্থিত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে গ্রীষ্মকালের আয়ু আর মাত্র মাস তিনেক। তারপরেই আসবে হূ-হূ শীত, কনকনে, দুরন্ত, ভয়ানক : সে সঙ্গে নিয়ে আসবে ঠাণ্ডা ঝড়, আর প্রবল বরফ—আর সংকেত ক'রে দূর-সমুদ্রের কোনো জাহাজকে ডেকে আনার সব চেষ্টাই তাদের তখন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। শীতকালে নাবিকেরা সমুদ্রের এইসব বিপজ্জনক অঞ্চল সযত্নে এড়িয়ে চলে।

সেই যে ২৬শে অক্টোবর তাদের চোখের সামনে আস্ত মস্ত নৌকোটা খোলামকুচির মতো টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেলো, তারপর থেকে দিন কাটছে একইভাবে—প্রত্যেক দিনই গত দিনটিকে পুনরাবৃত্তি করে, আর এক অসহ্য একঘেয়েমির মতো সমুদ্র তার চাপা গলায় একই রহস্যময় বাণী শুনিয়ে যায় এই বালুকাময় উপকূলকে। সবাই তারা কাজের লোক—আর সেইজন্যেই এই একঘেয়ে দিনগুলি তাদের স্নায়ুর উপর চেপে বসতে চাইলো। পাহাড়ের তলা দিয়ে ঘোরাফেরা করা ছাড়া আর-কিছুই করার নেই, সবসময়েই চোখ থাকে বিপুল সেই বারিধির দিকে, যার দিগন্তেও কোনো জাহাজের চিহ্ন থাকে না। নিছকই অসাধারণ মনের জোরে ছিলো ব'লেই কোনোরকমে তারা চূড়ান্ত হতাশাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারছিলো।

দীর্ঘ, দীর্ঘ সব দিন—কিছুতেই যেন ফুরোতে চায় না। কেবল আলাপ-আলোচনা কথাবার্তায় কাটে আর সেইসব আলাপ-আলোচনায় প্রধান বক্তার ভূমিকা নেয় জেনি। সাহসের তার অন্ত নেই, তার উপর সবাইকেই সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে এই অসহ্য দিনগুলিকে যথাসম্ভব মুখরোচক ক'রে তোলার চেষ্টা করে সে, ফুর্তির জোগান দেয় সবাইকে, কেউ হতাশায় তলিয়ে যাচ্ছে দেখলে নানাভাবে তার

মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলাবার চেষ্টা করে। আশ্চর্য তার মনের জোর—কিছুতেই সে ভেঙে পড়বে না, এই যেন তার জেদ। এই জেদকে সম্বল ক'রেই সে যেন দুর্ভাগ্যের সঙ্গে এক অন্তহীন লড়াই চালাতে চাচ্ছে।

মাঝে-মাঝে মনে হ'তো, কোনো ভুল হয়নি তো তাদের ? সত্যি কি এই দ্বীপটা প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত ? এই বিষয়ে যার সন্দেহ সবচেয়ে বেশি, সে হ'লো নাবিক ব্লক।

'অ্যালবাট্রসটিকে দেখেই কি তোমার এই সন্দেহ বেড়ে গেছে ?' কাপ্তেন একদিন তাকে জিগেস করলেন।

'তা একটু বেড়েছে বৈকি,' জন ব্লক উত্তর দিলে, 'আর আমার ধারণাই বোধকরি ঠিক।'

'তুমি তাহ'লে বলতে চাচ্ছো যে, দ্বীপটা আরো-অনেক-বেশি উত্তরে অবস্থিত, তা-ই না ?'

'হ্যাঁ, কাপ্তেন। ভারত মহাসাগরেরই ধারে-কাছে কোনোখানে হবে। কোনো অ্যালবাট্রস একটুও না-থেমে কয়েকশো মাইল পাড়ি দিয়েছে, এটা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু হাজার-হাজার মাইল কি একটানা উড়ে চলা যায় ?'

'তা আমিও জানি,' কাপ্তেন গুড উত্তর দিলেন, 'কিন্তু *ফ্ল্যাগ* জাহাজকে প্রশান্ত মহাসাগরে এনে ফেলা যে বোরাপ্টেরই স্বার্থের পক্ষে অনুকূল, সেটাও তো মানতে হবে। যে-এক সপ্তাহ আমাদের বন্দী হ'য়ে থাকতে হয়েছিলো, সেইসময়ে পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বয়েছিলো ব'লে আমার ধারণা।'

'তা মানি। কিন্তু তবু এই অ্যালবাট্রস—! আচ্ছা, ও কি সত্যি অতদূর থেকে এসেছে ? না কাছেই কোনো দ্বীপে ছিলো ?'

'আর না-হয় মেনেই নিলাম যে তোমার ধারণাই ঠিক। না-হয় এটাই ধ'রে নিচ্ছি যে দ্বীপের অবস্থান আমরা সঠিক নির্ণয় করতে পারিনি—আসলে এই দ্বীপ হয়তো নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড থোক মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু তা জেনেই বা লাভ কী ? কয়েক মাইল আর কয়েকশো মাইল—সবই এখন আমাদের কাছে তুল্যমূল্যের, কেননা এই দ্বীপ থেকে বেরুবার কোনো উপায়ই আমাদের নেই।'

কাপ্তেন গুডের এই শেষ কথাগুলি এমন-এক অসুখী যুক্তিকে হাজির ক'রে দিলে, যার উপরে আর-কোনো কথাই চলতে পারে না। *ফ্ল্যাগ* জাহাজ যে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকেই চালিত হয়েছিলো, নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড থেকে অনেক, অনেক দূরের দিকে, সব-কিছুই সেই ধারণাকেই ঠিক ব'লে ইঙ্গিত ক'রে দেয়। কিন্তু তবু জন ব্লকের মাথায় কেবলই একটি ভাবনা ঘুরপাক খায়, অন্যরাও নতুন-এক ভাবনায় আচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে। বার্নিং রকের এই পাখি যেন তার ডানায় ক'রে তাদের জন্যে আশা ব'য়ে এনেছে।

ক্লান্তিটুকু শিগগিরই তার কেটে গেছে। খুব যে বুনো, তাও যেমন নয়, তেমনি আবার অলসও নয়। আজকাল সে বেলাভূমিতেই হেঁটে বেড়ায়, শামুক, গুগলি আর ছোটো-ছোটো মাছই তার ক্ষুণ্ণিবৃত্তির উপায়। উড়ে যাবার কোনো লক্ষণই তার নেই এমন-একটা পোষমানা ভাব তার ধরনধারণে। মাঝে-মাঝে কেবল অন্তরীপের চুড়োয় গিয়ে বসে সে, আর টেনে-

টেনে ডাক দেয় আস্তে। আর তা-ই দেখে জন ব্লক বলে, 'ওই দ্যাখো, ও আমাদের ওপরে যেতে ডাকছে। তা এত না-ডেকে যদি ডানা দুটি কিছুক্ষণের জন্য ধার দেয় তাহ'লেই এক-এক ক'রে আমরা উপরে চ'লে যেতে পারি। তাতে অন্তত চর্মচক্ষুতে একবার দেখতে পারবো ওইপাশে কী আছে। খুব-যে ভুরিভোজের সুব্যবস্থা আছে তা অবশ্য মনে হয় না, তবু একেবারে নিঃসন্দেহ হ'য়ে নেয়া যাবে।'

নিঃসন্দেহ হবার অবশ্য কীই-বা আর আছে ? ফ্রিৎজ তো ব'লেই দিয়েছে মস্ত পাহাড় আর পাথুরে মালভূমি ছাড়া অন্তরীপের ওপাশে আর-কিছুই তার চোখে পড়েনি।

অ্যালবাট্রসের প্রধান বন্ধুদের মধ্যে একজন হ'লো ছোট্ট বব। পাখিটির সঙ্গে তার ভারি ভাব হ'য়ে গেছে চট ক'রে। দুজনে মিলে প্রায়ই বেলাভূমিতে গিয়ে খেলাধুলো করে। ছুটোছুটি করে দুজনে বালুর উপর—ঠুকরে-ঠুকরে শামুক আর গুগলি শিকার করে পাখি আর বালি দিয়ে মস্ত সব কেল্লা, সুড়ঙ্গ আর রাজপ্রাসাদ তৈরি করে বব। আবহাওয়া একটু মুখভার করলেই দুজনে গুহায় ফিরে আসে—গুহায় এককোণে পাখির থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেয়া হয়েছে, গুহায় ফিরে এসে সোজা সে নিজের কোণে গিয়ে গুটিশুটি মেরে প'ড়ে থাকে।

যতই দিন যায়, ততই শীতকালের আশঙ্কা গুরুতর হ'য়ে আসে। যদি দৈব সহায় না-হয় তাহ'লে চার-পাঁচ মাসের জন্যে কনকনে ঠাণ্ডা সহ্য করতে হবে তাদের। এইসব অক্ষরেখায়, প্রশান্ত মহাসাগরের একেবারে বুকের ভিতর, ভীষণ জোর নিয়ে ফেটে পড়ে ঝড়, আর তাপ এত ক'মে যায় যে বিপদের সম্ভাবনা নানা দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাঝে-মাঝে ফ্রিৎজ আর ব্লকের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনায় বসেন কাপ্তেন গুড। ভবিষ্যৎ তাদের জন্যে যে-ভীষণ দিনগুলি তুলে রেখেছে, মোহমুক্তভাবেই তাদের সম্মুখীন হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। এখন তারা লড়াই করবে ব'লে পণ করেছে ; ঠিক করেছে কিছুতেই হাল ছাড়বে না ; আর এই প্রতিজ্ঞাটা ক'রে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গেই নৌভঙ্গের বিপর্যয়ের সময় যে-ভীষণ হতাশা তাদের আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিলো, তা আস্তে-আস্তে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

'যদি বাচ্চা বব আর মহিলারা সঙ্গে না-থাকতেন,' কাপ্তেন গুড একাধিকবার এই কথাটা বলেছেন তাদের, 'যদি শুধু কেবল পুরুষরাই থাকতুম এখানে, তাহ'লে—'

'কিন্তু তারা আছে ব'লেই তো এখন আরো-বেশি ক'রে আমাদের উদ্ধারের উপায় ঠিক ক'রে নিতে হবে,' ফ্রিৎজও তৎক্ষণাৎ তাঁকে এই কথাটা বলেছে।

'শীত এলো ব'লে'—এই ভাবনাটার সঙ্গে-সঙ্গেই আরেকটি গুরুতর দুর্ভাবনা তাদের মাথায় ভিড় ক'রে এলো ; যদি এখানে ঠাণ্ডা খুব-বেশি পড়ে, আর দিন-রাত যদি গনগনে আগুনের ব্যবস্থা করতে হয়, তাহ'লে কালক্রমে একদিন সব জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে নাকি ? এটা ঠিক যে প্রতিবারই জোয়ারের সময় প্রচুর পরিমাণে শৈবাল স্তূপাকারে ছড়িয়ে পড়ে বেলাভূমিতে, আর চট ক'রে রোদে শুকিয়ে খটখটে মুচমুচে হ'য়ে যায়। কিন্তু এইসব সমুদ্র-শৈবাল জ্বালিয়ে দিলে এত ভীষণ ভাবে ধোঁয়া হয় যে গুহার ভিতর গরম করার জন্য এইসব শৈবালের স্তূপ ব্যবহার করা যাবে না। নৌকোর পালগুলি দিয়ে ভালোভাবে গুহার মুখ বন্ধ ক'রে দেয়ার ব্যবস্থা করলে তারা ; তাতে অন্তত ঝড়ের দিনের কনকনে হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু গুহায় ভিতরে আলোর ব্যবস্থা করার সমস্যাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। শীতকালে যখন বাইরে বেরিয়ে কাজকর্ম করা যাবে না, তখন গুহার ভিতরেই

দরকারি ও জরুরি কাজগুলি সারতে হবে তাদের। কিন্তু সেইজন্যে প্রচুর পরিমাণে আলোর দরকার। কুকুরমাছের চর্বি দিয়ে ব্লক আর ফ্রাংক জেনি আর ডলির সাহায্যে মোটা-মোটা মোম তৈরি করেছিলো। এবার আবার বেশি ক'রে কুকুরমাছ জোগাড় করার জন্যে ব্লক তোড়জোড় শুরু ক'রে দিলে। অন্তরীপের ওই ছোট্ট ঝরনায় ঝাঁক বেঁধে আসে এইসব মাছ। ব্লক তাদের উপর একেবারে নির্দয় আক্রমণ চালিয়ে দিলে। তারপর তাদের চর্বি গালিয়ে নিয়ে শুকনো শৈবালকে সলতে হিশেবে ব্যবহার ক'রে সে মস্ত-সব মোটামাপের মোম বানাতে উঠে-প'ড়ে লেগে গেলো। তারপরে এলো জামাকাপড়ের সমস্যা, যার মুখোমুখি এসে সকলকেই একটু থমকাতে হ'লো।

'এটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে,' ব্লক একদিন সকলকে ধ'রে জ্ঞান দিলে, 'কোনোদিন যদি জাহাজডুবি হ'য়ে কোনো বিজন দ্বীপে এসে পড়তে হয়, তাহ'লে নৌকোর ভিতর গোটা জাহাজের জিনিশপত্র ঠাশাঠাশি বোঝাই না-ক'রে নিলে বড্ড অসুবিধেয় পড়তে হয়। আস্ত একটা জাহাজ যদি ব্যবহার করা যায়, তাহ'লে যা-কিছু কাজে লাগে, সব পাওয়া যাবে। না-হ'লে দুর্দশার একেবারে একশেষ হ'য়ে পড়ে।'

কেউ কোনো প্রতিবাদ করলে না তার কথার। এটা তো ঠিক যে, আস্ত *ল্যাণ্ডলর্ড* জাহাজটা নিজেদের অধীনে পেয়েছিলো ব'লেই নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের বাসিন্দাদের কোনো অসুবিধেতেই পড়তে হয়নি।

১৭ তারিখ বিকেবেলায় এমন-একটা ঘটনা ঘ'টে গেলো, যা তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিলো। উদ্বেগে, আশঙ্কায়, ভয়ে তারা যেন প্রায় চুপসে গেলো।

অ্যালবাট্রসটির সঙ্গে যে ববের খুব ভাব হ'য়ে গিয়েছিলো, এ-কথাটা আগেই বলা হয়েছে। পাখির সঙ্গে খেলা করতে খুব ভালো লাগতো তার। যতক্ষণ সে বেলাভূমির উপর খেলাধুলো করতো, তার মা তার দিকে সজাগ ভাবে নজর রাখতেন সবসময়, যাতে খেলতে-খেলতে সে দূরে চ'লে না-যায়। অন্তরীপের ছোটো-ছোটো পাথরের উপর দিয়ে চলতে যে ববের খুব মজা লাগতো, কী সুন্দরভাবে ফেনা ছিটিয়ে যায় সেখানে সমুদ্র! কিন্তু যখন গুহার ভিতর ব'সে সে পাখির সঙ্গে খেলা করে, তখন আর তাকে অমনভাবে চোখে-চোখে রাখার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

তখন বেলা তিনটে; গুহার মুখে নৌকোর পাল দিয়ে মস্ত পর্দা ফেলা হবে—তারই সব ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত জেমস আর ব্লক। জেনি, সুসান আর ডলি এক কোণে উনুনের সামনে ব'সে আছে, সামনেই কেটলিতে টগবগ ক'রে জল ফুটছে, আর তারা ঘাড় গুঁজে জামাকাপড় তালি লাগাচ্ছে। রোজ এমন সময়ে বব তার বিকেলের খাবার খায়। সুসান একবার ছেলের নাম ধ'রে ডাক দিলেন, কিন্তু বব কোনো উত্তর দিলে না।

তখন আসন ছেড়ে উঠে বেলাভূমির দিকে এগিয়ে গেলেন সুসান, জোরে গলা ফাটিয়ে ছেলের নাম ধ'রে ডাকলেন, কিন্তু তবু কোনো উত্তর এলো না।

তখন সুসান গলা ছেড়ে ডাক দিলেন, 'বব! বব! এসো! তোমার খাবার সময় হ'লো।'

কিন্তু ছোট্ট ববকে আশপাশে কোথাও দেখা গেলো না—অন্যসময় সে বেলাভূমিতে ছুটোছুটি করতো, কিন্তু এখন বেলাভূমি প'ড়ে আছে ফাঁকা ও শূন্য।

'একটু আগেই তো এখানে ছিলো। এর মধ্যেই গেলো কোথায় ?' জেমস বললেন।

'কোথায় যেতে পারে ?' আপন মনে এই কথা বলতে-বলতে ব্লক অন্তরীপের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলো।

...

কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না ববকে। সকলেই বিমূঢ়, হতচকিত, শঙ্কায় আচ্ছন্ন। ওদিকে আবার সন্ধে হ'য়ে আসছে। আর দেখতে-না-দেখতে নামলো ঘুটঘুটে একটি কালোরাত। বাবা-মার মখের দিকে তাকানো যায় না, এত তাঁরা বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন। সুসান তো এতটাই বিচলিত যে সবাই সন্দেহ করলে শেষকালে তিনি না পাগল হ'য়ে যান। অন্যরা যে কী করবে, কিছুই ঠিক করতে পারছিলো না। এই বিব্রত ও বিমূঢ় অবস্থার ভিতর আরেকবার তারা খুঁজে এলো চারপাশ। অন্তরীপের পাশে শৈবালের শুকনো স্তূপে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হ'লো, যাতে বব আলো দেখে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু ফিরে আসবেই বা কোথেকে ? সব তো তারা ওলটপালট ক'রে তছনছ ক'রে খুঁজে দেখেছে। শেষকালে রাত যখন অনেক হ'য়ে গেলো, তখন তারা তাকে ফিরে-পাবার আশা ছেড়ে দিলে। পরদিনও যে তাদের চেষ্টা সফল হবে, এমন-কোনো আশাই তাদের রইলো না।

ফিরে এলো তারা গুহার ভিতর। কিন্তু ঘুমের কথা ভাবতেই পারলে না কেউ। গোল হ'য়ে সবাই ব'সে থাকলো গম্ভীরভাবে। মাঝে-মাঝে একেকজন উঠে গিয়ে গুহার বাইরেটা ঘুরে আসে, কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে জলের শব্দ ছাড়া আর-কোনো আওয়াজ কানে ঢোকে কিনা, তারপর ফিরে এসে আবার গম্ভীরভাবে কোনো কথা না-ব'লে ব'সে পড়ে।

এই পরিত্যক্তউপকূলে এ-রকম দুর্বহ কোনো রাত এর আগে কখনো তারা কাটায়নি।

এইভাবেই রাত প্রায় দুটো বেজে গেলো। এতক্ষণ অসংখ্য তারা সবুজ আলো জ্বালিয়ে মিটমিট ক'রে জ্বলছিলো, যেন আকাশের কোনো দেবতা অসংখ্য চোখে তাদের নিরীক্ষণ করছেন। কিন্তু এখন ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ এসে আকাশকে ঢেকে দিলে—আর এলো হাওয়া। ক্রমেই হাওয়া দ্রুত হ'য়ে উঠলো, আর হাওয়ার ফূর্তি দেখেই যেন সমুদ্র উৎসাহ পেলে নতুন —হৈ-হৈ ক'রে সেও এবার তুমুল শব্দ ক'রে ঢেউ ছুঁড়ে মারলে উপকূলের দিকে। এই হ'লো জোয়ারের সময়, যখন জল এসে বেলাভূমিকে ভাসিয়ে দিয়ে যায়।

জলের শব্দ শুনেই উঠে দাঁড়ালেন সুসান, তারপর বিকারের ঘোরে—কেউ-কিছু বুঝে-ওঠার আগেই—গুহার বাইরে ছুটে গেলেন, আর বলতে লাগলেন, 'আমার বব ! আমার বব!'

অনেক কষ্টে তাঁকে ধরাধরি ক'রে গুহায় ফিরিয়ে আনা হ'লো। ফিরে এসেই তিনি শৈবালের শয্যায় এলিয়ে প'ড়ে থাকলেন—অন্যদিন এই বিছানায় বব তাঁর পাশে শোয়। জেনি আর ডলি নীরবে তাঁর শুশ্রূষা করতে লাগলো। শেষে অনেক পরে তিনি খানিকটা শান্ত হ'য়ে উঠলেন।

সারা রাত ধ'রে পাহাড়ের চূড়োয় অবিশ্রাম শোনা গেলো হাওয়ার কান্না। আরো-কয়েকবার সকলে মিলে বেলাভূমির উপর ঘুরে-ঘুরে দেখলেন। সবসময়েই মনে একটা ভয় তীক্ষ্ণ খোঁচার মতো ব্যথা দিচ্ছে : যদি জোয়ারের জলের সঙ্গে ছোট্ট একটি মৃতদেহ ভেসে এসে থাকে। কিন্তু কিছুই নেই বেলাভূমিতে, কিছুই নেই। তাহ'লে কি ঢেউয়েরা

তার মৃতদেহটা লুফতে-লুফতে ভাঙা নৌকোটার মতো দিগন্তের দিকে চ'লে গেছে ?

চারটের সময় যখন ভাটার টান জেগে উঠলো জলে, পুবদিকে লাল ছোপ দিয়ে আলোর রেখা ফুটে উঠলো ।

গুহার দেয়ালে হেলান দিয়ে ব'সে ছিলো ফ্রিৎজ ; হঠাৎ এমন সময়ে তার মনে হ'লো সে যেন দেয়ালের ওপাশে কার কান্না শুনতে পাচ্ছে । কান পেতে শুনলে সে একটু, তারপরে ভাবলে হয়তো সে ভুল শুনেছে, সবই তার মনগড়া, অলীক কল্পনা হয়তো ; উঠে গেলো সে কাপ্তেনের কাছে । 'আমার সঙ্গে আসুন তো একবার ...'

ফ্রিৎজ কী চায়, তা না-জেনেই কাপ্তেন তার সঙ্গে গেলেন ।

'ওই শুনুন !' ফ্রিৎজ বললো ।

সমস্ত শরীর টান ক'রে কাপ্তেন শোনবার চেষ্টা করলেন । 'কোনো পাখির গলা শুনতে পেলাম মনে হ'লো ।'

'হ্যাঁ, পাখির গলাই !' ফ্রিৎজ ঘোষণা ক'রে দিলো ।

'তাহ'লে এই দেয়ালের ওদিকে গর্ত আছে—ফাঁকা জায়গা ?'

'নিশ্চয়ই তা-ই । নিশ্চয়ই বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এমন-একটা সুড়ঙ্গ আছে ওদিকে । না-হ'লে এর তো আর-কোনো ব্যাখ্যাই হয় না ।'

'ঠিকই ধরেছো তুমি ।'

তক্ষুনি জন ব্লককে কথাটা ব'লে ফেলা হ'লো । দেয়ালের গায়ে কান লাগিয়েই একটু শুনেই সে দৃঢ়স্বরে ব'লে উঠলো, 'এটা নিশ্চয়ই অ্যালবাট্রসের গলা ; আমি চিনতে পেরেছি ।'

'অ্যালবাট্রসটি যদি ওখানে থাকে,' ফ্রিৎজ বললে, 'তাহ'লে ববও নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আছে ।'

'কিন্তু তারা এর ভিতর গেলো কী ক'রে ?' কাপ্তেন জানতে চাইলেন ।

'সেটা এক্ষুনি জানতে পারবো,' জন ব্লক তাঁকে ব'লে দিলে ।

খবরটা তৎক্ষণাৎ সকলের মনের ভিতর আশা জাগিয়ে দিলে । 'বব ওখানে আছে, নিশ্চয়ই ওখানে আছে বব,' বারে-বারে এই কথাটাই বলতে লাগলেন সুসান ।

জন ব্লক তার মোটা মোমবাতিগুলোর একটা জ্বালিয়ে নিলে । দেয়ালের ওপাশ থেকে যে অ্যালবাট্রসের চীৎকারই শোনা যাচ্ছে, এ-বিষয়ে কারুরই তখন কোনো সন্দেহ নেই । কেননা সেই ডাকটা একটানা শোনাই যাচ্ছে, একবারও থামছে না ।

কিন্তু বাইরের কোনো অন্য মুখ দিয়ে পাখিটা ওপাশে আছে কিনা, সেটা দেখবার আগে গুহার ভিতরটা একবার ভালো ক'রে দেখে নেয়া উচিত । হয়তো কোনো ফাটল আছে গুহার দেয়ালে, যার ভিতর দিয়ে পাখিটা ওপাশে চ'লে গেছে ।

মোমবাতিটা হাতে নিয়ে ব্লক গোটা দেয়ালটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে আরম্ভ ক'রে দিলে ।

মাটির কাছে, দেয়ালের গা ঘেঁষে, ছোট্ট একটি গর্ত আবিষ্কার করতে পারলে সে । গর্তটা বেশি বড়ো নয়, তবে বব আর পাখিটা গুটিশুটি হ'য়ে গ'লে যেতে পারে । এদিকে তখন আবার অ্যালবাট্রসের ডাক থেমে গেছে । আর পাখির গলা থেমে যেতেই সবাই সন্দেহ করলে ফ্রিৎজ, ব্লক, আর কাপ্তেন গুড নিশ্চয়ই শুনতে ভুল করেছেন ।

জেনি কোনো কথা না-ব'লে গর্তের দিকে এগিয়ে এলো, তারপর ঝুঁকে প'ড়ে পাখিটাকে কয়েকবার ডাকলে সে আদর ক'রে। তার গলা আর আদর পাখির খুব পরিচিত—তৎক্ষণাৎ একটি .তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেলো উত্তরে, আর তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ওই গর্তের ভিতর দিয়ে পাখিটা বেরিয়ে এলো।

'বব! বব!' এবার জেনি ববের নাম ধ'রে ডাক দিলে।

কিন্তু ববের কোনো উত্তর শোনা গেলো না। সবাই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করলে একটুক্ষণ, কিন্তু আর-কেউ বেরুলো না সেই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে। তাহ'লে কি পাখির সঙ্গে দেয়ালের ওপাশে যায়নি সে? সুসান এবারে একেবারে ভেঙে পড়লেন—এতক্ষণ আশায় তাঁর মুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠেছিলো, কিন্তু এখন মনে হ'লো তাঁর মুখ থেকে কে যেন সব রক্ত শুয়ে নিয়েছে।

'আমাকে একটু দেখতে দিন,' এই ব'লে ব্লক আবার এগিয়ে গেলো।

গুঁড়ি মেরে বসলো সে মাটিতে, তারপর দু-হাত দিয়ে মাটি তুলে-তুলে গর্তের মুখটা বড়ো করতে লাগলো। গর্তটা আগেই কুড়ি-পঁচিশ ইঞ্চি লম্বা ছিলো—এখন একটুক্ষণের মধ্যেই এত-বড়ো হ'য়ে গেলো যে, কোনোরকমে ব্লক শুদ্ধু গ'লে যেতে পারে।

এক মিনিট পরে ববকে সে ওই গর্তের ভিতর থেকে বের ক'রে আনলে। অচৈতন্য হ'য়ে পড়েছিলো বব, কিন্তু একটু পরেই চুমোয়-চুমোয় তার মা তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

৮

দূরের ইশারা

বব যে অ্যালবাট্রসের সঙ্গে খেলা করতে-করতে তার পিছন-পিছন গুহায় চ'লে আসে, তারপর তাকে অনুসরণ ক'রে গুহার শেষপ্রান্তে এসে হাজির হয়—এই জিনিশটা বুঝতে কারুরই বিশেষ দেরি হ'লো না। ব্যাপারটি ঘটেছিলো এইরকম: অ্যালবাট্রসটি ওই সংকীর্ণ পথ দিয়ে দেয়ালের ওপাশে চ'লে যায়, ববও যায় তার পিছন-পিছন। দেয়ালের ওপাশটা আসলে হ'লো একটি অন্ধকার গুহা। বব সেখান থেকে ফিরে আসবার চেষ্টা করে প্রথমে, তারপরে পথ হারিয়ে ফ্যালে। প্রথমে সে ডাকাডাকি করে, কিন্তু সে-ডাক কারু কানে আসে না। তারপর সে জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে। যদি দৈবাৎ অ্যালবাট্রসের চীৎকার ফ্রিৎজের কানে না-আসতো, তবে ববের যে কী হ'তো, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

ব্লক বললে, 'ববকে পাওয়া গেলো, এবং আরেকটি গুহা আবিষ্কৃত হ'লো—এই দুই কাজের জন্যেই অ্যালবাট্রসকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অবশ্য এ-কথা সত্যি যে নতুন গুহাটা আমাদের কোনো কাজেই লাগবে না। এই গুহাটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বড়ো, আর—সত্যি-বলতে—এটা ছেড়ে যাবার কোনো প্রয়োজনই আপাতত আমাদের নেই।'

কাপ্তেন গুড মন্তব্য করলেন, 'কিন্তু ও-পাশের গুহাটা কতদূর পর্যন্ত গেছে, তা আমি দেখতে চাই ।'

'পাহাড়ের ও-পাশ পর্যন্ত গেছে ব'লেই কি আপনার ধারণা, কাপ্তেন ?'

'না-দেখে কে বলতে পারে ?'

'বেশ না-হয় ধ'রেই নিলুম, গুহাটি পাহাড়ের ও-পাশে গিয়ে শেষ হয়েছে । কিন্তু কী আছে ও-পাশে ? হলুদ বালি, কঠিন পাথর, ঝরনা, পাহাড় আর খুব-বেশি হ'লো কিছু সামুদ্রিক উদ্ভিদ ।'

ফ্রিৎজ বললে, 'খুব সম্ভবত তা-ই । কিন্তু তবু আমরা দেখবো ।'

'নিশ্চয়ই দেখবো, মিস্টার ফ্রিৎজ, নিশ্চয়ই । এটা আর এমন আর কী বেশি কথা । এখুনি রওনা হ'লেই হয় ।'

অনুসন্ধানের ফলাফল হয়তো হবে শূন্য, কিন্তু তবু যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, তা চুকিয়ে ফেলা ভালো । কাপ্তেন গুড ফ্রিৎজ আর ফ্রাংককে নিয়ে গুহার শেষপ্রান্তে এসে হাজির হলেন । কয়েকটা বড়োশড়ো মোম হাতে নিয়ে ব্লকও তাদের অনুসরণ করলে । পথটাকে আরো-বড়ো ক'রে নেবার জন্যে সবাই দু-হাতে পাথর সরাতে লাগলো । মিনিট পনেরো পরে পথটি বেশ চওড়া হ'লো । তারা যখন সেই পথ দিয়ে দ্বিতীয় গুহাটিতে ঢুকলো, তখন মোমবাতিগুলো যথেষ্ট কাজ দিলে : মোমের আলোয় স্পস্ট দেখা গেলো সবকিছু ।

দ্বিতীয় গুহাটি প্রথমটির চেয়ে গভীর হ'লেও চওড়ায় বড়ো, একশো ফিটের মতো লম্বা, দশ-বারো ফিট বেড়, উচ্চতায় আগেরটির চেয়ে একটু বেশি । গুহাটির দেয়ালে জটিল অনেকগুলো পথরেখা । কোন্ পথটি যে পাহাড়ের চুড়োয় গেছে, আর কোন্টিই বা গেছে পাহাড়ের অপর পাশে, সেটা খুঁজে বের করা যথেষ্ট কষ্টের ব্যাপার ব'লে মনে হ'লো ।

যে-পথটি সোজা সামনের দিকে চ'লে গিয়েছিলো, সেইটে ধ'রেই এগুলো সবাই । কিন্তু পথটি ক্রমশ সংকীর্ণ হ'য়ে যেতে লাগলো । পঞ্চাশ-ষাট ফিট গিয়ে সবাই থামতে বাধ্য হ'লো । এখানে এসে পথ শেষ হ'য়ে গেছে, তার বদলে সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নিরেট একটি দেয়াল । খুব ভালো ক'রে মোমের আলোয় দেয়ালটি পরীক্ষা করা হ'লো । না, কোনো পথই নেই ।

কাপ্তেন গুড বললেন, 'বেশ । তাহ'লে এবার অন্য পথ ধ'রেই এগুবো আমরা ।'

ফিরে এসে সবাই অন্য পথগুলোও পরীক্ষা ক'রে দেখলে । কিন্তু খামকাই তারা চেষ্টা করলে : সবগুলি পথই কুড়ি-পঁচিশ ফিট এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে শেষ হ'য়ে গেছে । সবাই বুঝতে পারলে যে একটি দেয়ালই সবগুলি পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে । অসহায় আক্রোশে ফুলতে-ফুলতে সেই নিরেট গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালটিকে তুমুল গলায় অভিশাপ দিলে ব্লক ।

শেষ পথটি পরীক্ষা ক'রে সবাই যখন ফেরবার উপক্রম করছে, হঠাৎ ফ্রিৎজের মনে হলো সে যেন তার চিবুকে তাজা টাটকা হাওয়ার ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করতে পারলে । তক্ষুনি সে দেয়ালে কান লাগিয়ে হাওয়ার শব্দ শোনবার চেষ্টা করলে । তার চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো না : ক্ষীণ, অতি-ক্ষীণ শোঁ-শোঁ শব্দ তার কানে এলো । দেয়ালের মসৃণ গায়ে সে তার

গাল লাগিয়ে দাঁড়ালো । হ্যাঁ, তাজা হাওয়ার ঠাণ্ডা স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে । 'হাওয়া'—ব'লে সে চেঁচিয়ে উঠলো ।

অন্যরা অবাক হ'য়ে তার রকমশকম দেখছিলো । এবার তার চীৎকার শুনে সবাই তার কাছে এগিয়ে এলো । না, ফ্রিৎজ ভুল করেনি । কোত্থেকে যেন তাজা হাওয়া আসছে গুহার ভিতরে ।

ফ্রিৎজ বললে, 'উত্তুরে হাওয়া বইছে এখান থেকে । নিশ্চয়ই এই দেয়ালের কোথাও কোনো পথ আছে, যেটা উত্তর দিকে চ'লে গেছে । গেছে পাহাড়ের চূড়োয়, নয়তো পাহাড়ের অন্যপাশে । পাহাড়ের উত্তর অংশের সঙ্গে এই গুহার নিশ্চয়ই কোনো সংযোগ আছে ।'

ব্লক তক্ষুনি গুহার মেঝের দিকে আলো নামিয়ে নিলে । দেখা গেলো, একটা বড়ো পাথরের চাঁই দেয়াল ঘেঁষে পথ আটকে মেঝেয় প'ড়ে আছে । সম্ভবত কোনো প্রাকৃতিক কারণে ছাদ থেকে ওই পাথরটা এই পথের উপর এসে পড়েছে । পাথরটি দেখেই ব্লক চেঁচিয়ে উঠলে, 'দরজা, আমাদের দরজা ! আর—কী আশ্চর্য !—সত্যিই এই দরজা খুলতে চাবিরই দরকার নেই । কাপ্তেন, শেষ-পর্যন্ত সত্যিই তবে আমরা পথ পেলাম !'

পাথরটা পাঁচ-ছ-ফিট উঁচু । পাথরটাকে ঠেলতে শুরু ক'রে দিলে তারা । প্রায় আধঘণ্টা পরে সবাই যখন সামান্য একটু সরালে পাথরটা, তখন ঘামে সকলের পোশাক ভিজে গেছে । আরো মিনিট পনেরো ঠেলাঠেলি ক'রে রুদ্ধ পথটি তারা উন্মুক্ত করতে পারলে । যেই উন্মুক্ত হ'লো পথ, অমনি সেই পথ দিয়ে তুমুল হাওয়ার ঝাপটা এসে ঢুকলো গুহার ভিতর ।

তৎক্ষণাৎ সেই পথ ধ'রে এগিয়ে গেলো ফ্রিৎজ । অন্যরা নীরবে তাকে অনুসরণ করলে । গড়িয়ে-গড়িয়ে উপর দিকে উঠে গেছে পথ । দশ-বারো ফিট যাওয়ার পর সামনে দেখা গেলো অস্ফুট এক আলোকরেখা । কোনো ছাদ নেই পথের । পাঁচ-ছ ফিট চওড়া একটি সুড়ঙ্গ পথের মতো দেখালো পথটা, যার ছাদ হ'লো গাঢ়-নীল আকাশ, আর দু-পাশে শূন্য-ছোঁয়া দেয়াল । এই পথ দিয়েই উত্তুরে হাওয়া এসে দেয়ালের ছোটো-ছোটো ফুটো দিয়ে গুহায় ঢুকছিলো ।

কিন্তু, পথটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে ? উপর দিকে উঠে গেছে যখন, তখন কি পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে পৌঁছেছে ? যতক্ষণ-না এর শেষ সীমান্তে যাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ এ-প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যাবে না । অবশ্য এই পথ ধ'রে আদৌ বেশিদূর পর্যন্ত যাওয়া যাবে কিনা, তা-ও বা কে জানে ?

তখন প্রায় আটটা বেলা । অনেক সময় হাতে । ফ্রিৎজ বা ব্লককে আগে পাঠিয়ে সব খোঁজখবর নিয়ে-আসা উচিত কিনা, তেমন-কোনো প্রশ্নই জাগলো না কারু মনে । মুহূর্তেকও সময় নষ্ট না-ক'রে চটপট সে-পথ ধ'রে চলবার জন্যে সবাই ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলো । কাপ্তেন গুড্ অবশ্য তবু জোর দিয়ে বললেন যে, প্রথমে ছোটোহাজরি সেরে নিয়ে, কয়েক দিনের উপযোগী রসদ গোছগাছ ক'রে নিয়ে শেষকালে না-হয় সবাই মিলে রওনা হওয়া যাবে । এ-পথ যে কতদূর গেছে, তা তো আর জানা নেই, তাছাড়া অভিযানেও যে ক-দিন লাগবে, সে-বিষয়েও কেউ কিছু জানে না ; কাজেই ভবিষ্যতের জন্যে পুরোদস্তুর তৈরি হ'য়ে রওনা হওয়াই ভালো !

তখুনি সবাই ফিরে এসে তাড়াহুড়ো ক'রে প্রাতরাশ সেরে নিলে । ব্যস্ত তারা, শশব্যস্ত,

অধীর আগ্রহে রুদ্ধশ্বাস। নির্জন ডাঙায় চারমাস কাটিয়ে দেবার পর স্বভাবতই তারা অবস্থার কোনো রকমফের কি উন্নতি হয় কি-না দেখবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলো। প্রাতরাশ সাঙ্গ হ'তেই পুরুষেরা রসদের বাণ্ডিল কাঁধে ঝুলিয়ে নিলে, তারপর প্রথম গুহা পরিত্যাগ ক'রে দ্বিতীয় গুহায় এসে হাজির হ'লো। এমনকী অ্যালবাট্রসটিও এলো, জেনির সঙ্গে-সঙ্গে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই সেই শুঁড়িপথের সামনে এসে দাঁড়ালে।

এবার ফ্রিৎজ আর ফ্রাংক চললো আগে-আগে। তারপর জেনি; ডলি আর ববের হাত ধ'রে সুসান গেলো তাদের পিছন-পিছন; পরের সারিতে জেমস আর কাপ্তেন গুড। ব্লক এলো সবার শেষে।

আকাশ-ছোঁয়া দুই দেয়ালের মধ্য দিয়ে ক্রমশ উপরের দিকে ঘুরে-ঘুরে উঠে এলো সেই সংকীর্ণ শুঁড়িপথ। প্রায় একশো গজ এগুবার পর পথ একটু খাড়াই হ'লো। যতদূর বোঝা গেলো, তাতে মনে হ'লো পথটি খুব লম্বা, সম্ভবত একেবারে পাহাড়ের চুড়োয় গিয়ে পৌঁছেছে। সমুদ্রতল থেকে কম ক'রেও আট-নশো ফিট উঁচু হবে নিশ্চয়ই পাহাড়ের চুড়ো। তাছাড়া পাকদণ্ডির মতো এঁকেবেঁকে গেছে পথ; অবশ্য তা সত্ত্বেও আকাশ থেকে চুঁইয়ে-পড়া আলো দেখে বোঝা গেলো পথটি উত্তরমুখো এগিয়ে গেছে। আস্তে-আস্তে পথ চওড়া হ'তে লাগলো, স'রে যেতে লাগল দু-পাশের দেয়াল, আর যত উপরে উঠতে লাগলো পথটি, ততই দেয়ালের উচ্চতা যেন ক'মে-ক'মে এলো। তাছাড়া পথটি চওড়া হ'তে থাকায় চলতেও সুবিধে হ'লো আগের চাইতে।

বেলা দশটার সময় সবাই জিরোবার জন্যে থামলেন। জায়গাটা অনেকটা অর্ধবৃত্তের মতো; উপর দিকে ফাঁকা নীল আকাশ থেকে আলো ঝ'রে পড়ছে। কাপ্তেন গুড হিশেব ক'রে দেখলেন যে, জায়গাটি সমুদ্রতল থেকে প্রায় দুশো ফিট উঁচুতে। তিনি বললেন, 'যদি এভাবে এগুতে পারি, যদি এই হারে চলতে পারি, তাহ'লে পাঁচ-ছ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা চুড়োয় পৌঁছুতে পারবো।'

'তাহ'লে আমরা যখন চুড়োয় পৌঁছুবো,' ফ্রিৎজ বললে, 'তখন দিনের আলো থাকবে। দরকার হ'লে তাহ'লে রাতের মধ্যেই আবার আমাদের আস্তানায় ফিরে আসা যাবে।'

'অবশ্য আমাদের পথ যদি আরো বেঁকে যায়, তাহ'লে আমাদের কিন্তু আরো-অনেক-বেশি সময় লাগবে।'

ফ্রাংক বললে, 'এমনও হ'তে পারে যে পথটি মোটেই পাহাড়ের চুড়োয় গিয়ে পৌঁছোয়নি।'

'পাহাড়ের চুড়োয় কি অন্যপাশে—পথ যেখানেই যাক না কেন, ভাগ্যকে আমরা মাথা পেতে গ্রহণ করবো।' ব্লক বললে, 'চুড়োই হোক আর পাহাড়ের অন্যপাশই হোক, আমাদের অবস্থার যে তাতে খুব-বেশি তফাৎ হবে, তা আমার মনে হয় না। আস্ত দ্বীপটাই হয়তো মনুষ্যবাসের অনুপযোগী।'

আধঘণ্টা বিশ্রাম ক'রে সবাই আবার রওনা হ'লেন। এবার পথ কিন্তু আরো এঁকেবেঁকে গেলো। বারো-তেরো ফিট গিয়েই একটি ক'রে বাঁক ফিরতে শুরু করলো পথ। শুধু বালি আর ইতস্তত নুড়িপাথর, কোথাও কোনো উদ্ভিদের চিহ্ন নেই। হয়তো চুড়োও এমনি শুকনো, খটখটে, মরা ধুলোর মরুভূমি, হয়তো সেখানেও কোনো কালো সরসতা নেই এক ফোঁটাও।

কেননা যদি উপরের সমভূমিতে শ্যামলতার সামান্য চিহ্নও থাকতো, তবে বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই তার বীজ কি লতাপাতা এই পথে এসে পড়তো। কিন্তু সবুজের সামান্য কোনো অভিজ্ঞানই নেই কোনোখানে, সমুদ্র-শৈবালের চিহ্ন পর্যন্ত না।

বেলা দুটোর সময় আবার বিশ্রাম নিতে হ'লো সকলকে—এবার অবশ্য সবাই আহারও সেরে নিলে। সূর্য হেলে পড়ছে পশ্চিমে—ছাইরঙা, ধোঁয়াটে পাৎলা, জিরজিরে মেঘের আড়াল থেকে গোল সূর্য তার রশ্মিজ্বলা সংকেত পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের উদ্দেশে—হালকা রোদ, নরম আলো, কোমল রশ্মি। জায়গাটা সমুদ্রতল থেকে সাত-আটশো ফিট উঁচুতে হবে —এই আন্দাজ ক'রে চুড়োয় পৌঁছুবার আশা দৃঢ় হ'লো সকলের।

তারা যখন আবার চলতে শুরু করলে, তখন বেলা তিনটে। এবার চলতে বেশ কষ্ট হ'তে লাগলো। খাড়াই পথ, মসৃণ, পাথুরে, অবশ্য সেইসঙ্গে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। দু-পাশের দেয়াল তখনো দু-তিনশো ফিট উঁচু। একে-অন্যকে আঁকড়ে ধ'রে চলতে লাগলো সকলে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছিলো চুড়োর পৌঁছুবার সময় হ'য়ে এলো। অ্যালবাট্রসটি এবার ডানা মেলে মাথার উপর উড়ছে, আর চীৎকার ক'রে যেন ডাক দিচ্ছে সবাইকে। তার রকমশকম দেখে মনে হচ্ছিলো পথটা তার মোটেই অচেনা নয়।

অবশেষে, তারা যখন চুড়োয় এসে দাঁড়ালে, তখন বেলা পাঁচটা।

পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম—তিন দিকেই সীমাহীন সমুদ্র। উত্তরদিকে সমভূমির বিস্তার পরিমাপ করা গেলো না, কেননা তার শেষপ্রান্ত চোখে পড়লো না। পাহাড়টি তবে উত্তরদিকে লম্বকের মতো সোজা শূন্যে উঠে এসেছে? উত্তর সীমান্তে গিয়েও নিরাশ চোখে সমুদ্রের নীল নির্জন প্রসার দেখতে হবে?

তারা ভেবেছিলো,পাহাড়ের চুড়োয় হয়তো-বা সপ্রাণ শ্যামলতা চোখে পড়বে। কিন্তু হতাশ নিরুদ্যম চোখে সবাই তাকিয়ে দেখলে মরা পাথরের মরুভূমি—ঠিক টার্টল বে-র মতো। তবু সেখানে সমুদ্রে কালো শ্যাওলা ছিলো, কিন্তু এখানে তা-ও নেই। আবার সবাই পুবদিকে তাকালে, তাকালে পশ্চিমের দিকে: কোনো দ্বীপ বা মহাদেশের বাঁকা উপকূলের ক্ষীণ রেখা যদি চোখে পড়ে! কিন্তু না, কেবল নীল আর শাদা ঢেউয়ের উপর বিকেলের রহস্যময় আলো চাপা গলায় ফিশফিশ ক'রে কী যেন ব'লে চলেছে একটানা। নির্জন মরুদ্বীপ একটি—তাছাড়া আর-কিছু নয়, মরু, বালু, পাথর—কেবল রুক্ষ, শুকনো, ধূ-ধূ শূন্যতা।

শেষ আশার এই শোচনীয় বিনাশ দেখে এক গভীর স্তব্ধতায় ভ'রে গেলো তারা। এবার ওই শুঁড়ি-পথ দিয়ে ফিরে-যাওয়া ছাড়া আর-কিছু করার নেই। আবার ফিরে যেতে হবে টার্টল বে-র তীরে, ফিরে যেতে হবে সেই গুহায়, প্রতীক্ষা করতে হবে দীর্ঘ শীত ভ'রে—যে শীতে গাছ ম'রে যায়, সাপ ম'রে প'ড়ে থাকে ঠাণ্ডা কালো গহ্বরে। আর প্রতীক্ষাই বা কীসের? না, যদি কোনো জাহাজ পথ-ভুল ক'রে এদিকে এসে পড়ে, দৈবাৎ!

সাড়ে-পাঁচটা প্রায় বাজে। দিগন্তে সূর্যের বাঁকা রশ্মিগুলি গোলাপি হ'য়ে এলো। ঝাপসা, কালো সন্ধেবেলার অন্ধকার নেমে আসবে একটু পরে। এখন আর একটু সময়ও নেই নষ্ট করার মতো। কিছু নেই অবসরে ভরা। অন্ধকারে ঢালুপথ দিয়ে নেমে-আসা রীতিমতো বিপজ্জনক হবে। অথচ সমভূমির উত্তরদিক তো এখনও অজ্ঞাত থেকে গেলো। সেই অজ্ঞাত উত্তর দিকে যদি অভিযান চালাতে হয়, তবে তা এখনই শুরু ক'রে দেয়া ভালো। পাহাড়ের

চূড়োয় যদি রাত কাটিয়ে দেয়া যায়, তাহ'লে কাল হয়তো উত্তর দিকে রওনা হওয়া যাবে। কিন্তু রাতের বেলায় আবহাওয়া যদি আচমকা ভীষণ হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে এই পাহাড়ে আশ্রয়ই বা পাবে কোথায় ? নিরাপত্তার খাতিরে এক্ষুনি তাদের গুহার দিকে ফেরা উচিত।

ফ্রিৎজ পরামর্শ দিলে যে মেয়েদের নিয়ে ফ্রাংক আর জেমস্ বরং গুহায় ফিরে যাক, আর ব্লক আর কাপ্তেন গুডকে নিয়ে রাতটা পাহাড়ের চূড়োয় কাটিয়ে আগামী কাল অভিযান শেষ ক'রে সে গুহায় ফিরে যাবে ।

'ফ্রিৎজ ঠিকই বলেছে।' ফ্রাংক সায় দিলে। 'খামকা সবাই মিলে এখানে ব'সে থেকে লাভ কী। জেনি, তোমরা আমার সঙ্গে গুহার দিকে চলো—তাড়াতাড়ি ফিরে যাই আমরা।'

জেনি কোনো কথা না-ব'লে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো। সূর্য ডুবে যাচ্ছে পশ্চিমে, উত্তরের দিকে মেঘ কাঁপছে এলোমেলো। যদি তারা এখন রওনা হয় তাহ'লেই গুহায় পৌঁছুতে-পৌঁছুতে রাত হ'য়ে যাবে।

ফ্রিৎজ আবার বললো, 'লক্ষ্মীটি জেনি, খামকা আপত্তি কোরো না। আমরা কালকেই ফিরে যাবো। কাজেই এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কী আছে ?'

জেনি সকলের মুখের দিকে তাকালে। যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলো তারা। অ্যালবাট্রসটি তার বিশ্বস্ত পাখা ছড়িয়ে এলোমেলোভাবে উড়ছিলো মাথার উপর। জেনি যখন বুঝতে পারলে যে স্বামীর পরামর্শ-মতোই কাজ করা ঠিক, তখন উঠে দাঁড়িয়ে অনিচ্ছুক গলায় বললে, 'বেশ, তবে চলো।'

ঠিক এমন সময়ে অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠলো ব্লক—গভীর মনোযোগের সঙ্গে সজাগভাবে উৎকর্ণ কী যেন শোনবার চেষ্টা করলে কান পেতে। আওয়াজটা অন্যরাও শুনতে পেয়েছিলো। উত্তরদিকে, অনেক দূর থেকে স্পষ্ট ও অনতিক্ষীণ একটি শব্দ ভেসে এলো প্রবল হাওয়ায়।

'বন্দুক !' বিস্মিত জন ব্লক চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওই শোনো বন্দুকের আওয়াজ !'

৯

শেষচূড়ার হাতছানি

নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো সবাই, টান হ'য়ে থাকলো আপাদমস্তক, যেন গুণটানা এক ধনুঃশর : সবাই অপলকে তাকিয়ে থাকলো উত্তরের দিগন্তের দিকে, নিশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে না এমনভাবে কান-খাড়া ক'রে আছে তারা।

দূরে আরো-কতগুলি বন্দুকের শব্দ গর্জন ক'রে উঠলো, আর সেই ক্ষীণ হাওয়া মিলিয়ে যাবার আগেই ঝাপশাভাবে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলো সেইসব আওয়াজ।

'নিশ্চয়ই কোনো জাহাজ তীরের কাছ দিয়ে যাচ্ছে,' শেষকালে ব'লে উঠলেন কাপ্তেন

গুড ।

'তা-ই তো মনে হচ্ছে । বন্দুকের ওইসব আওয়াজ কেবল কোনো জাহাজ থেকেই আসতে পারে,' জন ব্লক উত্তর দিলে, 'রাত যখন নেমে আসবে আমরা তার বাতির আলো দেখতে পাবো নিশ্চয়ই ।'

'কিন্তু ওইসব শব্দ তো ডাঙা থেকেও আসতে পারে,' জেনি তার ধারণাটা প্রকাশ ক'রে দিলে ।

'ডাঙা থেকে ?' ফ্রিৎজ তার বিস্ময় প্রকাশ করলে, 'তুমি কি বলতে চাচ্ছো এই দ্বীপের আশপাশে অন্য-কোনো স্থলভূমি আছে ?'

'আমার বরং এটাকেই বেশি সম্ভব ব'লে মনে হয় যে উত্তরদিকে কোনো জাহাজ এসে ভিড়েছে,' আবার বললেন কাপ্তেন গুড ।

'তাহ'লে সে, বলা-নেই-কওয়া-নেই, খামকা বন্দুক ছুঁড়তে যাবে কেন ?' জেমস জিগেস করলেন ।

'সত্যি, কেন ?' জেনি তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি করলে ।

যদি কাপ্তেন গুড-এর ধারণাই ঠিক হ'য়ে তাকে তাহ'লে এটা মানতেই হয় যে জাহাজটি নিশ্চয়ই ডাঙা থেকে খুব-একটা দূরে নেই । হয়তো আকাশ কালো ক'রে যখন রাত নেমে আসবে, তখন আবার বন্দুক ছোঁড়া হ'লে বারুদের ঝিলিক দেখতে পারে তারা, এমনকী জাহাজের রাত-বাতির জাগ্রত চোখগুলোও জ্বলজ্বল ক'রে উঠবে তখন অন্ধকারে । কিন্তু বন্দুকের শব্দ যেহেতু উত্তরদিক থেকে এলো, সেইজন্যেই এটা খুবই-সম্ভব যে জাহাজটি তাদের চোখেই পড়বে না ; কেননা সেদিকের সমুদ্রকে চেষ্টা ক'রেও এখনো দেখতে পাওয়া যায়নি ।

এখন আর কেউ টার্টল-বে-র দিকে যাবার কথা ভাবছিলোই না । আবহাওয়া যে-রকমই থাকুক না কেন, ভোর পর্যন্ত এখানেই থাকবে ব'লে তারা সাব্যস্ত করলে । দ্বীপের কাছে সত্যিই যদি কোনো জাহাজ এসে থাকে, আর তা যদি উত্তরে না-হ'য়ে পুবে বা পশ্চিমে হয়, তাহ'লে খুবই দুর্ভাগ্যের কথা : এই সোনালি সুযোগ কিনা হেলায় হারাবে তারা কাঠকুঠোর অভাবে—যথেষ্ট কাঠকুঠো থাকলে রাতের বেলায় আগুন জ্বালিয়ে তাকে আলোর সংকেত করা যেতো ।

দূরের ওইসব ক্ষীণ-আওয়াজ তাদের গোটা অস্তিত্বকেই যেন আমূল নাড়া দিয়ে গেলো । যেন এই শব্দগুলি ইঙ্গিতে তাদের এই কথাই বোঝাতে চাচ্ছে যে জগতের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয় তারা, নয় পরিত্যক্ত ও নির্বাসিত—বরং এক অদৃশ্য অথচ অবিচ্ছিন্ন কোনো সূত্রের সাহায্যে মনুষ্যনামক প্রাণীকুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের ভাগ্য । আর সেইজন্যেই সম্ভব হ'লে তারা তক্ষুনি চ'লে যেতো পাহাড়ের শীর্ষে, তাকিয়ে দেখতো উত্তরের সমুদ্রকূল, দেখতে পেতো কোত্থেকে এলো এই আগ্নেয়াস্ত্রের গুরুগর্জন । কিন্তু সব ঝাপসা ক'রে দিয়ে সন্ধে নেমে আসছে এখন এই পাষাণের পাহাড়ে, আরেকটু পরেই কালো রাত যবনিকা বিছিয়ে দেবে দিক থেকে দিগন্তরে—কালো-এক যবনিকা, যার গায়ে চাঁদ জ্বলবে না, জ্বলবে না নক্ষত্র কি কোনো নীহারিকামণ্ডল, শুধু ঝুলে থাকবে নিচু ভারি আবছা মেঘ—হাওয়া যাদের তাড়া ক'রে নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণদিকে । এই পাষাণের ভিতর অন্ধকারে পথ-চলার কোনো মানে

হয় না। দিনের বেলাতেই পথ যথেষ্ট দুর্গম—রাতের বেলায় তা তো একরকম অগম্যই।

কাজেই, এখন যেখানে আছে সেখানেই যখন রাত কাটাতে হবে, তখন তার ব্যবস্থা করাই সমীচীন। সেই উদ্দেশ্যেই তারা ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। একটু খোঁজাখুঁজির পর মস্ত দুই পাথরের আড়ালে সামনেটা-খোলা এমন-একটি ছোট্ট ঘরের মতো জায়গা বের করলে ব্লক—প্রকৃতির নিজের হাতে বানানো কুঠুরি—আর ঠিক হ'লো ছোট্ট ববকে নিয়ে মেয়েরা সেখানেই শুয়ে রাত কাটিয়ে দেবে। তাতে অন্তত ঝোড়ো হাওয়া কি বৃষ্টির হাত থেকে তারা রেহাই পাবে।

থ'লের ভিতর থেকে খাবার বের করা হ'লো। কয়েক দিনের উপযোগী খাদ্য আছে তাদের সঙ্গে। আর ভগবান যদি মুখ তুলে তাকান তো টার্টল বে-র কাছে শীতকাল কাটাবার দুরূহ সম্ভাবনাটাই তো চিরকালের মতো অপসৃত হ'য়ে যেতে পারে।

রাত নেমে এলো তার পরে—শেষহীন এক রাত্রি যেন, তার প্রতিটি ঘণ্টা যেন আরো বেড়ে গিয়েছে—ষাট মিনিটের চেয়েও বেশি সময় যেন লাগছে তার একেকটা ঘণ্টা পূর্ণ হ'তে। এই জাগর-রাত্রির দীর্ঘ প্রহরগুলি তারা কেউ বোধহয় কোনোদিনই ভুলবে না—শুধু বব নির্বিকার, সে এরই মধ্যে দিব্যি তার মায়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়লো। মিশকালো এক অন্ধকারের রাজত্ব চললো সারা রাত। সমুদ্রতীর থেকে অনেক দূরের জাহাজের আলোও চোখে পড়ে—কিন্তু এখানে এই পাষাণের পাহাড়ে সব দিগন্তই ঢেকে রাখলো কৃষ্ণকায় একটি পর্দা—কেউ তাকে মুহূর্তের জন্যেও টান দিয়ে সরিয়ে দিয়ে গেলো না।

উষাবেলার আগে কোনো আলোই সংকেত ক'রে হাতছানি দিলে না তাদের, কোনো শব্দই ভাঙলে না নিশুতি রাতের ঝিমঝিমে স্তব্ধতা, দিগন্তে কোনো শাদা নিশেনের মতো কোথাও দেখা গেলো না জাহাজের পাল। তাহ'লে কি ভুল করলে তারা—এই প্রশ্নটাই চর্কিবাজির মতো পাক খেতে লাগলো তাদের ভিতর। তাহ'লে কি দূরের কোনো ঝোড়ো আবহাওয়ার বাজ ফেটে পড়েছিলো তখন গুমগুম ক'রে, আর তারা তাকেই ভেবেছিলো আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ ব'লে?

'না, না,' যেন হাত দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে এমনভাবে এই আশঙ্কার প্রতিবাদ ক'রে উঠলো ফ্রিৎজ, 'মোটেই ভুল হয়নি আমাদের। নিশ্চয়ই এটা কোনো কামানের শব্দ—অনেক দূরে গ'র্জে উঠেছে ব'লেই এমন ঝাপসাভাবে শুনেছি আমরা।'

'কিন্তু জাহাজ থেকে খামকা কামান ছুঁড়তে যাবে কেন?' জেমস জিগেস করলেন।

'হয় অভিবাদন জানাবার জন্যে, নয়তো আত্মরক্ষার খাতিরে,' ফ্রিৎজ উত্তর দিলে।

'হয়তো কোনো জংলিরা দ্বীপে নেমে হামলা চালাচ্ছে,' ফ্রাংক তার ধারণাটা খুলে বললে।

'আর যা-ই হোক, এটা আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে, এগুলো জংলিদের বন্দুকের শব্দ নয়,' ব্লক বললে।

জেমস জানতে চাইলেন, 'তাহ'লে হয় মার্কিন, নাহ'লে ইওরোপীয়রা থাকে এই দ্বীপে—এই-তো কথার মানে দাঁড়াচ্ছে।'

'সে-কথাই যদি ওঠে তো বলি,' কাপ্তেন গুড বললেন,'এটা যে একটা দ্বীপ, তাই-বা সঠিক জানা গেলো কবে? এই পাহাড়ের ওপাশে কী আছে তা আমরা জানতে পেলাম

কবে ? হয়তো আমরা এখন কোনো মস্ত দ্বীপের—'

'প্রশান্ত মহাসাগরের এই অংশে কোনো মস্ত দ্বীপ ?' ফ্রিৎজ তক্ষুনি কথাটা কেড়ে নিলে, 'কোনটা ? আমি তো বুঝতে পারছি না—'

জন ব্লক তার সাংসারিক সুবুদ্ধির পরিচয় দিলে, 'এইসব কথা নিয়ে তর্ক ক'রে কোনো লাভ আছে ? মোদ্দা কথাটা এই যে, আমরা এটাই জানি না আমাদের দ্বীপটা কোথায় অবস্থিত —প্রশান্ত, না ভারত মহাসাগরে । বরং সকাল অব্দি একটু ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা ক'রে থাকাই ভালো—আর সূর্য উঠতে এখন তো আর বেশি বাকিও নেই—তারপরে গিয়ে নিজের চোখেই দেখা যাবে উত্তর দিকে কী আছে ।'

'হয়তো সবই—হয়তো কিছুই-না !' জেমস বললেন ।

'তা, সেটা জানাই তো অনেক-কিছু !' ব্লক ব'লে উঠলো ।

পাঁচটার সময়ে সকালের প্রথম আভাস ঝাপসাভাবে ফুটে উঠলো দিগন্তে, আস্তে-আস্তে আবছা হ'য়ে এলো পুবদিক । আবহাওয়া এখন খুব শান্ত, কারণ হাওয়ার বেগ শেষদিকে ক'মে গিয়েছিলো । হাওয়া যে-মেঘের পাল তাড়া ক'রে নিয়ে গেছে, এখন তাদের জায়গা দখল ক'রে আছে রাশি-রাশি কুয়াশা । আর তারই ভিতর দিয়ে আস্তে-আস্তে দুয়ার খুলে বেরিয়ে এলো সেই জলন্ত আগুনের চাকা, সব আলোরই যে উৎস, অবিশ্রাম যার ভিতর টানাপোড়েন চলছে পিণ্ড-পিণ্ড আগুনের । স'রে গেলো সব কুয়াশা, আর পর্দা তুলে বেরিয়ে এলো নীল আকাশ । পুব দিক থেকে সারি-সারি যে-সব আলোর বল্লম ছুটে এসেছিলো, ধীরে-ধীরে তারা গোটা আকাশ আর সমুদ্রকে জিতে নিলে । দেবতার মহীয়ান মুকুটের মতো জেগে উঠলেন সেই জ্যোতির অধীশ্বর, এগিয়ে এলেন তিনি সাতঘোড়ার রথে, বাঁকাভাবে ছড়িয়ে দিলেন আলোর ঝরনা—জলের গায়ে, পাষাণের চুড়োয়, নীল দিগন্তে ।

তাকালে তারা অকূল সেই পাথারে, কিন্তু না—কোনো জাহাজই চোখে পড়লো না তাদের । অ্যালবাট্রসটি ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক, লাফিয়ে-লাফিয়ে যাচ্ছে এই থেকে ওই স্তূপে, কখনো চ'লে যায় অনেক দূরে, উত্তরে, যেন সে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে ।

সকলে ছোটোহাজরি সেরে নিয়েই রওনা হলেন । এই পাথরের উপর দিয়ে পথ-চলা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও কঠিন । কাপ্তেন গুড তাঁর অনুচরকে নিয়ে চললেন সকলের আগে —কোন পথ অপেক্ষাকৃত সুগম তা-ই তাঁরা বের ক'রে দিতে লাগলেন । তারপর এলো ফ্রিৎজ তার স্ত্রীর হাত ধ'রে, ফ্রাংক সাহায্য করলে ডলিকে, আর জেমস তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে ধ'রে-ধ'রে নিয়ে এলেন সকলের শেষে ।

নেই কোনো হলুদ বালি কি শ্যামল ঘাস—শুধু এলোমেলো প'ড়ে আছে পাথরের স্তূপ, শুকনো, চৌকো, তিনকোণা—কোনো-কোনোটা এত-বড়ো যেন কোনো দানবের ভীষণ মুণ্ড, তাদের ভয় দেখাবার জন্যে প'ড়ে আছে ইতস্তত । তারই উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে সামুদ্রিক পাখিরা—আর অ্যালবাট্রসটিও মাঝে-মাঝে ডানা কাঁপিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গী হচ্ছে ।

একঘণ্টার মধ্যে তারা দু-মাইল উঠে এলো সেই পাষাণের স্তূপে, কিন্তু তার মাশুল হিশেবে ক্লান্তিতে তারা যেন ভেঙে পড়েছিলো । পথ সেই একই-রকম দুর্গম ও ক্লান্তিকর । একটু বিশ্রাম না-ক'রে আবার পথ-চলা অসম্ভব হ'য়ে উঠলো, বিশেষ ক'রে মেয়েদের পক্ষে

তো বটেই।

আবার যখন তারা চলতে শুরু করল, বেলা তখন ন-টা বাজে। সূর্যের খর তাপকে একটু কমিয়ে রেখেছে এলোমেলো কুয়াশার রাশি : তা যদি না-হ'তো এই উপলবন্ধুর অপচয়ের উপর তাপে তারা ভীষণ কষ্ট পেতো, কারণ দুপুরের দিকে এ-সব অঞ্চলে একেবারে সোজাসুজি নিচে নেমে আসে সূর্যরশ্মিরা—তারা তাতিয়ে দিতো পাথর, আঁচে ভ'রে যেতো শুকনো হাওয়া, আর গরমে তারা যে শুধু আরো-বেশি ক্লান্ত হ'তো, তা-ই নয়, একেবারে অবসন্নই হ'য়ে পড়তো।

যতই তারা উত্তরে এগুচ্ছে ততই সেই পাহাড় পুবে-পশ্চিমে চওড়া হ'য়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ দু-দিকেই সমুদ্র চোখে পড়ছিলো তাদের, হয়তো আরেকটু এগুলেই জলরাশিও আড়ালে প'ড়ে যাবে। অথচ এখনও কিনা কোনো গাছপালা চোখে পড়লো না তাদের, কোনো চিহ্নই নেই উদ্ভিদের, শুধু একঘেয়ে অনুর্বর প্রাণহীনতা ছেয়ে আছে এই মালভূমি —আর দূরে দেখা যাচ্ছে ছোটো-ছোটো কয়েকটি পাথরের স্তূপ—মস্ত মিনারের মতো উঠে গেছে তারা আকাশের দিকে—কিংবা তারা যেন কতকগুলি বিরাট স্তম্ভ, আকাশ তাদের খিলেন, আর তাদের ওপাশে আছে অজ্ঞাত এক দেশ—কিন্তু এই হচ্ছে তার প্রবেশপথ।

এগারোটায় সময় দেখা শেষ চূড়াকে। মালভূমির উপরে প্রায় তিনশো ফিট উঠে গেছে সে—এত উঁচু দেখালো যে মনে হ'লো আকাশ ফুঁড়ে সে চ'লে গেছে কোনো অন্য ভুবনে, আর সংকেতে সবাইকে ডেকে পাঠাচ্ছে সেইদিকেই। এই চূড়োটার উপরেই ওঠা হবে ব'লে ঠিক হ'লো—কারণ ওই উঁচু চূড়ো থেকে তাকিয়ে চারদিকেই দেখা যাবে ভালো ক'রে। কিন্তু এখন সমস্যা হ'লো উঠতে না বেশি কষ্ট হয়। সম্ভবত হবে, কিন্তু তারা তখন এতটাই উত্তেজিত যে, যত কষ্টই হোক সব স্বীকার ক'রে নেবার জন্যে তৈরি হ'লো। কে জানে, তারা হয়তো এখন শেষ নিরাশার দিকেই ছুটে চলেছে, হয়তো চোখের সামনে তারা শেষ আশাকেও ধূলিসাৎ হ'য়ে যেতে দেখবে! কিন্তু তবু তাও ভালো—এইভাবে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতো আশা-নিরাশার সূক্ষ্ম রজ্জুর উপর দিয়ে অবিশ্রাম ভ্রমণ করার চেয়ে একেবারে হতাশ হ'য়ে-যাওয়া অনেক বেশি ভালো।

চূড়োর দিকে চললো সবাই—এখন তা আর প্রায় আধমাইল দূরে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপ অধিকতর দুর্গমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাদের, আর কষ্টও বেড়ে চলেছে। জন ব্লক এবার ববকে কোলে তুলে নিলে, মেয়েরা সবাই পুরুষদের কাছে-কাছে থাকলো—পথ এত বিপজ্জনক যে আচমকা কোনো দুর্ঘটনা ঘ'টে যেতে পারে—আর তখন পারস্পরিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে সবচেয়ে বেশি।

বেলা যখন দুটো বাজে, তখন সবাই সেই শেষ চূড়ার পাদদেশে গিয়ে পৌঁছুলো। এই আধমাইল পথ আসতে তিন ঘণ্টা লেগেছে তাদের, তবু এখন ক্লান্তিতে মনে হচ্ছে শরীরের সবগুলি জোড় যেন আলগা হ'য়ে খুলে যাচ্ছে। তারা বাধ্য হ'লো আবার বিশ্রাম করতে, কিন্তু উত্তেজনাও তো কম না, তাই তারা আধঘণ্টার আগেই আবার রওনা হ'লো। এবার আধঘণ্টার মধ্যে তারা চূড়োর অর্ধেকটায় উঠতে পারলো। সকলের আগে ছিলো ফ্রিৎজ, আর এবার তার গলা থেকে আচমকা একটি বিস্মিত ধ্বনি বেরিয়ে এলো। তৎক্ষণাৎ সবাই তার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলো।

'ওটা কী ? ওই উপরে ?' চুড়োর একেবারে মাথাটা দেখিয়ে সে ব'লে উঠলো ।

পাঁচ-ছ ফিট লম্বা একটা লাঠি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে—একেবারে উপরের পাথরের উপর কে যেন সযত্নে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে ।

'কোনো গাছের ডাল হবে কি—হয়তো সব পাতা ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে তার গা থেকে ?' ফ্রাংক জিগেস করলে ।

'না, গাছের ডাল তো হ'তেই পারে না,' কাপ্তেন গুড ব'লে দিলেন ।

'নির্ঘাৎ কোনো লাঠি—হাঁটার সময় ব্যবহার করা হ'তো হয়তো !' ফ্রিৎজ ঘোষণা করলে, 'ওই লাঠিটা ওখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ।'

'শুধু তা-ই নয়—নিশেন লাগানো আছে তাতে—ওই-তো, দ্যাখো না !' ব্লক আঙুল দিয়ে দেখালো তাদের ।

এই শেষচুড়োর উপরে নিশেন উঠছে ! আরে, তা-ই তো ! এই তো হওয়ায় কেঁপে গেলো পৎ-পৎ ক'রে—অবশ্য দূর থেকে তার রঙ দেখা যাচ্ছে না কিছুই !

'দ্বীপে তাহ'লে লোক থাকে !' ফ্রাংকের বিস্ময় একেবারে অসীমে পৌঁছে গেলো ।

'কোনো সন্দেহই নেই তাতে ।' জেনি ব'লে দিলে ।

'তাহ'লে এটা কোন দ্বীপ ?' জেমস জানতে চাইলেন ।

'কিংবা ওই নিশেনটাই বা কোন দেশের ?' কাপ্তেন গুড আরেকটা প্রশ্ন জুড়ে দিলেন সঙ্গে ।

'ব্রিটিশ নিশান,' চেঁচিয়ে উঠলো ব্লক, 'ওই দেখুন ! লাল রঙের ওদিকে একটা পালতোলা নৌকো—কোণের দিকে একেবারে ।'

ঠিক তখন হাওয়া এসে নিশেনটাকে মেলে দিয়ে গেলো, আর—সত্যিই—তারা দেখলো দ্বীপের শেষচূড়ায় ইংরেজদের একটি নিশেন উড়ছে পৎপৎ ক'রে !

আর পথশ্রম বোধ করলো না তারা, প্রায় যেন লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠে গেলো চুড়োর উপর—যেন কোনো অলৌকিক ক্ষমতা পেয়ে গেছে সবাই । কিন্তু চুড়োয় উঠেই হতাশায় সব আবার তিক্ত হ'য়ে গেলো । মস্ত কুয়াশার পর্দা দিগন্ত পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে উত্তরে । এদিকে বেলা প্রায় তিনটে বাজে—সূর্য ডুবে যাচ্ছে পশ্চিমে, আবার বাঁকাভাবে এলিয়ে পড়ছে তার রশ্মিরা, আর কুয়াশার উপরে তারা সাত রঙের ঝলমলে বিচ্ছুরণ ছিটিয়ে দিচ্ছে । যতক্ষণ-না কুয়াশা স'রে যায়, ততক্ষণ আর একতিলও নড়বে না ব'লে তারা ঠিক করলে। উত্তরে কী আছে, না-দেখে যাওয়া চলবে না । তাছাড়া ওই-তো উড়ছে ইংল্যাণ্ডের পতাকা—তাদের আশা ও ভরসার এক উজ্জ্বল প্রতীক । কাল যে কামানের গর্জন শুনেছে, তা হয়তো কোনো জাহাজ থেকেই এসেছে—হয়তো এই পতাকা দেখে জাহাজ থেকে অভিবাদন জানানো হয়েছে তোপ দেগে । এমনও হ'তে পারে উত্তরদিকে কোনো বেনামি বন্দর আছে, যেখানে মাঝে-মাঝে এসে জাহাজ থামে ।

নানা ধরনের সম্ভাবনার কথা আলোচনা করছে তারা, এমন সময় একটি পাখি ডেকে উঠলো জোর গলায়, আর শোনা গেলো ডানার ঝাপট । জেনির অ্যালবাট্রস এটি—দ্রুত সে উড়ে যাচ্ছে উত্তরদিকে, কুয়াশার আবছায়ায় । কোথায় যাচ্ছে সে—কোন দূর তীরের উদ্দেশে তার ডানা আবেগে কেঁপে উঠলো ? কিছুই তারা বুঝতে পারলে না, শুধু তাকিয়ে দেখলে

ক্রমশ সে মিলিয়ে গেলো কুয়াশার ভিতর, আর তারপরেই যেন কোনো কুহকের কাঠি ছুঁয়ে গেলো কুয়াশাকে, আস্তে-আস্তে তারাও পাৎলা হ'য়ে চ'লে যেতে শুরু করলো, যেন ওই অ্যালবাট্রস আসলে তাদেরই চ'লে যেতে ব'লে গেলো, আর তার কথাকে সমর্থন ক'রেই যেন ব'য়ে গেলো দূরের হাওয়া—কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে সরিয়ে দিলে ঝাপসা এই পর্দা ।

আর অমনি এক সবুজ বিতান উন্মোচিত হ'য়ে গেলো তাদের চোখের সামনে । প্রকৃতির দরাজ দাক্ষিণ্য শ্যামলতায় ভ'রে রেখেছে দ্বীপের এইপাশ—যেন কোনো সবুজের ভোজ ব'সে গেছে । ডালেপালায় ন'ড়ে উঠছে সবুজ পাতারা—যেন হাতছানি দিয়ে তারা ডেকে পাঠাচ্ছে আগন্তুকদের ।

'চলো, এক্ষুনি চলো সবাই, আর দেরি নয় ।' ফ্রিৎজ ব'লে উঠলো, 'আর-একটুও দেরি নয়—রাত হবার আগেই আমরা পাহাড় থেকে নেমে পড়তে পারবো—তারপরে ওই কুঞ্জবন তো আছেই—সেটাই আমাদের আশ্রয় হবে ।'

আর এমন সময় শেষ কুয়াশা স'রে গিয়ে উন্মোচিত ক'রে গেলো সুনীল জলরাশি । দ্বীপই তাহ'লে এটা—ছোট্ট একটি স্থলভূমি, যার চারপাশেই চ্ছলোচ্ছল করছে বিপুল জলধি ।

দ্বীপের দক্ষিণ দিকে যে-কার্পণ্য ছিলো উত্তরের এই অকৃপণ শ্যামলতায় প্রকৃতি যেন তা কড়ায়-ক্রান্তিতে পুষিয়ে দিতে চাচ্ছে । এই শ্যামবিলাস যেন কোনো নন্দন কাননের মতো ছড়িয়ে আছে চোখের সামনে—রুক্ষ, শুকনো, খোঁচা-লাগা পাষাণের পাশে সে যেন এক স্বর্গের প্রতিভাস । কিন্তু কোনো কুটির চোখে পড়লো না কারু—কোনো ঘরবাড়ি নেই আশপাশে, নেই কোনো প্রাসাদ কি খড়কুটোর বাড়ি ।

আর তারপরেই একটা চীৎকার—যে-চীৎকারের ভিতর সব উন্মোচনের রেশ লেগে আছে—ভেসে গেলো হাওয়ায় । না-চেঁচিয়ে পারলে না ফ্রিৎজ, তার হৃৎপিণ্ড থেকে যেন এক আশ্চর্য সুখের মতো তা ছড়িয়ে পড়লো অধীর পবনে—দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে নাটকীয়ভাবে সে চেঁচিয়ে উঠলো : 'নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড !'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড!' ফ্রাংকও ব'লে উঠলো তৎক্ষণাৎ !

আর তারই কম্পিত প্রতিধ্বনি করলে জেনি আর ডলি সমস্বরে : 'নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড !'

সত্যি তা-ই । সত্যি তাদের সামনে ওই ঝোপঝাড় জঙ্গলের আড়ালে শ্যামল বনভূমির ওপাশে, পাথরের বাধার আড়ালে ছড়িয়ে আছে 'ডিফাইল অব ক্লুজ', যার ওপাশে 'গ্রীন ভ্যালি' ! তারপরে আছে 'প্রমিস্‌ড ল্যাণ্ড' আর 'জ্যাকেল রিভার'—'ফ্যালকনহার্স্ট'ও চোখে পড়লো তাদের, চোখে পড়লো 'রক-কাসলে'র চুড়ো । বাঁ-পাশে যে উপসাগরটি জলস্রোত নিয়ে ব'য়ে গেছে দূরের দিকে, সে হ'লো 'পার্ল বে', আর সবচেয়ে দূরে কালো একটি ছোট্ট ফুটকির মতো দাঁড়িয়ে আছে 'বার্নিং রক', যার জ্বালামুখ দিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠে এসেছে রাশি-রাশি ধোঁয়া । আর আছে 'নটিলাস বে'—তারই ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়েছে 'ফলস হোপ পয়েন্ট' ; 'শার্ক্‌স্ আইল্যাণ্ড' দিয়ে ঘেরা 'ডেলিভারেন্স বে'ও চোখে পড়ে—ভালো ক'রে তাকালে ; এখন সবাই বুঝতে পারলে কোত্থেকে এসেছিলো বন্দুকের শব্দ ।

তাদের হৃৎপিণ্ড সুখে আনন্দে উল্লাসে বেজে উঠলো, রক্তের ভিতর নেচে-নেচে ছড়িয়ে গেলো তার রেশ, দরদর ক'রে ব্যথার মতো সুখে গড়িয়ে পড়লো চোখের জল,

আর অসীম কৃতজ্ঞতায় তারা নতজানু হ'য়ে ব'সে স্মরণ করলে ঈশ্বরের করুণা ।

১০

চেনা পথ ধ'রে

জাঁ জেরমাট চূড়োয় ব্রিটিশ পতাকা প্রোথিত করবার আগের দিন সন্ধেবেলায় যে-গুহায় মিস্টার য়ুলস্টোন আর্নেস্ট এবং জাঁককে নিয়ে চারমাস আগে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেদিন সন্ধেবেলায় সে-গুহা আনন্দ-উচ্ছল হ'য়ে উঠেছিলো । সে-রাতে কেউ ভালো ক'রে ঘুমুতেও পারেনি উত্তেজনায় ।

ব্যাপারটা ঘটেছিলো এইরকম : প্রার্থনার পালা শেষ হ'তেই অবরোহণ শুরু করেছিলো তারা ; তখনও রাত হ'তে ঘণ্টা দুয়েক বাকি ছিলো—টিলার পাদদেশে পৌঁছুতে তা-ই ছিলো যথেষ্ট ।

নামতে-নামতে ফ্রিৎজ মন্তব্য করেছিলো, 'আমাদের সবাইকে আশ্রয় দিতে পারে এমনতর কোনো গুহা যদি না-পাওয়া যায়, তবে সেটা ভারি আশ্চর্যের হবে ।' ফ্রাংক উত্তর দিয়েছিলো, 'কিন্তু অন্য উপায়ও তো আছে । আমরা গাছের নিচে আশ্রয় নিতে পারবো—নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের গাছের নিচে !' এই ব'লে সে গানের ধুয়োর মতো বারবার তার প্রিয় দ্বীপের নাম উচ্চারণ করেছিলো । নানারকম কথাবার্তায় সকলের গতি শ্লথ হ'য়ে পড়েছিলো ; কাপ্তেন গুড তখন তাড়া লাগিয়েছিলেন : 'কী-হে ! তোমরা কি এই চূড়ো থেকে নামবে না ? নিচে যদি নামতেই হয়, তাহ'লে আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা চলবে না আমাদের ।'

'আমাদের খাওয়ার কী হবে ?' জানতে চাচ্ছিলো জন ব্লক, 'পথে কী ক'রে খাবার পাবো আমরা ?'

ফ্রাংক ঘোষণা করেছিলো, 'আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা রক-কাসলে পৌঁছে যাবো । তাছাড়া নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডে শিকারের অভাব নেই ।'

'শিকারের হয়তো অভাব নেই,' কাপ্তেন গুড বলেছিলেন, 'কিন্তু বন্দুক তো নেই । বন্দুক ছাড়া শিকার করবো কী ক'রে ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী ক'রে তোমরা—'

ফ্রিৎজ তাঁর কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলো, 'আপনি কিছু ভাববেন না, কাপ্তেন । কাল দুপুরের আগেই কাছিমের ঐ শুকনো মাংসের বদলে আসল খাবার কাকে বলে আপনাকে দেখিয়ে দেবো ।'

'কাছিমকে অমন অবজ্ঞা কোরো না, ফ্রিৎজ,' জেনি বলেছিলো, 'তবে তাই ব'লে তাকে তো সর্বোত্তম খাদ্যদ্রব্যও বলতে পারবো না ।'

বেশি কষ্ট করতে হয়নি কাউকেই। অনায়াসেই তারা টিলার নিচে এসে পৌঁছেছিলো। মিস্টার য়ুলস্টোন আর জাঁক যে-পথ দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, সেইপথ দিয়েই এগিয়েছিলো সবাই। যখন তারা বিশাল পাইন-গাছের অরণ্যের কাছে এসে পৌঁছেছিলো তখন প্রায় আটটা বাজে। সেখানে মিস্টার য়ুলস্টোনের রাত-কাটিয়ে যাওয়া গুহাটা আবিষ্কার করতেও তাদের খুব বেশি দেরি লাগেনি। গুহাটা অবশ্য তেমন-বড়ো নয়, তবে জেনি, ডলি, সুসান আর ছোট্ট ববের পক্ষে যথেষ্ট। অন্যরা বাইরেই ঘুমুবে ব'লে ঠিক হয়েছিলো। গুহার ভিতরে একরাশ ছাই পড়েছিলা, শাদা রঙের ছাই, আর তা দেখে তারা এটা বুঝতে পেরেছিলো যে এই গুহায় কেউ নিশ্চয়ই এর আগেই কিছুক্ষণ থেকে গেছে। হয়তো উভয় পরিবারের সকলেই এসে দিন কাটিয়ে গেছে এখানে ; হয়তো তারাই বন পেরিয়ে ঐ চুড়োয় উঠে ব্রিটিশ পতাকাটি প্রোথিত ক'রে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'লে, বব গুহার কোনায় ঘুমিয়ে পড়লে পর, অনেকক্ষণ ধ'রে কথা বলেছিলো তারা। অবসাদ সত্ত্বেও নানা বিষয়ে তারা আলাপ করছিলো, তারপর আলোচনা মোচড় নিয়েছিলো *ফ্ল্যাগ*-বিষয়ে। যে-এক সপ্তাহ তারা বন্দী হ'য়ে ছিলো, জাহাজ তখন নিশ্চয়ই উত্তরমুখো চলেছিলো, আর তার একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা হ'লো বিপরীত বায়ু। যদি বিপরীত হাওয়া বইতো, তবে রবার্ট বোরাপ্ট নিশ্চয়ই প্রশান্ত মহাসাগরের সুদূর দিগন্তে চ'লে যেতো। সেইটেই তার স্বার্থ ছিলো। তা যখন পারেনি তখন আবহাওয়া নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে ছিলো। এখন তো নিঃসন্দেহে বোঝা যাচ্ছে যে, *ফ্ল্যাগ* হাওয়ার তাড়নে ভারত মহাসাগরে এসে পড়েছিলো, এসে পড়েছিলো নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের কাছাকাছি। তারপর *ফ্ল্যাগ* কর্তৃক পরিত্যক্ত নৌকোয় ক'রে যে-ডাঙায় এসে পৌঁছেছিলো তারা, সেইটেই ছিলো নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূল, যার হালচাল কিছুই জানা ছিলো না ফ্রিৎজের বা ফ্রাংকের। কেই-বা ভাবতে পেরেছিলো, যে-দ্বীপের একাংশ উর্বরতায় শ্যামল, তার অপরাংশ মরুর মতো বালুময়, কঠিন, নিষ্ঠুর।

অ্যালবাট্রসের আগমন-রহস্যও সবার কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিলো। জেনি মণ্টরোজের প্রস্থানের পর পাখিটি হয়তো বার্নিং রকে ফিরে এসেছিলো ; তারপর যদি আর-কখনও ফ্যালকনহার্স্ট কিংবা রক-কাসলে ফিরে যায়নি, তবু নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের তীরে-তীরেই উড়ে বেড়িয়েছে। তাদের উদ্ধার পাবার কাহিনীতে অ্যালবাট্রসের ভূমিকা নেহাৎ ফ্যালনা নয়। তার জন্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে দ্বিতীয় গুহা, আর সেই সুড়ঙ্গপথ, যা সবাইকে নিয়ে এসেছে পাহাড়ের চুড়োয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করেছিলো তারা। কিন্তু অবশেষে অবসাদ প্রবল হ'য়ে উঠলে তারা কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়েছিলো বটে, কিন্তু ঘুম তাদের ভেঙে গিয়েছিলো ভোরবেলাতেই। প্রাতরাশ সেরে ফুর্তিবাজ পায়ে সবাই আবার রওনা হ'য়ে পড়লো।

নেতৃত্ব নিলে ফ্রিৎজ। এবার চলা শুরু হ'লো অরণ্যপথে। যদিও পথ গেছে বনের ভিতর দিয়ে, তবু সে-পথ তুলনায় ঢের সুগম। পথ বোধহয় কুড়ি মাইলের মতো। যদি দিনে দশমাইল ক'রে এগুনো যায়—অবশ্যই দুপুরবেলায় দু-ঘণ্টা বিশ্রামের কথা হিশেব করলে তারা—তাহ'লে পরদিন সন্ধে নাগাদ ক্লজ অন্তরীপে পৌঁছনো যাবে। সেখান থেকে রক-কাসল কিংবা ফ্যালকনহার্স্ট তো কয়েক ঘণ্টার মাত্র ব্যাপার।

দুপুরবেলার আগে কেউ বিশ্রামের কথা বলতে পারবে না—এমনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো তারা রওনা হবার সময় । বব যদিও হাঁটতে চাচ্ছিলো, তবু জেমস, ফ্রাংক আর ব্লক পালা ক'রে তাকে কোলে নিয়ে চলছিলো । সুতরাং অরণ্য পেরিয়ে আসতে তাদের একটুও সময় নষ্ট হ'লো না । জেমস আর সুসান আগে নিউ-সুইৎজাল্যাণ্ডের অপরূপ ভূদৃশ্য দ্যাখেনি ; এবার তারা দ্বীপের শ্যামল সম্পদ দেখে একবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো । তাও তো এখনও এর প্রায় কোনোখানেই মানুষের হাত পড়েনি । যদি পরে এখানে প্রকৃতির উর্বরতার সঙ্গে মানুষের মগজ মেশে, তাহ'লে যে কী-রকম একটা চমৎকার ব্যাপার হবে, সে-কথা ভাবতেও তারা রোমাঞ্চিত বোধ করলো । শিকারের কোনো অভাব নেই সেই অরণ্যে । পীকারি, ক্যাভি, অ্যান্টিলোপ, খরগোশ ; এছাড়া বালিহাঁস, বুনোহাঁস, বন-মুরগি, তিতির–কত-কি ! বন্দুক সঙ্গে না-থাকার জন্যে ফ্রিৎজ আর ফ্রাংকের রীতিমতো আপশোশ হচ্ছিলো ।

এগারোটার সময় ফ্রিৎজ অকস্মাৎ অঙ্গুলিসংকেতে সবাইকে থামতে নির্দেশ দিলে । একটা ঝোপের ওপাশে ছোট্ট একটা ঝরনায় একটি অ্যান্টিলোপ জলপান করছিলো । তার মানে পুরোদস্তুর টাটকা খাবার : আহা, যদি তারা মারতে পারতো এটাকে !

ঠিক করা হ'লো, ঝোপের আড়াল দিয়ে সন্তর্পণে গিয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর, তারপর ছুরির সাহয্যেই খতম করবে তাকে । জেনি, সুসান, ডলি আর বব একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলো ; অন্য পাঁচজনে ঘন ঝোপের আড়াল দিয়ে শুধু তাদের পকেট-ছুরিকে সম্বল ক'রে সাবধানী পায়ে অ্যান্টিলোপটির দিকে এগোলো ।

অ্যান্টিলোপের ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ ; শ্রবণশক্তিও ; তা সত্ত্বেও সে স্বচ্ছন্দভাবে জল খেয়ে চললো । সম্ভবত আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিলো না ব'লেই এতটা স্বচ্ছন্দ ছিলো সে । কিন্তু যখন সে অকস্মাৎ মুখ উঁচু ক'রে হাওয়ার আঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করলে, তখন আর সময় ছিলো না, সবাই তখন তিনদিক থেকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে । এত সহজে যে অ্যান্টিলোপটিকে শিকার করা যাবে, এমন আশা কেউ করেনি । এ নেহাৎই দেবতার দয়া ।

তক্ষুনি চামড়া ছাড়িয়ে দু-দিনের উপযোগী মাংস সংগ্রহ ক'রে নিলে তারা । কাল সন্ধের মধ্যেই যখন 'ডিফাইল অব ব্লুজ'-এ পৌঁছুনো যাবে তখন খামকা গোটা জন্তুর মাংস ব'য়ে নিয়ে কী লাভ ? প্রায় দুপুর হ'য়ে এসেছিলো ; কাছেই ঝরনা, তাই তাজা পরিষ্কার জলের অভাব নেই । ঠিক হ'লো এখানেই গাছের ছায়ায় টাটকা মাংস রান্না ক'রে আহার সেরে নেয়া হবে । সুসান আর ডলি রান্নার ভার নিলে ।

তাদের ফুর্তির সীমা ছিলো না । অফুরন্ত কথা আর হাসি, কত গল্প আর গুজব । নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের কথা একবার বলতে শুরু করলে সহজে থামতে পারতো না ফ্রাংকরা । অনেকদিন পরে সানন্দে অ্যান্টিলোপের সুস্বাদু মাংস খেলে সবাই । তারপর আবার ফুর্তিবাজ পায়ে সবাই রওনা হ'য়ে পড়লো । পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ধের আগেই দশ মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে তো !

শুধু যদি ফ্রিৎজ আর ফ্রাংক হ'তো, তবে তারা অবসাদ বোধ করতো না, একটু না-থেমেই হয়তো 'ডিফাইলে' পৌঁছে যেতো । 'তারা দুজনে আগে চ'লে যাক রক-কাসলে' —এই কথা তাদের একবার মনেও হয়েছিলো । কিন্তু সবাই মিলে একসঙ্গে যাওয়ার যে-

আনন্দ, সেইটেও লোভনীয় ব'লে সে-কথা নিয়ে তারা আর মাথা ঘামালে না।

বিকেল চারটের সময় তারা অরণ্য ছাড়িয়ে এলো। সামনে এবার লোভনীয় শ্যামল প্রান্তর। ঘাস, আর বাঁশ-ঝাড়, মাঝে-মাঝে গাছের সারি। 'গ্রীনভ্যালি' পর্যন্ত এমনি উর্বর প্রান্তর চ'লে গেছে। দু-একটা হরিণ আর পীকারি-জাতীয় জীবের সঙ্গে পথে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিলো ; কিন্তু খাদ্যের ভাবনা না-থাকায় তাদের নিয়ে তারা মাথা ঘামালে না। কয়েকটি হাতিও প্রশান্ত পদক্ষেপে অরণ্যের ঘন গাছপালার মধ্য দিয়ে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলো, তবে তারা সন্তর্পণে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিলো ব'লে, আর হাতিগুলোও উন্মত্ত ছিলো না ব'লে, কোনো বিপদই হ'লো না। সন্ধে ছটার সময় তারা থামলে।

আবহাওয়া বেশ প্রসন্ন। ঠাণ্ডা তেমন গুরুতর নয়। যদিও গাছের ছায়ায় এতটা পথ অতিক্রম করেছে তারা, তবু আসলে রোদটাই ছিলো ভয়াবহরকম।

কিছু শুকনো কাঠকুটো জোগাড় ক'রে দুপুরবেলার মতোই আগুন জ্বালিয়ে রান্না করা হ'লো। খাওয়া-দাওয়ার পরে সবাই একটা বড়োশড়ো পাথরের আড়ালে ঘুমুবার ব্যবস্থা করলে। ফ্রিৎজ, ফ্রাংক আর ব্লকের উপর পড়লো পালা ক'রে পাহারা দেবার ভার। যখন রাত্রি গভীর হ'লো, তখন সুদূর অরণ্যে বুনো জানোয়ারদের গর্জানির ক্ষীণ আওয়াজ কানে এলো, তবে অরণ্য বেশ খানিকটা পিছনে পড়েছিলো ব'লে তেমন ভয়ের-কিছু ছিলো না।

পরদিন ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই সবাই রওনা হ'য়ে পড়লো। পথে যদি কোনো বিপদ-আপদ না-ঘটে তো সন্ধের আগেই 'ডিফাইল অভ ক্লুজ'-এ পৌঁছুতে পারবে ব'লে আশা করেছিলো তারা ; রোদের তাপ এড়াবার জন্য তারা গাছপালার ছায়া দিয়ে চললো ব'লে গরমে ততটা কষ্ট পেতে হ'লো না।

দুপুরবেলা উত্তরমুখী একটা ছোটো শীর্ণ নদীর পাশে মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে নিলে তারা। এবার নদীটির বাঁ-তীর ধ'রে চলতে হবে। ফ্রিৎজ আর ফ্রাংক—কেউই এই নদীটির অস্তিত্বের কথা জানতো না, কেননা তারা আগে কোনোদিন এখানে আসেনি। এই নদীর নাম যে 'মন্টরোজ' দেয়া হয়েছে, আর পাহাড়ের চুড়োর নাম যে 'জাঁ জেরমাট পীক', এ-কথা তারা জানতো না। নদীটির সঙ্গে তার পদবি জড়িত—এ-তথ্য যখন জেনি আবিষ্কার করবে, তখন তার নিশ্চয়ই খুশির সীমা থাকবে না।

ঘন্টাখানেক পথ চলার পর 'রিভার মন্টরোজ' পুবমুখো বাঁক ফিরে চ'লে গেলো। দু-ঘন্টা পরে তারা 'গ্রীন-ভ্যালিতে' এসে পৌঁছুলো : এবার ফ্রিৎজ আর ফ্রাংকের সব পথঘাট চেনা। লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে তাদের গতি আগের চাইতে আরো দ্রুত হ'লো।

এবেরফুটের কুটিরের সামনে এসে পৌঁছুলো তারা : বুনো জানোয়ারেরা যাতে আক্রমণ করতে না-পারে, সেইজন্য পাথরের মধ্য দিয়ে শক্ত বেড়া চ'লে গেছে কুটিরের চারপাশে।

বেড়াটা দেখিয়ে ফ্রিৎজ বললে, 'এই হ'লো আমাদের দরজা।'

'হ্যাঁ,' জেনি বললে, 'এইটেই হ'লো প্রমিস্ড ল্যাণ্ডে যাবার প্রবেশপথ।'

তারা যখন এবেরফুটের কুটিরে এসে পৌঁছলো, তখন সাড়ে সাতটা বাজে। মাত্র তিনদিন আগে যে-স্বদেশকে তারা হাজার মাইল দূরে ব'লে মনে করেছিলো, শেষকালে এখন কিনা সেখানেই তারা উপস্থিত!

কুটিরে কেউ ছিলো না। অবশ্য এতে অবাক হবার কিছুই ছিলো না, কেননা কুটিরটি

দ্বীপে গ্রীষ্মাবাস হিশেবেই ব্যবহৃত হ'তো ।

ছোট্ট ভিলাটা ছবির মতো সাজানো-গুছোনো । সব দরজা-জানলা খুলে দিয়ে নিজেদের স্বচ্ছন্দ ক'রে তোলবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো সকলে ।

মঁসিয় জেরমাট এমন ব্যবস্থা ক'রে রাখতেন যে, উভয় পরিবার বছরের মধ্যে বার কয়েক এখানে এলেও যেন কোনো জিনিশের অভাব না-ঘটে । বব, মহিলাগণ এবং কাপ্তেন গুড—এঁরাই বিছানাপত্র ব্যবহার করবেন ব'লে ঠিক হ'লো ; মেঝেয় শুকনো ঘাস বিছিয়ে অন্যদের শুতে মোটেই অসুবিধে হবে না । এবেরফুটের ভাঁড়ারে সবসময়েই এক সপ্তাহের উপযোগী রসদ থাকতো । শুধু সেগুলো বার ক'রে নেয়ার ওয়াস্তা । শুকনো মাংস, নোনা মাছ ইত্যাদি আছে ভাঁড়ারে, আর কলা, আম, আপেল প্রভৃতি যদৃচ্ছ গাছ থেকে পেড়ে নিলেই হ'লো ।

হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে যে-যার শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়তেই আয়েসে আর অবসাদে চোখ বুজে এলো । তারপর একঝাঁক ঘুম ।

১১

সামনে দুশমন !

পরদিন সকালবেলায় ছোটোহাজরি সেরে ফ্রিৎজ ও তার সঙ্গীরা সাতটার মধ্যেই এবেরফুটের ভিলা ছেড়ে রওনা হ'য়ে পড়লো । তাড়া ছিলো সবার । ফ্যালকনহার্স্ট সাড়ে সাত মাইল দূরে ; তিন ঘণ্টার মধ্যেই যাতে সেই ব্যবধান অতিক্রম করা যায়, সেইজন্য সকলে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলো ।

ফ্রিৎজ মন্তব্য করলে, 'হয়তো ওরা এখন আকাশ-বাড়িতে আছে ।'

'তা-ই যদি হয়,' জেনি বললে, 'তবে একঘণ্টা আগেই ওদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে ।'

'অবশ্য যদি তারা প্রসপেক্ট-হিল-এ গিয়ে আশ্রয় না-নেয় !' ফ্রাংক মন্তব্য করলে, 'তাহ'লে কিন্তু আমাদের ফলস-হোপ পয়েন্টে যেতে হবে ।'

কাপ্তেন গুড জানতে চাইলেন, 'সেখান থেকেই তো মঁসিয় জেরমাট *ইউনিকর্নের* আগমন প্রতীক্ষা করবেন, তাই না ?'

ফ্রিৎজ উত্তর দিলে, 'সেইটেই সম্ভব । *ইউনিকর্নের* কলকব্জা হয়তো এতদিনে মেরামত হ'য়ে গেছে—এতদিনে এসেও পৌঁছেছে সে ।'

ব্লক বললে, 'সে যা-ই হোক, এখনই আমাদের রওনা হওয়া উচিত । ফ্যালকনহার্স্টে যদি কেউ না-থাকে, তাহ'লে রক-কাসলেই যাবো না-হয় । সেখানেও যদি কেউ না-থাকে তো প্রসপেক্ট হিল-এ যেতে হবে । কিন্তু এখন আর এ-বিষয়ে আলোচনা ক'রে সময় নষ্ট করবার কোনো মানে হয় না ।'

ঘণ্টা দেড়েক হাঁটবার পর, এবেরফুট আর ফ্যালকনহার্স্টের মধ্যখানে এসে, একটি ঝরনাধারা দেখে ফ্রিৎজ থমকে দাঁড়ালো। দ্বীপের এইরকম জায়গায় যে কোনো স্রোতস্বিনী আছে, তা সে জানতো না। তাই সে বিস্মিত স্বরে ব'লে উঠলো, 'আরে ! এইটে আবার কবে হ'লো ?'

'আরে, তাই-তো।' জেনি বললে, 'এখানে কোনো ঝরনা আছে ব'লে তো জানতুম না।'

কাপ্তেন গুড মন্তব্য করলেন, 'ঝরনা না-ব'লে এটাকে খাল বলাই ভালো। আমার তো অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, কাপ্তেন।' ফ্রিৎজ বললে, 'জ্যাকেল-রিভার থেকে সোয়ান লেক অবধি এই খাল কাটার পরিকল্পনা নিশ্চয়ই মিস্টার য়ুলস্টোনের। য়ুড-গ্রেজের জমিতে যাতে সেচের জলের অভাব না-হয়, সেই জন্যেই বোধহয় এটা কাটা হয়েছে।'

সাঁকো পেরিয়ে আবার সবাই এগিয়ে চললো। গরান গাছের শাখায় তৈরি শূন্যে-ঝোলা আবাসের দিকেই এগিয়ে চললো তারা। চারদিকে কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্যভরা নীরবতা। জেনির চোখের তারায় একটা উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠলো। কিন্তু কেন সেই উদ্বেগ, কেন সেই অস্বাচ্ছন্দ্য, তার কোনো কারণ কেউ খুঁজে পাচ্ছিলো না। ফ্রাংক যাচ্ছিলো সকলের আগে-আগে। এবার সেও কী-রকম একটি অকারণ স্নায়বিক অসুস্থতা বোধ ক'রে পিছিয়ে এলো। অন্যরাও কোনো কথা বলছিলো না, বলতে চাচ্ছিলো না, কী-রকম যেন গম্ভীর হ'য়ে হাঁটছিলো। যতই তারা গাছপালার মধ্য দিয়ে পথ ক'রে এগুতে লাগলো, এই অদ্ভুত ধরনের অস্বস্তির ভাবটা বেড়েই চললো। দশ মিনিটের মধ্যেই ফ্যালকনহার্স্টে গিয়ে পৌঁছুবে তারা। দশ মিনিটের পথ মানে তো একরকম পৌঁছুনোই হ'লো গন্তব্যস্থলে। কিন্তু সেই ভারি অস্বস্তির ভাবটা সকলকে চুপ করিয়ে রাখলো, গতিও তাদের আপনা থেকেই মন্থর হ'য়ে এলো।

সবাইকে চাঙ্গা ক'রে তোলবার চেষ্টা করলে ব্রক। বললে, 'এখানে যদি কাউকে না-পাওয়া যায় তো রক-কাসলে যেতে হবে আর-কি ! তাতে হয়তো আরো ঘণ্টাখানেক লাগবে। কিন্তু এতদিন গরহাজির থাকবার পর এই একঘণ্টা আর কতটুকুই বা ?'

এ-কথার উত্তরেও কেউ কোনো কথা বললে না, নিঃশব্দে পা চালাতে লাগলো সবাই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রাঙ্গণের মাঝখানে মাথা-তোলা বিশাল গরান গাছের ঝাঁক চোখে পড়লো। চারদিকে লতানো ঝোপঝাড়ের বেড়া। ফ্রিৎজ আর ফ্রাংক দৌড়ে ফটকের কাছে চ'লে এলো। ফটক সপাটে খোলা। লতাপাতা সব ছেঁড়াখোঁড়া, হা-হা করছে চারদিক। প্রাঙ্গণের ভিতরে এসে ঢুকলো দুইভাই, মধ্যখানের ছোটো জলাধারটার কাছে এসে থামলো।

না, কেউ নেই এখানে। পাখি-মুরগির বাসা থেকে কোনো শব্দ এলো না। বাইরের কুটিরে, যেখানে নানারকম জিনিশপত্র থাকতো, সব কি-রকম একটা বিশৃঙ্খল এলোমেলো অগোছালো অবস্থায় প'ড়ে আছে। দেখে ভালো লাগলো না। মাদাম জেরমাট, মিসেস য়ুলস্টোন আর হ্যানা—তিনজনেই খুব সাবধানি, তাঁদের তো এ-রকম অগোছালো হবার কথা নয়। ফ্রাংক গোরু-রাখার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। র‍্যাকের মধ্যে একরাশ শুকনো ঘাস-পাতা ছাড়া আর-কিছুই নেই সেখানে। তবে কি গোরু-ভেড়াগুলো বেড়া ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে ? তারা কি স্বাধীনভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে-জঙ্গলে ? না, ফ্যালকনহার্স্টের আশপাশে তো

দেখা গেলো না তাদের । তবে হয়তো কোনো বিশেষ কারণে অন্যত্র গোয়াল-ঘর তৈরি করিয়ে তাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । কিন্তু ওই ব্যাখ্যাটিও কেন যেন তাদের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হলো না ।

ফ্যালকনহার্স্টের খামার-বাড়ির দুই মহল । এক মহল ম্যানগ্রোভ গাছের নিচে : পাখি-মুরগির বাসা, গোয়াল-ঘর, আর দু-একটি জিনিশপত্র রাখবার ঘর । উপরে, গরান গাছের শাখার উপরে, ছিলো অন্য মহল । সেইটেই হ'লো ফ্যালকনহার্স্টের আকাশ-বাড়ি । উপরে ওঠবার মইও বেশ শক্ত । আকাশ-বাড়িটি বেশ বড়ো ; উভয় পরিবারের লোকজনই থাকতে পারে সেখানে ।

প্রাঙ্গণের মহল, বন-জঙ্গলের মতোই, নীরব ও নির্জন দেখে উদ্বিগ্ন গলায় ফ্রিৎজ বললে, 'ওধারে চলো তো !' এধারের ঘরগুলোয় পৌঁছেই আচমকা একটা চীৎকার ফেটে পড়লো তাদের মধ্য থেকে । সেই চীৎকারের মধ্যে ভয়, বিস্ময়, উদ্বেগের একটি বিমিশ্র অনুভূতি প্রকট ।

ঘরের আশবাবপত্র সমস্ত অগোছালো, এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ; কোনো-কোনোটি আবার ভাঙাচোরা ; চেয়ার-টেবিল ওলোটপালোট হ'য়ে প'ড়ে আছে ; বাক্স-প্যাটরার ডালা খোলা ; বিছানাপত্র মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে । ফ্যালকনহার্স্টের যে-ভাঁড়ার ঘর সবসময় প্রাচুর্যে ভরা থাকতো, সেই ভাঁড়ারে কোনো জিনিশই নেই । জালা, কুঁজোগুলো শূন্য ; শস্যাধারের অবস্থা পিঁপড়ে-কাঁদানো । প্রথমটায় কোনো অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গেলো না, শেষে ভালো ক'রে খোঁজবার পরে মেঝেয় একটা কার্তুজ-ঠাশা পিস্তল পেয়ে কোমরবন্ধে গুঁজে রাখলে ব্লক । ফ্যালকনহার্স্টে সর্বদা শিকারের জন্যে বন্দুক-পিস্তল থাকতো । তা না-দেখে কেন জানি ভালো লাগলো না ফ্রিৎজের । অকারণেও শরীর শিউরে উঠতে চাচ্ছিলো তার । এই অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খলার দৃশ্য দেখে অন্যরাও কেমন যেন স্তম্ভিত হ'য়ে রইলো । অন্য-সব আস্তানাগুলিও কি এইরকম বিশৃঙ্খল হ'য়ে আছে নাকি ? লুণ্ঠনকারী শত্রু নিশ্চয়ই কেবল এবেরফুটেই হানা দেয়নি ? আর এই শত্রুই বা কারা ?

কাপ্তেন গুড বললেন, 'একটা-কোনো ভয়ংকর ব্যাপার এখানে ঘ'টে গেছে । তবে তোমরা যতটা ভয় করছো, হয়তো ততটা ভয় পাবার কোনো কারণ নেই ।'

কেউ এ-কথার জবাব দিলে না । কীই-বা বলবে উত্তরে ? তাদের বুদ্ধি যেন ভির্মি খেয়ে পড়েছে । এত আশা-আনন্দ নিয়ে তারা যে প্রমিস্‌ড ল্যাণ্ডে পদার্পণ করলে সে কি শুধু ধ্বংসের তুমুল অনাচার দেখবার জন্যে ?

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী ঘটেছে ? জলদস্যুরা কি নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড আক্রমণ করেছিলো ? দ্বীপবাসীরা কি বিপদে পড়বার আগেই দ্বীপ পরিত্যাগ করতে পেরেছেন, না আশ্রয় নিয়েছেন অন্যত্র, কোনো নিরাপদ জায়গায় ? জলদস্যুদের হাতেই কি বন্দী হয়েছেন তাঁরা, না আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন ? আর এই ব্যাপারটা কবে ঘটলো ? কয়েকমাস আগে, না কয়েক সপ্তাহ আগে ? কিংবা মাত্র কি দিন কয়েক হ'লো এই বিশ্রী ঘটনাটা ঘটেছে ? যদি সেই ভয়াবহ ধ্বংস-কার্যের সময় *ইউনিকর্ন* দ্বীপে ভিড়ে থাকে, তবে একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে । কিন্তু *ইউনিকর্ন* কি দ্বীপে পৌঁছেছিলো তখন ?

চারদিকে অনুসন্ধান ক'রে তারা সমস্ত ব্যাপারটা মধ্য থেকে একটা সূত্র আবিষ্কার করবার

চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই ঘটনাটির উপর কোনোরকম আলোকপাত করা সম্ভব হ'লো না। হতভম্ব আর ভ্যাবাচাকা সবাই প্রাঙ্গণে ফিরে এলো।

এক্ষুনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা দরকার। ফ্যালকনহার্স্টে থেকেই কি এখন ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির প্রতীক্ষা করা উচিত হবে, নাকি কোনোকিছু না-জেনেই রক-কাসলে চ'লে যাওয়া ভালো? জেমসের এক্তিয়ারে মেয়েদের রেখে অন্যরা কি দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধানের জন্যে বেরিয়ে পড়বে? কিন্তু যে-সিদ্ধান্তই নেয়া হোক না কেন, সবকিছুরই প্রধান ভিত্তি অনিশ্চয়তা। আদৌ কোনো আশা আছে কিনা এখনও তা-ই বা কে জনে?

সকলে মনে-মনে যে-কথা ভাবছিলো, ঠিক সেই কথাটাই মুখ ফুটে বললো ফ্রিৎজ। 'রক-কাসলে যাওয়ার চেষ্টা করাই সবচেয়ে ভালো।'

ফ্রাংক বললে, 'এক্ষুনি রওনা হ'য়ে-পড়া উচিত।'

'হ্যাঁ, সেইটেই সবচেয়ে ভালো।' জন ব্লক বললে, 'সেখানে গিয়ে চারদিক দেখে-শুনে একটা জুতসই সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

কাপ্তেন গুড বললেন, 'কিন্তু তার আগে ম্যানগ্রোভ গাছের উপরে যে ঝোলানো-বাসা আছে, সেইটে আমাদের দেখে নেয়া উচিত। বিশেষ ক'রে ম্যানগ্রোভ গাছের চুড়ো থেকে অনেক দুর পর্যন্ত দেখা যাবে।'

ফ্রিৎজ বললো, 'বেশ, তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখা যাক। ওঠো ব্লক, ওঠো।'

ম্যানগ্রোভ গাছের ঘনসন্নিবিষ্ট শাখা-পত্রের জন্যে আকাশ-বাড়ি তলা থেকে ভালো ক'রে লক্ষ না-করলে সহসা চোখে পড়বার কোনো সম্ভাবনাই নেই। গাছের কোটরের মধ্যে যে-ঘোরানো সিঁড়ি, সেখানে কোনোরকম বিশৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন দেখা গেলো না। বন্ধ ছিলো দুয়ার; ফ্রাংক কৌশলে তার বল্টু খুলে নিলে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তারা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু ক'রে দিলো। গাছের সংকীর্ণ ঘুলঘুলিগুলো দিয়ে আলো আসছিলো ব'লে কোনো অসুবিধেই হচ্ছিলো না। এর পরে তারা বৃত্তাকার ঝোলানো বারান্দায় গিয়ে উঠলো; গাছের পাতায় পর্দার ঢাকা ব'লে তার কোনো চিহ্নই তলা থেকে নজরে পড়ে না। ফ্রিৎজ আর ফ্রাংক তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকলো। আশ্চর্য! সবকিছু যথারীতি নিখুঁতভাবে ছবির মতো সাজানো-গোছানো। এমনকী মসিয়ঁ জেরমাট যে-টেলিস্কোপটি সর্বদা ফ্যালকনহার্স্টে রাখতেন, সেটিকে পর্যন্ত যথাস্থানে পাওয়া গেলো।

দুরবিনটা নিয়ে ফ্রিৎজ আর ব্লক গাছের সবচেয়ে উঁচু শাখাটির উপরে উঠে গেলো, যাতে চারদিক ভালো ক'রে দেখা যায়। না, কোনোদিকেই লোকজনের কোনো চিহ্ন নেই। দক্ষিণ রক-কাসল প'ড়ে আছে পূর্ববৎ; সেখানে মানুষ বাস করে ব'লে মনে হ'লো না এতদূর থেকে। চারদিক দেখে-শুনে মনে হ'লো উভয় পরিবারের কেউই দ্বীপে নেই। অবশ্য, এমনও হ'তে পারে, বোম্বেটের আক্রমণের ভয়ে তাঁরা প্রমিস্‌ড ল্যাণ্ডের কোনো খামার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। কাপ্তেন গুড কিন্তু আরেকটি সম্ভাবনার কথা তুললেন। বোম্বেটে বা জংলি—যারাই নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডে আক্রমণ করুক না কেন, তারা যে ডেলিভারেন্স উপসাগর দিয়ে দ্বীপে এসেছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু এখন যখন তাদের নৌকোর কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না—দুরবিন দিয়ে তন্নতন্ন ক'রে দৃষ্টিপাত করা

সত্ত্বেও—তখন নিশ্চয়ই হামলাবাজেরা ফিরে গেছে। হয়তো তারা দ্বীপবাসীদের নিয়েই চ'লে গেছে।

কাপ্তেন গুডের এই কথার কোনো জবাব দেবার মতো শক্তি কারুই ছিলো না। কীই বা উত্তর আছে? রক-কাসলে যে এখন মানুষ বাস করে তেমন-কোনো চিহ্নই তো দেখা গেলো না। রক-কাসলের চিমনি দিয়ে ধোঁয়ায় চিহ্নমাত্রকেও উঠতে দেখা গেলো না।

আরো-একটি সম্ভাবনার কথা তুললেন কাপ্তেন গুড। 'এমনও তো হ'তে পারে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে *ইউনিকর্ন* ফেরেনি দেখে তাঁরা দ্বীপ পরিত্যাগ করেছেন।'

এই সম্ভাবনাও আছে দেখে ফ্রিৎজের মন আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠলো। কিন্তু তবু সে বলতে বাধ্য হ'লো, 'কিন্তু তাঁরা দ্বীপ পরিত্যাগ করবেন কী ক'রে?'

'হয়তো কোনো জাহাজ এসে দ্বীপে ভিড়েছিলো, সেই জাহাজেই তাঁরা দ্বীপ পরিত্যাগ করেছেন,' বললেন কাপ্তেন গুড।

কাপ্তেন গুডের কথাটি যে একেবারে আজগুবি, এমন কথা কোনো মতেই বলা চলে না। কিন্তু চারদিকের অবস্থা যে-রকম দেখা গেলো, তাতে তাঁরা যে ওই-রকম কোনো পন্থায় দ্বীপ পরিত্যাগ করছেন—তা মনে হ'লো না।

নীরবতা ভাঙলে ফ্রিৎজই; বললে, 'আর আমাদের ইতস্তত করা উচিত হবে না। রক-কাসলে গিয়ে আগে সব দেখে-শুনে নিই।'

ফ্রাংক সায় দিলে, 'হ্যাঁ, তাই ভালো।'

ফ্রিৎজ নিচে নামতে উদ্যত হ'তেই জেনি হঠাৎ তীব্র স্বরে ব'লে উঠলো, 'ধোঁয়া! আমার মনে হ'লো, রক-কাসলের উপরে যেন আমি ধোঁয়া দেখতে পেলুম।'

দূরবিনে চোখ রেখে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করলে ফ্রিৎজ। এক মিনিটেরও বেশি সে ওদিকে তাকিয়ে রইলো। না, জেনি ভুল বলেনি। রক-কাসলের সবুজ গাছপালার উপর পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠছে ধূসর ধোঁয়ার রাশি।

'রক-কাসলে আছেন তবে তাঁরা!' চেঁচিয়ে উঠলো ফ্রাংক, 'এতক্ষণে আমাদের ওখানে পৌঁছে-যাওয়া উচিত ছিলো।'

ফ্রাংকের এই উচ্ছ্বাসের কেউ বাধা দিলে না, যদিও ঐ ধোঁয়া যে মঁসিয় জেরমাটেরই চুল্লির, লুণ্ঠনকারীদের নয়, তা সঠিক বলা কঠিন ছিলো। খুব সাবধানে রক-কাসলে যেতে হবে। বনের মধ্য দিয়ে গাছের আড়াল দিয়ে চলাই সবচেয়ে ভালো।

খানিকক্ষণের মধ্যেই সবাই তৈরি হ'য়ে নিলে। জেনি শুধু একবার বললে যে, 'উভয় পরিবারই যে দ্বীপে আছে, তার প্রমাণ শার্কস-আইল্যাণ্ডে পতাকা উড়ছে, দূরবিন দিয়ে আমি দেখতে পেয়েছি। শাদায়-লালে মেশানো নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের পতাকা।' সত্যিই ব্যাটারির উপরে হালকা হাওয়ায় পতাকাটা উড়ছিলো। অবশ্য পতাকা দেখেই নিশ্চিন্ত ক'রে বলা যায় না যে মঁসিয় জেরমাটরা দ্বীপে আছেন, কেননা পতাকা হয়তো ওখানে সর্বক্ষণই উড়তো। তবে জেনির কথা নিয়ে কেউ তর্ক করলে না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই, রক-কাসলে পৌঁছুবার পর, সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।

'চলো, চলো!' সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালে ফ্রাংক।

ঠিক তক্ষুনি ধীর স্বরে ব্লক বললে, 'থামো! থামো! থামো সবাই!'

ঝোলানো বারান্দার রেলিং ধ'রে ডেলিভারেন্স উপসাগরের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়েছিলো ব্লক। এবার সে ঘন পাতার পর্দা সরিয়ে সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে মাথা বাড়িয়ে উঁকি মারলে, আর পরক্ষণেই সাঁৎ ক'রে মাথা ফিরিয়ে অনলে।

'কী, ব্যাপার কী ?' ফ্রিৎজ শুধোলে।

'জংলি !' উত্তর করলে জন ব্লক, 'অসভ্য বুনোর দল।'

১২

হাঙরের দ্বীপ

এখন অপরাহ্ণ আড়াইটে। গরানগাছের অরণ্য এত নিবিড় যে, সূর্যকিরণ ঋজুভাবে নেমে এলেও সেই অরণ্যে প্রবেশ করতে পারছিলো না। ফ্যালকনহার্স্টের এই আকাশ-বাড়িতে ফ্রিৎজেরা তাই এ-হিশেবে নিরাপদ ছিলো, কেননা একেই তলা থেকে ওখানে দৃষ্টি চলে না, উপরন্তু অসভ্যরা তাদের উপস্থিতি সম্পর্কেও নিশ্চেতন।

পাঁচ-পাঁচটি অর্ধ-উলঙ্গ জংলি তীরধনুক হাতে পথ দিয়ে আসছিলো। দেখে বোঝা গেলো তারা অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাংশের অধিবাসী। নিশ্চিন্ত মনে আসছিলো তারা। প্রমিস্‌ড ল্যাণ্ডে অন্য-কারু উপস্থিতি তারা কল্পনাও করেনি।

কিন্তু মঁসিয় জেরমাটদের কী হ'লো ? তাঁরা কি জংলিদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছেন ? না, বন্দী হ'য়ে আছেন জংলিদের হাতে ? এই পাঁচজনই নিশ্চয়ই দ্বীপে-এসে-নামা সমস্ত জংলি নয় ; জংলিদের সংখ্যা যে এর বহুগুণ বেশি, সে-সম্পর্কে কোনো সন্দেহই নেই। কেননা সংখ্যায় কম হ'লে জেরমাটদের সঙ্গে জংলিরা এঁটে উঠতে পারতো না। নিশ্চয়ই বড়োশড়ো একটি জংলির দল অনেকগুলি ক্যানুতে ক'রে নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছে। জংলিরা যে সদলে এখনো দ্বীপে আছে, তাতেও কারু কোনো সন্দেহ রইলো না। কিন্তু মঁসিয় জেরমাটরা এখন তবে কোথায় ? রক-কাসলে বন্দী ? অন্য-কোনোখানে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষায় তৎপর ? না কি, জংলিদের নির্মম অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন ?

আশার একটু আলোও কারু চোখে পড়লো না। বিহ্বল হ'য়ে পড়লো সবাই, হতচকিত। শুধু কাপ্তেন গুড আর জন ব্লক তাকিয়ে রইলেন জংলিগুলো কী করে দেখবার জন্যে।

জংলিরা আস্তে-আস্তে ফ্যালকনহার্স্টের বেড়ার এসে দাঁড়ালে। দুজন দাঁড়িয়ে রইলো ফটকের কাছে, বাকি তিনজন ঢুকলো উঠোনে। বাঁ-দিকের একটি আউট-হাউসে ঢুকে তারা কিছুক্ষণ বাদে মাছ ধরবার সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে এলো। তাদের রকমসকম দেখে বোঝা গেলো ইতিমধ্যেই জায়গাটি তাদের বেশ চেনাজানা হ'য়ে গেছে। যে-পথ দিয়ে তারা এসেছিলো, মাছ ধরবার সরঞ্জাম নিয়ে সেই পথেই আবার তারা ফিরে চললো। একটু বাদেই তারা বাঁ-দিকের পথ বেঁকে ঘুরে দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলো। সম্ভবত তীরে নৌকো আছে তাদের ; হয়তো প্রায়ই তারা ফ্যালকনহার্স্টের কাছে এসে মাছ ধরে।

কাপ্তেন গুড আর জন ব্লক যখন পাহারায় ব্যস্ত, ফ্রিৎজ তখন অন্যদের একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলো। সমস্ত আশাভরসা এখনও হয়তো বিনষ্ট হয়নি। হয়তো দূরে থাকতেই জংলিদের নৌকোগুলো চোখে পড়েছিলো জেরমাটদের ; হয়তো তাঁরা অন্য-কোনো খামারে গিয়ে আশ্রয় নেবার উপযুক্ত সময় হাতে পেয়েছিলেন। পার্ল উপসাগরের কাছে যে-অরণ্য আছে, হয়তো তার মধ্যেই আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। জংলিরা হয়তো উপকূল ছেড়ে অন্য কোথাও যায়নি, কেননা এবেরফুট থেকে আসার সময় জংলিদের চলাফেরার কোনো চিহ্নই তাদের চোখে পড়েনি।

এমনও অবশ্য হ'তে পারে যে, মঁসিয় জেরমাটরা জংলিদের হাতে পড়েছিলেন, কিন্তু জংলিরা তাদের হত্যা না-ক'রে রক-কাসলে বন্দী ক'রে রেখেছে। কেননা রক-কাসলের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখেছে সবাই।

প্রথমে ঠিক হ'লো সবাই মিলে রক-কাসলে যাবে, কিন্তু ফ্রিৎজ বাধা দিলে। সে বললে, 'অন্ধকার নামুক আগে, রাতের বেলায় দু-তিনজন চুপিসাড়ে আগে গিয়ে রক-কাসলের খবর নিয়ে আসুক, তারপর সবাই মিলে যাওয়া যাবে। কেননা, দিনের বেলায় জংলিদের চোখ এড়িয়ে কোথাও যাবার চেষ্টা করাটা নিছকই পাগলামি হবে।' সারা দিন অপেক্ষা ক'রে রাত্রি এলে, ফ্রাংক আর জন ব্লক ফ্যালকনহার্স্ট পরিত্যাগ ক'রে রক-কাসলের দিকে রওনা হবে ব'লে ঠিক হ'লো। ঝোপ-জঙ্গলে মধ্য দিয়ে গা-ঢেকে যাওয়াটাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, কেননা সোজা পথ ধ'রে গেলে জংলিদের চোখে পড়বার বিষম সম্ভাবনা। সাঁৎরে 'জ্যাকেল রিভার' পেরিয়ে, অন্ধকারে গা-ঢেকে, রক-কাসলের কাছে গিয়ে তারা পাচিল ডিঙিয়ে জানলা দিয়ে ভিতরে ঢুকবে ব'লে ঠিক হ'লো। জানলা দিয়ে না-ঢুকলেও অবশ্য চলে। ভিতরে তাকালেই বোঝা যাবে মঁসিয় জেরমাটরা রক-কাসলে বন্দী কিনা। যদি দেখা যায় তাঁরা ওখানে নেই, তাহ'লে তক্ষুনি দুজনে ফ্যালকনহার্স্টে ফিরে আসবে। কেননা, তাহ'লে রাত্রির অন্ধকারেই সবাই মিলে শুগারকেন-গ্রোভের অরণ্যে গিয়ে আশ্রয় নেবে।

রক-কাসলে না থাকলে মঁসিয়ে জেরমাটরা শুগারকেন-গ্রোভে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন।

ঘণ্টা যে এত দীর্ঘ হ'তে পারে, এ-কথা কেউ এর আগে কল্পনাও করেনি। ছোট্ট একটি নৌকোয় ক'রে অজানা সমুদ্র পাড়ি দেবার সময় কিংবা টার্টল উপসাগরের তীরে থাকবার সময়ে পর্যন্ত সময়কে এত দুর্বহ ব'লে মনে হয়নি কারু।

আস্তে-আস্তে বিকেল ফুরোতে লাগলো। সবার মন ভ'রে উঠলো অস্বস্তিতে। সবসময়েই গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে উঠে কেউ-না-কেউ পাহারায় ব্যস্ত রইলো। জংলিরা ফ্যালকনহার্স্টের আশপাশে আছে, না রক-কাসলে ফিরে গেছে, এটা সঠিক জানবার জন্যে সবাই উদ্বিগ্ন হ'য়ে ছিলো। কিন্তু দক্ষিণদিকে, জ্যাকেল রিভারের মুখের কাছে, পাথরের আড়াল থেকে আকাশগামী ধোঁয়ার সর্পিল রেখা ছাড়া আর কিছুই কারু নজরে পড়লো না।

বিকেল চারটে পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য এমন-কিছুই ঘটলো না, যা অবস্থার বদল সূচিত করে। সবাই খাওয়া দাওয়া ক'রে নেবার জন্য প্রস্তুত হ'লো। হয়তো আজ রাতে দীর্ঘ পথচলায় ব্যস্ত থাকতে হবে—হয়তো রওনা হ'তে হবে শুগারকেন-গ্রোভের উদ্দেশে।

এমন সময় আচমকা একটা তীব্র আওয়াজ শুনতে পেলে সকলে।

বিস্মিত জেনি প্রশ্ন করলে, 'কীসের শব্দ ওটা ?'

ফ্রিৎজ দ্রুতপদে একটি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ।

'বন্দুকের শব্দ না ?' ফ্রাংক শুধোলে ।

জন ব্লক বললে, 'নির্ঘাৎ বন্দুকের শব্দ ।'

ফ্রিৎজ জিগেস করলে, 'কিন্তু এখানে বন্দুক চালালে কে ?'

'দ্বীপের কাছাকাছি কোনো জাহাজ থেকে কি ছুঁড়লো ?' জেমস সম্ভাবনার কথা তুললেন ।

জেনি বললে, *ইউনিকর্ন* হ'তে পারে !'

'তাহ'লে জাহাজটি নিশ্চয়ই দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়েছে ।' জন ব্লক বললে, 'কারণ বন্দুকের শব্দটার উৎপত্তি খুব বেশি দূরে হয়নি ।'

'এখানে এসো, এখানে এসো !' উত্তেজিত গলায় অলিন্দ থেকে ফ্রিৎজ চেঁচিয়ে উঠলো ।

'আমাদের হুঁশিয়ার থাকা উচিত ।' কাপ্তেন গুড সবাইকে সাবধান ক'রে দিলেন, 'নইলে আমাদের দেখে ফেলবে ।'

প্রত্যেকে উদ্গ্রীব চোখে সমুদ্রের দিকে তাকালে । কোনো জাহাজ চোখে পড়লো না । শব্দটার উৎপত্তি এত কাছে হয়েছিলো যে, হোয়েল আইল্যাণ্ডের কাছাকাছি কোনোখানে ছাড়া অন্যত্র তার উৎপত্তিস্থল হ'তে পারে না । শুধু দেখা গেলো, দুজন জংলি আরোহীসমেত একটি ক্যানু চালিয়ে উন্মুক্ত সমুদ্র থেকে দ্রুতবেগে ফ্যালকনহার্স্টের তীর লক্ষ্য ক'রে আসছে ।

'অসভ্য দুটো অমন ক'রে পাগলের মতো ছুটে আসবার চেষ্টা করছে কেন ? ফ্রাংক জিগেস করলে, 'ওদের কি কেউ তাড়িয়ে নিয়ে আসছে ?'

ফ্রাংকের কথা শেষ হবার আগেই আনন্দ আর বিস্ময়মিশ্রিত একটি চীৎকার ক'রে উঠলো ফ্রিৎজ । শাদা ধোঁয়ার মাঝখানে উজ্জ্বল একটি আলোর ঝিলিক তার নজরে পড়লো, সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেলো তুমুল-একটি অগ্ন্যুদ্গারের আওয়াজ : একটি অগ্নিগোলক বিদ্যুৎবেগে এসে পড়লো সমুদ্রে, লাফিয়ে উঠলো ঢেউ, লাফিয়ে উঠলো জলস্তম্ভের আকারে —ক্যানুটির কাছ থেকে কয়েক হাত মাত্র দূরে । ক্যানুটি তখন পুরোদমে ছুটে আসছিলো ফ্যালকনহার্স্টের দিকে ।

'ওইখানে ! ওইখানে !' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো ফ্রিৎজ, 'সবাই ওইখানে আছেন— ওই শার্কস আইল্যাণ্ডে !'

ফ্রিৎজ মিথ্যে বলেনি । ওই শার্কস্ আইল্যাণ্ড থেকেই দু-বার অগ্ন্যুদ্গার ঘটেছে জংলিদের ক্যানুকে লক্ষ্য ক'রে । নিঃসন্দেহে দ্বীপবাসিরা হাঙরের দ্বীপের ব্যাটারিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । অসভ্যরা যে ওই দ্বীপের কাছে যেতে সাহস করেনি, তা এই ব্যাপারেই পরিষ্কার বোঝা গেলো । ব্যাটারির উপরে তখন নিউ-সুইৎজারল্যান্ডের শাদা ও লাল রঙের পতাকা উড়ছিল : দ্বীপের সর্বোচ্চ চূড়োয় যে এখন ব্রিটিশ পতাকা উড়ছে, তা তো আগেই বলা হয়েছে ।

হতাশার অন্ধকারের মধ্যে তীব্রভাবে আশার আলো ঝলসে উঠতেই রক-কাসলে যাওয়ার পরিকল্পনা তখনি বাতিল ক'রে দেয়া হ'লো । ফ্যালকনহার্স্ট থেকে এখন কেবল একটিমাত্র জায়গায়ই যাওয়া চলে, সেটি হ'লো শার্কস্ আইল্যাণ্ড বা হাঙরের দ্বীপ । কী ক'রে

তারা সেখানে গিয়ে পৌঁছবে—তা তারা কেউ জানে না ; কিন্তু এটা তারা সবাই জানে যে, যে-ভাবেই হোক না কেন, এবার হাঙরের দ্বীপে যেতে হবে । ইতিমধ্যে পিস্তল ছুঁড়ে কিংবা পতাকা উড়িয়ে হাঙরের দ্বীপের সঙ্গে সাংকেতিক যোগাযোগ করা সম্ভব নয়, কেননা তাহ'লে জংলিরা তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে যাবে । বরং তারা যাতে কিছুতেই আগন্তুকদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন না-হ'তে পারে, সেইদিকে সজাগ নজর রাখাই সংগত । একবার যদি অসভ্যরা জানতে পারে যে, দ্বীপে অন্য অধিবাসী আছে, তবে রক কাসল থেকে এসে একযোগে সবাই মিলে তাদের আক্রমণ ক'রে বসবে ।

ফ্রিৎজ মন্তব্য করলে, 'আমাদের অবস্থা এখন রীতিমতো ভালো । এমন ভালো অবস্থা যাতে নষ্ট না-হয়, সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ।'

কাপ্তেন গুড দিলেন, 'আমিও সে-কথা বলতে চাচ্ছিলুম । জংলিরা যখন এখনও আমাদের কথা জানে না, তখন কোনো মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে খামকা ওদের মুখোমুখি হওয়া উচিত হবে না । কিছু করবার আগে রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমাদের উচিত ।'

জেনি জিগেস করলে, 'আমরা কী ক'রে শার্কস্ আইল্যাণ্ডে যাবো ।?'

ফ্রিৎজ্ বললে, 'বাবা নিশ্চয়ই বড়ো নৌকোটায় ক'রে ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠেছেন । আমি সাঁতার কেটে সেখানে গিয়ে নৌকোটা নিয়ে আসবো—তাহ'লেই যাবার একটা সুব্যবস্থা হবে ।'

জেনি প্রতিবাদ না-ক'রে পারলে না । 'সমুদ্রে সাঁতার কাটবে তুমি ? পাগল হ'লে নাকি ?'

'এ-তো একটা সামান্য বাপার ।'

জন ব্লক বললে, 'অসভ্যদের ক্যানুটা সম্ভবত তীরেই পাবো আমরা । সেটাকে কাজে লাগালেই হয় ।'

সন্ধে নামলো । অন্ধকার নামলো ঘন হ'য়ে, আর প্রায় আটটার সময় সবাই প্রস্তুত হ'তে লাগলো যাত্রার জন্যে । ঠিক ছিলো ফ্রিৎজ, ফ্রাংক আর ব্লক প্রথমে নিচে উঠোনে নেমে যাবে । কাছাকাছি কোথাও জংলিরা আছে, কিনা সেটা তারা দেখে আসবে আগে, তারপরে যাবে তীরের দিকে । কাপ্তেন গুড, জেমস য়ুলস্টোন, জেনি, ডলি, সুসান আর বব গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাদের সংকেতের অপেক্ষা করবে ।

তারা তিনজন সিঁড়ি বেয়ে নিচে এলো । কোনো লণ্ঠন তারা জ্বাললে না । আলো দেখলে জংলিরা সব টের পেয়ে যাবে, আর তাহ'লেই সব মাটি !

নিচে কেউ ছিলো না, কেউ না । না আউট-হাউসের ঘরবাড়িতে, না উঠোনে । ফ্রিৎজদের প্রথম কর্তব্য হ'লো চারদিকে অনুসন্ধান ক'রে দেখা, দিনের বেলায় যারা এসেছিলো, তারা রক-কাসলে ফিরে গেছে, না সমুদ্রতীরের ক্যানুটির আশপাশে আছে ।

এত সতর্কতার প্রয়োজন ছিলো । ফ্রিৎজ আর ব্লক এগিয়ে গেলো তীরের দিকে, আর ফ্রাংক উঠোনের কাছে ফটকের সামনে পাহারায় দাঁড়িয়ে রইলো : যদি হঠাৎ কোনো বিপদ দেখা দেয় তো দৌড়ে যাতে ভিতরে ঢুকতে পারে, সেইজন্যে তৈরি হ'য়েই থাকলো সে ।

গাছের আড়াল দিয়ে অন্ধকারে গা ঢেকে ফ্রিৎজ আর ব্লক সাবধানী পায়ে এগিয়ে গেলো । নিরাপদেই সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছুলো তারা । সমুদ্রসৈকত তখন পরিত্যক্ত, নির্জন ।

পুবদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেউ কোথাও নেই। রক-কাসল কিংবা ডেলিভারেন্স উপসাগরের দিকেও আলোর কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না। সমুদ্রের মধ্যে থেকে—বেশ-কিছুটা দূরে—একটি বিরাট পাহাড় জল থেকে শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সেইটেই হ'লো শার্কস্ আইল্যাণ্ড। বেলাভূমি ধ'রে অল্প এগিয়েই তারা দেখতে পেলে একটি ক্যানু তীরে বালির উপর উপুড় ক'রে রাখা। আনন্দে তাদের মন নৃত্য ক'রে উঠলো। এই ক্যানুটিকে লক্ষ্য ক'রেই শার্কস্ আইল্যাণ্ড থেকে অগ্ন্যুদ্গার ঘটেছিলো ; ভাগ্যিশ গোলাটা লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি !

ক্যানুটি ছোটো। জংলিরা যেমনভাবে বানায় তেমনিভাবেই তৈরি। ছ-সাতজন মাত্র আঁটে তাতে। ববকে নিয়ে ফ্রিৎজরা দলে আটজন। কোনোরকমে জড়োশড়ো হ'য়ে সবাইকে ক্যানুতে উঠতে হবে, এছাড়া আর-কোনো উপায় নেই। এই বিপজ্জনক অবস্থায় দু-বার পাড়ি দেয়া যায় না, কাজেই একটু কষ্ট করতেই হবে সবাইকে।

তারা তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। ফ্রাংক উঠোনে দাঁড়িয়ে তাদের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো, সুখবর শুনে সে একেবারে লাফিয়ে উঠলো !

সাড়ে ন-টার সময় সবাই সন্তর্পণে রওনা হ'য়ে পড়লো। নিস্তব্ধ রাত্রি, কোথাও সন্দেজনক কিছু নেই ; তবু তারা গাছের আড়াল দিয়েই গেলো সারা রাস্তা।

সবাই নৌকোয় উঠলে পর ফ্রিৎজ আর ফ্রাংক বৈঠা হাতে নিলে। ঘন অন্ধকার চারদিকে, চাঁদ ওঠেনি। কেবল জোয়ারের ছলোচ্ছল আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জোয়ার ছিলো ব'লেই শার্কস্ আইল্যাণ্ড অভিমুখে নৌকো চালাতে কোনো অসুবিধে হ'লো না। অন্ধকার ব'লে একটা সুবিধে হয়েছে—জংলিরা তাদের দেখতে পাবে না। কিন্তু অসুবিধেও একটি আছে। ব্যাটারিতে নিশ্চয়ই কেউ-একজন পাহারায় আছে ; ফ্রিৎজদের জংলি মনে ক'রে সে গুলি চালিয়ে বসতে পারে। এবং সত্যিই, নৌকো যখন শার্কস্ আইল্যাণ্ড থেকে কয়েকগজ মাত্র দূরে, তখন হঠাৎ তীরে তীব্র আলো জ্ব'লে উঠলো, আর আলোর নিচে দেখা গেলো কতগুলি বন্দুকের নল।

তখনই অসভ্যরা শুনতে পেলো-কি-না-পেলো সে-খেয়াল না-ক'রে ব্লক আর ফ্রাংক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো : 'গুলি চালিয়ো না ! গুলি চালিয়ো না। আমরা বন্ধু ! আমি ফ্রাংক !'

১৩

সর্বনাশের ডাক

কয়েক মিনিট পরেই সকলে দ্বীপের মাঝখানের স্টোর-হাউসটায় মিলিত হ'লো। স্টোর-হাউসের প্রায় পাঁচশো ফিট দূরের ব্যাটারিতে তখন নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের পতাকা পৎপতিয়ে

উড়ছে হাওয়ায় । ঈশ, কতদিন বাদে কত বিপদ-আপদ পেরিয়ে দেখা ! আনন্দের যেন বন্যা ব'য়ে গেলো স্টোর-হাউসে ।

প্রথম উচ্ছ্বাসটুকু ক'মে যাবার পর গত পনেরো মাসের ঘটনাবলির আদান-প্রদান হ'লো সকলের মধ্যে । অবশ্য অতীতের ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামানোর চাইতে বর্তমানের ভাবনাই তখন প্রবলভাবে প্রধান । কেননা, যদিও দীর্ঘ দেড় বছর পরে, উভয় পরিবার আবার সম্মিলিত হয়েছে, তবু পারিপার্শ্বের এখন যা অবস্থা, তাতে সর্বনাশের বিকট সম্ভাবনা । যদি-না বাইরে থেকে কোনো-রকম সাহায্য আসে, তাহ'লে—রসদ ফুরিয়ে গেলে—হয় জংলিদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নয়তো অনাহারে মৃত্যুবরণ ক'রে নিতে হবে । কিন্তু বাইরে থেকেই বা সাহায্য আসবে কী ক'রে ? সুতরাং সামনে কেবল আছে শোচনীয় একটিই অবস্থা ।

প্রথমে ফ্রিৎজ খুবই সংক্ষেপে আরোহীদের দুর্দশার কাহিনী বিবৃত করলে । তারপর বললে কী ক'রে গাছের আড়াল থেকে তারা বুনোদের দেখেছে । সব ব'লে সে শুধোলে, 'হ্যাঁ ভালো কথা । একটা কথা জানতে চাচ্ছি আমি : বুনোরা আড্ডা জমিয়েছে কোথায় ?'

জেরমাট উত্তর করলেন, 'রক-কাসলে ।'

'কতজন আছে ওদের দলে ? আন্দাজ ?'

'কম ক'রেও একশোজন তো হবেই । পনেরোটি ক্যানুতে ক'রে এসেছে ওরা । খুব সম্ভব অস্ট্রেলিয়ার উপকূল থেকে ।'

জেনি বললে, 'ওদের হাত থেকে যে সকলে অন্তত প্রাণে বাঁচতে পেরেছি, সেজন্যই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ।'

'অবশ্যই ধন্যবাদ ।' জেরমাট উত্তর দিলেন, 'ডেলিভারেন্স উপসাগরের মুখে ওদের ক্যানু দেখেই আমরা শার্কস্-আইল্যাণ্ডে এসে আশ্রয় নিই যাতে ওদের আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে পারি ।'

ফ্রাংক বললে, 'তোমরা যে এখানে আছো, অসভ্যরা এখন সে-কথা জানে ?'

'হ্যাঁ, তা জানে । কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখনও ওরা এই দ্বীপে এসে উঠতে পারেনি ।' খুব সংক্ষেপে গোড়ার কথাগুলি বর্ণনা করলেন জেরমাট ।

প্রখর ঋতু ফিরে এলে পর, যখন মন্টরোজ নদী আবিষ্কৃত হয়েছিলো, তখন মিস্টার য়ুলস্টোন, আর্নেস্ট আর জাক গিয়ে 'জাঁ-জেরমাট-পীকে' ইংলিশ পতাকা প্রোথিত ক'রে আসেন । *ফ্ল্যাগের* পরিত্যক্ত আরোহীরা তার দশ-বারোদিন পরে দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে এসে নৌকা ভিড়োয় । যদি জাকরা পাহাড়ের অপর পাদদেশ পর্যন্ত অভিযান চালাতো, এবং দিন কয়েক ওখানে থাকতো, তাহ'লে কাপ্তেন গুডকে সেখানে দেখতে পেতো । কিন্তু ওরা সেই মরুর মতো পাহাড়ি এলাকাটায় আর বেশিদূর না-এগিয়ে ফিরে আসে ।

বাচ্চা হাতি ধরবার দুঃসাহস নিয়ে রওনা হ'য়ে জাক কী ক'রে অসভ্যদের হাতে বন্দী হয়েছিলো, সে-ঘটনাও আগাগোড়া বিবৃত করা হ'লো । অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জংলিদের হাত থেকে পালিয়ে সে যখন একটি গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে ফিরে এসেছিলো, তখন সকলে এই আকস্মিক বিপদের পূর্বাভাসে অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন । রক-কাসলকে যাতে জংলিদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, তার যথোচিত ব্যবস্থা

ক'রে সবাই চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগলেন। নিরাপদেই তিনমাস অতিক্রান্ত হ'লো। কিছুই ঘটলো না, বুনোরা এলো না। মনে হ'লো, তারা হয়তো চিরকালের জন্যে দ্বীপ ছেড়ে চ'লে গিয়েছে। বুনোদের আশঙ্কা যদিও খানিকটা কমলো, অন্যদিকে তেমনি আরেকটি উদ্বেগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সেপ্টেম্বর কি অক্টোবরের মধ্যে যে-*ইউনিকর্নের* আসার কথা, তার কোনো চিহ্নই আশপাশের সমুদ্রে দেখা গেলো না। *ইউনিকর্ন* আসছে কিনা দেখবার জন্যে খামকাই জাক মাঝে-মাঝে গিয়ে প্রস্‌পেক্ট-হিল-এ উঠতো।

'জাঁ-জেরমাট-পীক' থেকে জাকরা যে-ত্রিমাস্তুল জলপোতটি সমুদ্রে দেখেছিলো, সেটি *ফ্ল্যাগ* ছাড়া অন্য-কোনো জাহাজ হতে পারে না। দ্বীপের কাছাকাছি এসে ত্রিমাস্তুলটি একটু থামে, তারপর সুন্দা সমুদ্র দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে পাড়ি জমায়।

১৮১৭ সালের শেষের সপ্তাহগুলো হতাশায় আঘাতে বিপর্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলো। দেড় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, অথচ *ইউনিকর্নের* কোনো সংবাদই নেই। *ইউনিকর্নের* প্রত্যাবর্তনের আশা পরিত্যাগ করেছিলো সবাই। 'কোনো অভাবিত দুর্ঘটনা ঘটেছে নিশ্চয়ই'—এই আশঙ্কায় সবাই কাতর হ'য়ে পড়েছিলো। কারু মনেই এককণা ভরসাও আবশিষ্ট ছিলো না। সবই যেন হতাশায় ভ'রে গিয়েছিলো। *ইউনিকর্ন* মধ্যসমুদ্রে ডুবে গেছে, সেই সম্পর্কে কোনো সংশয়ই আর তাদের ছিলো না।

এই হতাশায় মধ্যেই এলো ১৮১৮। আবহাওয়া চমৎকার : প্রসন্ন সূর্যলোক, মন্থর বাতাস, আর গাঢ় নীল আকাশ। আবহাওয়ার প্রভাবে মনের ভিতরে ক্ষীণ একটু আশাও জাগলো : হয়তো-বা কিছুই বিনষ্ট হয়নি, হয়তো-বা কোনো বিশেষ কারণে আরোহী সমেত *ইউনিকর্ন* ইওরোপে আটকা প'ড়ে গেছে। এই জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহেই অকস্মাৎ মসিয়ঁ জেরমাটের চোখে পড়লো, অনেকগুলো ডিঙিনৌকোয় ক'রে একদল জংলি ডেলিভারেন্স উপসাগরের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের এই আবির্ভাব অবশ্য কোনো বিস্ময়ের সৃষ্টি করলো না, কেননা, ইতিপূর্বে জাক তো জংলিদের হাতে একবার বন্দী হয়েছিলো, আর তখনই তো জংলিরা জানতে পেরেছিলো যে দ্বীপটি একেবারে নির্জন নয়। দূর থেকে দেখে মনে হ'লো জংলিদের দলে কম ক'রেও একশোজন লোক আছে। এত লোককে বাধা দেয়া দ্বীপবাসীদের পক্ষে নিতান্ত সহজ কাজ নয়, বরং মারাত্মক বিপদেরই সম্ভাবনা। তাই তখনই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, রক-কাসলের বাস উঠিয়ে শার্কস্ আইল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে, কেননা সেখানকার ব্যাটারিতে দুটো কামান আছে। সেই কামানের সাহায্যে অন্তত কিছুক্ষণ তো প্রতিরোধ করা যাবে জংলিদের ; চাই-কি, হয়তো হেরেও যেতে পারে জংলিরা।

জংলিদের ডিঙি-নৌকোগুলোর গতি দেখে বোঝা গেলো, দু-ঘন্টার মধ্যেই তারা ডাঙায় এসে পৌঁছুবে। সুতরাং খুব তাড়াতাড়ি শার্কস্ আইল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নেয়া দরকার। সেখানকার স্টোর-হাউসে কয়েক মাসের উপযোগী খাবার আছে, তার উপর ফলমূল পাওয়া যাবে, অ্যান্টিলোপ ইত্যাদিও শিকার করা যাবে। সুতরাং খাদ্যের ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিন্ত। যদি জংলিরা সবাই মিলে শার্কস্ আইল্যাণ্ড আক্রমণ করে, তাহ'লে হয়তো দুটো কামানের সাহায্যেই তাদের ধ্বংস ক'রে ফেলা যাবে। জংলিরা অবশ্য সন্দেহাতীতভাবেই কামানের সারমর্ম জানে না, কামানের গর্জন শুনে সম্ভবত তাদের মধ্যে ভয়ের হুড়েহুড়ি প'ড়ে যাবে। দুটো কামান আর বন্দুকের একটানা অগ্ন্যুদ্‌গারের সামনে জংলিরা বেশিক্ষণ থাকতে পারবে

ব'লেও মনে হয় না। কিন্তু, তবু যদি কোনোমতে ওদের অর্ধেকও শার্কস্ আইল্যাণ্ডে অবতরণ করতে পারে, তবে আর কেনোমতেই রেহাই নেই।

একমুহূর্তও নষ্ট করবার মতো ছিলো না। রসদপত্র গুলিবারুদে নৌকো বোঝাই ক'রে মসিয়ঁ আর মাদাম জেরমাট, মিস্টার আর মিসেস য়ুলস্টোন, আর্নেস্টি আর হ্যানা কুকুর দুটিকে নিয়ে নৌকোয় চ'ড়ে বসলো! জাক নৌকো চালিয়ে জ্যাকেল রিভার পার ক'রে দিলো। শুধু পোষমানা জন্তুগুলো রক-কাসলে থেকে গেলো; তাদের জন্যে ভাবনা নেই, তারা নিজেরাই নিজেদের খাবার জোগাড় ক'রে নিতে পারবে।

ব্যাটারিতে পৌঁছেই হাতিয়ারগুলো শানিয়ে রাখলেন সকলে। জংলিরা তখন হোয়েল আইল্যাণ্ড থেকে বেশি দূরে নেই। সবাই জংলিদের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে থাকলেন, কিন্তু জংলিরা আক্রমণ করলো না। তারা ডাঙায় নেমে প্রথমে ক্যানুগুলোকে নিরাপদ জায়গায় রাখলে, তারপর এগিয়ে গেলো রক-কাসলের দিকে।

এই হ'লো আগাগোড়া ব্যাপার। পক্ষকাল অতিক্রান্ত হ'তে চললো, জংলিরা রক-কাসল দখল ক'রে ব'সে আছে। রক-কাসল থেকে খুব কমই বেরিয়েছে তারা। অবশ্য ফ্যালকনহার্স্টে অন্যরকম ব্যাপার ঘটেছিলো, ব্যাটারির ছোট্ট গোল টিলাটির চূড়োয় উঠে মসিয়ঁ জেরমাট তাদের ঘর-দুয়ার ও ভাঁড়ারঘরগুলো তছনছ করতে দেখেছেন।

হালচাল আপাতত এইরকম থাকলেও কথাটি অবোধ্য ছিলো না যে জংলিরা কোনো-না-কোনো মুহূর্তে শার্কস্ আইল্যাণ্ডে দ্বীপবাসীদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করবেই। কয়েকবার ক্যানুতে ক'রে কয়েকটি জংলি শার্কস্ আইল্যাণ্ডে আসবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু জাক আর আর্নেস্টের তুমুল গুলিবর্ষণে তারা তখনকার মতো ফিরে গিয়েছে। কিন্তু যখনই দ্বীপে মানুষের অস্তিত্ব আছে ব'লে জংলিরা নিঃসন্দেহ হয়েছে তখন থেকেই দিনরাত্রি পাহারা দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে হামলা চালাতে পারে জংলিরা। বিশ্বাস নেই তাদের। এখন একমাত্র ভরসা হ'লো ব্যাটারির ছোটো টিলাটির উপরে প্রোথিত পতাকাটি। যদি ওটা দেখে কোনো জাহাজ নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডে এসে নোঙর ফ্যালে।

১৪

ভয় যাদের পিছু নিয়েছে

চব্বিশে জানুয়ারি শেষরাত্রি কথাবার্তাতেই কেটে গেলো। এত-কথা তাদের বলবার ছিলো যে ঘুমুবার কথা তাদের মনেই এলো না। অবশ্য শুধু ছোট্ট বব ব্যতিক্রম। কিন্তু তাই ব'লে সূর্যোদয় পর্যন্ত তাদের কড়া পাহারা একটুও শিথিল হ'লো না। বন্দুক-কামানে গুলি ভ'রে সবাই চরম মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে ছিলো।

ভোরবেলায় নানা কাজে তৎপর হ'য়ে পড়লো সকলে। হয়তো কয়েক সপ্তাহ—এমনকী হয়তো, একমাসেরও বেশি সময়—সবাইকে শার্কস্ আইল্যাণ্ডে থাকতে হবে। স্টোর-হাউসে অনায়াসে পনেরোজন থাকতে পারে। গ্রীষ্মকাল ব'লে দিন আর রাত্রি এমনিতেই বেশ গরম; সুতরাং মেয়েদের বিছানা ছেড়ে দিয়ে পুরুষেরা অনায়াসেই শুকনো ঘাসে শুতে পারবে। এছাড়া রসদ সম্পর্কেও আপাতত ভয়ের কোনো কারণ নেই। স্টোর-হাউসে যা খাবার আছে, তাতে অনায়াসেই মাস ছয়েক কেটে যাবে। একমাত্র যে-জিনিশের টান প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা, তা হ'লো গুলিবারুদ। আর এই সম্ভাবনাটিই সবচেয়ে মারাত্মক। গুলিবারুদের যদি অভাব হয়, তাহ'লে অতগুলো জংলিকে বাধা দেয়া একেবারেই অসম্ভব হবে। যদি জংলিরা বারবার হামলা করে, তবে গুলিবারুদ হয়তো নিঃশেষ হ'য়ে যাবে, তারপর বিনা প্রতিরোধেই বরণ ক'রে নিতে হবে বিনাশ। তবে সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। আপাতত সবাই যাতে স্বচ্ছন্দে কিছুকাল এখানে থাকতে পারে, তার ব্যবস্থায় উঠে-প'ড়ে লাগাটাই উচিত।

দ্বীপের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান ছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত। সেখানেই ব্যাটারি-টিলার অবস্থিতি। সেদিকটায় বিশাল মাপের বহু চোখা এবড়ো-খেবড়ো পাথরের চাঁই থাকায়, সেদিকে নৌকো ভিড়োনো জংলিদের পক্ষে অসম্ভব। অন্য সবখানেই অবশ্য জংলিদের পক্ষে সেইকাজ তুলনায় অনেকটাই সহজসাধ্য। সুতরাং অন্য সবখানেই কড়া পাহারার দরকার হ'য়ে পড়েছিলো।

এখানে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা উচিত। উভয় পরিবার দ্বীপে এসে আশ্রয় নেবার পর হঠাৎ একদিন অ্যালবাট্রসটি উড়ে আসে। বলা বাহুল্য, জাঁ জেরমাট চুড়ো থেকে। অ্যালবাট্রসটি এলে পর তার পায়ে বাঁধা সেই পুরোনো ন্যাকড়ার ফালিটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। অ্যালবাট্রসটিকে সহজেই ধরতে পেরেছিলো জাক, কিন্তু এবারে সে জাককে কোনো নতুন খবরই দেয়নি।

কথায়-বার্তায় হঠাৎ আরেকটি অলক্ষিত সম্ভাবনাও সকলের মনে উঁকি দিয়ে গেলো। *ইউনিকর্নের* বারুদ-বোঝাই তিনটি পিপে রক-কাসলের গহ্বরটিতে রেখে দেয়া হয়েছিলো। তাড়াতাড়ি রক-কাসল ছেড়ে চ'লে আসার দরুন তার কথা জেরমাটদের আর মনে পড়েনি। জংলিরা যদি সেই বারুদের সন্ধান পায়, তাহ'লে সর্বনাশ। কেননা, তারা বারুদের ব্যবহার জানে না ব'লে যে-কোনো সময় বিস্ফোরণ ঘ'টে রক-কাসল একেবারে উড়ে যেতে পারে। তাতে অবশ্য জংলিদেরও নিধন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু রক-কাসলের এইরকম নিদারুণ ধ্বংস নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর কথা। কোনো সন্তোষজনক পরিকল্পনা মাথায় এলো না ব'লে ব্যাপারটি নিয়ে কেউ আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করলে না। বরং ঠিক হ'লো পালা ক'রে একেকবার একেকজন ব্যাটারির চুড়োয় উঠে পাহারা দেবে।

তারপর কেটে গেলো ঘটনাশূন্য চারটি দিন। সারা দিন ধ'রে সতর্ক চোখে দ্বীপ পাহারা দেয়া ছাড়া তাদের আর-কিছুই করবার ছিলো না। সময় আর কাটতে চাচ্ছিলো না যেন; প্রতিটি মুহূর্তকেই মনে হচ্ছিলো দীর্ঘ বৎসরের মতো।

তবু সেই ক্লান্তিকর নিরানন্দ দিনগুলোকে যথাসম্ভব আমোদের মধ্যে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করলে সবাই। জন ব্লক তার হাসির গল্প আর মজার মন্তব্যে বেশ জমিয়ে রাখলে।

মাঝে-মাঝে বেড়াতে-বেড়াতে চারদিক দেখে আসতো তারা । তাকাতো দিগন্তের দিকে, যেখানে সমুদ্র আর আকাশ একাকার হ'য়ে গেছে । কিন্তু দিনগুলি কোনোরকমে এইভাবে কাটিয়ে দিতে পারলেও রাত্রি যেন আর কাটতে চায় না । আবার আশঙ্কা ও উদ্বেগ ফিরে আসতো তখন, ফিরে আসতো জংলিদের আকস্মিক আক্রমণের আতঙ্ক আর দুর্ভাবনা ।

উনত্রিশে জানুয়ারির সকালবেলাটাও ঘটনাহীনভাবে একঘেয়ে কেটে গেলো । দিগন্ত লাল ক'রে সূর্য উঠলো অন্যদিনের মতোই । দিনটা যে খুব গরম হবে, তার আভাস পাওয়া গেলো সকালেই । অত্যন্ত মৃদু বাতাস বইছিলো । রকমসকম দেখে বোধ হ'লো হয়তো সন্ধের আগেই বাতাস বন্ধ হ'য়ে যাবে ।

মধ্যাহ্নভোজনের পর কাপ্তেন গুড জাকের সঙ্গে বেরুলেন স্টোর-হাউস থেকে ; আর্নেস্টি আর মিস্টার য়ুলস্টোন ব্যাটারির টিলার চুড়োয় পাহারা দিচ্ছিলেন তখন ; কাপ্তেন গুডের উদ্দেশ্য ছিলো তাঁদের বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে তিনি আর জাক পাহারার ভার নেবেন । কিন্তু চারজনের সাক্ষাৎ হ'তেই নতুন-একটি বিপদের সম্ভাবনা উঁকি মেরে গেলো ।

দেখা গেলো, জংলিদের বারোটি নৌকো একে-একে জ্যাকেল রিভারের মুখে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে, প্রত্যেকটিতেই জংলিরা ভিড় ক'রে আছে । জংলিদের ক্যানুতে সাত-আটজন ক'রে লোক ধরতো : জাক যখন জংলিদের হাতে বন্দী হয়েছিলো, তখন এই জিনিশটি লক্ষ করেছিলো । প্রথমটা সকলে ভাবলেন, অন্যদিনের মতো আজকেও জংলিরা মাছ ধরতে বেরিয়েছে । কিন্তু তাহলে দলশুদ্ধু কেন ? ব্যাপারটা একটু বেখাপ্পা ঠেকলো । দুরবিনের সাহায্যে দেখা গেলো, দলের প্রত্যেকটি লোকই এসে ক্যানুতে উঠেছে, একজনকেও রক-কাসলে ব'সে থাকতে দেখা গেলো না । তবে কি তারা সবাই নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড ছেড়ে ফিরে যাচ্ছে ? কিন্তু তাদের হাবভাব সে-সম্ভাবনাও দেখা গেলো না । খুব সম্ভব, তারা শার্কস্ আইল্যাণ্ডে এসে চড়াও হবে । জোয়ার আরম্ভ হবে দেড়টার সময়. আর দেড়টা বাজতে তখন আর বেশি বাকি ছিলো না । কাপ্তেন গুড বললেন, 'জোয়ার এলেই তো জংলিরা ক্যানু ছাড়বে, তখন এদের আসল মৎলবটা বোঝা যাবে ।'

তক্ষুনি স্টোর-হাউসে গিয়ে মসিয়ঁ জেরমাটকে খবর দিলে আর্নেস্টি । তৎক্ষণাৎ সকলে ব্যাটারিতে এসে বন্দুক হাতে হ্যাঙারের নিচে যে-যার অবস্থান নিলে ।

বেলা একটার পর নদীতে যখন জোয়ারের ক্ষীণ চাঞ্চল্য জাগলো, তখন ক্যানুগুলো নদীর পূর্বতীর ধ'রে ধীরে-ধীরে এগুতে লাগলো । যতটা পারা যায় শার্কস্ আইল্যাণ্ড থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করলে তারা, কেননা এরমধ্যেই তারা আগ্নেয়াস্ত্রের মহিমা কিছুটা টের পেয়ে গিয়েছিলো । এবার তাদের রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছিলো, সম্ভবত তারা দ্বীপ পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবার সংকল্প করেছে । জোয়ার এসে ক্যানুগুলোর গতি বাড়িয়ে দিলে, কিন্তু তখনও তারা তীর ঘেঁষেই এগিয়ে যেতে লাগলো । সম্ভবত কেপ-ঈস্টে ঘুরে যাবার মৎলব করেছে তারা । সাড়ে-তিনটির সময় তারা কেপ-ঈস্ট আর ডেলিভারেন্স বে-র মাঝখানে এসে পড়লো । তারা যে দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইলো না সন্ধের সময় । শেষ নৌকোটি পর্যন্ত অন্তরীপ ঘুরে গিয়ে অপরপ্রান্তে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, ইতিমধ্যে ব্যাটারি থেকে কেউ একতিলও নড়েনি । যখন শেষ নৌকোটিও অন্তরীপের ওপাশে অদৃশ্য হ'লো তখন সকলের আনন্দের আর সীমা থাকলো না । শেষ পর্যন্ত বিনা রক্তপাতেই

তবে জংলিদের হাত থেকে নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ড রক্ষা পেলো। এবার তাহ'লে রক-কাসলে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবে সবাই! হয়তো জংলিরা দ্বীপের বিশেষ কিছু ক্ষতি ক'রে যায়নি। এখন শুধু একমাত্র কাজ হ'লো *ইউনিকর্নের* আগমনের প্রতীক্ষা করা।

জাক তো তখনই রক-কাসলে রওনা হওয়ার জন্যে অস্থির হ'য়ে পড়েছিলো, অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে তাকে সকলে শান্ত করলে। রাত্রিটা শার্কস্ আইল্যাণ্ডেই কাটানো হবে ব'লে ঠিক হয়েছিলো, কেননা জংলিরা সত্যিই দ্বীপ ছেড়ে চ'লে গেছে কিনা, কে জানে? জংলিদের তো আর বিশ্বাস নেই, ওরা যা-তা করতে পারে। হয়তো এটা ওদের টোপ। হয়তো ওরা অন্তরীপের ওপাশে লুকিয়ে থাকতে গেছে গোপনে শেষ আঘাত হানবে ব'লে। পরদিন সব দেখেশুনে ব্যবস্থা করা যাবে ব'লে ঠিক হ'লো, তারপরে সবাই বসলো রাত্রি-ভোজনে।

হাসি-ঠাট্টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি শয্যাগ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হ'লো সকলে। এতদিন তো রাতে ভালো ক'রে ঘুমুতে পারেনি কেউ! তবু কেউ-কেউ রাত্রে পাহারার ব্যবস্থা করার কথা তুলেছিলো, কিন্তু মঁসিয় জেরমাট সে-প্রস্তাব বাতিল ক'রে দিলেন। শুধু ব্যাটারিতে দুজন পাহারা দেবে রাত জেগে, আর একবার একজন গিয়ে চারদিক ঘুরে আসবে রাত্তিরে।

মেয়েরা সকলে ববকে নিয়ে স্টোর-হাউসে তাদের নির্দিষ্ট কোঠায় আশ্রয় নিলো; জাক, আর্নেস্টি, ফ্রাংক আর জন ব্লক বন্দুক কাঁধে দ্বীপের উত্তর প্রত্যন্ত অভিমুখে এগিয়ে গেলো। ফ্রিৎজকে নিয়ে কাপ্তেন গুড ব্যাটারির টিলার চুড়োয় উঠে হ্যাঙারের নিচে আশ্রয় নিলেন: রাত্রে তাঁদেরই পাহারা দেবার কথা। জেমস, মিস্টার য়ুলস্টোন আর মসিয়ঁ জেরমাট নিশ্চিন্ত মনে স্টোর-হাউসে শয্যা গ্রহণ করবার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

অন্ধকার রাত্রি, চাঁদ ওঠেনি, একটিও তারা নেই আকাশে। আবহাওয়া গরমে ভারি হ'য়ে আছে। হাওয়া নেই একটুও। রাত আটটায় ভাঁটার টান শুরু হয়েছিলো; জলের সেই ক্ষীণ শব্দ ছাড়া আর-কোনো শব্দ নেই কোনোদিকে।

ফ্রিৎজের সঙ্গে সমস্ত ঘটনাগুলো আবার আলোচনা করতে লাগলেন হ্যারি গুড। *ফ্ল্যাগ* থেকে তাঁদের নামিয়ে দেবার পর যা-যা ঘটেছে, সব কিছু বলাবলি করলেন কাপ্তেন গুড। মাঝে-মাঝে উঠে গিয়ে দুটো অন্তরীপের মধ্যবর্তী সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আসছিলো ফ্রিৎজ। চারদিক স্তব্ধ, এত স্তব্ধ যে শিরশির ক'রে ওঠে শরীর।

আচমকা রাত দুটোর সময় হাত-থেকে-প'ড়ে-যাওয়া কাচের গেলাশের মতো স্তব্ধতা টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেলো। হ্যারি গুড ভয়ে-বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী সর্বনাশ! বন্দুকের আওয়াজ!'

দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম দিকে আঙুল নির্দেশ ক'রে ফ্রিৎজ বললে, 'হ্যাঁ। শব্দটা ওইদিক থেকে এলো।'

'হঠাৎ আবার কী ঘটলো?'

দুজনেই ছুটে হ্যাঙারের বাইরে বেরিয়ে এলেন। অন্ধকারে কিছু দেখা গেলো না। কেবল আরো দু-বার বন্দুকের আওয়াজ হ'লো; এবারে শব্দটি আগের চেয়ে আরো-কাছে।

ফ্রিৎজ বললে, 'ক্যানুগুলো তবে আবার ফিরে এসেছে!"

হ্যারি গুডকে ব্যাটারিতে রেখে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টোর-হাউসের দিকে ছুটলো।

মঁসিয়ে জেরমাট আর মিস্টার য়ুলস্টোনও বন্দুকের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। ফ্রিৎজ গিয়ে দেখতে পেলে, তাঁরা ব্যস্ত হ'য়ে স্টোর-হাউসের উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাকে দেখেই জেরমাট জিগেস করলেন, 'ব্যাপার কী ?'

'সম্ভবত জংলিরা দ্বীপে নামবার চেষ্টা করছে।'

'রাস্কেলরা এর মধ্যেই দ্বীপে নেমে গেছে।'

এ-কথা শুনেই সবাই ফিরে তাকিয়ে দেখলো ব্লক আর আর্নেস্টিকে নিয়ে জাক সেখানে এসে হাজির হয়েছে।

'জংলিরা দ্বীপে নেমেছে তাহ'লে ?'

আর্নেস্টি বললে, 'উত্তর-পূর্ব সীমান্তে যখন এসে ওদের নৌকো ভিড়ছিলো, ঠিক তখনই আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছুই। আমাদের এই ক-টা গুলিতে ওদের ভয় পাওয়ার কিছু ছিলো না। এখন —'

'না, চরম-কিছু নয়,' বলতে-বলতে কাপ্তেন গুড এসে যোগ দিলেন, 'আমরা তাদের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করবো।'

মহিলারাও তখন তাঁদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। জংলিদের আক্রমণ ঠেকাতে হ'লে এখনই সমস্ত জিনিশপত্র, গুলিবারুদ, রসদ প্রভৃতি নিয়ে ব্যাটারিতে চ'লে-যাওয়া উচিত। জংলিরা যে ওদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে চ'লে যাবার ভাণ করেছিলো, এই তথ্যটা পরিষ্কার হ'য়ে গেছে এখন। আসলে তারা ভাঁটার সুযোগ নিয়ে শার্কস আইল্যাণ্ডে নৌকো ভেড়াতে চাচ্ছিলো ; তাদের সে-মৎলব একেবারে ভেস্তে যায়নি। অবশ্য তারা যে-রকম ভেবেছিলো—আচমকা হামলায় দ্বীপবাসীদের বিচলিত ও বিভ্রান্ত ক'রে ফেলবে—তা পুরোপুরি কাজে খাটাতে পারেনি। এখন তাদের উপস্থিতি কারুই অগোচর নেই, তাছাড়া প্রথম সংবর্ধনা তারা বন্দুক মারফৎই লাভ করেছে ; তবু দ্বীপের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত তাদের দখলে ব'লে স্টোর-হাউস আক্রমণ করা তাদের পক্ষে খুব-একটা কষ্টকর ব্যাপার হবে না।

জংলিরা সবাই দ্বীপে নেমে গিয়েছে ব'লে পরিস্থিতি মারাত্মক হ'য়ে উঠলো, কেননা সংখ্যায় তারা দ্বীপবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি। যখন গুলিবারুদ আর রসদপত্র ফুরিয়ে যাবে, তখন সবাইকে অনাহারে মরতে হবে। কিন্তু এই-মুহূর্তে ব্যাটারির সেই ছোটো টিলাটায় গিয়ে আশ্রয় নেয়া ছাড়া অন্য-কিছু করবার নেই। সেখান থেকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও প্রতিরোধ করা যাবে জংলিদের।

মহিলারা ববকে নিয়ে নিঃশব্দে হ্যাঙারে লুকিয়ে থাকবেন ব'লে ঠিক হ'লো। খামকা সময় নষ্ট না-ক'রে তখনই জিনিশপত্র নিয়ে ব্যাটারির দিকে তারা রওনা হ'য়ে পড়লেন। কাপ্তেন গুড, মসিয়ঁ জেরমাট, মিস্টার য়ুলস্টোন, আর্নেস্টি, ফ্রাংক, জেমস আর জন ব্লক বন্দুকে কার্তুজ ভ'রে তৈরি হ'য়ে থাকলেন, আর জাককে নিয়ে ফ্রিৎজ জ্বলন্ত শলাকা হাতে কামান দুটোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে।

চারটের সময় হঠাৎ একটি তুমুল শোরগোল শোনা গেলো। ঝাপসা কুয়াশার মধ্যে দেখা গেলো, একদল কালোছায়া টিলার দিকে এগিয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ গুলি ছুঁড়বার হুকুম দিলেন কাপ্তেন গুড। বন্দুকগুলি একসঙ্গে গর্জন ক'রে উঠলো আর সেইসঙ্গে শোনা গেলো তুমুল আর্তনাদ। বোঝা গেলো, একাধিক বুলেট লক্ষ্যভেদ করছে।

সূর্য ওঠবার আগেই তিনবার জংলিদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হ'লো। শেষবারে জনকুড়ি জংলি টিলার গা বেয়ে উঠে এসেছিলো প্রায়। যদিও তখন বন্দুকের গুলিতে কয়েকজন নিহত হওয়ায় তারা ফিরে যায়, তবু এইটে স্পষ্ট বোঝা গেলো যে তারা যদি সকলে একসঙ্গে টিলায় ওঠবার চেষ্টা করে, তাহ'লে কোনোমতেই তাদের বাধা দেয়া যাবে না। বার-বার বন্দুক ব্যবহার করতে গিয়ে এর মধ্যেই অনেক গুলি নষ্ট হয়েছে ; সুতরাং আবার যদি তারা টিলায় উঠতে চেষ্টা করে, তবে তাদের বাধা দেয়া মোটেই সহজ ব্যাপার হবে না।

দিনের আলো ফুটতেই জংলিরা স্টোর-হাউসের কাছে গাছপালার আড়ালে আশ্রয় নিলে। তাদের রকমসমকম দেখে বোঝা গেলো, দিনের বেলায় তারা আর আক্রমণ করবে না, রাত্রি হ'লে অন্ধকারের সুযোগ নেবে।

দুর্ভাগ্যবশত জেরমাটদের কার্তুজ ইতিমধ্যেই প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিলো। যখন দুটো মাত্র বন্দুক সম্বল রইবে, তখন ঢালুর দিকেই বা কী ক'রে গুলি চালানো যাবে, আর চূড়োই বা রক্ষা করা হবে কী ক'রে ? তখনই পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লো। প্রতিরোধ যখন সম্ভব হচ্ছে না, তখন শার্কস্ আইল্যাণ্ড ছেড়ে ফ্যালকনহার্স্টে গিয়ে প্রমিস্‌ড ল্যাণ্ড কিংবা অন্য কোনোখানে আশ্রয় নিলেই কি ভালো হয় না ? না কি আচমকা সবাই বন্দুক চালাতে-চালাতে ছুটে যাবে জংলিদের দিকে, গুলিবর্ষণ ক'রে বাধ্য করবে তাদের সমুদ্রপাড়ি দিতে ? কিন্তু জেরমারটরা সংখ্যায় মাত্র ন-জন, উলটো দিকে জংলিরা সংখ্যায় এখনও অর্ধশতাধিক।

এমন সময়ে তাঁদের সমস্ত ভাবনার নিরসন ক'রে একঝাঁক বিষাক্ত তীর হিশ-হিশ ক'রে বাতাস চিরে এগিয়ে এলো, কোনো-কোনো তীর গিয়ে বিঁধলো হ্যাঙরের ছাদে। জন ব্লক বললে, 'ওরা তাহ'লে রাত্রির জন্যে আর অপেক্ষা করলো না শেষ পর্যন্ত !'

এবারকার আক্রমণটা হ'লো সবচেয়ে মারাত্মক, কেননা জংলিরা একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠেছিলো। মরিয়া হ'য়ে বুলেট আর কামানের গোলা উপেক্ষা করলে তারা। উপরন্তু গুলিবারুদ ফুরিয়ে যাচ্ছিলো ব'লে শিথিল অগ্ন্যুদ্‌গারের সুযোগ নিলে তারা। জংলিদের কেউ-কেউ বুকে হেঁটে হ্যাঙারের কাছে এগিয়ে এলো। ছোটো কামান দুটি তৎপর হ'য়ে তাদের অনেককেই ছিন্নভিন্ন করলে বটে, কিন্তু অন্যরা উঠে এসে হাতাহাতি লড়াই শুরু ক'রে দিলে। কুড়ুল এবং বর্শা উন্মাদের মতো ব্যবহার ক'রে জংলিদের ছিন্নভিন্ন করা গেলো বটে, কিন্তু তাতে ক'রেও বিপদের আশঙ্কা পুরোপুরি গেলো না।

কেননা নিচের দিকের জংলিরা আবার আক্রমণের জন্য তোড়জোড় করতে শুরু করেছে অথচ শেষ কার্তুজটি পর্যন্ত ব্যবহার করা হ'য়ে গেছে। মঁসিয় জেরমাট সবাইকে নিয়ে হ্যাঙারের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালেন ; এখনি জংলিরা হ্যাঙারের দিকে এগিয়ে আসবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হ'য়ে যাবে। জংলিরা প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছে এতক্ষণে ; তারা বিন্দুমাত্র করুণাও দেখাবে না।

সবাই যখন নিশ্বাস বন্ধ ক'রে চরম বিনাশের প্রতীক্ষা করছে, উত্তর দিকে হঠাৎ সেই সময় একটি অগ্ন্যুদ্‌গার গ'র্জে উঠলো। জংলিরা তখন টিলায় উঠছিলো। ওই শব্দ শুনে আতঙ্ক মেশানো বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালে।

'বন্দুকের আওয়াজ !' ফ্রাংক অবাক গলায় চেঁচিয়ে উঠলো।

ব্রক বললে, 'নিশ্চয়ই কোনো জাহাজের বন্দুক ! আমি যদি ভুল ব'লে থাকি তো এরপর আমাকে আহাম্মক এক ওলন্দাজ ব'লে গণ্য করবেন।'

মসিয়ঁ জেরমাট বললেন, 'একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে।'

জেনি ব'লে উঠলো, 'নিশ্চয়ই ওটা *ইউনিকর্ন* !'

আবারও বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেলো—এবার শব্দ আরো কাছে। জংলিরা এবার আর সাহস পেলে না, তক্ষুনি ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলে গাছপালার আড়ালে।

উত্তর দিকে, ফলস-হোপ পয়েন্টের কাছে, একটি ত্রিমাস্তুল জাহাজের পাল দেখা গেলো ; জাহাজটি কেপ ডেলিভারেন্সের দিকে এগিয়ে আসছে। তার মাস্তুলে উড়ছে ব্রিটিশ পতাকা।

জাহাজটিকে দেখেই জংলিরা তাদের ক্যানুগুলোর দিকে ছুটে গেলো ; হুড়োহুড়ি ক'রে ক্যানুতে উঠেই তারা দ্রুতহাতে দাঁড় চালিয়ে এগিয়ে চললো কেপ ঈস্টের দিকে।

ব্রক আর জাক তক্ষুনি হ্যাঙারে ফিরে গিয়ে কামানে ভরলো শেষ চার পাউণ্ড বারুদ, তারপর যখন গর্জন ক'রে উঠলো কামানটি, তখন দেখা গেলো, তিনটি ক্যানু ছিন্নভিন্ন হ'য়ে আরোহীসমেত জলে ডুবে গেলো। জাহাজটিও পুরোদমে এগুতে-এগুতে জংলিদের ক্যানুর উপর তুমুল গুলিবর্ষণ করতে লাগলো। সেই তুমুল অগ্নিবৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পেলে একটিমাত্র ক্যানু—মাত্র দুজন আরোহীকে নিয়ে জংলিদের সেই ক্যানু কেপ-ঈস্ট ঘুরে দূরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

১৫

অবশিষ্ট

দ্বীপবাসীরা যখন জংলিদের হাতে অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলো, *ইউনিকর্ন* তখন ডেলিভারেন্স উপসাগরের মুখে নোঙর ফেলেছিলো। তার মেরামত শেষ হয়েছিলো কয়েকমাসে, আর তারপরেই কাপ্তেন লিট্‌লস্টোন কেপ-টাউন থেকে রওনা হয়েছিলেন নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের উদ্দেশে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের মালিকানা নেবার ভারও ছিলো তাঁর উপর। কাপ্তেন গুডের মুখ থেকে *ফ্ল্যাগ* সম্পর্কিত সমস্ত খবরই শুনতে পেলেন কাপ্তেন লিট্‌লস্টোন। *ফ্ল্যাগ* জাহাজের কী হ'লো, রবার্ট বোরাপ্ট কি প্রশান্ত মহাসাগরে বোম্বেটেগিরি করছে, না কি সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে কোনো ক্রুদ্ধঝড়ের মুখে প'ড়ে জাহাজ-সমেত জলের তলায় চ'লে গেছে, সে-কথা কখনোই সঠিক জানা যাবে না।

রক-কাসলের আশ্রয় যে বিনষ্ট হয়নি, এ-খবর পেয়ে উভয় পরিবারই খুব খুশি হ'লো। জংলিরা বোধহয় তৈরি-করা আস্তানা দেখে দ্বীপে বসবাস করবার জন্যে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলো, খামকা তার কোনো ক্ষতি করবার চেষ্টা করেনি।

ইংল্যাণ্ড থেকে ঔপনিবেশিকগণ মালপত্র সমেত অচিরেই এখানে আসবে ব'লে প্রথমেই আবশ্যক হ'য়ে উঠলো নতুন দালান-কোঠার জন্যে জায়গা পছন্দ করা। ঠিক হ'লো, জ্যাকেল নদীর তারেই নতুন দালান-কোঠাগুলি তৈরি হবে—একেবারে ঝরনাটি পর্যন্ত থাকবে সারি-সারি বাড়ি-ঘর। অর্থাৎ, রক-কাসলই উপনিবেশের প্রথম শহর হিসেবে ধীরে-ধীরে গ'ড়ে উঠবে ব'লেই সকলে সিদ্ধান্ত নিলেন। এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে অদূর ভবিষ্যতে রক-কাসলই হবে নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের রাজধানী, কেননা প্রমিস্‌ড ল্যাণ্ড এবং তার আশপাশের এলাকার মধ্যে এই জায়গাটিরই গুরুত্ব সর্বাধিক। আরো ঠিক হ'লো, ঔপনিবেশিকরা এসে না-পৌঁছুনো অব্দি *ইউনিকর্ন* ডেলিভারেন্স উপসাগরের মুখেই থাকবে, কেননা, সেখান থেকেই উপকূলভাগে নজর রাখা সবচেয়ে সুবিধাজনক।

তিন সপ্তাহের মধ্যেই নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের প্রথম উৎসব অনুষ্ঠিত হ'লো। রক-কাসলের উপাসনাকক্ষে *ইউনিকর্নের* পুরোহিত আর্নেস্ট জেরমাট আর হ্যানা য়ুলস্টোনের বিবাহ সম্পাদন করলেন। নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম-বিবাহকর্ম ব'লে এর একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা যেমন আছে, তেমনি এই বিবাহ দ্বারা প্রথম ঔপনিবেশিকগণ আরো নিবিড় আত্মীয়তায় বাঁধা পড়লেন।

এর ঠিক দু-বছর পর ফ্রাংক বিয়ে করেছিলো ডলি য়ুলস্টোনকে। তখন কিন্তু রক-কাসলের উপসনাকক্ষে বিবাহ সম্পন্ন হয়নি, রীতিমতো একটি গম্বুজ-তোলা গির্জেয় বিশপমশাই মন্ত্র পড়েছিলেন। গির্জেটা তৈরি হয়েছিলো রক-কাসল আর ফ্যালকনহার্স্টের মধ্যকার অ্যাভিনিউতে।

নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের প্রগতির পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং ধারাবাহিক বিবরণ নিশ্চয়ই পাঠকদের কষ্ট ক'রে বলতে হবে না। প্রতি বৎসরই নবাগতের আবির্ভাবে দ্বীপের জনসংখ্যা বাড়তে শুরু করেছিলো; প্রথম বন্দর বানানো হয়েছিলো ডেলিভারেন্স উপসাগরে, তারপরে মন্টরোজ নদীর মোহানায় একটি এবং ইউনিকর্ন উপসাগরে আরেকটি; আস্তে-আস্তে গ'ড়ে উঠলো চারটে জনপদ; য়ুডগ্রেঞ্জ শুগারকেনগ্রোভ, এবেরফুর্ট এবং প্রস্‌পেক্ট হিল; ফলস-হোপ পয়েন্টের নাম পালটে নতুন নামকরণ হ'লো কেপ ডেলিভারেন্স, এবং সেখানে আর কেপ-ঈস্টে দুটি ফৌজিব্যারাক নির্মিত হ'লো। নিয়মিত যোগাযোগের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'লো ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে; তিন বছরের মধ্যেই জনসংখ্যা হ'লো দুই হাজারেরও বেশি, আর প্রতিষ্ঠিত হ'লো স্বায়ত্তশাসন, এবং প্রথম রাজ্যপাল নির্বাচিত হলেন মঁসিয় জেরমাট। এইসব তথ্য যদিও এখানে রুদ্ধশ্বাসে ব'লে দেয় হ'লো, তবু আমাদের কাহিনীর যবনিকা সত্যি-সত্যি নেমেছিলো সেদিন যেদিন জংলিরা দ্বীপ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলো। কেননা, সেই ঝড়—যা জেরমাটদের এই দ্বীপে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিলো—সেই ঝড়ের পর থেকে জংলিদের সঙ্গে লড়াই করা পর্যন্ত যে-দীর্ঘকালটুকুর বিবরণ 'স্যুইস ফ্যামিলি রবিনসন,' 'রবিনসনদের দ্বীপ' এবং এই গ্রন্থে বিবৃত হ'লো, তা-ই তো যথেষ্ট এই তথ্যটা প্রমাণ করতে, যে, অধ্যবসায়ী মানুষ ঈশ্বরের অশেষ করুণায় আস্থা রাখলে যে-কোনো বিপদই অতিক্রম করতে পারে। এখন এই দ্বীপে একটি আস্ত উপনিবেশ গ'ড়ে উঠেছে—প্রধানত একটিমাত্র পরিবারের অক্লান্ত চেষ্টায়—তখন গ্রন্থের এই শেষপাতায় পৌঁছে কাহিনীকারের সঙ্গে পাঠকও আশা করি কামনা করবেন দিনে-দিনে নিউ-সুইৎজারল্যাণ্ডের সৌভাগ্য আরো উজ্জ্বল হোক।